যখন সাংবাদিক ছিলাম

সানাউল্লাহ্ নূরী

যখন সাংবাদিক ছিলাম

যখন সাংবাদিক ছিলাম

সানাউল্লাহ্ নূরী

www.pathagar.com

যখন সাংবাদিক ছিলাম

সানাউল্লাহ্ নূরী

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা

www.pathagar.com

যখন সাংবাদিক ছিলাম

সানাউল্লাহ্‌ নূরী

প্রকাশক
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম অফিস ঃ নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩

ঢাকা অফিস
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। ফোন ঃ ৯৫৬৯২০১

প্রকাশকালঃ ফেব্রুয়ারী-২০০২

মুদ্রাকর
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
ফোনঃ ৭১১০৫৬২

প্রচ্ছদ ঃ আরিফুর রহমান

মূল্য ঃ ১৫০.০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম
৭২ জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
১৫০-১৫১ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা
৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা

JAKHAN SANGBADIK CHILLAM By : Sanaullah Noori, Published by: Muhammad Nurullah, Director (Publication), Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000. Price : Tk. 150.00 US $ 5/-
ISBN.984-493-075-8

www.pathagar.com

ভূমিকা

জনাব সানাউল্লাহ নূরীর 'যখন সাংবাদিক ছিলাম' শিরোনামে স্মৃতিকথা মূলক লেখাগুলো ধারাবাহিকভাবে 'দৈনিক মুক্তকণ্ঠে' পত্রিকায় ১৯৯৭ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পর এসকল লেখা নিয়ে বই বের করার ব্যাপারে বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ এর সভাপতি জনাব মুনাওয়ার আহমদ বিশেষভাবে উৎসাহী হন। তাঁর আগ্রহের কারণেই 'যখন সাংবাদিক ছিলাম' আজ বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে। এ মহান উদ্যোগের জন্য আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ-এ কর্মরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারির প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ যাঁরা বইটি প্রকাশের ব্যাপারে কঠোর নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন।

এ স্মৃতিকথামূলক বইটিতে ইতিহাস সমৃদ্ধ বহু তথ্য রয়েছে। অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বিভিন্ন ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ করা হয়েছে বিধায় বইটি পাঠক মহলের কাছে সমাদৃত হবে বলে আশা করি।

ফেব্রুয়ারী, ২০০২ — লেখকের পরিবারের সদস্যবৃন্দ
ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

জনাব সানাউল্লাহ নূরী, সর্ব্বসাধারনের 'নূরী ভাই' ছিলেন কিশোর সময় থেকেই আমার অগ্রপথিক। ১৯৫১-৫২ সাল থেকেই আমি চট্টগ্রাম 'তমদ্দুন মজলিশের' সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলাম। ঢাকায় তখন মজলিশের কেন্দ্রিয় নেতা হিসাবে ছিলেন পরম শ্রদ্ধেয় গফুর ভাই (অধ্যাপক আবদুল গফুর), শাহেদ ভাই (মরহুম অধ্যাপক শাহেদ আলী), কাসেম ভাই (মরহুম প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম), নূরী ভাই, (তখন তিনি মজলিশ এর সাহিত্য সম্পাদক), ফরমান ভাই (এডভোকেট ফরমান উল্লাহ খাঁন), মাহফুজ ভাই (মরহুম ডঃ মাহফুজুল হক) এঁরা। মজলিশ এর মুখপত্র 'সৈনিক' এর কর্মকর্তা হিসাবে আমার অত্যন্ত বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন নূরী ভাই আর গফুর ভাই।

নূরী ভাই আজ আমাদের মাঝে নেই। গত ১৫ জুন ২০০১, দিবাগত রাতে তিনি ইন্তেকাল করেন। অনেকদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন তিনি। চিকিৎসার জন্য একাধিকবার দেশের বাইরেও যেতে হয়েছিল তাঁকে। বিগত বেশ কয়েক বছরের কঠোর পরিশ্রম এবং শরীরের প্রতি অযত্ন অবহেলা ছিল তাঁর অসুস্থতার অন্যতম কারণ। এই অসুস্থ শরীর নিয়েও তিনি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সুযোগ পেলেই উপস্থিত হতেন। দৈহিক ভাবে অসুস্থ হলেও মনের দিক দিয়ে সজীব ছিলেন সানাউল্লাহ নূরী। তাঁর সাথে আমার ছিল আরও একটা আত্মিক সম্পর্ক। সেটা জাতীয় শিশু কিশোর সংগঠন 'ফুলকুঁড়ি' নিয়ে। 'জাতীয় সম্পাদক' হিসাবে সম্মানিত সানাউল্লাহ নূরী ছিলেন পেশাগত জীবনে সাংবাদিক। তবে সাহিত্যিক, কবি, ইতিহাসবেত্তা এবং শিশু সংগঠক হিসাবেও তিনি ছিলেন সাবলীল। তিনি ছিলেন 'ফুলকুঁড়ির' কেন্দ্রীয় সভাপতি আর আমি চট্টগ্রাম মহানগরী শাখার সভাপতি।

১৯২৮ সালের ২৪ মে লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি থানার চর ফলকন গ্রামে তাঁর জন্ম। তাঁর বাবা মওলানা মুহাম্মদ সালামত উল্লাহ ছিলেন খিলাফত আন্দোলনের একজন সংগ্রামী কর্মী। জনাব নূরী প্রথমে নিজ গ্রামে ও পরে নেত্রকোনায় তিনি শৈশব কাটান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েশন করেন। পারিবারিক আবহের আনুকুল্যে 'নূরী ভাই' অনেক অপরিণত বয়সেই সাহিত্য জগতে পা রাখেন। দশম শ্রেণীতে পড়ার সময়ই আসকার ইবনে শাইখ সম্পাদিত একটি শিশু পত্রিকায় 'আন্ধার মানিকের রাজকন্যা' নামে তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশিত হয়। সাংবাদিকতা শুরু করেন ১৯৪৭ সালে 'ইনসান' পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক হিসাবে। পরবর্তীতে

www.pathagar.com

বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে পর্যায়ক্রমে বার্তা সম্পাদক, সম্পাদক ও প্রধান সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৮২ সালে সাহিত্য ও সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদানের জন্য তাঁকে একুশে পদক দেয়া হয়।

তমুদ্দন মজলিশ কর্তৃক আয়োজিত স্মরণ সভায় আমি নৈতিক ও জাতীয় দায়িত্ববোধ থেকে নূরী ভাবীকে বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ থেকে তাঁর রচনাবলী প্রকাশের জন্য প্রস্তাব করি। আমার প্রস্তাবে তিনি সানন্দে সম্মতি দেন। 'যখন সাংবাদিক ছিলাম' সেই রচনাবলী প্রকাশনার প্রথম পদক্ষেপ। তাঁর জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে ও সময়ে ইতিহাসের পটভূমিতে তখনকার নানা ঘটনাকে নিয়ে তথ্য সমৃদ্ধ করেছেন তিনি এই বইতে। 'যখন সাংবাদিক ছিলাম' শিরোনামে 'দৈনিক মুক্তকণ্ঠ' পত্রিকায় ১৯৯৭-১৯৯৯ এ বইয়ের লেখাসমূহ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

সত্তরের দশকে জনাব নূরী রাশিয়া ভ্রমণের কাহিনী এঁকেছেন রাশিয়ার ইতিহাসের গভীর থেকে। সাংবাদিকের দৃষ্টিতে তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা দিয়েছেন এবং ঐসব ঘটনার সাথে শক্তিমান মানুষের নানা বিষয়কে তুলে ধরেছেন। ঘটনা পরম্পরায় তিনি প্রতিটি মুহূর্তকে ধারাবাহিক ছকে বেঁধেছেন এবং প্রতিটি বিষয়কে তিনি গবেষকদের মত রেফারেন্সিং করেছেন।

এ বইটি মূলতঃ একটি স্মৃতিকথা। একজন সাংবাদিক হিসেবে 'নুরী ভাই' তাঁর সময়ের দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন ঘটনার বস্তুনিষ্ঠ রিপোর্টিং করেছেন এ বইটিতে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিতে এশিয়া, ইউরোপের বহু ঘটনায় সমৃদ্ধ হয়েছে বইটি। এছাড়া আমাদের প্রিয় স্বাধীনতার জন্য অনেক মানুষের সংগ্রাম মুখর জীবন, উৎসর্গীকৃত আত্মদানের ঘটনা আর তাঁদের আকাংখা চিত্রিত হয়েছে বইটিতে। তাই স্বাভাবিক ভাবেই বইটি যে কোন পেশার মানুষের অবশ্য পাঠ্য এবং সংগ্রহে রাখার মত প্রয়োজনীয়।

ফেব্রুয়ারী, ২০০২
ঢাকা

(মুনাওয়ার আহমদ)
সভাপতি
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.pathagar.com

গোটা জীবনটাই আমার কেটে গেল বুড়ো বটের তলায় বসে বেসুরো বাঁশি বাজিয়ে। অনেকটা হুতম পেঁচার মতন বদ্খত বেতাল একটা জীবন। যার মধ্যে ছন্দ নেই, মাত্রা-যতি নেই, তাল-লয় নেই। শুধুই কেবল অমিল আর ছন্দপতন। রাতে জেগে থাকো, মাঝেমধ্যে কর্কশ গলায় গান গাও, ঘুম ভাঙাও নিদ্রাতুর লোকেদের। আর দিনের বেলা লম্বা দিয়ে ডাকাতে থাক নাক।

শুরুতে ভাবতেও পারিনি, এরকম পেঁচকতুল্য দিনগত পান ক্ষয়ের একটা জীবন হবে আমার। যার চটকদার নাম সাংবাদিকতা, সাংবাদিক-পেশা। বাইরে থেকে মনে হবে, আহা এর চাইতে মহৎ পেশা বুঝি আর কিছু নেই। একটু সমাজ সচেতন যাঁরা তাঁরাই বলেনঃ যদি সমাজটাকে শুধরাতে চাও তবে ছুটে যাও একজন ভাল সাংবাদিকের কাছে। কলম ধরলেই পাল্টে দিতে পারেন তাঁরা বিশ্ব সংসারের চেহারা। রাশ ধরতে পারেন অস্থির রাজনীতির বল্গাহীন ঘোড়ার। কার তোয়াক্কা করেন একজন সাহসী সাংবাদিক?

জানি না কে দিয়েছে কলমযোদ্ধা নামটা। সাংবাদিকেরা নাকি এই বিশেষণটার অধিকারী। শুনতে দারুণ ভালো লাগে, মনটা দরাজ হয়, অহংকারে টান টান হয় বুকের ছাতিটা। ওই মুহূর্তে মনে হবে আমার মতন বুঝি যুদ্ধজয়ী বীর আর কেউ নেই পৃথিবীতে। কিন্তু পর মুহূর্তেই ঠুন্‌কো একটা ফানুস হয়ে ফেটে যায় সমস্ত অহংকার যখন চোখের সামনে ভাসে জহুর হোসেন চৌধুরীর মুখ। কি তীক্ষ্ণধারই না ছিলো এই সাংবাদিকের কলম। পরোয়া করতেন না তিনি ফিল্ড মার্শাল আইয়ুবের মতন শক্তিধর ডিক্টেটরকেও। কলমের মুখে আগুন ঝরাতেন। সমালোচনার তলোয়ারে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করতেন রাজনীতির ভূঁইফোড়দের। তখন মনে হতো এক জহুর হোসেন একাই একশ। তাঁর মতন আর দশজন সাংবাদিক থাকলে পাল্টে যেতো দেশটার চেহারা। উচ্ছন্নে যাওয়া রাজনীতি পেত শক্ত মাটির ভর। গণতন্ত্র হতো নিরাপদ। ঘোড়দৌড় বন্ধ হতো অপসংস্কৃতির। সুস্থতা ফিরে আসতো সমাজে।

হ্যাঁ, তাঁর মতন না হলেও কমবেশি কিছু সাহসী সাংবাদিক সে যুগেও ছিলেন। কলমেও ছিলো তাঁদের ধার। কিন্তু শত লিখেও তাঁরা কি পেরেছেন রাজনীতিকে স্থিরতা দিতে? বিপরীত স্রোতকে উজানে নিয়ে যেতে? কিংবা ক্ষত-বিক্ষত সমাজটার চালচিত্র বদলাতে ? এ কথা সত্য, মানুষের বিবেকের ওপর কিছুটা প্রভাব অবশ্যই ফেলেছেন তাঁরা। কিন্তু পারেননি অনাচারের গড্ডলিকা প্রবাহের গতি রুখে দিতে। এ কাজ রাজনীতিকের, সাংবাদিকের নয়। তবুও অনেকে মনে করেন, দায়টা সাংবাদিকদেরই বেশি। এটা মস্ত একটা ভুল। কারণ, সাংবাদিক রাষ্ট্রনেতা নন। দলনেতাও নন। রাজপথে ঝড় তুলে, তুলকালাম করে তিনি বসেন না সরকারের উঁচু গদিতে। রাষ্ট্রপতি হন না, প্রধানমন্ত্রী হন না, এমনকি উজির-নাজিরও না।

www.pathagar.com

উজিরের বেলায় হয়তো এ পেশার কাউকে কাউকে দু'চারবার বাছাই করা হয়েছে। কিন্তু তাঁরা জহুর হোসেন ছিলেন না, আবদুস সালাম কিংবা কাজী ইদ্রিস ছিলেন না। ওজারতির মোহ যে ক'জন হাতে গোনা সাংবাদিককে পেয়ে বসেছিল তাঁরা হঠাৎ সিঁড়ি টপকে উপরে উঠেছিলেন। কিন্তু সেসব ঘটনা অন্য এক কাহিনী। ব্যতিক্রমী ঘটনা মাত্র। নুন আনতে যাঁদের পান্তা ফুরায় অথচ কলম নিয়ে যুদ্ধ করতে হয় অষ্টপ্রহর- সেসব সংগ্রামী সাংবাদিকের সঙ্গে এ রকম সিঁড়ি টপকানোর ঘটনার কোন মিলই নেই।
যদি তাই হতো, তাহলে শেষ জীবনে অর্থকষ্টে ভুগতে হতো না জহুর হোসেনকে। প্রায় বিনা চিকিৎসায় মরতে হতো না হাসপাতালে। তীক্ষ্মধার লেখার জন্য প্রচুর প্রশংসা কুড়িয়েছেন এরকম একজন সাংবাদিককে আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে হয়েছে দীর্ঘদিন উপোসে কাটিয়ে।

এরকম মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি খুব একটা কম ঘটলেও এর কাছাকাছি যন্ত্রণা আছে কমবেশি প্রতিটি আত্মনিবেদিত সাংবাদিকের জীবনে। তাই দুঃখ হয়, কেন সাংবাদিক হলাম। কেন বেছে নিলাম ঘানি টানার এ পেশা। তবে সুখকর যে কিছু নেই তাও নয়। সেখানে বেদনার মধ্যেও আছে আনন্দ। অনিশ্চয়তার মধ্যেও আছে বরাভয়ের হাতছানি।

মাঝেমধ্যে এমন দিনও আসে, যা স্মৃতিকে জড়িয়ে রাখে গর্ডিয়ান-গ্রন্থির মতন। অথবা সেলুলয়েডের ফিতায় ধরে রাখা রঙিন ফিল্মের চলমান দৃশ্যের মতন। জানালা দিয়ে চোখ বাড়ালেই যাকে ছোঁয়া যায়, দেখা যায়। যার পদধ্বনি শুনলে কখনো কান্না পায়। আবার কখনো স্বপ্ন নামে দু'চোখ জুড়ে। এমন কিছু ঘটনাও আছে একজন ভগ্নদূত- সাংবাদিকের জীবনে, যার ঘ্রাণ ঘাস ফুলের মতন। পথ চলতে বাতাস ভুরভুর করে যার সৌরভে। এমন কিছু মুহূর্ত থাকে, যা ঝিনুকের খোলের মাতৃগর্ভা মুক্তোর মতন ঝকমক করে স্মৃতির ঝাঁপি খুলে বসলেই। কখনো এরকম মুহূর্তের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় শৈশবে, কখনো যৌবনে। আবার কখনো পড়ন্ত বেলায়। আমার শৈশবে একবার হঠাৎ করে এলো অমন একটি মুহূর্ত। ভাবতে এখন অবাক লাগে, তখন কত ছোট ছিলাম আমি। কেবল সাত বছরের সিঁড়িতে পা বাড়িয়েছি। গ্রামের পাঠশালার প্রথম শ্রেণীতে পড়ছি তখন। এর আগে বিদ্যাসুন্দর বাল্যশিক্ষার পাঠ শেষ হয়ে গিয়েছিল। এখনো চোখে জ্বলজ্বল করছে মোটা কাগজের মলাটে মুদ্রিত কুইন ভিক্টোরিয়ার ছবিটি। নিচে লেখা ছিলঃ 'রাজ-রাজেশ্বরী ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া'। চাঁদির টাকার পিঠেও উৎকীর্ণ থাকতো তাঁর মস্তক। বাবাকে জিজ্ঞেস করে জেনেছি, ভিক্টোরিয়া ছিলেন এক সময়ে ভারত-সম্রাজ্ঞী।

সেকালের পাঠশালায় শিশু ক্লাস থেকেই শুদ্ধ করে বাংলা বানান শেখা আর পড়ার ওপর জোর দেয়া হতো। মুখস্থ করতে শেখানো হতো শিশুতোষ ছড়া, কবিতা আর নামতা।

প্রথম শ্রেণীতে উঠতে হলে তরতর করে পড়তে হতো যুক্তাক্ষরের গদ্য এবং

www.pathagar.com

পদ্য। এটা ছিল শিশু শ্রেণী থেকে প্রথম শ্রেণীতে ওঠার যোগ্যতা। যুক্তাক্ষরের লেখা পড়তে না পারলে শিশু ক্লাসেই ঝুলিয়ে রাখা হতো এক -দুই বছর। গুরু ট্রেনিং-পাশ পন্ডিত মহোদয়দের বেতের মার খেতে হতো পড়া না পারলে। অনেক সময় কপালে পাতিলের ভাঙ্গা টুকরো বসিয়ে পাঠশালার মাঠে ঠা-ঠা রোদে সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড় করিয়ে রাখা হতো পুরো একটা ঘন্টা। কপাল থেকে পাতিলের টুকরোটা নিচে পড়লেই ফের পিটুনি। এ কঠিন সাজাটাকে বলা হতো 'সূর্য-চ্যাংগা'। গ্রামের অনেক ছেলেকেই স্কুল ছাড়তে দেখেছি এই শাস্তিটার ভয়ে।

আজকাল পাঠশালায় মারপিটের নিয়ম প্রায় উঠে গেছে। কারণ উল্টো এখন বখাটে ছেলেদের হাতেই মার খেতে হয় শিক্ষকদের। সেকালের ছাত্র পেটানোর নিয়মটা মধ্যযুগীয় হলেও একটা দিক এর ভাল ছিল। সাজার ভয়ে নিয়মমাফিক পড়াশোনা করতো ছেলেরা। ফাঁকি দিতে সাহস পেতো না। ফলে তাদের বানান হতো শুদ্ধ। বাক্য গঠন হতো নির্ভুল। আজকালকার বাংলার উচ্চ ডিগ্রিধারীদের যেমন ভুল বাংলা লিখতে দেখা যায় সেকালের ম্যাট্রিক পাশদের কাছে ছিলো তা কল্পনার বাইরে। এমন কি মাইনর পাস ছাত্ররাও নির্ভুল বাংলা লেখায় ছিলো পারঙ্গম। আমার ভাগ্য ভালো, বাবা-মা দু'জনের কাছেই লেখাপড়ার হাতেখড়ি হয়েছিলো পাঁচ বছর বয়সে। তাই অ-আ, ক-খ'র পাঠটা ছিলো আমার নিখুঁত। কারণ, দু'জনই ছিলেন তাঁরা সাবেক যুগের আলোকপ্রাপ্ত মানুষ। তার ওপর ছিলেন বই আর পত্র-পত্রিকার পোকা। বাবা দিনের পাঁচ-ছয় ঘন্টা পড়ে থাকতেন মোটা মোটা কেতাব নিয়ে। সংবাদপত্র পেলে আটখানা হতেন খুশিতে। যেন হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছেন গোটা দুনিয়াটা। খুঁটে খুঁটে পড়তে থাকতেন প্রতিটি খবর। অবসর পেলেই মাও মজে থাকতেন গল্প-উপন্যাস নিয়ে। কখনো পড়তেন বটতলার পুঁথিপত্র।

এবার আসি আমার নিজের প্রসঙ্গে। ঘরে লোখাপড়ার পরিবেশ থাকায় অল্প বয়সেই আগাম দু-একটা সিঁড়ি ভাঙতে পেরেছি স্কুলের। কখনো সূর্যমুখো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার সাজা পোহাতে হয়নি আমায়। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ওঠার আগেই ভালো মতন রপ্ত করতে পেরেছি ছোটদের গল্পের বইয়ের ভাষা। এসব বইয়ের মধ্যে আমার প্রিয় ছিল 'ঠাকুর মা'র ঝুলি' 'ঠাকুর দাদার ঝুলি', 'সিন্দাবাদের সফরনামা', 'সুলতান মাহমুদ ও পেঁচকের গল্প' ইত্যাদি।

১৯৩৫ সালের কথা। বোধকরি ডিসেম্বর মাস হবে। জাঁকিয়ে শীত পড়েছিল সেবার। বাবা রোদ পোহাচ্ছিলেন বাইর-বাড়ির আঙিনায় চেয়ারে বসে। হঠাৎ দেখি, একটি লোক তাঁর হাতে দিয়ে গেল বিরাট আকারের একখানা কাগজ। অনেকগুলো পৃষ্ঠা ছিল ভেতরে। কাগজটা পেয়েই লুফে নিলেন তিনি। আমি তাঁর কাছে এসেছিলাম বোধকরি কোনো কিছুর বায়না নিয়ে। কাগজটার মাথায় লেখা ছিলোঃ 'দৈনিক যুগান্তর'। একটু নিচে বড় বড় হরফে লেখাঃ 'ইতালির আবিসিনিয়া আক্রমণ'। সহজেই বাক্যটা পড়তে পারলাম আমি।

সেই প্রথম একটি দৈনিক পত্রিকা চোখে পড়লো আমার। সাদা পৃষ্ঠাগুলোর

www.pathagar.com

ভেতর থেকে বেরুচ্ছিলো কেমন মিষ্টি একটা গন্ধ। বড় ভালো লাগছিল আমার গন্ধটা। এরকম বিশাল আকারের কোন ছাপার কাগজ আগে কখনো দেখিনি। ব্যাপারটা ছিল আমার কাছে এক অপার বিস্ময়ের। কাগজের পাতাগুলো অমন প্রকাণ্ড কেন, কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করতেই বাবা হেসে বললেনঃ এটা একটা দৈনিক পত্রিকা। এরকম বড়ই হয় দৈনিকের পাতা।

কৌতূহল আরো বাড়লো আমার। জিজ্ঞেস করলামঃ এতসব কি লেখা আছে এতে? আর কেমন ছোট ছোট লেখাগুলোর হরফ। ওই লাইনটা অমন বড় হরফের কেন? আরো কয়েকটা লাইনও দেখছি বড় হরফের।

আমার কৌতূহল দেখে বাবা অবাক হয়ে তাকালেন আমার দিকে। হয়তো ভাবছিলেন এক রত্তি একটা ছেলে। তার মনে হঠাৎ কোথা থেকে এসে ভিড় করলো এতসব প্রশ্ন। এত আগ্রহই বা জাগলো তার কেমন করে? বোধকরি তিনি খুশি হয়েছিলেন আমার অজানাকে জানবার ঔৎসুক্য দেখে। হেসে বললেনঃ বাপ্‌রে বাপ্‌, এত কিছু জানতে চায় আমার ছেলে! ভবিষ্যতে দেখছি তুই সাংবাদিক হবি। একটু দম নিয়ে ফের বললেঃ শোন্ বলছি, আবিসিনিয়া আক্রমণটা একটা বড় খবর। অমন খবর খুব বেশি হয় না। তাই পত্রিকার লোকেরা মাথার লাইনটা ছেপেছে অমন বিরাট বিরাট গোট গোট হরফে। আশেপাশের বড় হরফের লাইনগুলোর নিচের খবরেও আছে জানবার মতন অনেক কিছু। বড় হলে সব বুঝতে পারবি তুই।

এরপরও আশ মিটলো না আমার। জিজ্ঞেস করলামঃ ইতালি কোথায়? আর কোথায় আবিসিনিয়া? কেন ইতালি আক্রমণ করলো আবিসিনিয়াকে?

সেকালে ইথিওপিয়াকে আমাদের দেশে বলা হতো আবিসিনিয়া। বয়স বাড়লে জেনেছি এটা নাকি কাফ্রিদের দেশ। লোকগুলো দেখতে খুবই কালো। চওড়া তাদের নাক। কিন্তু খুব সাহসী তারা।

আমার উৎসাহ দেখে গল্পের মতন করে বাবা মহাদেশগুলোর ধারণা দিলেন। আবিসিনিয়া আর ইতালি কোথায় জানালেন। ইতালির ফ্যাসিস্ট ডিক্টেটর মুসোলিনির অনাচারের কথা বললেন। বললেন আবিসিনিয়ার সম্রাট হাইলে সেলাসির কথা।

আমার চলার পথে ভুল করেও দু-চারটি ফুল বিছিয়ে রাখেননি বিধাতা। শুধু কাঁটা, কেবল কাঁটাই ছিল আমার চারপাশে ছড়ানো। তার ওপর দিয়ে চলতে গিয়ে অবিরাম রক্ত ঝরেছে গায়ে। ছটফট করেছি যন্ত্রণায়। নাভিশ্বাস উঠেছে এই বুঝি শেষ হয়ে যাবো। সাংবাদিকের জীবন মানেই এরকম কাঁটাঘের পথ ধরে চলা। আর হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়া।

আমার একান্ত কথা আরো করুণ। ভিন্ন ধরনের একটি ট্র্যাজেডি। শৈশব থেকেই ঘাসের-ওপর-বসা প্রজাপতির পেছনে ছুটেছি। কখনো কস্তুরি-মৃগ ভেবে পিছু-ধাওয়া করেছি সোনার হরিণের। এই পাবো পাবো মনে করে হৈ-হল্লাও কম করিনি। কিন্তু শেষে যা পেয়েছি তা হলো এক শূন্যঘট মাত্র। শেক্সপীয়রের ভাষায়

www.pathagar.com

বলতে গেলে আমার জীবন ছিলো সত্যি সত্যি নির্বোধের কথিত একটি উপাখ্যান। যার সবটাই হাঁকডাকে ভরা। কিন্তু পুরোপুরি অর্থহীন।

হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে চলবার বয়স থেকেই এক চঞ্চল শিশু ছিলাম আমি। নতুন কিছু দেখলেই মেতে উঠতাম আনন্দে। দৌড়-ঝাপ দিতে চাইতাম, ফেটে পড়তাম উল্লাসে। মনে হতো কী সুন্দরই-না পৃথিবীটা। আকাশটাকে মনে হতো সারাটাই তার আদিগন্ত নীলের একটা সাগর। ডানা মেলে পাখির মতন তার বুকে ভেসে বেড়াতে ইচ্ছা করতো। সেখান থেকে কখনো ঘূর্ণিঝড় প্রলয়ের দূত হয়ে নামতে পারে তা কল্পনায়ও আসেনি। তখন ভাবতেও পারিনি আকাশে যুদ্ধ হতে পারে। বোমারু বিমান রাশি-রাশি আগুন ঝরিয়ে ছারখার করে দিতে পারে নিচেকার শান্তিপূর্ণ লোকালয়গুলোকে। সংবাদপত্র নিয়ে যখন কেবল নাড়াচাড়া করতে শুরু করি ঠিক এরকম একটা বয়সে হঠাৎ একদিন দেখি মাথার উপরকার সেই খোলা নীল আকাশটায় ঝাঁক-ঝাঁক জাপানি বোমারুর আনাগোনা।

কোথায় মিলিয়ে গেলো আমার পাখি হয়ে ওড়ার স্বপ্নটা। আনন্দের বদলে ভয় এসে ছেঁকে ধরলো ভীরু প্রাণটাকে। সাক্ষাৎ যমদূত হয়ে কয়েকটি গ্রামকে চোখের নিমিষে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেলো সেসব যুদ্ধ দানব। বোমার আগুনে পুড়ে ছাই হলো ফেনী শহরের পাশেকার একটা তল্লাটের সমস্ত ঘরবাড়ি। প্রাণ হারালো নিরীহ গ্রামবাসী। পোড়া কাঠ হয়ে মরলে কোলের শিশুরা। শমসেরনগরেও হানা দিয়েছিলো সেই লাশ খেকো হিংস্র শকুনের ঝাঁক। হানা দিয়েছিল পতেঙ্গায়, চট্টগ্রাম বন্দরে। অনেক জাহাজ ডুবলো কর্ণফুলির মোহনায়, ক্ষতবিক্ষত হয়ে মারা গেলো শয়ে-শয়ে নাবিক, সারেং -সুকানি খালাসি। নদীর তীরের মাঠগুলোতে চরে-বেড়ানো গরু-ছাগলও রেহাই পায়নি আকাশ-যুদ্ধের সেই তাণ্ডব থেকে। সারা বাংলা জুড়ে ছড়িয়ে পড়লো জাপানি বোমা হামলার বিভীষিকা। শুনেছি কলকাতার খিদিরপুর ডকেও বেশ কয়েকবার হয়েছে বিমান হামলা।

হাজারে-হাজারে মানুষ শহর ছেড়ে পালিয়েছিলো প্রাণের ভয়ে দূরবর্তী গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলো তারা। খাঁ-খাঁ করছিল লোকশূন্য মহানগরী। আমাদের এলাকার অনেক জাহাজি শ্রমিক কাজ করতেন খিদিরপুরে। তারাও প্রাণ হাতে করে নিয়ে ছুটে এলেন গ্রামের বাড়ি। তাঁদের মুখে শুনেছি বোমার খোরাক হয়েছে অসংখ্য ডক শ্রমিক। আহতদের স্থান সংকুলান হয়নি হাসপাতালে। সব মিলিয়ে হতাহতের সংখ্যা ছিল এক লাখের কাছাকাছি। বৃটিশ সরকারের খতিয়ানে সংখ্যাটা দেখানো হয়েছিলো অনেক কম।

বিশ্বযুদ্ধ কী এদেশের মানুষ চল্লিশ-একচল্লিশেও তা আঁচ করতে পারেনি। খবরের কাগজ পড়ে শুধু জেনেছে ইউরোপে চলছে ভয়ংকর এক হানাহানি। হিটলারের নাজি বাহিনী রাত পোহাবার আগেই দখল করে নিচ্ছে একটার-পর-একটা দেশ। বোমা মেরে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে শহরের পর শহর। কিন্তু সেই যুদ্ধ যখন সিঙ্গাপুর, মালয়-বার্মা হয়ে আসামের কোহিমা-মনিপুরে থাবা বিস্তার করলো তখন তারা অনুভব

www.pathagar.com

করলো তার উত্তাপ। এরপর ঘরের দুয়ারে এসে হানা দিতেই আর ধড়ে প্রাণ থাকলো না। আকাশের অনেক উঁচু থেকে মৌমাছির ঝাঁকের মতন একটানা ভন ভনানো শব্দ জাগলেই ভয়ে পিলে চমকে উঠতো লোকের। এই বুঝি আকাশ-দানবগুলো নেমে আসবে নিচে। আর ভয়ংকর গর্জন তুলে বোমার মুখ থেকে ঝরাতে থাকবে আগুন। পুড়ে ভস্মসাৎ হবে স্থাবর-জংগম সবকিছু।

আমার মনে কিন্তু তখনো অতোটা দানা বাঁধতে পারেনি আতংক। বোধ করি একটু ডানপিটে ছিলাম তাই। কেমন চাঞ্চল্য অনুভব করতাম বাঁশির দূরাগত ধ্বনির মতন জঙ্গি আর বোমারুর সেই ধাতব শব্দ শুনলে। মাঠে ছুটে গিয়ে তাকাতাম আকাশের দিকে। মা হা-হা করে উঠতেন। আর্তস্বরে চেঁচিয়ে বলতেনঃ ওরে খোকা, যাসনে ওদিকে! বোমা পড়লে আর বাঁচবিনে !

বাঁ থেকে চার্চিল, রুজভেল্ট এবং স্টালিন

আমার চোখ তখন আকাশে। কানেই যেতো না মায়ের কথা। তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখতাম সূর্যের আলোয় কেমন ঝিকমিক করছে বিমানগুলোর ডানা। যেন চক্রাকারে উড়ে চলছে রূপোলি ডানার একঝাঁক চিল। একদিন গুণে দেখলাম ঝাঁকে আছে চল্লিশটি বিমান। পূর্ব-দক্ষিণ কোণ থেকে মেলা করে যাচ্ছে উত্তর-পশ্চিমে। বোধকরি কলকাতা ছিলো তাদের লক্ষ্যস্থল। অথবা অন্য কোনো বৃটিশ সেনাছাউনি। কিংবা মৌলবিবাজারের শমসেরনগর ঘাঁটি। কিংবা গৌহাটি। আসামে জাপানি অভিযান রুখতে পূর্বাঞ্চলের বৃটিশ কমাণ্ড একটি নতুন সেনাছাউনি গড়ে তুলেছিল মাত্র কিছুদিন আগে। ফেনী শহরের পাশের কয়েকটি গ্রাম তুলে দিয়ে সেখানে করা হয়েছিলো একটি সামরিক অ্যারোড্রাম।

তিন-চার মাসের ব্যবধানে পর-পর কয়েকটি সামরিক অ্যারোড্রাম করা হলো

www.pathagar.com

পূর্ববাংলায়। এর একটি ছিল কুমিল্লার ময়নামতিতে। আরেকটি ঢাকার কুর্মিটোলায়। পতেঙ্গা, ফেনী আর শমসেরনগর বিমান ঘাঁটি একই সময়ের করা। জাপান চেয়েছিলো আসাম আর বাংলাদেশ দ্রুত দখল করে নিয়ে ভারতের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে। এই সামরিক বিমান ঘাঁটি আর সেনানিবাসগুলো ছিলো তাদের অগ্রাভিযানের পথে প্রধান বাধা। এগুলিকে গুঁড়িয়ে দেবার জন্যেই তাই তাদের ঘন ঘন বিমান-আক্রমণ।

সিঙ্গাপুরে বৃটিশ প্রতিরোধ চুরমার করে দিয়ে ঝড়োগতিতে তারা দখল করে নিয়েছিলো কুয়ালালামপুর, রেঙ্গুন, আকিয়াব আর আসামের কোহিমা, মনিপুর। আকিয়াবে ছিলো তাদের মজবুত সামরিক বিমান ঘাঁটি। সেখান থেকেই জাপানি জঙ্গি বিমান বহর ঝাঁকে ঝাঁকে এসে হানা দিতো বাংলাদেশে। বঙ্গোপসাগর আর উপকূলবর্তী দ্বীপগুলোর আকাশ ছিলো তাদের আনাগোনার পথ। আমার জন্মস্থান ছিলো সেকালের বিচ্ছিন্ন দুর্গম দ্বীপ রামগতি। যাকে এক সময় বলা হতো উত্তর হাতিয়া। যার তিনদিকে ছিলো প্রায় দশ-দশ মাইল চওড়া প্রমত্তা মেঘনা। আর দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। আমরা ছিলাম জাপানের ভারত-অভিযানের একেবারে প্রবেশমুখে। বোমা ভরতি করে আমাদের মাথার ওপর দিয়েই অভিযানে আসতো তাদের জঙ্গি বিমানের বহর। আবার মিশন শেষ করে একই পথে খোলা আকাশে স্বচ্ছন্দে সাঁতার কেটে উড়ে যেতো আকিয়াব।

বৃটিশের কোনো বিমানকেই সেসময় উড়তে দেখিনি আকাশে। থাকলেই তো উড়বে। ঢাল-তলোয়ারবিহীন নিধিরাম সর্দার ছিলো তখন বৃটিশ-ভারতের বিমান বাহিনী। নতুন গড়া বিমান ঘাঁটিগুলোতে হাতিয়ার বলতে ছিলো কিছু অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গান অর্থাৎ বিমান বিধ্বংসী কামান। আর দু-একটা সাইরেন। জাপানি বিমান আক্রমণের আভাস রাডারে ধরা পড়লে আঁ- আঁ করে উচ্চনাদে বিলাপ তুলতো সাইরেন। আর হানাদার বিমানের ঝাঁক ঘাঁটির আকাশে এলে গোলা ছোঁড়া হতো কামান থেকে। কিন্তু সহজেই এই অবরোধ ভেঙে বেধড়ক বোমা হামলা চালিয়ে যেতো জাপানি জঙ্গি বোমারু বিমানগুলো। তছনছ হতো বৃটিশের অ্যারোড্রাম সেনাছাউনি। ভারি বোমার আঘাতে পুকুরের মতন বড়ো বড়ো গর্ত হতো ঘাঁটিতে আর তার চারপাশে।

বৃটিশ বিমান বাহিনী ছিলো তখন জার্মানি এবং জাপানের তুলনায় অনেক দুর্বল। আবার যা কিছু জঙ্গি বিমান তাদের ছিলো সেগুলোও মোতায়েন ছিলো তাদের ইংল্যান্ডের ঘাঁটিতে। সেসব বিমান দিয়েই তারা রুখবার চেষ্টা করতো হিটলারের আকাশ পথের ঝটিকা-অভিযান। কন্টিনেন্টাল ইউরোপ আর দূরপ্রাচ্যের রণাঙ্গনে আমেরিকান বিমান বহরই কেবল পাল্টা হামলা চালিয়ে যেতো দুই প্রধান অক্ষশক্তির আকাশ অভিযানের বিরুদ্ধে। সেসব মার্কিন বিমানের ছায়াও আমরা বাংলাদেশে কিংবা ভারতের কোথাও দেখিনি। আমেরিকানরাও তখন দিশেহারা হয়ে

www.pathagar.com

পড়েছিলো দুই অতিকায় যুদ্ধ দানবের মত্ততায়। তাছাড়া তারা তখন ছিল প্রাচ্যে প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধ আর পশ্চিমে ইউরোপীয় রণাঙ্গন নিয়ে। তাদের কাছে তখন উপমহাদেশ রক্ষার গুরুত্ব তেমন একটা ছিলো বলে মনে হয় না। থাকলে নিশ্চয় অমন অবাধে আমাদের মাথার উপর দিয়ে চলাচল করতে পারতো না জাপানি জঙ্গি বিমানের বিরাট বিরাট ঝাঁক।

আকাশ অরক্ষিত রেখেই এদেশে নামকাওয়াস্তে একটা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছিলো বৃটিশ সরকার। এটা ছিলো যেন তাদের একটা যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা। আমার আজো হাসি পায় সে সময় তাল গাছের কদর বাড়তে দেখে। জেলা প্রশাসকরা ঠিকাদার নিয়োগ করতেন তাল গাছ কেনার জন্যে। গাছ কেনা হলে পর সেগুলিকে তিনচার টুকরো করা হতো। এরপর আলকাতরা মাখিয়ে গাছের মোটা টুকরোগুলোর নিচে জুড়ে দেয়া হতো রবারের উঁচু চাকা। ঠেকন দিয়ে এগুলোকে এমনভাবে আকাশমুখো করে রাখা হতো যাতে জাপানি বৈমানিকেরা দূর থেকে দেখে মনে করেন এর সবই বিমান-বিধ্বংসী কামান।

পর্যাপ্ত অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গান কেনার সঙ্গতি না-থাকায় সে কাজটা তাল গাছ দিয়েই সারবার চেষ্টা করতে দেখা যায় বৃটিশ-ভারতীয় প্রতিরক্ষা দফতরকে। জাপানিদের চোখে ধুলো দেয়ার জন্যেই এই সহজ দেশীয় কৌশলটা তারা বেছে নিয়েছিলো। সুতরাং এই কৌতুককর কাণ্ডটাকে যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা ছাড়া আর কী বলবো? তাল গাছের এ রকম ঠুঁটো- জগন্নাথ কামান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে অনেক জায়গায় দেখেছি আমি। ইংরেজদের হাল তখন কতটা কাহিল হয়ে পড়েছিলো এই একটা ঘটনা থেকেই তা আঁচ করতে পারা যায়। দৃশ্যটা চোখের সামনে ভাসলে আজো আমি কৌতুকবোধ না করে পারি না।

যুদ্ধাতংকের মধ্যেই আমি তখন লেখাপড়া করছিলাম রামগতির একটি নিউ স্কিম জুনিয়র মাদ্রাসায়। আমাদের পাঠ্যসূচি ছিলো সেকালের মাইনর স্কুলের মতোই। বাংলা, ইংরেজি, পাটিগণিতের পাশাপাশি পড়ানো হতো আরবি সাহিত্য আর গ্রামার। আরবি ছিল বাধ্যতামূলক। নিউ স্কিম মাদ্রাসাগুলোর এইটেই ছিলো বিশেষত্ব। তাছাড়া আর সব বিষয়ে এগুলো ছিলো পুরোপুরি হাইস্কুল। ক্লাস সেভেন থেকে টেন পর্যন্ত পড়ানো হতো প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ যাদব চন্দ্রের উচ্চতর পাটিগণিত, জ্যামিতি আর কে-পি বসুর বীজগণিত। ইংরেজি ভাষার ওপর জোর দেয়া হতো। এর সবই ছিলো অবশ্য পাঠ্য তালিকাভুক্ত। এতগুলো বিষয়ের ওপর আরবির চাপ থাকায় আমরা কুঁজোপৃষ্ঠ হতাম বইয়ের ভারে। হিমশিম খেতাম পড়াশোনা নিয়ে।

জুনিয়র মাদ্রাসার ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ফাইনাল পরীক্ষা হতো সরকারি তদারকিতে। ১৯৪২ সালে ফাইনাল দেয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছিলাম। সীট পড়বার কথা নোয়াখালী জেলা স্কুল কেন্দ্রে। এর আগে জেলা শহর দূরে থাকায় ছোটখাটো কোনো থানা-শহর দেখবারও সৌভাগ্যও হয়নি। প্রবীণদের মুখে সুধারাম শহরের গল্প শুনে মনে হতো পরীর দেশের কুহে-কাফ শহরের কেস্‌সা শুনছি। নোয়াখালী শহরের সাবেক

www.pathagar.com

নাম ছিলো সুধারাম। এখানে নাকি আছে বড়ো বড়ো অনেক পাকা দালান। তার মধ্যে সবচেয়ে মনোরম আর প্রকাণ্ড ছিলো দুটো ইমারত। জজকোর্ট আর কালেক্টরেট বিল্ডিং। মাঝখানে ছিলো গোল দীঘি। যার চারপাশটা ঘেরা গুপারি আর নারকেল কুঞ্জে।

আমার জুনিয়র মাদ্রাসার ভ্রাম্যমাণ শিক্ষক ছিলেন আবদুল ওয়াজেদ মাস্টার। তিনি ছিলেন এন্ট্রান্স ফেল। স্বদেশী রাজনীতি, লবণ আন্দোলন আর চরের কৃষকদের দাবি-দাওয়া নিয়ে মেতে থাকতেন। প্রায়শ যেতেন নোয়াখালী টাউনে। টাউন কথাটা তার মুখেই প্রথম শোনা। সময় পেলে মাঝেমধ্যে এসে ওয়াজেদ সাহেব বাংলার ক্লাস নিতেন আমাদের। আধুনিক যুগের লোক ছিলেন তিনি। বোধ করি সে কারণেই তার কথাবার্তায় ছিলো প্রচুর ইংরেজি শব্দের মিশ্রণ।

আমাদের চরাঞ্চলে ঘর বলতে প্রায় সবই ছিলো ছনের আর কিছু কিছু টিনের ছাউনির চৌচালা। সম্পন্ন গেরস্ত বাড়ির ঘরগুলো ছিলো আটচালার। মাথার ছাউনি ছনের আর ভেতরের কাঠামোতে রঙের প্রলেপ- দেয়া বাঁশ বেতের কারুকাজ। এসব ঘরকে বলা হতো বাঁশপাতের ঘর। নিপুণ ঘরামিদের ডাকা হতো বাঁশপাতের ঘর করবার জন্যে। সৌখিন লোকেরাই বেশি পছন্দ করতেন তিন-চার থাকের পুরো ছাউনির এসব ঘরে বাস করতে। ছাউনি ভারি ছিলো বলে চৈত্র-বৈশাখেও শীতল থাকতো ঘর। আবার শীত ঋতুতে ভেতরটা থাকতো গরম। ঠিক একালের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাড়ির মতন। দাদার আমলে করা আমাদের বড়ো শোবার ঘরটা ছিলো এরকম।

পুরনো দু-তিনটি পাকা মসজিদ ছাড়া সেকালে রামগতি দ্বীপে কারো বাড়িতে একটিও দালান ছিলো না। স্বাভাবিক কারণেই দালানঅলা শহর দেখতে আঁকুপাঁকু করতো আমার কিশোর- মন। টাউন দেখবার জন্যে তাই ছেঁকে ধরতাম মাস্টার সাহেবকে। বান-তুফান আর ভরা কাটালের জলোচ্ছ্বাসের নদী মেঘনা পেরিয়ে ওপারে শহর দেখতে যাবো এটা ভাবতেই পারতেন না অভিভাবকেরা। তাছাড়া একমাত্র সন্তান ছিলাম আমি বাবা-মায়ের। মাস্টার সাহেব প্রবোধ দিতেন। বলতেনঃ জুনিয়র ফাইনাল পরীক্ষার সময় তো জেলা স্কুলেই তোমাদের সীট পড়বে। তখন টাউন দেখতে পাবে। বয়সও বাড়বে তোমার। আর এর মধ্যে ভালোমতন সাঁতারও শিখে নিতে পারবে। মেঘনার ঢেউ দেখে তখন আর ভয় লাগবে না।

অপেক্ষায় থাকলাম কখন আসবে সেই সুবর্ণ মুহূর্তটা। পরীক্ষার বই পড়বার ফাঁকে ফাঁকে কল্পনায় ভাসতো দালানখচিত একটা ছিমছাম সুন্দর শহরের ছবি। তখন যুদ্ধ মাথার উপর। জাপানি জঙ্গি বিমানগুলো রোজই চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছে আকাশের অনেক উঁচুতে ভন্‌ভন্‌ শব্দ তুলে। এর মধ্যে হেড মাস্টার হঠাৎ একদিন নোটিস দিলেনঃ যুদ্ধের জন্যে পরীক্ষার হল বদল হয়েছে। যে- কোনো সময় নোয়াখালী শহরে বোমা পড়তে পারে। তাই সরকার জেলা স্কুলের পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করে দিয়েছেন। সোনাইমুড়ি জুনিয়র মাদ্রাসায় হবে তোমাদের পরীক্ষা।

www.pathagar.com

জায়গাটা শহর থেকে দশ মাইল দূরে। বাজারের কাছে হলেও চারদিকে গ্রাম। বোমা পড়বার ভয় কম। সরকার মনে করেন গণ্ডগ্রামের একটা গ্রামে হামলা করতে যাবে না জাপান। তোমাদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করেই শহর থেকে কেন্দ্র সরিয়ে নিয়েছেন সরকার। সুতরাং সবাই তৈরি হয়ে নাও সোনাইমুড়ি যেতে।

মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেলো আমার। তাহলে বুঝি আর শহর দেখাই হলো না। গ্রাম্য দলাদলিতে পড়ে আগের বৃদ্ধ হেড মাস্টার তখন হাজত বাস করছেন। তাঁকে একটা খুনের মামলার আসামি করা হয়েছিলো। আসলে তিনি ছিলেন নির্দোষ। স্কুলের জাঁদরেল সেক্রেটারীর সঙ্গে বনিবনা হচ্ছিলো না হেড মাস্টার জয়নুল আবেদিন মাস্টার সাহেবের। তিনি চাইছিলেন দরিদ্র কৃষকের ছেলেদের পিটিয়ে-পাটিয়ে মানুষ করতে। কোনো সভা হলেই তিনি হাজির হতেন সেখানে। বক্তৃতায় শিক্ষার কথা বলতেন। বলতেনঃ ছেলেদের মানুষ না করলে তোমরা মার খেতেই থাকবে জোতদার-তালুকদারদের হাতে। ওরা তোমাদের পথে বসাবে। চিরকাল শোষণ করবে। আর তোমরা গামছা গলায় ঝুলিয়ে ওদের কদমবুচি করতে থাকবে। সেকালের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন একজন সমাজ বিপ্লবী। সুতরাং জোতদারদের চক্ষুশূল হয়ে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলবার যোগাড় হলো তার। মাস্টার সাহেব আমাকে খুব স্নেহ করতেন। উৎসাহ যোগাতেন যাতে কলেজ-ইউনিভার্সিটি ডিঙিয়ে বড়ো কিছু হতে পারি আমি। শিক্ষা-প্রেমিক এই মানুষটার দুর্গতি দেখে মনটা সেদিন দুঃখে ভরে গেলো আমার।

ফাইনাল পরীক্ষার আগে-আগে নতুন একজন হেড মাস্টার এলেন। ইনি ছিলেন বয়সে তরুণ। আমরা যাতে পরীক্ষায় ভাল করি সেদিকে নজর ছিলো তাঁর। বিশেষ কোচিংয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি আমাদের দশজন পরীক্ষার্থীর জন্যে। জাপানি বিমানের ভন্-ভনানির মতন আমার মাথায় তখনো ভন্ভন করছিল শহর দেখবার মুগুর-পেটানো সেই উত্তপ্ত ভাবনাটা। নতুন হেড মাস্টার সৈয়দ আহ্মদকে মনের ইচ্ছাটার কথা বলতেই হো-হো করে হাসলেন তিনি। বললেন, জাপানি বোমা কি আর যখন তখন পড়বে? পরীক্ষাটা শেষ হলেই এক ফাঁকে তোমাদের সোনাইমুড়ি থেকে নিয়ে যাবো নোয়াখালী। তখন প্রাণ-ভরে শহরটাকে দেখে নিও। এতো আর লণ্ডন-কলকাতা নয় যে অনেক সময় লাগবে।

ঠিকই পরীক্ষার পর নিয়ে গেলেন তিনি আমাদের শহর দেখাতে। শহরে পা রাখতেই চারদিকে দু-চোখ মেলে ধরে কেমন একটা রোমাঞ্চ অনুভব করলাম। যেন কলম্বাসের মতন নতুন পৃথিবী আবিষ্কার করে ফেলেছি। বিস্মিত দৃষ্টি তুলে ধরে কোর্ট বিল্ডিং দেখলাম। সৈয়দ আহমদ বললেন, এসব ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলের করা। দেখলাম গোল দীঘিটা। মেঘনা তখন গ্রাস করছিলো শহরটা। অনেক দালান-কোঠা হাঁটু ভেঙ্গে পড়ে আছে নদীতে। বড়ো মসজিদটার দেয়ালের কাছে এসেই দক্ষিণে অনেক দূর পিছিয়ে ছিলো নদী। সেখানে জেগেছে এক প্রকাণ্ড চর। তার ওপর রোজ সন্ধ্যায় পর্দা টাঙিয়ে দেখানো হতো বোবা-সিনেমা।

www.pathagar.com

সিনেমা কী জিনিস এই প্রথম দেখলাম। পর্দার মানুষগুলো মুখ- চোখ, হাত-পা নাড়াতো, কথা বলতে পারতো না। তার জন্যেই নাম হয়েছিলো বোবা ছবি। পর্দায় সবই ছিল যুদ্ধের দৃশ্য। জার্মানি আর জাপান কি বর্বর অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে মানবজাতির ওপর সেসবই ছিলো ছবির বিষয়বস্তু। এদেশের লোককে বৃটিশের পক্ষে টানবার জন্যে এগুলো ছিলো প্রোপাগান্ডা-ফিল্ম। একজন লোক পাশে দাঁড়িয়ে দর্শকদের বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন সিঙ্গাপুরে, রেঙ্গুনে, কোহিমায়, জাপ দখলদার বাহিনী কী নিষ্ঠুরভাবে দলিতমথিত করছে শহরের পর শহর। গ্রামকে গ্রাম। দেখানো হচ্ছিলো নিহত শিশুর ছিন্ন-ভিন্ন লাশের ছবি। ভয়ে আঁতকে উঠেছিলাম এসব বীভৎস দৃশ্য দেখে।

গোটা নোয়াখালী শহরে তখন যুদ্ধাবস্থা। রাতে ব্ল্যাক-আউট। কোথাও জ্বলে না একটা বাতি। অন্ধকারে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে শহর, শহরের উপকণ্ঠ। গোরা আর দেশি সৈনিকদের জিপ-ট্রাক চলে রাতের বেলা। অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট ডিফেন্স ছাউনি থেকে হঠাৎ চারদিক কাঁপিয়ে বেজে ওঠে সাইরেন। তখন সবার মনে শংকা জাগেঃ এই বুঝি বোমা পড়লো। বোমাতংকে ঘুমোতে পারে না মানুষ। সোনাপুর টার্মিনাল স্টেশনের দক্ষিণে প্রাগৈতিহাসিক দৈত্যের মতন আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে হাজার ফুট লম্বা ওয়ারলেস-স্তম্ভ। তার মাথায় রাডার।

এসব দেখে শহর দেখার আনন্দটা পানসে হয়ে গেলো। এবার সত্যি সত্যি মনে হলো ভয়ংকর একটা যুদ্ধ মুখ ব্যাদান করে আছে আমার চারপাশে। রাতে শুতে গিয়ে মনে হলো কোথায় যেন বোমা ফাটছে। আগুনে পুড়ছে বাড়িঘর।

সমরসজ্জিত শহরটি মনের অজান্তেই কেমন যেন সাহসী করে তুললো আমাকে। পরের দিনই গেলাম এআরপি হেডকোয়ার্টার দেখতে। 'এয়ার-রেইড প্রিকশন্স' অর্থাৎ বিমান- আক্রমণ সতর্কতামূলক ব্যবস্থাকে সেকালে সংক্ষেপে বলা হতো এআরপি। দায়িত্বটা পালন করতো নীল ইউনিফর্মঅলা একটা বাহিনী। বিমান আক্রমণের সময় এবং পরে কী কী ব্যবস্থা নিতে হবে, সে বিষয়ে এদের তিন মাস ধরে ট্রেনিং দেয়া হতো। এই আধা-সামরিক লোকগুলোকে বাছাই করা হতো স্থানীয় যুবকদের মধ্য থেকে।

সাবেক নোয়াখালী শহরের এক মাইল পশ্চিমে ছিলো প্রাচীন কালিতারা গ্রাম। দু'ধারে ছিলো এর আম-কাঁঠাল-শুপারি- নারকেলের ঘন নিবিড় বাগিচা। মাঝখানে আধা-শহুরে আধা-গ্রামীণ একটি বাজার। গ্রামের দক্ষিণে একটা মাঠ ঘেঁষে ছিলো এআরপি হেডকোয়ার্টার। মাঠে দু'বেলা লেফট-রাইট করতো এআরপি জোয়ানের দল। মাথায় তাদের শোভিত থাকতো 'তেকুনো' সামরিক টুপি। ডান হাতের বাজুতে ঝুলতো সুতোর মোটা লাল রশিতে বাঁধা হুইসেল। বেশ চৌকস দেখাতো বিশ/পঁচিশ বছরের তাগড়া জোয়ান ছেলেগুলোকে।

এই সিভিল সংস্থার চীফ ওয়ার্ডেন ছিলেন সে সময়কার জেলা বোর্ড চেয়ারম্যান সৈয়দ আবদুল গোফরান। পরে ১৯৪৬ সালে সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভায় তিনি খাদ্যমন্ত্রী

www.pathagar.com

হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে যুদ্ধের সময় আমার পরিচয় হয়। এআরপি প্রতিরক্ষার কন্ট্রোলার ছিলেন তদানীন্তন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আবুল খায়ের সাহেব। ১৯৩৭ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ্ হলের ভিপি ছিলেন। ১৯৪০ সালে বিসিএস পাশ করে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন। ১৯৪২ সালে ভারতের হায়দরাবাদে সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং নিয়ে নোয়াখালীর এআরপি কন্ট্রোলারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। '৬০ -এর দশকে একনাগাড়ে পাঁচ বছর তিনি ঢাকার জেলা প্রশাসক ছিলেন। পরে ডিআইটি'র চেয়ারম্যান আর প্রাদেশিক সরকারের পূর্ত সচিব হয়ে অবসর নেন ১৯৭০ সালে। এখন তাঁর বয়স চৌরাশি। বৃটিশ এবং পাকিস্তান যুগের ঘটনাবলীর এক জীবন্ত বিশ্বকোষ তিনি। আত্মীয়তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছাড়াও তাঁর সঙ্গে রয়েছে আমার মনের আশ্চর্য একটা মিল। প্রায়শই দেখা-সাক্ষাৎ হতো আমাদের।

এআরপি'র কথায় আসছি। এই সিভিল ডিফেন্স সংস্থার দালানের ছাদের মাথায় দুটো উঁচু লোহার রডের ওপর সর্বক্ষণ ঘুরতে থাকতো বেতার যন্ত্রের প্রকাণ্ড একটি রাডার। নিচেকার বড় একটি ঘরে ছিলো কয়েকটি সাইরেন। রাডারের ওপর অষ্টপ্রহর চোখ রেখে বসে থাকতেন জনা-কয়েক বিশেষজ্ঞ। রাডারের পর্দায় শত্রু বিমানের সংকেত ধরা পড়লেই তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে হুইসেল বাজাতেন। অমনি ছোটাছুটি লেগে যেতো এআরপি ক্যাম্পে। মুহূর্তের মধ্যে কাঁপা-কাঁপা আওয়াজে চারদিক সজাগ করে আর্তনাদ তুলতো সাইরেনগুলো।

অনেক সময় বিমান-আক্রমণের কৃত্রিম মহড়া হিসেবেও বাজানো হতো এসব দীর্ঘ আওয়াজের হুঁশিয়ারি ভেঁপু। এআরপি হেডকোয়ার্টারের সামনে-পেছনে খুঁড়ে রাখা ছিলো খড় খাইয়ের মতন লম্বাটে কিছু পরিখা। অর্থাৎ ট্রেঞ্চ। সাইরেন বেজে উঠলেই এআরপি জোয়ানেরা ছুটে যেতো ট্রেঞ্চের দিকে সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে ঢুকে উবু হয়ে শুয়ে পড়তো। দুই কানে চাপা দিয়ে রাখতো দুই হাত। বোমার গর্জনে যাতে কানে তালা না-লাগে, তার জন্য এই সতর্কতা। বোমার স্পিলিন্টারের আঘাত থেকে চোখ-মুখ রক্ষা করার জন্যই তাদের উবু হয়ে শুয়ে থাকা।

বিমান- আক্রমণের সময় লোকজন কেমন করে আত্মরক্ষা করবে সরেজমিনে তা তাদের শেখানোর জন্যই দিনে বারকয়েক এরকম মহড়া চলতো। আমরা যখন এআরপি হেডকোয়ার্টার দেখতে যাই, ঠিক সে সময় চলছিলো এরকম একটি মহড়া। সাইরেন বেজে উঠতেই ইউনিফর্মধারী লোকগুলোকে দেখলাম ট্রেঞ্চের ভেতরে গিয়ে মাথা নিচু করে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়তে। মিনিট দশেক পর আবার কেন সাইরেন গর্জে উঠলো বুঝতে পারলাম না। কিন্তু অবাক চোখে তাকিয়ে দেখি, লোকগুলো ইউনিফর্মে ধুলো-ময়লা মেখে বেরিয়ে আসছে গর্তের ভেতর থেকে। তাদের মাথার চুল আর চোখে মুখে লেপ্টে ছিলো কাদা। বোঁজা-বেড়ালের মতন দেখতে মনে হচ্ছিলো লোকগুলোকে।

পরে জানলাম, শেষের সাইরেনের আওয়াজটা ছিলো ক্লিয়ারেন্স সংকেত। যার মানে ছিলোঃ বিপদ কেটে গেছে। বিমান-হামলার আর ভয় নেই। এবার আশ্রয়-

www.pathagar.com

স্থান ছেড়ে বাইরে উঠে আসতে পারো তোমরা।

অফিস-আদালত ছাড়াও শহরের সব বাড়ির আঙিনাতেই ছিলো তিন-চার ফুট গভীর করে খোঁড়া ট্রেঞ্চ। সিভিল ডিফেন্সের লোকেরা এগুলোকে বলতেন 'শেল্টার'। নোয়াখালী শহরে ছিলো সাতটি বেসামরিক প্রতিরক্ষা কেন্দ্র তথা এআরপি ফাঁড়ি। কোন একটি ফাঁড়ি থেকে সাইরেন বাজলেই অন্য ফাঁড়িগুলোর সাইরেনও সঙ্গে সঙ্গে জুড়ে দিতো তুমুল চিৎকার। ওই মুহূর্তে মনে হতো, পৃথিবীতে বুঝি প্রলয় নেমেছে। লোকজন ভয়ে শিঁটিয়ে যেতো। রাতের বেলা এরকম কাণ্ড ঘটলে শহরটাকে মনে হতো, আস্ত একটা নরকপুরী।

বৃটিশ ইস্টার্ন কমাণ্ডের ভয় ছিলো জাপানি সাবমেরিনের বহর হয়তো বঙ্গোপসাগরে ঢুকে পড়েছে। তাদের দ্রুতগামী সামরিক স্পিডবোটগুলো যে- কোনো মুহূর্তে সন্দ্বীপ চ্যানেল হয়ে শহরের দক্ষিণের চর জব্বরে এসে হানা দিতে পারে। এমনটা ঘটলে দ্রুত পতন ঘটবে নোয়াখালী, কুমিল্লা আর সিলেটের। এর জন্য নতুন নতুন সেনাছাউনি আর সামরিক বিমান ঘাঁটি বসানোর পাশাপাশি শক্তিশালী করে তোলা হলো বেসামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। শহরের সবচেয়ে উঁচু দালান ছিলো জজকোর্ট ভবন। তার মাথায় গড়ে তোলা হলো পর্যবেক্ষণ টাওয়ার। এই টাওয়ারটির চূড়ায় ছিলো একটি বিশাল রাডার। মেঘনা চ্যানেলের তীর ঘেঁষে ছিলো জজ-আদালতের এই বিল্ডিংটি। দক্ষিণে ছিলো চরের পর চর। একেবারে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। পানির এক নিঃসীম রাজ্য সেখানে।

সবটা তল্লাট উন্মুক্ত আকাশের নিচে ছিলো বলে পর্যবেক্ষণ টাওয়ার থেকে দূরবীণের চোখ দিয়ে সমুদ্র পর্যন্ত সবই পরিষ্কার দেখা যেতো। নৌকাযোগে উপকূলে জাপানি সেনা অবতরণের আশংকা সব সময়ই করতেন বৃটিশ কর্মকর্তারা। তার জন্য সর্বক্ষণ টাওয়ারের উপর থেকে দক্ষিণে তাক করে রাখা হতো একাধিক মেশিনগান, দূরপাল্লার কামান আর অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গান। সেই সঙ্গে কড়া পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা তো ছিলোই।

সামরিক আর বেসামরিক লোকজনকে শত্রু বিমানের হামলার ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়ার জন্য আরো একটি ব্যবস্থা ছিলো। সেটি হলো পতাকার সংকেত। সিভিল ডিফেন্স আর এআরপি ফাঁড়িগুলোতে থাকতো লাল, হলুদ এবং সাদা নিশান। শত্রু বিমান বঙ্গোপসাগরের আকাশ থেকে উত্তরমুখো হয়ে উড়তে শুরু করলেই ওড়ানো হতো লাল ঝাণ্ডা। সঙ্গে সঙ্গে সাইরেনগুলো একযোগে কঁকিয়ে উঠতো। সংকেতটা টেলিফোনে দেয়া হতো টাওয়ারের কন্ট্রোল রুম থেকে। তখন মাত্র তিনটি টেলিফোন সংযোগ ছিলো শহরে। একটি ছিলো জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অফিসে। একটি সিভিল ডিফেন্স কন্ট্রোলারের রুমে। অন্যটি পর্যবেক্ষণ টাওয়ারে।

লাল নিশান ওড়ানোর মানেই ছিলো, যে- কোনো মুহূর্তে শহরে বিমান- আক্রমণ হতে পারে। লাল নিশান তোলার পাশাপাশি সাইরেনের চিৎকার শোনা গেলে আশ্রয়ের সন্ধানে এদিক ওদিক ছুটতে থাকতো শহরবাসী। বেশির ভাগ লোকই ট্রেঞ্চের

www.pathagar.com

নিরাপদ শেল্টারে ঢুকে শুয়ে পড়তো। অনেকে আবার গাছগাছালি-ভরা বাগিচায় গিয়ে আশ্রয় নিতো। ভয়ংকর একটা আতংক ছড়িয়ে পড়তো বাংলাদেশের উপকূলবর্তী মাঝারি গোছের শহরটায়। লোকজনের হুড়াহুড়ি দেখে মনে হতো, বিমান-দস্যুরা বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়েছে জনপদটির ওপর। আর এখুনি সব নিঃশেষ হয়ে যাবে বোমার তাণ্ডবে।

সিভিল ডিফেন্স ডিপোগুলোতে বোমার আগুন নেভানোর জন্য মোতায়েন ছিলো লাল রঙের অনেক দমকল গাড়ি। সেবারই প্রথম আমার চোখে পড়ে পানি- ভরতি হোস্‌পাইপের এসব বিরাট আকারের গাড়ি। কিন্তু রহস্যজনক হলো, প্রতিরোধ ব্যবস্থায় সজ্জিত হলেও ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পুরো সময়টায় একবারও বিমান হামলা হয়নি শহরটায়।

গোরা আর লাল পাগড়ি এই দুই অভিনব জিনিসের সংগে সেবারই আমার প্রথম মুখোমুখি সাক্ষাৎ। এক গোরা সাহেবকে বেশ দূর থেকে দেখেছিলাম বছর তিনেক আগে। তিনি তাঁর দ্বীপাঞ্চলের রাজ্যপাট দেখতে বেরিয়েছিলেন স্পিডবোটযোগে। বোধ করি বংগোপসাগরের উত্তর-পুর্ব মাথার সন্দ্বীপ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে এসেছিলেন। স্কুলের মাস্টাররা দিন কয়েক আগে থেকেই বলাবলি করতে লাগলেন হাজিরহাট মৌজার একমাত্র মিডল ইংলিশ মাদ্রাসাটিও দেখে যাবেন চট্টগ্রাম বিভাগের ইংরেজ কমিশনার বাহাদুর। চারদিকে পড়ে গেলো সাজ-সাজ রব। লেপেমুছে সাপসুতরো করা হলো টিনের ছাদঅলা মাদ্রাসার ক্লাস রুমগুলো। মেরামত করা হলো ভাঙা চেয়ার টেবিল। কয়েকটি হাতলঅলা দামি উঁচু চেয়ার আর একখানা বড়ো টেবিল যোগাড় করা হলো রাজা ৬ষ্ঠ জর্জের প্রতিনিধি এবং তার দলবলকে দুরস্ত-মাফিক অভ্যর্থনা করবার জন্যে। মাঠে কলাগাছ পুঁতে সাজানো হলো চমৎকার একটি গেট। ধুত্‌রা আর রক্তজবার ঝালর দিয়ে শোভিত করা হলো তোরণটি। চারদিকে বাঁশের খুঁটির উপর দড়ি টাঙিয়ে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছিলো লাল-নীল-সবুজ কাগজের পতাকা। তার ভেতর ইউনিয়ন জ্যাক ছিলো কিনা এখন আর মনে করতে পারছি না।

আমি তখন পাঠশালার প্রথম শ্রেণীর থেকে একটি বাড়তি প্রমোশন নিয়ে বাবার পীড়াপীড়িতে ভর্তি হয়েছি এই গঞ্জের স্কুলে। ক্লাস থ্রিতে বসবার সুযোগ হলো আমার। বাংলার শিক্ষক ছিলেন মান্নান স্যার। নর্মাল স্কুল থেকে ডিগ্রি নিয়ে আসবার পর এই অ্যাংলো- অ্যারাবিক স্কুলে তাঁর শিক্ষকতার শুরু। তিনি খুব দরদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সত্যেন্দ্রনাথ আর যতীন্দ্রমোহন বাগচির কবিতা পড়াতেন আমাদের। রবীন্দ্রনাথকে সংক্ষেপে বলতেন রবি বাবু। মনে আছে ইংরেজি রাজপুরুষটিকে সংবর্ধনা দেয়ার জন্যে ছোটদের মধ্য থেকে আমাদের কয়েকজনকে বেছে নিয়ে একটি গানের রিহার্সাল দিচ্ছিলেন তিনি। যার প্রথম দুই কলি এ রকম ঃ 'স্বাগত, সুস্বাগত তোমায় হে অতিথি, লহ এই বরমাল্যখানি সযতনে।' বাকি কলিগুলোর কথা এখন আর মনে নেই। তবে মনে আছে আমাদের সবার হাতে গুঁজে দেয়া হয়েছিলো একটি করে বুনো ফুলের মালা।

www.pathagar.com

কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজার প্রতিনিধির গলায় সেই মালা পরানো আর আমার হয়নি। বোধ করি সর্দিতে ভুগছিলাম। তাই গানের দল থেকে বাদ পড়ে গিয়েছিলাম। দূর থেকে কেবল এক নজর দেখলাম গোরা সাহেবটিকে। চেহারাটি ছিলো তাঁর সাদা-লালচে। মুখখানা গোলগাল। ঘন্টা আধেক থেকেই পাইক বরকন্দাজ পরিবেষ্টিত হয়ে বিদায় নিয়ে গেলেন ঘোড়ায় চেপে। তিনি বাংলা গানটির অর্থ নিশ্চয় এতটুকুও বুঝতে পারেননি। তবে আঁচ করতে পেরেছিলেন শিশুরা তাঁকে 'ওয়েলকাম' জানিয়েছে খালি গলায় সুরের বোল ফুটিয়ে। তখন আমাদের তল্লাটের কোনো স্কুলে হারমোনিয়াম, তবলা ইত্যাদির প্রচলন হয়নি। এগুলোর কথা সেকালে ভাবাই যেতো না।

মহাদেশীয় পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন আমাদের সেই কালাপানির দেশে যানবাহন বলতে একমাত্র গরুর গাড়িরই ছিলো একাধিপত্য। মাঝে মধ্যে দেখা যেতো চার বেহারার পাল্কি। দূর থেকে নাইওর নিয়ে গোপাট অর্থাৎ হাঁটা-পথ ধরে সেগুলো চলতো হুমহাম শব্দ তুলে। পথ অনেক দূরের হলে বেহারারা গলার সংগে গলা মিলিয়ে সুর করে গান ধরতো। গানের কলিগুলো ছিলো এ রকমঃ 'এই ওঁ, হেঁইও, লাল রঙের পাটের শাড়ি, নাইওর যাইবো বাপের বাড়ি। আম পাকে, পাকে জাম, হুমহাম! হুমহাম!'

বেহারাদের গান সাংঘাতিক আকর্ষণ করতো ছোটোদের। আমরা দল বেঁধে ছুটে আসতাম বাড়ির ঘাটায়। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম কোন দিকে যাচ্ছে পাল্কি। আর কোন বাড়িতে নামবে নতুন বউ? সেকালে অজ পাড়াগাঁয়ে গান বড়ো একটা শোনা যেতো না। কেবল ধান বোনার সময় মাঠ থেকে ভেসে আসতো কৃষকদের গান। বৈশাখে বৃষ্টি কম হলে জমিতে সেচ দেয়ার জন্যে তাল গাছের কোষা নৌকায় করে শুকনো পুকুরের তলা থেকে পানি তুলতো তারা অতিকষ্টে। ছোটো চিলতে খাল কেটে সেই পানি নিয়ে যেতো জমিতে। সামান্য পানির সংগে মাটি গুলিয়ে বুনতো ধানের চারা। বৈশাখের ঠা-ঠা রোদে বিল-ডোবা সব শুকিয়ে গেলে হাহাকার উঠতো গ্রামে। হাইল্যা-চাষীর প্রাণটাও তখন কাঠ হয়ে যেতো শুকিয়ে। মেঘ শূন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে পানি ঝরতো তার চোখ থেকে। সবাই মিলে মাঠে দাঁড়িয়ে মিনতি জানাতোঃ 'আল্লা মেঘ দে, পানি দে, বিষ্টি দে-রে তুই।.....।'

আগুন-জ্বলা মাঠের সেই হাহাকারের দৃশ্য আজো ভাসে আমার চোখের সামনে। ভাসে ফাঁকা চৌচির হয়ে যাওয়া শাইল ধানের জমিতে বুকভরা আর্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কৃষকদের করুণ চাহনির জলজ্যান্ত একেকটি ছবি। এ রকম দুঃখ-বেদনার এবং কখনো খানিকটা হাসি-আনন্দের হাজারো দৃশ্য আর বিমর্ষ দৃশ্যান্তরের মধ্য দিয়ে কাটছিলো আমার স্বপ্নতাড়িত শৈশব। আনন্দ আসতো যখন জমিতে ভালো ফসল হতো। যখন খনার বচনকে স্বাগত জানিয়ে বৃষ্টি নামতো মাঘের শেষে। মাঘ মাস এলেই মা আমাদের শুনিয়ে আওড়াতেন আবহমান কালের বাংলার ঋতুবিশেষজ্ঞ খনা নামক সেই বহুদর্শী কৃষক বধুটির বচনামৃতঃ 'যদি বর্ষে মাঘের শেষ, ধন্যি রাজার পুণ্যি দেশ।'

www.pathagar.com

মাঘে এই আর্শীবাদী বৃষ্টি হলেই খুশিতে ঝলকে উঠতো কৃষকের চোখ। আনন্দ খেলে যেতো চরের কৃষক- বধূদের উদ্বেল-আকুল প্রাণে। 'আয় বৃষ্টি ঝেঁপে, ধান দেবো মেপে' বৃষ্টির পর বৈশাখে গোলাভরা ধান এলে সত্যি সত্যি তাদের মন হতো দরাজ। ধুনোয় ভরে ধান বিলিয়ে দিতে এতটুকু কার্পণ্য করতো না তারা। নবান্নের উৎসব তখন লেগে যেতো ঘরে ঘরে। সে ছিলো 'ধনধান্যে পুষ্পে-ভরা' বাংলার এক নিটোল আনন্দঘন ছবি।

ছোটোবেলায় ওই সুফলা ঋতুতে বাংলা নববর্ষটিকে আক্ষরিক অর্থেই সার্থক হয়ে উঠতে দেখেছি। সম্রাট আকবরের সভাসদ মির্জা ফতেহউল্লাহ সিরাজী কেন বঙ্গোপসাগরের এই দেশে বৈশাখকে 'ফসলি মাস' হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন এখন তা বুঝতে কষ্ট হয় না। মনে হয় খনার বচনগুলো বিশ্বখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী আর চতুষ্পদী পংক্তিমালার অমর স্রষ্টা কবি উমর খৈয়ামের এই উত্তরসূরির উপর গভীর একটা প্রভাব ফেলেছিলো। বোধ করি তার জন্যেই তিনি বঙ্গোপসাগরের বলয়ে ঋতুচক্রের গতিবিধি তীক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করে আমাদের জন্যে আলাদাভাবে তৈরি করেছিলেন সৌরকেন্দ্রিক বাংলা পঞ্জিকা।

এই পঞ্জিকাকে সামনে রেখেই আজো আমরা বার, তিথি, পূর্ণিমা, অমাবশ্যা আর মাস-ঋতু ইত্যাদির হিসাব করি। সেকালে বৈশাখে নতুন ফসল উঠলেই কৃষকরা মুগল তহশিলদারদের ফসলি জমির খাজনা দিতো ধান দিয়ে। অথবা ডালা-ভরতি কড়ি দিয়ে। মুগল আমলে এমন কি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বকালেও কড়ি ছিলো সুপ্রচলিত স্থানীয় মুদ্রা। কৃষকরা কড়ির বস্তা মাথায় চেপে হাটে যেতেন কেনাকাটার জন্যে। ফৌজদাররা কড়ির খাজনার বস্তা হাতির পিঠে চাপিয়ে আগ্রা কিংবা দিল্লিতে পাঠাতেন অশ্বারোহী সেনার পাহারায়।

কোম্পানির কালেক্টররা কখনো নৌকা বোঝাই দিয়ে আবার কখনো গোশকটে করে এই দেশীয় মুদ্রা কলকাতা পাঠাতেন বল্লমধারী বরকন্দাজ বাহিনীর হেফাজতে। গবর্ণর জেনারেল হেস্টিংস-এর আমলে ছিয়াত্তরের সময় ঝোপ-জংগলে ওঁত-পেতে-থাকা ঠগিদের হামলায় লুটপাট হয়েছে কোম্পানির লাখ লাখ টাকার কড়ির খাজনা। পরে চাঁদির টাকা আর কাগজের নোটের প্রচলন হলে আস্তে আস্তে উঠে যায় কড়ি। ছোটোবেলায় দেখেছি কড়ি দিয়ে আর কেনাকাটা না চললেও তার কদর একেবারে ফুরিয়ে যায়নি। কৃষকদের মেয়েরা কড়ির মালা গলায় পরে পুরণ করতো সোনার হারের সাধ। কোমরের শোভা বর্ধন করতো তারা কড়ির বিছায়। ছোটো মেয়েরা ভালোবাসতো কড়ির রিং কানে পরতে। রংটা শংখের মতন ধবধবে সাদা ছিলো বলে মনে হতো ঝুমকো ফুল ঝুলছে ওদের কানে। এছাড়াও আরো অনেক কাজ চলতো এ ক্ষুদে সামুদ্রিক শংখ দিয়ে। কবিরাজরা ওষুধ তৈরি করতেন কড়িচূর্ণের সংগে লতাপাতার রস মিশিয়ে। আমরা এক্কা-দুক্কা খেলতাম কড়ি পাতিয়ে রেখে। আমাদের ঘরে এক হাঁড়ি-ভরতি ছিলো গ্রাম-বাংলার প্রাচীন যুগের এই জনপ্রিয় মুদ্রা। এখন সেই কড়িও নেই আর সেই দুধে-ভাতের সোনার বাংলাও নেই। সেই অতীত এখন এক রূপকথা। গল্পকারের কল্পকাহিনী কেবল।

www.pathagar.com

কথায় কথায় চলে এলাম আরেক প্রসংগে। শ্বেতাংগ বিভাগীয় কমিশনারের স্কুল পরিদর্শনের গল্প বলছিলাম। তিনি বেশ খুশিই হয়েছিলেন পাণ্ডব-বর্জিত আমাদের সেই দুর্গম অনার্য দেশে তাঁর অভ্যর্থনার উষ্ণতা দেখে। ঘাসের উপর লাল গালিচা বিছানোর সামর্থ্য স্কুল কমিটির না থাকলে ফুল ছড়িয়ে বরণ করা হয়েছিলো রাজপুরুষকে। এক অক্ষর ইংরেজি না জানলেও ধোপ-দুরস্ত পোশাক-সজ্জিত কমিটির সদস্যরা বিগলিত করুণা হয়েছিলেন অমন ক্ষমতাধর এক ইংরেজ সাহেবকে কাছে পেয়ে। আকবরের দরবারে সভাসদদের মতন প্রায় আভূমি নত হয়ে কমিশনার বাহাদুরকে অভিবাদন জানিয়েছিলেন তাঁরা। যেন এক নতুন মুগলে-আজম তথা 'দিল্লিশ্বর-বা জগদীশ্বর-বা' অপার দয়া বিতরণে পদধূলি দিলেন আমাদের গন্ধগোকুল আর শিবাকুল-ডাকা অন্ধকার দেশে। যেমন মধ্যযুগে স্কটল্যাণ্ডের পার্বত্য ভূমিতে রাজকীয় জমিদারী দেখতে পদার্পণ করতেন বাকিংহাম প্রাসাদের হিজ আর হার ম্যাজেস্টিস রাজা-রানীরা অথবা দেয়ার রয়্যাল হাইনেস প্রিন্স এবং প্রিন্সেসরা।

তাঁরা সেখানে দেহরক্ষী অশ্বারোহী প্রহরীর দল আর লোকলশ্‌কর নিয়ে শিকারে বেরুতেন। হরিণ, পাখি, বাঘ ইত্যাদি মেরে আনন্দ উপভোগ করতেন। একালেও স্কটল্যান্ডের উত্তরে কয়েক হাজার বর্গমাইল এলাকা জুড়ে আছে ইংল্যান্ডের বর্তমান রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের নিজস্ব জমিদারি। এখানে রানীর মৃগয়া ক্ষেত্রও রয়েছে। আজকাল রানী শিকারে তেমন বেরুতে চান না। তার কারণ তাঁর স্বামী প্রিন্স ফিলিপ বিশ্ব বন্য প্রাণিকুল রক্ষা সমিতির সভাপতি। ষাটের দশকে একবার রানী এক চা-চক্রে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন আমাদের কয়েকজন সিনিয়র সাংবাদিককে। ঢাকার মিন্টো রোডের 'সুগন্ধা' ভবনটি ছিলো তখন রাষ্ট্রীয় অতিথিশালা। বাংলাদেশ সফরকালে এ বাড়িতে উঠেছিলেন রানী। রাজকীয় মেহমানদের উপযোগী করে বাড়িটিকে সাজানো হয়েছিলো প্রচুর মুদ্রা খরচ করে। প্রিন্স ফিলিপের সংগে রাণীর ব্যক্তিগত স্টাফও ছিলেন এখানে।

বাংলাদেশ দেখতে কেমন এ প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করতেই রানী আমার দিকে চোখে রেখে বলে উঠলেনঃ তোমাদের শ্যামল নিসর্গের কোনো তুলনা হয় না। স্কটল্যান্ডের অরণ্যের চেয়েও ঘনসবুজ তোমাদের তরুবীথি। আর আমাদের লোকগুলো? এ প্রশ্নের উত্তরে কুইন বললেনঃ এরা ভারি সহজ-সরল। কিন্তু অশিক্ষিত। শিক্ষার ব্যাপারে আরো বেশি সচেতন হওয়া উচিত তোমাদের। তবে হ্যাঁ, আমার বেশি লেগেছে তোমাদের গ্রামের মেয়েদের। লেখাপড়ার সুযোগ পেলে এই মেয়েরা পাল্টে দিতে পারে তোমাদের সমাজের চেহারা।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে আরেকটি প্রশ্ন রাখলাম। জিজ্ঞেস করলামঃ আচ্ছা, এখানকার খাদ্য- তালিকার কোন জিনিসটি খেতে ভালো লেগেছে আপনার? ঝটিতি উত্তর রানীর ঃ হিল্‌শা, দ্য সুইট হিল্‌শা। আমাদের স্যামন ফিশের চেয়েও সুস্বাদু তোমাদের নদীর ইলিশ মাছ। এর আগেও একবার ঢাকায় এসে ইলিশ খেয়েছি। কিন্তু স্বাদটা এখনো লেগে আছে আমার জিভে।

www.pathagar.com

হো-হো করে হেসে উঠলেন প্রিন্স ফিলিপ। বললেনঃ ইয়েস, শী ইজ রাইট। রিয়্যালি হিল্‌শা ইজ এ ওয়ান্ডারফুল ফিশ। ভেরি সুইট্‌ অ্যান্ড টেস্টফুল। দু'জনের মুখে বাংলাদেশের এই রূপোলি মাছের তারিফ শুনে মনটা ভরে গেলো। সর্দিতে ভুগছিলেন ফিলিপ। ডান হাতের পিঠে নাক মুছলেন তিনি। বোধ করি রুমাল ব্যবহার করতে ভুলে গিয়েছিলেন। একটু খেয়ালি ধরনের লোক তিনি। তাছাড়া বয়স হয়েছিলো তাঁর। তাঁর পাবলিক সার্ভিস বিশেষ করে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের কথা তুলতেই প্রশ্নটা লুফে নিলেন তিনি। বললেনঃ তোমাদের সবই ভালো। কিন্তু প্রাণীদের ব্যাপারে বড়ো নিষ্ঠুর তোমরা। মেরে-কেটে সাফ করে ফেলেছো সুন্দরবনের প্রায় সব হরিণ। রয়াল বেঙ্গল টাইগারগুলোকেও স্রেফ চামড়ার লোভে নির্বংশ করে ফেলেছো। ঢাকার রাস্তায় দেখলাম শীতের অতিথি পাখিগুলোকে ধরে বেঁধে সামান্য কিছু পেনির জন্যে বেঁচে দেয়া হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে প্রাণিশূন্য হয়ে যাবে তোমাদের দেশ। সুন্দর প্রকৃতিটাও তোমাদের শেষ হয়ে যাবে বৃক্ষ নিধনের নিষ্ঠুরতার জন্যে। বললেনঃ এ নৃশংসতা বন্ধ করো তোমরা। নইলে একদিন জেরবার হয়ে যাবে তোমাদের এ মনোরম দেশ।

তাঁর কথাগুলো শুনে দুঃখ বোধ করলাম। কোনো সদুত্তর খুঁজে পেলাম না। মুখে বললাম ঃ বন্যপ্রাণী রক্ষার আইন আমাদের দেশেও আছে। কিন্তু দুষ্ট লোকেরা তা মানছে না। তুমি সরকারকে এর পরিণামটার কথা একটু বুঝিয়ে বলো। তিনি রুক্ষ স্বরে বললেনঃ মানাতে না পারলে আইন করে কী লাভ ? এর জন্য দরকার গণসচেতনতার। আর আমার কথা বলছো। আমি তো দু'দিনের অতিথি। প্রাণীদের ভালোবাসবার কথা আমি সবখানেই বলে বেড়াই। কিন্তু কেউ কান না দিলে কী করবার আছে আমার? ফিলিপের কথার ইতি টানছি এখানে। এবার তাঁর স্ত্রীর জমিদারি স্কটল্যান্ডের কথায় আসছি। ষোড়শ শতকের শেষ ভাগে স্কটল্যান্ডের এসব অরণ্য ভূমি ছিলো সে দেশের রানী ম্যারির খাস দখলে। ম্যারি ছিলেন ইংল্যান্ডের রানী প্রথম এলিজাবেথের জ্ঞাতি বোন। ভুবনমোহিনী সুন্দরী ছিলেন ম্যারি কুইন অভ্‌ স্কটস্‌। বৃটিশ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নিয়ে এলিজাবেথের সংগে জড়িয়ে পড়েছিলেন তিনি সংঘাতে। ম্যারি ছিলেন ক্যাথোলিক ধর্মমতের অনুসারী। আর এলিজাবেথ প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদের। ধর্মীয় এই কলহের সুযোগে ম্যারিকে কৌশলে আটক করলেন এলিজাবেথ। একটানা আঠারো বছর লণ্ডন টাওয়ারে রাজবন্দীর দুঃসহ জীবন যাপন করতে হলো ম্যারিকে।

এর পরেই ঘটলো এই রাজনৈতিক নাটকের বিয়োগান্ত যবনিকাপাত। এক ট্রাইব্যুনাল করে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হলো ম্যারিকে। এলিজাবেথকে সিংহাসনচ্যুত করবার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হলো ম্যারির বিরুদ্ধে। তড়িঘড়ি করে শেষ করা হলো বিচার। ম্যারি পেলেন মৃত্যুদণ্ডের সাজা। টাওয়ার দুর্গে গিলোটিনের খাঁড়ার কোপে স্কটল্যাণ্ডের হতভাগিনী এই রানীর মস্তক হলো দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন। ট্রাইব্যুনালের এই বিচারকদের রায় নিয়ে আজো বিতর্ক আছে ইংল্যাণ্ডে, স্কটল্যাণ্ডে।

www.pathagar.com

ঐতিহাসিকরা বলেন- এলিজাবেথের প্রিয়ভাজন হওয়ার জন্য অন্যায়ভাবে ম্যারিকে হত্যা করবার পক্ষে রায় দিয়েছিলেন একচোখো অ্যাংলিকান বিচারকরা।

ম্যারিকে লণ্ডন দুর্গের যে কক্ষে হত্যা করা হয়েছিলো সেটি আমি দেখেছি প্রথমবার লণ্ডন সফরকালে। ১৯৮০ সালে দরজাটির বাইরের গেটের মাথায় লেখা রয়েছেঃ গেট অভ্ দ্য ট্রেইটর্স। অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতকদের দরজা। এই দরজার ভেতরের কক্ষে রানী প্রথম এলিজাবেথের প্রেমিক ডিউক অভ্ এসেক্সসহ আরও অনেক উচ্চাভিলাষী রাজনীতিককে প্রাণ হারাতে হয়েছে একই অভিযোগে।

সেদিন ইতিহাসের এই জল্লাদখানা দেখে একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়েছিলো আমার শিহরিত বুকের ভেতর থেকে।

সেই ইংরেজ কমিশনারের কথা বলতে গিয়ে স্কটল্যাণ্ড, রানী ম্যারি আর সে দেশে ব্রিটিশ রাজ পরিবারের খাস তালুকের প্রসঙ্গ টেনেছিলাম। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে ক্লাইভ, ওয়ারেন হেস্টিংস, উইলিয়াম বেন্‌টিংস আর কর্নওয়ালিসসহ প্রায় সব নতুন ব্রিটিশ নবাবের দল বাংলাদেশকে তাঁদের খাস তালুক মনে করতেন। ১৭৯৯ সালে টিপু সুলতানের হাত থেকে মহীশুর দখল করে নেবার পর গোটা ভারতবর্ষই তাদের মৃগয়াক্ষেত্র হয়ে উঠেছিলো। ইংরেজদের প্রথম জমিদারির টোপ গিলিয়েছিলেন মীর জাফর। পলাশীর যুদ্ধে মদদ যোগানোর বখ্‌শিশ হিসাবে তিন কোটি টাকার নগদ নারায়ণসহ চব্বিশ পরগনা জেলার জমিদারী দিয়েছিলেন তিনি তাঁকে। সেটা ছিলো ১৭৫৭ সালের ঘটনা। চার বছর পর, ১৭৬১ সালে, নবাব মীর কাসিম একইভাবে চট্টগ্রাম জেলার ভূমিস্বত্ব লিখিয়ে দিলেন ব্রিটিশ ফৌজের এই ধুরন্ধর সেনানায়ককে।

সেই থেকে পাকাপাকিভাবে গড়ে উঠলো এ দেশে ব্রিটিশ উপনিবেশ। ইণ্ডিগো প্লান্টার্সরা তথা ইংরেজ নীলকরের দল হুগলি-মেদিনীপুর থেকে শুরু করে চট্টগ্রাম পর্যন্ত সারাটা বাংলায় ভূমির পত্তনি কায়েম করলো তাদের জমিদারী অর্থাৎ নীল চাষের সাম্রাজ্য। ব্যক্তিমালিকানায় বিশাল রাজ্যপাট গড়ার রাস্তাটা প্রথম খুলে দিয়েছিলেন লর্ড কর্নওয়ালিস। ১৭৯৩ সালে এজেন্টের মাধ্যমে খাজনা আদায়ের কুটকৌশল হিসাবে তিনি পত্তন করেছিলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা। এই কুখ্যাত সামন্ত প্রথার সুবাদে এ দেশে কোম্পানির কুঠির মুন্‌শি মুৎসুদ্দি, পাইকার-দালাল এমন কি দস্যু দলপতিরাও রাতারাতি বনে গেলো রাজা-মহারাজা। আর ইংল্যাণ্ডের ভাগ্যান্বেষী ঠ্যাঙাড়েরা হলো নীলকর জমিদার।

ভাবতে অবাক লাগে এই নব্য নবাবদের ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পর্যন্ত দেয়া হয়েছিলো। তাদের আলাদা কোর্ট ছিলো। ছিলো কয়েদখানা। খরা-বন্যা-আকালে হাড্ডিসার হয়ে যাওয়া চাষীদের খাজনার দায়ে বরকন্দাজ দিয়ে ধরে আনা হতো জমিদারের কাছারিতে। ক্রোক করা হতো তাদের হালের বলদ, ঘরের আসবাবপত্র এমন কি থালাবাটিও। খাজনা দিতে অক্ষম নিরন্ন কৃষকের সমস্ত কাকুতি-মিনতি, আর্তহাহাকার মিলিয়ে যেতো বাতাসে। এ দেশের ভুখানাঙা মানুষ তো জমিদারের

www.pathagar.com

কাছে মনুষ্যপদবাচ্য বলেই গণ্য ছিলো না। তারা ছিলো তাদের কাছে দুই হাত দুই পায়ের ইতর প্রাণী-বিশেষ মাত্র।

আর ভূস্বামীরা ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের সাক্ষাৎ প্রতিভূ। শ্বেতাঙ্গ না হলেও মনে মনে তারা নিজেদের ইংরেজ লাটবেলাটের সমতুল্য জ্ঞান করতেন। ভাবতেন স্বয়ং কর্নওয়ালিসের পোষ্যপুত্র তারা। সুতরাং সাত খুন মাপ তাদের। ব্যাপারটা বাস্তবেও এ রকমই দাঁড়িয়েছিলো। জমিদারের ফাটকখানায় বছরের পর বছর ধরে পচতে থাকতো সর্বহারা কৃষক। তার চাষের জমি, ঘর-বাড়ি, ফলবান গাছ, পুকুর সবকিছু চলে যেতো রাজা-নবাব বাহাদুরের খাস দখলে। কৃষকের স্ত্রী-পুত্র-কন্যারা ভিটাছাড়া হয়ে নিঃশেষ হতো ধুঁকে ধুকে। অথবা বরণ করতো ক্রীতদাসের দুর্ভাগ্য। আর হতাভাগা কৃষকের ভবলীলা সাঙ্গ হতো তার দণ্ডমুণ্ডের বিধাতার বন্দিশালায়।

খাজনা দিতে অক্ষম যেসব সাহসী কৃষক জমিদারের নায়েব-তহশিলদার-পেয়াদার অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতো, তাদের দুর্গতির সীমা-পরিসীমা থাকতো না। তাদের বলা হতো বিদ্রোহী প্রজা। জমিদার স্বয়ং বিচারক হয়ে তাদের কয়েক বছরের জেল দিতেন। এ জেলের মানে ছিলো রোজ বিদ্রোহীর খালি পিঠে চাবুকের ঘা লাগানো। এক সময় রক্ত মাংসে একাকার হয়ে নিঃশব্দে বিদ্রোহীদের ঢলে পড়তে হতো ফাটকখানা নামক সেকালের উৎপীড়ক ভূস্বামীকুলের নরককুণ্ডে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আদালতে প্রজা হত্যার অপরাধে এসব স্বেচ্ছাচারী ঘাতক জমিদারকে পারতপক্ষে কখনো তলব করা হতো না। তারা ছিলেন সার্বভৌম রাজার মতোই ইম্মিউন অবল অর্থাৎ আইনের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

সাদা চামড়ার লোক হিসাবে নীলকর জমিদারদের ক্ষমতা আর দাপটের তো কোনো সীমারেখাই ছিলো না। কৃষকদের ধানের জমিতে ঘুঘু চরিয়ে সেখানে তারা বুনতো নীলের চারা। যেসব চাষী তাদের খামারে কাজ করতে চাইতো না তাদের ঘাড়ে জোয়াল বেঁধে বাধ্য করা হতো বলদের মতন লাঙল ঠেলে নীলের জমি চাষ করতে। এরপরও যারা অবাধ্য হতো তাদের ধরে এনে ফাটকখানায় পুরে রাখা হতো। চাবকে চাবকে জ্যান্ত তুলে নেয়া হতো জঠরজ্বালায় ওষ্ঠাগতপ্রাণ সেই অভিশপ্ত চাষীর শরীরের চামড়া। ছটফট করতে করতে তাকে আলিঙ্গন করতে হতো দুঃসহ মৃত্যু। দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'নীল দর্পণ' নাটকে সবিস্তারে বর্ণনা করে গেছেন এদের দুর্গতির কাহিনী। ইন্টারমেডিয়েট ক্লাসে এই নাটকটি পড়ে চোখের পানি রোধ করতে পারিনি আমি। এখনো চোখের সামনে ভাসে যশোরের শ্বেতাঙ্গ নীলকরের চাবুকাঘাতে জর্জরিত চাষীদের করুণ মুখচ্ছবি। দুর্নামের ভয়ে তথাকথিত ন্যায়বিচারের ব্যাঘ্র চর্মধারী ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিলো 'নীল দর্পণ'। কিন্তু এরপরও 'বিচারের বাণী শুধু নীরবে-নিভৃতেই কেঁদেছিলো'।

যতো বর্বর-পাষণ্ড আর খুনে ডাকাই হোক ওরা তো আসলে ছিলো গাত্রবর্ণে শ্বেতাঙ্গ। কে করবে ওদের বিচার? নিজেরাই তো ছিলো বিচারক। একদিকে নীলকুঠির জমিদার আবার একই সঙেগ ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুর। কিন্তু তারপরও উৎপীড়িত কৃষকের

www.pathagar.com

বিদ্রোহ থেমে থাকেনি। ফরিদপুরের কৃষক নেতা হাজী শরিয়ত উল্লাহ, দুদু মিয়া প্রমুখ সারা দক্ষিণ-পূর্ব বাংলাকে টালমাটাল করে তুলেছিলেন অত্যাচারী শ্বেতাঙ্গ নীলকর আর তাদের দোসর স্থানীয় জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বারাসতের প্রজা-আন্দোলনের বিপ্লবী গণনায়ক তিতুমীর তাঁর লাঠিয়াল বাহিনী নিয়ে উৎখাত করেছিলেন নীলকর আর তাদের স্যাঙাতদের। শেষে গভর্নর জেনারেল লর্ড বেনটিংক ব্রিটিশরাজ খতম হওয়ার ভয়ে সেনাবাহিনী পাঠিয়ে তোপের মুখে উড়িয়ে দিয়েছিলেন তিতু আর তাঁর সঙ্গেকার কৃষক নেতাদের। ভূমিসাৎ করেছিলেন তিতুর প্রতিরোধ দুর্গ বাঁশের কেল্লাটিকে। কিন্তু সেই বিদ্রোহের ছড়িয়ে পড়া দাবানলকে, তার অনিরুদ্ধ জলতরঙ্গকে শেষমেষ হাজার বালির বাঁধ দিয়েও রুখতে পারেনি ব্রিটিশরাজ।

আমাদের সাবেক বসত ভুলুয়া পরগনার ইতিহাস জুড়ে আছে স্থানীয় রাজা-জমিদার, পর্তুগিজ-মগ জলদস্যু, ব্রিটিশ হানাদার বোম্বেটে আর ফিরিঙ্গী লবণকর-নীলকরদের অত্যাচারের হাজারো কাহিনী। উনিশশ' তেতাল্লিশ-চুয়াল্লিশে বঙ্গোপসাগরের যে পথ ধরে মূল ভূখণ্ডে হানা দিতো জাপানের আকাশ দস্যুরা সেই একই পথে এসে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করতো ইউরোপীয় হার্মাদের দল। এদের ধ্বংসযজ্ঞের কিছু কিছু চিহ্ন এখনো আছে চট্টগ্রামে, সন্দ্বীপে, ভুলুয়ায়, শাহবাজপুরে আর সাবেক বাকলা তথা চন্দ্রদ্বীপে। বাকলার এ কালের নাম বরিশাল।

সোনারগাঁয়ের স্বাধীন সুলতানদের যুগে ভুলুয়া ছিলো পূর্ববাংলার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের রাজধানী। ভুলুয়ায় গৌড়ের সুলতানের ভাইসরয় ছিলেন ফখরুদ্দিন মুবারক। তিনি টিপ্‌রা উপজাতির রাজাকে দমন করে জয় করেছিলেন পার্বত্য- ত্রিপুরা। আরাকানের মগরাজার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে গৌড়ের অধীনে এনেছিলেন চট্টগ্রাম। পরে গৌড় এবং দিল্লির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সোনারগাঁয় প্রতিষ্ঠা করলেন পূর্ববাংলার প্রথম স্বাধীন সরকার। ভুলুয়া আর ত্রিপুরার রাজা ছিলেন তাঁর সামন্ত। ষোড়শ শতকে ঈসা খাঁর নেতৃত্বে ঢাকার শ্রীপুরের রাজা কেদার রায়, গাজীপুরের দেওয়ান আর যশোরের প্রতাপ রায়ের সঙ্গে বাংলার স্বাধীন বারো ভূঁইয়ার কোয়ালিশনে যোগ দিয়েছিলেন ভুলুয়ার রাজা লক্ষ্মণ মানিক্য। ১৫৭৬ সালে মুগল সেনাপতি মানসিংহের হানাদার বাহিনী এবং পরে সুবাদার ইসলাম খাঁর ফৌজের সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধ হয়েছিলো ভুলুয়ার সেনাদলের।

আত্মকথা লিখতে গিয়ে আমি যখন অতীত ইতিহাসের জের টানছি তখন ১৯৯৭ সাল তামাদি হতে চলছে। পেছন দিকে চোখ ফেরাতে গিয়ে দেখছি আমার প্রতিবেশের চারপাশটাকে ঘিরে কত বিচিত্র ঘটনা-দুর্ঘটনা ছায়া বিস্তার করে রয়েছে। সেকালের বয়স্ক লোকেরা কথায় কথায় হার্মাদের প্রসঙ্গ ওঠাতেন। দুষ্টু ডানপিটে ছেলেদের হার্মাদ বলে গাল দিতেন। মা আমাকে ঘুম পাড়াতেন এই অজানা ভূতের ভয় দেখিয়ে। যেমন নবাব আলীবর্দী খানের আমলে গ্রামের শিশুদের ঘুম পাড়ানো হতো 'বর্গি'র কথা বলে। কে রচনা করেছিলেন সেই অপূর্ব ছেলে-ভোলানো ছড়াটি জানি না। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে সেটি স্থান করে নিয়েছে চিরকালের মতো। তার

www.pathagar.com

সুর আর ছন্দের ঝংকারে দোতারার মতন বেজে উঠে হৃদয় যখন আবৃত্তি করা হয়- 'ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গি এলো দেশে বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিবো কিসে?'

তেমনি মগ, ফিরিঙ্গি আর হার্মাদ জলদস্যুর উপদ্রবের কাহিনী নিয়েও অনেক ছড়া রচনা করেছিলেন উপকূলের সেই আদ্যিকালের বদ্যি বুড়িরা। একটি ছড়ার নমুনাঃ 'মগা আইলো বগা আইলো হার্মাদ আইলো শেষে। ভিটা জ্বলে গেরাম জ্বলে, আগুন জ্বলে দেশে।' আরেকটি ছড়ার ভাষ্যঃ 'কালা গোরা ধলা গোরা, লুটি নেয় থালা-খোরা। ধরি নেয় পোলা মাইয়্যা। ভিটায় চরে কোয়াল-কাউয়্যা। আইন নাই রাজা নাই, লোক মরে ঠাঁই ঠাঁই।'

গ্রামীণ ছড়ার এই বর্ণনাগুলো থেকে বোঝা যায় কী বিভীষিকার মধ্যে সেকালে জীবন কাটিয়েছে বঙ্গোপসাগর উপকূলের মানুষ। 'কালা-গোরা' বলতে ছড়ায় বোঝানো হয়েছে মগ জলদস্যুদের কথা। আর ধনী-গোরা হলো শ্বেতাঙ্গ পর্তুগিজ জলদস্যু। কোয়াল শব্দের অর্থ ঘুঘু পাখি। 'হার্মাদ' শব্দটি হলো ইংরেজি আর্মাডা অর্থাৎ নৌবহর শব্দের লোকজ অপভ্রংশ। পর্তুগিজ জলদস্যুরা বোম্বাই সংলগ্ন তাদের আরব সাগরের উপনিবেশ গোয়া থেকে নৌবহর নিয়ে এসে সেকালে হানা দিতো চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, বরিশাল আর খুলনা উপকূলে। সন্দ্বীপে, কর্ণফুলি-মোহনা সংলগ্ন দিয়াঙ্গা পাহাড়ে আর ভোলার দক্ষিণ-পশ্চিমে কুকরি-মুকরি দ্বীপে ছিলো তাদের মূল আড্ডা। তাদের নৌবহরে থাকতো ইউরোপের ভাইকিং জলদস্যুদের ব্যবহার করা জাহাজের মতো বিশ দাঁড়-ত্রিশ দাঁড়ের মাস্তুলঅলা ছিপের নৌকা। মাস্তুলে উড়ানো হতো কখনো তিন গাল, কখনো ছয় গাল। এছাড়া তারা ফ্রিগেট, স্কুনারের মতো বড়ো বৈঠার ছইঅলা লম্বাটে জাহাজও ব্যবহার করতো। এসব পালতোলা বোম্বেটে জাহাজ গাংচিলেদের মতো ঝাঁক বেঁধে চলতো বঙ্গোপসাগরে। কী বর্ষা কী শীত সব ঋতুতেই তারা সাগর থেকে উড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়তো উপকূলের শান্তিপূর্ণ লোকালয়গুলোতে। লুটপাটের পর আগুনে পুড়িয়ে ছারখার করতো ঘরবাড়ি, গ্রামগঞ্জ। যুবক-যুবতী, শিশু কিশোরদের ধরে নিয়ে গিয়ে জাহাজে পুরতো। গরু-ছাগলের সঙ্গে হাত-পায়ে লোহার বেড়ি লাগিয়ে ফেলে রাখতো এসব হতভাগ্য বন্দীকে। যেসব তাগড়া জোয়ান ছেলে নদীতে কিংবা সাগরে ঝাঁপ দিয়ে পালাতে পারে বলে মনে করতো হার্মাদেরা, তাদের ওপর চলতো নারকীয় উৎপীড়ন। লোহার শলা গরম করে ফুটো করা হতো এদের হাতের তালু। ফুটোর ভেতর দড়ি ঢুকিয়ে এদের বেঁধে রাখা হতো ছইয়ের ভেতর।

সেকালে গোয়া, মধ্যপ্রাচ্যের কাতার, ভারত মহাসাগরের মরিশাস দ্বীপ আর আফ্রিকার জাঞ্জিবার ছিলো পর্তুগিজ উপনিবেশ। দাস ব্যবসার আন্তর্জাতিক বাজার ছিলো এসব জায়গায়। কাতারকে বলা হতো পাইরেট কোস্ট অর্থাৎ জলদস্যুর উপকূল। এসব দাস-বাজারে বেঁচে দেয়া হতো বাংলাদেশের হতভাগ্য যুবক-যুবতীকে। ক্রীত দাস-দাসী হিসাবে এরা কোথায় হারিয়ে যেতো তার হদিস কেউ কখনো জানতো না।

www.pathagar.com

দিয়াংগায় ছিলো পর্তুগিজ গির্জা। সেখানে বন্দী বাঙালি শিশু এবং মহিলাদের পরমানন্দে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষা দিতেন জেসুইট পাদ্রিরা। এদের মাথায় দীক্ষার জল সিঞ্চন করে জন দ্য ব্যাপটিস্টের ভাষায় তারা স্তোত্র আওড়াতেন। বলতেনঃ হে ঈশ্বর, এই অজ্ঞজনদের করুণা করো। মোচন করো এদের পাপ। তোমার ধর্মের শান্তির ছায়াতলে গ্রহণ করো এদের। কিন্তু পর্তুগিজ জলদস্যুদের হাতে বন্দী এদেশের অসহায় নারী-পুরুষ-শিশুর আর্তনাদ এই ধর্মযাজকদের কানে যেতো না। তাঁরা বেশি উৎসাহী ছিলেন ম্যানুয়েল ডি ম্যাথুজ, কারভ্যাল-হো, সেবাস্তিয়ান গনজালেস প্রমুখ বঙ্গোপসাগরের হার্মাদ রাজাদের দস্যিপনায়। কারণ এরা উপকূলের নতুন নতুন এলাকা গ্রাস করে পর্তুগালের ইস্ট ইন্ডিজ সাম্রাজ্য বাড়িয়ে চলছিলো। আর নারী-শিশু-যুবকদের দলে দলে ধরে এনে তুলে দিচ্ছিলো দিয়াঙ্গা গির্জার ফাদার ফ্রে গ্যাসফার, ফ্রে ডা-লুজ আর ফারনানদিজের হাতে। এঁরা লুটের মালের মতো বাংলাদেশের শৃঙ্খলিত লা-ওয়ারিশ মানুষদের খেয়ে আনন্দে আটখানা হতেন। এদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করে ভাবতেন একদিন গোটা দেশটাই হবে লর্ড ক্রাইস্টের আশীর্বাদপুষ্ট। আর তাঁরা সেন্টের গৌরব নিয়ে বিনা ছাড়পত্রেই পেয়ে যাবেন স্বর্গের সোনার চাবি।

চট্টগ্রাম, সন্দ্বীপ আর ভুলুয়া-লক্ষ্মীপুর বিজয়ের জন্যে পর্তুগালের রাজা 'অর্ডার অভ্ ক্রাইস্ট' পদকে ভূষিত করেছিলেন জলদস্যু সর্দার কারভ্যাল-হো এবং ম্যাথুজকে। যেমন পর্তুগিজ অভিযাত্রী ভাস্কো ডা-গামাকে ১৪৯৮ সাথে কালিকট বিজয়ের জন্যে দেয়া হয়েছিলো একই উপাধি। তাঁকে গোয়াসহ ভারতের সামুদ্রিক উপনিবেশগুলোর ভাইসরয় করা হয়েছিলো। ভাস্কো ডা-গামার সেই অভিযানের পর থেকেই বঙ্গোপসাগরে শুরু হলো মায়ে-তাড়ানো বাপে-খেদানো পর্তুগিজ চোর-ছ্যাঁচ্চর-দস্যুর উপদ্রব। এ দেশে 'ছেলে-ধরা' কথাটার উৎপত্তি সেই সময় থেকেই। কারণ এই হার্মাদ দস্যুরা গ্রামগঞ্জে হানা দিয়ে সোনাদানার সঙ্গে শিশু আর যুবক-যুবতীদেরও উঠিয়ে নিয়ে যেতো।

ছোট্টবেলায় মা-দাদির কাছে হার্মাদদের গল্প শুনবার পর সাংবাদিক জীবনে এদের নিয়ে অনেক মাথা ঘামিয়েছি আমি। পুঁথিপত্র-ইতিহাস ঘেঁটে যা পেয়েছি, ছড়ার বর্ণনার চেয়েও তা বেশি রোমহর্ষক। একটানা দেড়শ' বছর ধরে মগ আর হার্মাদের অত্যাচারে জনশূন্য ছিল সুন্দরবন থেকে সীতাকুন্ডের বঙ্গোপসাগরের গোটা উপকূল।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি সৈয়দ আলাওলও (১৬০৭-১৬৮০) পর্তুগিজ জলদস্যুদের কবলে পড়ে ভোগ করেছিলেন অশেষ দুর্গতি, হার্মাদেরা তাকে আরাকানে ক্রীতদাস হিসাবে বেচে দিয়েছিলো। কবি তাঁর বিখ্যাত 'সিকান্দারনামা' কাব্যে তাঁর ভাগ্যবিড়ম্বনার চিত্র এভাবে তুলে ধরেনঃ 'মন্দকৃতি ভিক্ষাবৃত্তি জীবন কর্কশ, দারাপুত্র সঙ্গে অঙ্গ হৈল পরবশ।'

কবি এবং তাঁর পিতা সপরিবারে কর্ণফুলি নদীপথে যাচ্ছিলেন সম্ভবত কোনো আত্মীয় বাড়িতে। যাত্রীবাহী নৌকাটির ওপর হামলা চালায় বোম্বেটেরা। তখন কর্ণফুলি, মাতামুহুরি, ফেনি, মেঘনা প্রভৃতি নদীতে এমন কি ঢাকার বুড়িগঙ্গা,

www.pathagar.com

ধোলাইখাল আর কাচপুর সংলগ্ন শীতলক্ষ্যা নদীতেও ঘাপটি মেরে থাকতো পর্তুগিজ হার্মাদদের ছিপের নৌকা। এদেশের মাঝিমাল্লারাও তাদের আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্যে শেল-বল্লম-ট্যাট ইত্যাদি নিয়ে চলাফেরা করতেন নদীপথে। আলাওলদের নৌকাটি আক্রান্ত হওয়ার পর হার্মাদদের সঙ্গে যুদ্ধ হলো দেশীয় নাবিক আর নৌকার যাত্রীদের।

হার্মাদেরা সেকালের ইউরোপীয় আগ্নেয়াস্ত্র সঙ্গে নিয়ে বোম্বেটেপনা করতো। তাদের বন্দুক-কামানের সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারলেন না আক্রান্ত নৌযানটির লোকজন। সংঘর্ষে নিহত হলেন কবির পিতাসহ অনেক যাত্রী। মারাত্মকভাবে আহত হলেন আলাওল স্বয়ং। আহতদের বন্দী করে বেচে দেয়া হলো আরাকানের দাস বাজারে। পরে এক দেশীয় সওদাগরের অনুগ্রহে ছাড়া পেয়ে রোগাঙ্গ রাজসভায় যাওয়ার সুযোগ ঘটলো তাঁর। সেখানেই 'পদ্মাবতী উপাখ্যান', 'হস্তপয়কর' 'সিকান্দারনামা' প্রভৃতি কাব্য রচনা করে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে খ্যাতির উচ্চাসনে আরোহণ করেন তিনি।

তাঁর রোগাঙ্গ-রাজসভায় অবস্থানকালেই আওরংজেবের সেনাপতি মীর জুমলার হাতে বন্দী হওয়ার ভয়ে শাহ্জাহান পুত্র সুজা পর্তুগিজদের সাহায্যে আরাকানের রাজধানী রোগাঙ্গা তথা রোহাং নগরে পৌঁছেন। ডাচ ইস্ট ইন্ডিজ কোম্পানির মধ্যস্থতায় শাহ্ সুজাকে রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়েছিলেন আরাকানের রাজা। ১৬৬০ সালে এক ষড়যন্ত্রে অনুচর দলসহ নিহত হলেন মুগল সিংহাসনের দাবিদার এই হতভাগ্য শাহ্জাদা। তাঁর স্ত্রী পরীবানু এবং কন্যারা আত্মহত্যা করে রক্ষা করেছিলেন সম্ভ্রম। পরীবানুর দুঃখের গান আজো গীত হয় চট্টগ্রাম, নোয়াখালী এবং বরিশালের গ্রামে। এই শোকগাথা 'পরীবানুর দোঁহা' নামে পরিচিত। সেই ষড়যন্ত্রের সময় শত্রুর প্ররোচনায় কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন কবি আলাওল। কারাজীবনেও অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করেন তিনি। কবিকে সুজার সমর্থক হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়েছিলো। পরে আরাকান দরবারের এক বাঙালি মন্ত্রীর হস্তক্ষেপে মুক্তি পেলেন তিনি। কবির বাসস্থান ছিলো চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারি থানার সাবেক ফতেয়াবাদ পরগনায়।

এখানে আলাওলের স্মৃতিবিজড়িত একটি দীঘি, একটি মসজিদ এবং কবির সমাধি আজো বিদ্যমান। আলাওল বাংলা ভাষা অনুরাগী এবং স্বদেশপ্রেমিক একজন খাঁটি কবি। কারামুক্তির পর জীবনের শেষদিনগুলো জন্মস্থানেই কাটিয়েছিলেন তিনি। বন্দিদশায় স্বদেশের জন্যে নাড়ি-ছেঁড়া টান অনুভব করতে দেখা যায় তাঁকে। কারাগারে বসে পূর্বগামী কবি দৌলত উজিরের ভাবানুষঙ্গ অনুসরণ করে তিনি লিখলেনঃ নগর ফতেয়াবাদ, দেখিতে পুরয়ে সাধ, চাটিগ্রামে সুনাম প্রকাশ। স্মরণযোগ্য, আরাকানের অর্থমন্ত্রী কবি দৌলত উজির বাহরাম খানের জন্মস্থানও ছিলো চট্টগ্রামের ফতেয়াবাদ অঞ্চলে।

আমরা উপকূল অঞ্চলে হার্মাদের উৎপাত আর দাস ব্যবসার কথা বলছিলাম। আলাওলের যুগে বঙ্গোপসাগর উপকূলও ছিলো পাইরেট-কোস্ট। এখানে হরহামেশাই

www.pathagar.com

তখন হানা দিতো মগ, পর্তুগিজ, ডাচ এবং ইংরেজ জলদস্যুর দল। ১৬৮৫ সালে চট্টগ্রাম দখলের জন্যে ইংল্যাণ্ডের রাজা দ্বিতীয় জেমস-এর আমলে দশটি হানাদার জাহাজ পাঠানো হয়েছিলো বঙ্গোপসাগরে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টর বোর্ডের এক নির্দেশে বলা হয়, 'চট্টগ্রাম বন্দর আর আশপাশের জায়গাগুলো আমাদের লেঃ কর্ণেল জব চার্নকের হাতে অবিলম্বে ছেড়ে দেয়া না হলে আমরা অস্ত্রবলে শহরটির দখল নিতে বাধ্য হবো। জব চার্নক হবেন বন্দরের গবর্নর।'

কিন্তু ইংরেজদের সে হানাদারি তৎপরতা ব্যর্থ হলো মুগল নৌবাহিনীর অবরোধের ফলে। ইংরেজরাও তখন বঙ্গোপসাগরে দস্যুবৃত্তি করতো আর দাস ব্যবসা চালাতো। বাংলাদেশের সামন্ত রাজা এবং জমিদারেরাও সেকালে ক্রীতদাস পুষতেন। নগদ মুদ্রার বিনিময়ে দাস কেনাবেচা করতেন। সুন্দরী ক্রীতদাসীরা বিক্রি হতো চড়া দামে। এরা আলো করতো জমিদারদের হারেম এবং বাগানবাড়ি। ক্রীতদাসদের বলা হতো কেনা-গোলাম। ক্রীতদাসীদের বলা হতো কেনা-বাঁদি। সিলেটে এই ক্রীতদাস দাসীদের বলা হতো খানাবাড়ির গোলাম।

পঞ্চাশ দশকে জমিদারি প্রথা উঠে যাওয়ার আগে প্রায় সব বড়ো জমিদার বাড়িতেই ছিলো গোলামদের জন্যে আলাদা মহল। রাজবাড়ির পেছনে ছিলো গোলামদের থাকবার ঘর। সত্তরের দশকেও আমি দেখেছি ক্রীতদাস প্রথার ক্ষয়িত অবশেষ। সেবার এক বিশেষ অনুসন্ধান রিপোর্ট সংগ্রহ উপলক্ষে গিয়েছিলাম ফেনির এক বর্ধিষ্ণু গ্রামে। আমাদের উঠতে হয়েছিলো গ্রামের এক প্রাচীন ক্ষয়িষ্ণু জমিদার বাড়িতে। রাত তখন প্রায় বারোটা। বাড়ির বুড়ো কর্তা আমাদের জন্যে খাবারের যোগাড়যন্ত্র শুরু করে দিলেন। তাঁদের কষ্ট হবে দেখে আপত্তি জানাতেই তিনি বলে উঠলেনঃ কোনো অসুবিধা হবে না আমাদের। পুরনো চাক্‌রানরা আছে বাড়ির ওপাশেই। মেহমান যতো রাতেই আসুন না কেন ওরাই সব যোগাড়যন্ত্র করে দেয়।

দেখলাম কয়েকজন মেয়ে এবং পুরুষ এসে তড়িঘড়ি করে রান্নার আয়োজনে লেগে গেলো। সবাই মিলে ঘন্টা দেড়েকের মধ্যে আমাদের খাওয়ার বন্দোবস্ত করলো। পরে এদের ব্যাপারে বুড়ো কর্তাকে জিজ্ঞেস করতেই তিনি বললেন, এরা আমাদের সাবেক কালের গোলাম বংশের লোক। এখন আর আমরা এদের ভার নিতে না-পারলেও এরা যে কোনো সময় খবর দিলে আমাদের ফাই-ফরমাশ খাটে।

১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড় আর জলোচ্ছ্বাসের সময় বিশেষ রিপোর্ট করবার জন্যে উপকূল এলাকা সফরকালেও তালুকদার বাড়িতে অতীতের এই ক্রীতদাস বংশের লোকদের দেখেছি।

সেই প্রলয়ংকর ঘূর্ণিঝড়ই বাংলাদেশের স্বাধীনতা দ্রুতারিত করে দিয়েছিলো। সেই ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের মারা গিয়েছিলো প্রায় পঁয়ত্রিশ লাখ লোক। লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছিলো সুন্দরবন থেকে টেকনাফ পর্যন্ত গোটা উপকূল। কিন্তু ইয়াহিয়ার সামরিক সরকার অত বড়ো বিপর্যয়েও বাংলাদেশের ত্রাণে এগিয়ে আসেনি। মওলানা ভাসানী সে সময়েই পাকিস্তানের শাসকদের হঠাৎ 'আস্‌সালামু আলাইকুম' জানিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

অর্থাৎ তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন এবারই তোমাদের সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া হয়ে গেলো আমাদের। আমরা আলাদা হয়ে গেলাম।

সেবার পাকিস্তান পার্লামেন্টের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পেলো নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। কিন্তু সামরিক ডিক্টেটর ইয়াহিয়া এবং তার দোসর জুলফিকার আলী ভুট্টো ব্যস্ত ছিলেন প্রাসাদ চক্রান্তে। তারা আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় যাওয়ার পথ বন্ধ করার জন্যে ষড়যন্ত্রের পর ষড়যন্ত্রের ঘুঁটি চালাতে লেগে গেলেন। এদিকে বাংলাদেশে হাহাকার উঠলো ।

বজ্রাঘাতে। আমরা একাই বিলাপ করতে লাগলাম ব্যানার হেডিংয়ে শিরোনাম দিলামঃ 'কাঁদো বাঙালি কাঁদো।' তারা আমাদের কান্নায় এতটুকুও সাড়া দিলো না। এরই প্রেক্ষাপটে শুরু হলো স্বাধীনতার সংগ্রাম। পাকিস্তানের মৃত্যু বাজলো। আমরা হলাম স্বাধীন।

সত্তরের সেই দুর্যোগকালে নোয়াখালীতে দেখা মালেক উকিলের সঙ্গে। সেই উপলক্ষে চারণ করছি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের স্মৃতি।

সত্তরের জলোচ্ছ্বাসের দুই দিন পর একটি উঁচু জীপে করে প্রথম গেলাম আমরা নোয়াখালীর চর জব্বরে। তখন জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি আবদুল মালেক উকিল ছিলেন তাঁর মাইজদির বাড়িতে। আমার সঙ্গে ছিলেন প্রাদেশিক সরকারের কৃষি বিভাগের সে সময়কার যুগ্ম সচিব আবদুর রব চৌধুরী। ছাত্রজীবন থেকেই মালেক উকিলের সঙ্গে ছিলো আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। ১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠার দিন নইমুদ্দিন, মোহাম্মদ তোয়াহা, তাজুদ্দিন, মালেক উকিলসহ আমরা অনেকে এই সংগঠনের আহবায়ক কমিটিতে ছিলাম। তখন রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন উত্তপ্ত হয়ে উঠছিলো। আমি তখন অর্ধ সাপ্তাহিক 'ইনসান' পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আমার জগন্নাথ কলেজ ছাত্রাবাসের রুমই ছিলো পত্রিকাটির অফিস। এর পরিচালনা এবং সম্পাদনার মূল দায়িত্বে ছিলেন আমার বন্ধু ডাঃ আব্দুল ওয়াহেদ চৌধুরী। আমার ওপর পড়ে যুগ্ম সম্পাদনার ভার। বলাবাহুল্য, কাগজটি ছিলো যেমন রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মুখপত্র তেমনি বিরোধী দলেরও মুখপত্র।

মালেক উকিল, ফেনির আজিজ ভাই, মোহাম্মদ তোয়াহা প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ছাত্রলীগ নেতারা কাগজটির পুশিং সেলের ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। কলকাতা থেকে ইতিমধ্যে ঢাকা এলেন শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর সংস্পর্শে ছাত্র রাজনীতির পাশাপাশি বিরোধী দলীয় রাজনীতিতে এলো এক নতুন প্রাণচাঞ্চল্য। একই সঙ্গে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনেও সঞ্চারিত হলো এক নবতর উদ্দীপনা। আটচল্লিশের মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন ভবনের আমতলায় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়ার দাবিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছিলো এক সর্বদলীয় ছাত্রসভা।

হঠাৎ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলো সমাবেশে। এক কোণ থেকে কয়েকজন দাঁড়িয়ে উঠে বললোঃ মুজিব ভাই এসেছেন! মুজিব ভাই ! এখন যেখানে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের পুব দিকের প্রধান গেট সেটি ছিলো সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

www.pathagar.com

প্রবেশ তোরণ। তার মাথার উপরকার দোতলায় থাকতেন প্রোক্টর ডাঃ মায্‌হারুল হ্ক। শেখ সাহেব তোরণটি ছাড়িয়ে দ্রুত পায়ে আস্‌ছিলেন সভার দিকে। তাঁর গায়ে ছিলো একটি কালো শেরওয়ানি, পরনে সাদা পায়জামা। ইটের গুঁড়োর লাল রং লেপ্টে ছিলো পায়জামার গোড়ার দিকটায়। তাঁর গড়ন ছিলো একহারা, ছিপ্‌ছিপে। লম্বায় ছিলেন ছয়ফুটের বেশি। আমার চোখে এই মুহূর্তেও জ্বলজ্বল করছে সেই ছবিটা।

সভায় এসেই তিনি আসর কাঁপিয়ে তুললেন। মাইক হাতে নিয়ে গম্ভীর উচ্চনাদি কণ্ঠে বললেনঃ মিছিল-মিটিং করে লাভ হবে না ভাইয়েরা। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করতে হলে ডাইরেক্ট অ্যাক্‌শনে যেতে হবে। অ্যাসেম্ব্লি ঘেরাও করতে হবে। নইলে পাকিস্তানের হর্তাকর্তাদের হুশ হবে না।' বলেই তিনি জোরে স্লোগান তুললেনঃ 'চলো, চলো অ্যাসেম্ব্লি চলো।' আর দাঁড়ালেন না তিনি। ছুটলেন জগন্নাথ হলের দিকে। উপমহাদেশ বিভাগের পর ঢাকা যখন পূর্ববঙ্গ সরকারের রাজধানী হলো তখন থেকে বেশ কয়েক বছর জগন্নাথ হলের লাল ইটের সাবেক ভবনটিতে বসতো প্রাদেশিক আইন পরিষদের বৈঠক। বিল্ডিংটিকে বলা হতো 'লেজিস্‌লেটিভ অ্যাসেম্ব্লি হাউস।' অর্থাৎ ব্যবস্থাপক পরিষদ ভবন। এই পরিষদের সদস্যদের বলা হতো এমএলএ। কথাটার মানে ছিলো মেম্বর অভ্ দ্য লেজিস্‌লেটিভ অ্যাসেম্ব্লি।

শেখ সাহেব ছুটছিলেন আগে-আগে। আমরা তাঁকে অনুসরণ করে দৌড়ে যাচ্ছিলাম। বেলা দুইটার দিকে ঘেরাও করা হলো আইন পরিষদ। এখনকার শহীদ মিনার এলাকা থেকে সলিমুল্লাহ হলের পশ্চিম প্রান্তে সাবেক রেল গেট পর্যন্ত ছিলো এক বিশাল জনসমুদ্র। এদের মধ্যে ছিলেন পলাশী এবং নীলক্ষেত ব্যারাকের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারিরা। ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং শহরের বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্র ছাড়াও শিক্ষক-অধ্যাপকেরা। ইডেন বিল্ডিংয়ের যেসব কর্মচারী রাজধানীর পুরাতন এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন তাঁরাও এসে জমায়েত হয়েছিলেন আইন পরিষদের চারপাশে। তখন ঢাকার নবাববাড়ি এবং চকবাজার-লালবাগ, কলতাবাজার, বংশাল, নারিনন্দাসহ অনেকগুলি মহল্লার সর্দার উর্দুর পক্ষে থাকলেও বেশ কিছু মহল্লার বাসিন্দা বাংলার পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁরাও বিক্ষোভে শরিক হলেন আমাদের সঙ্গে। ঘরে ঘরে গিয়ে বুঝিয়ে এঁদের আমরা টেনেছিলাম বাংলার পক্ষে। বিশাল এই জনসমুদ্র থেকে মুহর্মুহু আওয়াজ উঠছিলোঃ 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। রাষ্ট্রভাষা না দিলে-গদি ছাড়ো একসাথে।'

আমার সাংবাদিক জীবনের নানান প্রসংগ নিয়ে লিখছিলাম দেখতে দেখতে বেলা অনেক বাড়লো। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৯৭। মাঝখানে পঞ্চাশটা বছর প্রায় উৎরে গেলো। এ ডিসেম্বরে পূর্ণ হবে অর্ধশতক। সুদীর্ঘ এই সময়টা কেমন করে পার হলো ভাবতে নিজের কাছেই বিস্ময় লাগে। মনে হয় যে এই সেদিন নিউজ ডেস্কে বসে সংবাদ অনুবাদ করতে বসেছি মানানসই শব্দ খুঁজবার জন্যে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছি এ টি দেবের ইংরেজি অভিধানে। বাক্য স্বচ্ছন্দ না- হওয়ায় পাতার

www.pathagar.com

পর পাতা ছিঁড়ে স্তূপাকার করছি ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটে।

আবার আনন্দে বুকটা ফুলে উঠেছে যখন সিনিয়ররা সংবাদ- শিরোনাম আর অনুবাদের তারিফ করতেন। মনে পড়ে পঞ্চাশের দশকের সূচনাকালে দৈনিক সংবাদ বেরুবার কথা। আজাদ পত্রিকার এককালের তরুণ বার্তা সম্পাদক খায়রুল কবীর সম্পাদক হলেন এই কাগজের। এত অল্প বয়সে এর আগে কেউ সম্পাদক হননি প্রথম শ্রেণীর কোনো দৈনিকের। সৈয়দ আবদুল মান্নান ছিলেন একজন বয়স্ক সাংবাদিক। কলকাতায় আজাদে কাজ করে অনুবাদে হাত পাকিয়ে ছিলেন। এক মাস আগে তিনি শিফট-ইনচার্জের দায়িত্ব নিয়ে সংবাদ অফিসে এলেন। তখনো পরিকল্পনার পর্যায়ে ছিলো কাগজটি। একদিন লালবাগে একটা মাসিক পত্রিকার অফিসে দেখা হতেই বললেনঃ নতুন একটি দৈনিক বেরুচ্ছে বংশাল রোড থেকে। কাজ করবে নাকি ওখানে। সাব-এডিটর হতে পারো।

রাজি হয়ে গেলাম তাঁর কথায়। তিনি ধরে নিয়ে এলেন খায়রুল কবীরর কাছে। প্রথম সাক্ষাতেই কবীর ভাই বললেনঃ কালই বসে যাও নিউজ টেবিলে। নতুন কাগজ। খুব খাটতে হবে। রাত জাগতে হবে আমার সংগে। ভালো সাংবাদিক হতে হলে পত্রিকা অফিসকে মনে করবে নিজের ঘরবাড়ি। রাতে কাগজের ফাইল হবে তোমার বালিশ। দু-তিনখানা চেয়ার জোড়া দিয়ে শোবার জায়গা করে নেবে। পত্রিকার অফিসে অমন করে রাত কাটাবার অভ্যাস আমার ধাতস্থ। কলকাতায় আজাদ অফিসে ফাইল মাথায় দিয়ে এভাবে কাটিয়েছি আমি মাসের পর মাস। দুই সপ্তাহ আগে সংবাদের ব্লুপ্রিন্ট হওয়ার সময় ধোপদুরস্ত হয়ে একদিন বংশাল রোডের বাড়িটার সদর-দরজায় ঢুকলাম। নেমে গেলাম কাজে। কুমিল্লার হাজী গিয়াসুদ্দিনী ছিলেন কাগজের স্বত্বাধিকারী। আমরা ডামি-কপি বের করতে শুরু করলাম। মাঝে মাঝে কাজী সাহেব এসে দেখতেন আমাদের কাজের নমুনা। কবীর ভাই প্রায় সর্বক্ষণ থাকতেন অফিসে। রাতে আমাদের সংগে ফাইল মাথায় দিয়ে সটান হয়ে শুতেন নিউজ রুমের বড়ো টেবিলটায়। তিনি তখন থাকতেন টিপু সুলতান রোডের একতলা একটা বাড়িতে। আমার বাসস্থান ছিলো আজিমপুর। ভোরবেলা প্রায়ই ব্রেকফাস্ট করবার জন্য নিয়ে যেতেন তিনি তাঁর বাসায়। টানা পনেরো দিন নমুনা কপি ছাপা হবার পর পাঠকের হাতে তুলে দিলাম আমরা কাগজ।

সেদিনকার আনন্দের কথা কখনো ভুলতে পারিনি। একদল তরুণ সাংবাদিকের হাতে একটি কাগজের জন্ম হয়েছে এ যেন বিশ্ব জয় করবার মতন একটি ঘটনা। ভূমিষ্ঠ কাগজটির মুখ দেখেই নবজাতকের আবির্ভাবের মতো খুশিতে ভরে উঠলো মন। 'সংবাদে'র গোড়ার দিককার নীতি ছিলো নিরপেক্ষ, বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা। সাংবাদিকদের বেশির ভাগই ছিলেন তরুণ লেখক, কবি এবং বুদ্ধিজীবী। তরুণদের মধ্যে ছিলেন ফজলে লোহানী, আনিস চৌধুরী, কবি হাবীবুর রহমান, কন্যাকুমারী উপন্যাসের লেখক আবদুর রাজ্জাক, খোন্দকার আবু তালেব, তোহা খান, ইউপিপির আবদুল মতীন, সিলেটের তোসাদ্দক হোসেন প্রমুখ। পরে এসে যোগ দিলেন কে জি

www.pathagar.com

মুস্তাফা, আবদুল গনি হাজারী, সিকান্দার আবু জাফর, ফয়েজ আহ্‌মদ। প্রায় কাছাকাছি সময়ে ডেইলি অবজার্ভার ছেড়ে এলেন জহুর হোসেন চৌধুরী, সৈয়দ নূরুদ্দিন এবং কাজী ইদ্রিস আর কমরেড মুজাফফর আহ্‌মদের জামাতা মোহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহ্‌। গান্ধী টুপি পরে স্বদেশী আন্দোলন করতেন বলে ওয়ালীউল্লাহ্‌ পরিচিত ছিলেন 'অলি গান্ধী' নামে। ওয়ালীউল্লাহ্‌ সাহেব এবং ইদ্রিস ভাই ছিলেন বর্ষীয়ান সাংবাদিক।

নবীন-প্রবীণের হাতে পড়ে অল্পকালের মধ্যেই পাঠক-নন্দিত হয়েছিলো দৈনিক সংবাদ। এক মাসের ব্যবধানে প্রচার সংখ্যা আঠারো হাজারে উঠেছিলো। সেকালের সীমিত পাঠক সংখ্যার তুলনায় এরকম একটা সার্কুলেশন ছিলো অভাবনীয়।

সম্পাদক খায়রুল কবীর তাঁর নিখুঁত পরিকল্পনা আর সাংবাদিক-মনস্কতার গুণে এভাবে একটি নতুন কাগজকে প্রচার সফল করে তুলেছিলেন অবিশ্বাস্য স্বল্প সময়ে। কিন্তু এই প্রিয় মুখটি মাত্র কিছু দিন আগে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন সিঙ্গাপুরের হাসপাতালে। ক্যান্সার তাঁকে শেষ বয়সে গ্রাস করলো।

অনেক আগেই চলে গেলেন জহুর হোসেন, সৈয়দ নুরুদ্দিন, কাজী ইদ্রিস, ওয়ালীউল্লাহ্‌ এবং আবদুর রাজ্জাক। সিরাজুদ্দিন হোসেনও কিছুকাল ছিলেন সংবাদে। পরে এসেছিলেন শহীদুল্লাহ্‌ কায়সার। এঁরা দুজন মুক্তিযুদ্ধকালে স্বাধীনতা বিরোধী ঘাতকচক্রের হাতে নিহত হলেন নৃশংসভাবে। আবু তালেব নিহত হলেন মিরপুরের বাসায় একই চক্রের ছুরিকাঘাতে। আবদুল গনি হাজারী, সিকান্দার আবু জাফর আবদুর রাজ্জাক এবং তোহার মৃত্যু স্বাভাবিক হলেও ছিলো বেদনাদায়ক।

প্রিয় বন্ধুদের এই মৃত্যুর আঘাত স্মৃতিকে আমার আরক্ত তোলে। তবে সান্ত্বনা হলো এঁরা সবাই পেছনে রেখে গিয়েছেন উজ্জ্বল, বর্ণাঢ্য এককেটি ইতিহাস। ঢাকা নামক এই শহরের রাজপথেই এক সময় এঁরা বিচরণ করতেন। প্রবীণরা দরবার বসাতেন নিজেদের কক্ষে। আলোচনা-সমালোচনার ঝড় তুলতেন রাজনীতি নিয়ে। কখনো তর্ক করতেন সমাজ-শিল্প-সাহিত্য এবং সংস্কৃতির গতিধারা নিয়ে। আবার অন্তরঙ্গ কাউকে পেলে মেতে উঠতেন আলাপচারিতায়।

কাপের পর কাপ চা আসতো টেবিলে। জর্দা-গুয়ামুরি মেশানো সুগন্ধি পান আসতো বরতন-ভরতি হয়ে। মুখে পান না- থাকলে লেখাই হতো না 'আজাদ' পত্রিকার সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিনের। সব সময় বাটা-উপছানো পানের খিলি থাকতো তাঁর টেবিলের ড্রয়ারে। চায়ের পেয়ালা উজাড় হওয়ার পর তাঁর কামরায় হাজিরা দেওয়া সাংবাদিক, লেখক, কবি সবার সামনে বাটা তুলে ধরতেন। কোনো রকম বাছবিচার করতেন না প্রবীণ-নবীনের। তাঁর সংগে আমার প্রথম দেখা ১৯৪৮ সালে। কলকাতার ৮৬/এ লোয়ার সার্কুলার রোডে ছিলো তখন দৈনিক আজাদ-এর অফিস। আমি তখন থাকতাম ব্রিটিশবিরোধী রাজনীতি আর কৃষক আন্দোলনের তরংগক্ষুব্ধ শহর নেত্রকোনায়। তখন দুর্গাপুরের মহারাজার কৃষক নির্যাতনের বিরুদ্ধে তেভাগা আন্দোলন চলছিলো গারো পাহাড় অঞ্চলে। ত্রিশ দশকের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আর কৃষক নেতারা ছিলেন আন্দোলনের পুরোভাগে। এঁদের

www.pathagar.com

মধ্যে খ্যাতনামা ছিলেন মনি সিং, খোকা রায়, খুশু দত্ত প্রমুখ। আমাদের রক্তে তখন তারুণ্যের উচ্ছ্বসিত আবেগ। সামন্তবাদের বিরুদ্ধে আদিবাসী গারো-হাজং আর স্থানীয় কৃষকদের এই বিদ্রোহের জোয়ারে টালমাটাল হয়ে উঠেছিলো চারদিক। আমরা জংগি হয়ে উঠেছিলাম তার প্রচন্ড উৎক্ষেপে। এর কিছুকাল পরেই শহরের লাগোয়া পার্‌লা গ্রামের বিশাল মাঠে আয়োজিত হলো নিখিল ভারত কৃষক সম্মেলন। ডায়নামা বসিয়ে বিজলি বাতির মালায় আলোকিত করা হলো প্রায় আধা বর্গমাইল জুড়ে থাকা সম্মেলনের কয়েক সার প্যান্ডেল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কেবল শেষ হয়েছে। তখনো গোটা বাংলা জুড়ে চলছে পঞ্চাশের ভয়ংকর মন্বন্তরের রেশ। চটের পোশাক পরে অবিভক্ত ভারতের বোম্বাই, গুজরাত, মধ্যপ্রদেশ আর বিহার উড়িষ্যা, তামিলনাড়ু-কেরালা- অন্ধ্র প্রদেশ থেকে এসেছিলেন ভুখানাঙা কৃষক প্রতিনিধিরা। বাংলাদেশের এমন কোনো জেলা-মহকুমা থানা বাদ ছিলো না যেখান থেকে আসেননি দলের পর দল কৃষক। এছাড়া কয়েক হাজার ডেলিগেট তো ছিলেনই। সব মিলিয়ে পাঁচ লাখের মতন লোক জমায়েত হয়েছিলো সম্মেলনে। অমন বিশাল জনসমুদ্র কখনো দেখবার কথা কল্পনায়ও আসেনি আমার। বাতাসে ভাসছিলো গণসঙ্গীতের সেই চরণটির সুর 'ধিকি-ধিকি জ্বলে ক্ষুধার আগুন ...।'

সম্মেলনে এসেছিলেন তখনকার সর্বভারতীয় বাম এবং মধ্যপন্থী রাজনৈতিক নেতাদের অনেকে। এসেছিলেন উপমহাদেশে কমিউনিস্ট পার্টির আদি যুগের সংগঠক কমরেড মুজাফফর আহমদ, নিখিল ভারত কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল পিসি যোশী, তাঁর স্ত্রী চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা খ্যাত কল্পনা দত্ত, বিখ্যাত বাগ্মী এবং পার্লামেন্টারিয়ান বংকিম মুখার্জি, খ্যাতিমান সাহিত্যিক গোপাল হালদার, 'স্বাধীন-সুখী বাংলা'র লেখক ভবানী সেন প্রমুখ। মুসলিম লীগ নেতাদের মধ্যে ছিলেন বাংলা-আসাম যুব মুসলিম লীগের প্রধান সংগঠক আটচল্লিশের টাংগাইল উপনির্বাচন বিজয়ী তরুণ বাগ্মী শামসুল হক। মুজাফফর আহমদ, পিসি যোশী, ভবানী সেন আর কল্পনা যোশীর সংগে বৈঠক হয়েছিলো আমাদের নেত্রকোনার দত্ত হাইস্কুলে।

এই শামসুল হকই নূরুল আমীন সরকারের আমলে ১৯৪৯ সালে গঠিত প্রথম রাজনৈতিক বিরোধীদল আওয়ামী মুসলিম লীগের জেনারেল সেক্রেটারি হয়েছিলেন। জয়েন্ট সেক্রেটারি হয়েছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। সবাই এঁরা ছিলেন উত্তর ত্রিশের তরুণ। আসামের লাইন প্রথা আন্দোলনের নেতা, আসাম প্রাদেশিক আইন পরিষদ সদস্য আর সেখানকার প্রাদেশিক মুসলিম লীগ প্রেসিডেন্ট মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী হয়েছিলেন এই নতুন বিরোধী দলীয় সংগঠনের সভাপতি। মজলুম জননেতা বিশেষ করে নির্যাতিত কৃষকদের নেতা হিসাবে সেকালেই বিশ্বজোড়া পরিচিতি ছিলো তাঁর।

আজন্ম বিপ্লবী ছিলেন ভাসানী। পঞ্চাশ দশকের শেষ পর্বে তিনি যখন ইউরোপ গেলেন, পশ্চিমা পত্রিকাগুলো প্রায় প্রতিদিনই ফলাও করে ছাপতো তাঁর খবর। বিলাত আর আমেরিকার কাগজওয়ালারা তাঁকে অভিহিত করলো 'রেড মোল্লা অভ্

www.pathagar.com

দ্য ইস্ট' বিশেষণে। তিনি গণমানুষের মুক্তির পক্ষে রাখলেন জোরালো বক্তব্য। বললেন বিপ্লব এবং প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথ ছাড়া বিশ্ব সম্পদের চালিকা শক্তি কৃষক-শ্রমিক আর সর্বস্তরের সংখ্যাগরিষ্ঠ মেহনতি মানুষের পরিত্রাণ নেই। আর এই বিরাট বিপুল জনগোষ্ঠীর মুক্তি ছাড়া পৃথিবী থেকে অবসান ঘটবে না যুদ্ধ এবং রক্তপাতের। মানব জাতিও উঠে দাঁড়াতে পারবে না কোমর সোজা করে। বললেন সাধারণ মানুষের ভাগ্য না বদলালে, তৃতীয় বিশ্বের অবনত দেশগুলিকে বিশ্বসম্পদের প্রাপ্য হিস্যা না দিলে একদিন ধসে পড়বে পশ্চিমা পুঁজিবাদ আর তার ঠুনকো সভ্যতার গজদন্ত মিনার চূড়া।

এই কথাগুলো মৃত্যুর চারদিন আগেও সন্তোষের এক জনসভায় নিষ্কম্প স্বরে উচ্চারণ করেছিলেন বর্ষীয়ান এই জননায়ক। আয়ুমান হয়েছিলেন তিনি। বয়স হয়েছিলো তাঁর একানব্বই। তাঁর শুভ্র চুলে, কোটরগত চোখে আর এককালের ইস্পাত দৃঢ় দেহের শিথিল পেশিগুলোতে রেখাপাত করছিলো মৃত্যুর কালো ছায়া। কিন্তু তখনও মনোবল ছিলো তাঁর অটুট। ১৯৭৬ সালের ১৭ নবেম্বর হাসপাতালের রোগশয্যায় অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন এদেশের রাজনীতি এবং নিরাপোস গণ আন্দোলনের এই শতায়ু বটবৃক্ষ। ভাসানী তাঁর তারুণ্যে শোষিত-বঞ্চিতের মিছিল নিয়ে শুরু করেছিলেন পদযাত্রা। মৃত্যুকালের জনসমুদ্রে উদ্বেলিত বিশাল এক মিছিল তাঁকে অনুসরণ করেছিলো কবর পর্যন্ত। আমাদের ইতিহাসের এক মহান পিতৃপুরুষ তিনি। তাঁর ক্ষয় এবং মৃত্যু নেই। অবিনাশী তাঁর অস্তিত্ব।

'তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহান' এই পংক্তিটি যেন এই বড় মাপের মানুষদের জন্যই নিবেদিত। জন্মলগ্নেই মৃত্যুহীন প্রাণ নিয়ে এসেছিলেন তিনি। আর জীবন-অবসানে সেই প্রাণটাই জাতিকে দান করে গেলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুদিবস উপলক্ষে তাঁর কাছের একজন সাংবাদিক হিসেবে এই প্রিয় শব্দাবলী দিয়েই তাঁকে স্মরণ করতে চাই। আমাদের প্রিয় বন্ধু সাংবাদিক-সাহিত্যিক খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস ইউরোপ সফরকালে সাদা লুঙ্গি, সাদা পাঞ্জাবি আর তালের আঁশের টুপি পরা এই নেতার নিত্যসহচর ছিলেন। 'ভাসানী যখন ইউরোপে' শিরোনামের একটি বিপুলায়তন বই লিখে তিনি এই গণনায়ককে বিশ্বজয়ীর আসনে বসিয়ে গেছেন। বলেছেন ইউরোপের রক্ষণশীল কাগজগুলো তাঁকে তাঁর র‍্যাডিক্যাল মতের জন্য 'রেড মোল্লা অভ্ দ্য ইস্ট' অভিধায় বিশেষিত করলেও তাঁর ঐন্দ্রজালিক ব্যক্তিত্বকে কিছুমাত্র খাটো করতে পারেনি। বরং লিখেছেঃ আটপৌরে পোশাক পরিহিত এই বর্ষীয়ান লোকটিকে দেখলে 'হাফ-ন্যাকেট' গান্ধীর কথাই মনে হয়। প্রাচ্যের রাজনীতির গতিধারা বদলানোর ক্ষমতা আছে এই মানুষটির।

ইউরোপে সিনিয়র-জুনিয়র যত সাংবাদিক এসেছিলেন ভাসানীর সান্নিধ্যে তাঁরাই মুগ্ধ-অভিভূত হয়েছেন তাঁর স্পষ্ট ভাষণে। মোহিত হয়েছেন তাঁর সাহসিকতায়, তাঁর ব্যক্তিত্বের যাদুময়তায়। ঢাকার পল্টন ময়দানে 'খামুস' নামের একটি মাত্র শব্দ বজ্রনির্ঘোষে উচ্চারণ করে তিনি যেমন লাখো শ্রোতার চাঞ্চল্যকে মুহূর্তে স্তব্ধ করে

www.pathagar.com

দিতে পারতেন ঠিক সেই রকমই হাতের সামান্য ইশারায় তিনি নিয়ন্ত্রিত করেছেন ইউরোপের মানুষের ঢল আর বাকচাতুর্য নিপুণ শ্বেতাংগ সাংবাদিকদের গিজ-গিজ করা ক্রাউড্‌কে।

আব্দুল হামিদ খান ভাসানী আজ লোকান্তরিত। তাঁর সহচর খোন্দকার ইলিয়াসও আর নেই। আমাদের বন্ধু এবং সহগামী সাংবাদিকদের বলতে গেলে প্রায় সবাই পাড়ি দিয়েছেন ওপারে। মাত্র আমরা গুটিকয়েক এখনও টিকে আছি সময়কে চোখ ঠেরে। যাঁরা একে-একে চলে গেলেন প্রায় জানান না দিয়ে তাঁদের কথা মনে পড়লে নীল হয় অনুভূতি। ভাসানীর আরেকজন ঘনিষ্ঠ সহচর এবং ভক্ত অনুরাগী ছিলেন ঢাকার ১৮ নম্বর কারকুন বাড়ির ইয়ার মুহাম্মদ খান। টাঙ্গাইলের সন্তোষ থেকে ঢাকায় এলে ইয়ার মুহাম্মদের বাড়িতেই উঠতেন মওলানা। দোতলার একটি খালি কামরায় থাকতেন তিনি। এখানে কোন আসবাবপত্র, টেবিল-চেয়ার ছিলো না। মেঝেতে পাতা থাকত দুটি সমান সাইজের পাটি। এক পাশে দুটি বালিশ। তার গায়ে ঠেস্ দিয়ে বসতেন। এই কামরাতেই চলতো তাঁর দেনদরবার। বড়ো বড়ো নেতারা যেমন এখানে আসতেন তেমনি দূর-দূর গ্রামের কৃষকরা আসতেন তাঁদের নালিশ আর অভাব-অনুযোগ নিয়ে।

এখানেই ১৯৪৯ সালে তিনি খুললেন সাপ্তাহিক ইত্তেফাক অফিস। আমি ছিলাম এই কাগজের অবৈতনিক সম্পাদকীয় লেখক, রিপোর্টার কাম কলামিস্ট। এটি ছিলো সে সময় বিরোধী দলের একমাত্র মুখপত্র। মওলানা সাহেব সাধু ভাষায় ব্রিফিং দিতেন। বলতেনঃ 'কলমকে শান দিয়া লিখ্‌বা। ভাষায় যেন আগুন ঝরে। জালিম সরকারের অন্যায়কে আর বরদাশ্‌ত করিব না। তাহারা মজলুমের দুশমন, গরীব কৃষকের রক্তশোষক। একদিন ইহারা খতম হইয়া যাইবে। এমন ভাষায় লেখ যাহাতে ইহাদের কলিজা কাঁপিয়া উঠে। মসনদ টলিয়া যায়। ভয় পাইবা না। খোদার দুশমনদের ভয় পাইবার কিছুই নাই। টিকটিকি-পুলিশদেরও তোয়াক্কা করিও না। তাহারা কী করিবে? বড়জোর জেলে ভরিবে। বহুবার আমি জেলে গিয়াছি। আবার দরজা ঠেলিয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। আসামের ধবড়ি জেল বরদুলই সরকার আমাকে আটকাইয়া রাখিয়াছিলো। কিন্তু বেশি দিন আটক রাখিতে পারে নাই। লাখো মানুষ দা-বল্লম লইয়া, জেলের তালা ভাঙ্গিয়া আমাকে বাহির করিয়া আনিয়াছে। তখন ব্রিটিশ সরকার ছিলো দোর্দণ্ড প্রতাপের অধিকারী। উহারা পর্যন্ত গণরোষের সামনে মাথা নুয়াইতে বাধ্য হইয়াছিলো। তোমাদের যুবকদের গায়ে রক্ত টগবগ করিয়া ফুটিতেছে। তোমরা কেন ভয় পাইবে?'

তাঁর ব্রিফিংয়ের ভাষায় সত্যি- সত্যি শিরায় আগুন ধরে যেতো। কলম বাগিয়ে লিখতে বসতাম পাটিতে বসেই উবু হয়ে লিখতাম। সংবাদপত্রে স্বাধীনতার জন্য আজীবন লড়াই করে গেছেন তিনি। বাক্ আর সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ বলে আমাদের শিখিয়েছেন। ময়দানের সভায়, রাজপথের মিছিলে অনর্গল দাবি তুলেছে লেখা এবং বলার স্বাধীনতার জন্যে।

www.pathagar.com

পূর্ববাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করবার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে কারাবরণ করেছেন। তাঁর সাহস আমাদের মনোবল যোগাতো। লেখাকে শব্দের সৈনিক হওয়ার অনুপ্রেরণায় উজ্জীবিত করতো। এর জন্যই বিনাবেতনে তাঁর কাগজে লিখতে ভালো লাগতো। মাঝে মাঝে তৃপ্ত হতাম ইয়ারমুহাম্মদ খানের চা-বিস্কুটের বদান্যতায়। রোজ গার্ডেনের যে প্রতিনিধি সম্মেলনে ঊনপঞ্চাশের জুলাই মাসে আওয়ামী মুসলিম লীগের আত্মপ্রকাশ ঘটে তার অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি হয়েছিলেন ইয়ার মুহাম্মদ। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মজলুম জননায়কের অনুসারী ছিলেন তিনি।

এককালে ঢাকা নামক এই রাজধানী নগরীকে বলা হতো 'বায়ান্ন বাজার তেপ্পান্ন গলির শহর'। এটি ছিলো একটি প্রবচন। আসলে কথাটার মানে হলো এক লোকারণ্য নগর। যেখানে শেষ নেই হাট-বাজারের আর অলিগলির। বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে এই শহর একটি গঞ্জ হিসাবে গড়ে উঠেছিলো সমতট-সভ্যতার আদি যুগে। কোনো কোনো পুরাতত্ত্ববিদের মতে, যখন ভাওয়ালগড় এবং মধুপুর অরণ্যে অস্ট্রোএশিয়াটিক জনগোষ্ঠী বসবাস করতো তখন থেকে এই গঞ্জের গোড়াপত্তন। সেই আদিম অরণ্যচারী আর কৃষিজীবীদের উত্তরসুরিরা এখনো বাস করে শাল-গজারি বনঘেরা এই লাল মাটির পাহাড়ে। এরা বুনা এবং রাজবংশী নামে পরিচিত। ঢাকার বংশিবাজারের প্রাচীন বাঁশিবাদক আর গায়েনরা এদের বংশধর বলে ঐতিহাসিকদের ধারণা।

মধুপুর পাহাড় এককালে যুক্ত ছিলো গারো হিলের সংগে। হিমালয়ের দুকোটি বছর আগে জন্ম গারো হিলের। এই ভূতাত্ত্বিক হিসাবে ঢাকা এবং তার উত্তরের লালমাটির গোড়াপত্তন হয় সাত কোটি বছর আগে। আদি ব্রহ্মপুত্র নদ-এর বুক চিরেই মিলিত হয়েছে শীতলক্ষ্যা এবং মেঘনায়। এখনো মধুপুর পাহাড় এই দুই নদীর তীরভূমি থেকে কোনো কোনো এলাকায় একশ' ফুটের বেশি উঁচু। সুদূর অতীতে পাহাড়টির উচ্চতা ছিলো হাজার-দু হাজার ফুট। ঢাকার নবাবগঞ্জ, আজিমপুর, মতিঝিল, মগবাজার আর কাওরানবাজার, তেজগাঁ এলাকা ছিলো এককালে টিলাটিংগর এবং জংলাকীর্ণ।

ঢাকার নগর-উপকণ্ঠেরও কিছু কিছু জায়গা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এখনো পনেরো থেকে বিশ ফুট উঁচু। এখানকার ভূগর্ভে জীবাশ্ম, বৃক্ষফসিল, খনিজ আর ব্রহ্মপুত্র-গঙ্গার পলি গঠিত মাটির স্তর তেত্রিশ বছর আগে আবিষ্কার করেন জাতিসংঘের মৃৎ বিশেষজ্ঞ এইচ,ব্রামার। তাঁর মতে ঢাকার ভূগর্ভের গভীরতম স্তর গড়ে ওঠে মাইওসিন ভূতাত্ত্বিক মহাকালের টার্শিয়ারি যুগে। যখন আফ্রো-এশিয়া, ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার ঘননিবিড় অরণ্যগুলো তলিয়ে যায় সামুদ্রিক প্লাবনে। পরে আবার ভূমি জেগে উঠলে তৃণলতায় ভরে ওঠে সমতল অঞ্চল। উত্তর আমেরিকার ওয়াশিংটন শহর সংলগ্ন কৃষ্ণবর্ণ ব্যাসল্ট শিলার মালভূমিটি এ-সময়ে গঠিত। ঢাকার ভূগর্ভেও এই শিলাস্তর রয়েছে।

ভূ-বৃত্তান্ত ছেড়ে এখন ইতিহাসের কাছে আসা যাক্। পুরাতত্ত্বের লেখকরা বলেন এই নগরীর প্রতিকণা ধুলোয় মিশে আছে কাল এবং মহাকালের ইতিহাস।

www.pathagar.com

এখানে হাঁটতে গেলে কানের কাছে ফিস্‌ফিস্‌ করে কথা বলে অতীত। বিশ্বখ্যাত গ্রিকো-মিসরীয় ভূগোলবেত্তা এবং জ্যোতির্বিদ টলেমি (খ্রিস্টীয় ১২৭-১৫১ সালের মধ্যে তাঁর আবির্ভাব) ঢাকার কথা জানতেন। তাঁর গ্রিক নাম ক্লডিয়াস টলেমিকাস। তিনি আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরিতে গবেষণা করতেন। গ্রিক ভাষায় লেখা তাঁর ভৌগোলিক, গাণিতিক এবং জ্যোতিষ শাস্ত্র বিষয়ক সূত্রগুলো তাঁর বিখ্যাত 'আনালেম্মা', (ভূগোল শাস্ত্র), 'টেট্রাবিব্‌লস্‌' (ত্রিকনোমিতি) এবং 'প্লানিস্‌ফারিয়াম' (গ্রহমন্ডল) প্রভৃতি গ্রন্থে সংকলিত। আরব ও লাতিন পন্ডিতগণ এই গ্রন্থগুলো অনুবাদ করে প্রাচীন পৃথিবীর এই ভূগোলবেত্তাকে স্মরণীয় করে রেখেছেন।

'আন্‌তিবোল্‌' নামে গঙ্গা নদীর যে মোহনাটির কথা টলেমি তাঁর ভূগোল 'আনালেম্মা'য় উল্লেখ করেছেন আধুনিক জিওগ্রাফারদের অনেকে সেটিকে ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদী বলে চিহ্নিত করছেন। কারণ বুড়িগঙ্গার স্রোত্‌ধারা দক্ষিণ-পুবে শীতলক্ষ্যা-ইছামতি, ব্রহ্মপুত্র আর পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরী এবং আড়িয়ালসহ একত্রিত হয়েছে সাতটি নদীর মোহনায়। তাছাড়া ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার যে প্রাচীন ঐশ্বর্যশালী দেশটির বর্ণনা দিয়েছেন টলেমি সেটি ছিলা প্রাচীন 'গঙ্গারিদাই' তথা বঙ্গভূমি। গঙ্গারিদাই দেশ এবং জাতির কথা উল্লেখ করেছেন প্রাচীন গ্রিক ঐতিহাসিক এবং ভূবেত্তা হিরোডোটাস (খ্রিস্টপূর্ব আনুমানিক ৪৮৪-৪২৫)। গঙ্গা নদীর তীরবর্তী দেশ বলে প্রাচীন বঙ্গের নাম গঙ্গারিদাই দিয়েছিলেন 'ফাদার অভ দ্য হিস্ট্রি' বলে খ্যাত ক্লাসিক্যাল যুগের এই মনীষী।

টলেমি বর্ণিত দেশটি মৌর্য এবং গুপ্ত যুগে সমতট এবং হরিকেল ভূমি নামে চিহ্নিত হয়। এরই অন্তর্গত ছিলো ঢবাক মন্ডল। যেমন সে যুগে বগুড়াকে বলা হতো পুন্ডমন্ডল বা পুন্ডভুক্তি, রাজশাহীকে বলা হতো বরেন্দ্রমন্ডল, ত্রিপুরাকে বলা হতো ত্রিপুর মন্ডল। অনেক পুরাতত্ত্ববিদের মতে ঢবাক মন্ডল থেকেই ঢাকা কথাটির উৎপত্তি।

মৌর্য যুগে খ্রিস্টপূর্ব ৩৮৫-১৮৪) সম্রাট অশোকের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিলো ঢাকা। বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং ঢাকা জেলা এবং কুমিল্লার বিভিন্ন জায়গায় দেখতে পেয়েছেন অনেকগুলো অশোক স্তম্ভ। গুপ্তযুগে ঢবাক মন্ডল বলতে বোঝাতো গারো ও ত্রিপুরার পাহাড় এলাকা থেকে দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা, মেঘনা এবং পদ্মা পর্যন্ত বিস্তৃত গোটা ভূভাগকে। আধুনিক ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর এবং ত্রিপুরা নোয়াখালী আর বরিশালের উত্তরাংশ ছিলো এই মন্ডলের অন্তর্গত।

সমুদ্রগুপ্ত (৩২০-৩৮০) এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের আমলে (৩৮০-৪৩১) জ্যোতিষশাস্ত্র, গণিত এবং সাহিত্য সংস্কৃতির উৎকর্ষের পাশাপাশি নৌবিদ্যারও বিকাশ ঘটতে দেখা যায়। গুপ্তরা তাঁদের সামুদ্রিক সীমান্ত রক্ষার জন্য অনেকগুলো নৌঘাঁটি এবং বন্দর গড়ে তোলেন ঢবাক মন্ডল এবং সমতটের ব্রহ্মপুত্র, শীতলক্ষ্যা, মেঘনা এবং বুড়িগঙ্গা, পদ্মাসহ বিভিন্ন নদীতটে। সম্ভবত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সময় একটি নৌঘাঁটি এবং বন্দর হিসাবে গড়ে ওঠে ঢাকা নগরীর আদি কাঠামো। মহাকবি কালিদাস ছিলেন বিক্রমাদিত্যের সভাকবি। তিনি 'ঋতু

www.pathagar.com

সংহার' এবং 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' প্রভৃতি কাব্য লিখে খ্যাতিমান হন। তাঁর লেখায়ও সমতট এবং ঢবাক মন্ডলের সমৃদ্ধির বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়।

চীন সম্রাট কুবলাই খানের সভাসদ ভেনিসীয় পর্যটক মার্কো পোলো সমুদ্রপথে পারস্য যাওয়ার পথে চট্টগ্রাম বন্দরে অবতরণ করেন। সম্ভবত তিনি প্রাচীন বাংলার রাজধানী গৌড়ও ভ্রমণ করেছিলেন। তখন তুর্কি শাসন চলছিলো বাংলাদেশে। তাঁর ভ্রমণ কাহিনীর বর্ণনায় আছেঃ 'ভারতের সংগে সীমান্তযুক্ত 'বেঙ্গলা' নামক দেশটি দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। শক্তিশালী 'কান্' (খান)-এর অধীন এই ভূমি। এখানকার লোকদের ভাষা বিচিত্র। বিত্তবানেরা এমন সব বিদ্যালয় (টোল) পরিচালনা করে যেখানে পৌত্তলিক-বিদ্যা, পূজা-অর্চনার রীতি, তন্ত্রমন্ত্র এবং যাদুবিদ্যা শেখানো হয়। ধনীদের প্রায় সবারই রয়েছে যাদুবিদ্যার প্রতি আকর্ষণ। মাছ-মাংস, ভাত এবং দুধ এখানকার প্রিয় খাদ্য। দেশটিতে সুপ্রচুর কার্পাস তুলা জন্মে। তুলার ব্যবসা এখানে রমরমা।' মার্কো আরো লিখেছেনঃ 'বেঙ্গলা দেশে সূর্যে, আদা, আখ এবং নানারকম মসলা-দ্রব্যের ফলন প্রচুর। বলদগুলো হাতির মতন দেখতে। এখানে হাতির সংখ্যা বিপুল। মর্দা গোরু এবং ছাগলগুলোকে খাসি বানিয়ে পোষা হয় এবং পরে বেচে দেয়া হয় বণিকদের কাছে।'

মার্কোর এই বর্ণনা থেকে ত্রয়োদশ শতকের বাংলার অর্থনৈতিক এবং সামাজিক জীবনের একটি চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। মার্কোর ভাষ্য অনুসারে এ দেশ যে সেকালে তুলার জন্যে বিখ্যাত ছিলো তার প্রমাণ হলো গাজীপুরের কাপাসিয়া এলাকা। প্রচুর কার্পাস তুলা জন্মাতো বলেই জায়গাটির নাম হয়েছে কাপাসিয়া। তাছাড়া তখন বাংলাদেশের কাঁচা তুলা, কার্পাস বস্ত্র, তুলার মিহি সুতোয় তৈরি মসলিন কাপড় বুড়িগঙ্গা এবং শীতলক্ষ্যার বন্দর হয়ে জাহাজযোগে যেতো চীন দেশে। যেতো ইউরোপের ভেনিসে, রোমে এবং এথেন্সে। চীনা পরিব্রাজক ই-চিং ৬৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ থেকে কার্পাস-বস্ত্র বোঝাই হয়ে ক্যান্টন বন্দরগামী ৩০টি বড়ো জাহাজকে সুমাত্রার কালিমপং বন্দরে নোঙর করে থাকতে দেখেছেন।

দিল্লির সুলতান গিয়াসুদ্দিন বুলবন ১২৭০ সালের দিকে বাংলার নায়েব-সুবাদার নিয়োগ করেছিলেন তুগ্রল খানকে। তিনিই প্রথম ঘোষণা করেন বাংলার স্বাধীনতা। ঢাকা সংলগ্ন সোনারগাঁয়ে ১২৭৫ সালে তিনি নির্মাণ করেন কিল্লা-ই-তুগ্রল। দুর্গটি পরে বিলীন হয়ে গেছে নদীগর্ভে। সোনারগাঁয়ের স্বাধীন শাসনকর্তা সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ সোনারগাঁয়ে প্রথম টাকশাল নির্মাণ করেন। পুরাতন ঢাকা শহর এলাকায় বেশ কিছু ইমারতও নির্মাণ করেন ফিরোজ। এগুলির ধ্বংসাবশেষ এখন শহরের ধুলোয় মিশে আছে।

মুগল সুবাদার ইসলাম খানই প্রথম ১৬০৯ সালে বুড়িগঙ্গা তীরের এই প্রাচীন নৌবন্দরটিকে একটি বড়ো আকারের শহর হিসাবে গড়ে তুলতে শুরু করলেন। বাংলার স্বাধীন পাঠান সুলতান ইসা খানের ছেলে মুসা খানকে দমনের জন্যে আকবরের সেনাপতি রাজা মানসিং আগেই ভাওয়াল, পদ্মা-লক্ষ্যা-মেঘনার সংগমস্থল

www.pathagar.com

নারায়ণগঞ্জের ত্রিমোহনীতে এবং ঢাকায় (টোক্) স্থাপন করেন মুগল সেনানিবাস। আকবরের মৃত্যুর পর জাহাংগীর সম্রাট হলে তিনি তাঁর ছোটেবেলার খেলার সাথী শেখ আলাউদ্দিন চিশ্তিকে বাংলার সুবাদার নিয়োগ করলেন ১৬০৮ সালের জুন মাসে।

আলাউদ্দিনের উপাধি দেয়া হলো ইসলাম খান। সেই থেকে হারিয়ে গেলো আলাউদ্দিন চিশ্তির আসল নাম। আলাউদ্দিন চিশ্তির তথা ইসলাম খানের দাদা দরবেশ সেলিম চিশ্তির শিষ্য ছিলেন সম্রাট আকবর। ফতেহপুর সিক্রিতে আকবরের সমাধির পাশেই রয়েছে সেলিম চিশ্তির মাজার।

১৬১২ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকাকে সুবে বাংলার স্থায়ী রাজধানী করলেন ইসলাম খান। তিনি শহরের নতুন নামকরণ করেন জাহাংগীর নগর। এর আগে তিনি বুড়িগঙ্গার ওপারে জিন্‌জিরায় স্থাপন করলেন নেভাল হেডকোয়ার্টার। তাঁর নৌবাহিনীর প্রধান ছিলেন মীর-বহর এডমিরাল ইহ্‌তিমাম খান। নৌবাহিনীতে ছিলো ৪০০-র মতো ছোটো-বড়ো জাহাজ। বুড়িগঙ্গা সংলগ্ন ইসলামপুর এলাকায় গোড়ার দিকে বাস করতেন ইসলাম খাঁ এবং তাঁর পরিবারের লোকেরা। এই এলাকাটিকে ঘিরেই পুব, পশ্চিম এবং উত্তর দিকে বাড়তে থাকে শহর।

সদরঘাট ছিলো সেকালে দেশি-বিদেশি জাহাজের পোতাশ্রয়। এছাড়া বাদামতলি, লালবাগ এবং নওয়াবগঞ্জ ঘাট আর পুবে শামবাজার, ফরাশগঞ্জ আর পোস্তগোলা ঘাটেও নোঙর করতো নানা ধরনের মালগুজারি নৌকা, বজরা এবং নৌবাহিনীর ফ্রিগেট। পর্তুগিজ, ফরাসি, ডাচ আর আর্মেনিয়ান এবং ইরানি বণিকরা নদীর এই ঘাটগুলিতে সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকতেন পণ্যের দরকষাকষি নিয়ে। জাহাজে মাল বোঝাই আর খালাসের কাজেও তাদের ব্যস্ত থাকতে দেখেছেন বিদেশি পর্যটকেরা।

ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কুঠি ছিলো শামবাজার সংলগ্ন ফরাশগঞ্জে। ফরাসি কুঠির অবস্থান থেকেই জায়গাটির নাম হয়েছে ফরাশগঞ্জ। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কুঠি ছিল সদরঘাট সংলগ্ন বর্তমান বাংলাবাজার এলাকায়। বাদামতলির উত্তরে আর্মানিটোলায় ছিলো আর্মেনিয়ান কুঠি আর গির্জা। গ্রিক বণিকদেরও আস্তানা ছিলো সেকালের ঢাকায়। এটা বর্তমান মিটফোর্ড রোডের দক্ষিণে বুড়িগঙ্গার ধার ঘেঁষে ছিলো বলে অনুমান করা হয়।

এখন যেখানে নয়াবাজার, তাঁতিবাজার, রায় সাহেববাজার আর, পুবে দয়াগঞ্জ, নারিন্দা এবং গেন্ডারিয়া- গোটা এই তল্লাটের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ছিলো ধোলাই নদী। এই ধোলাই নদী দিয়েই ১৬২৬ সালে আরাকানের মগ রাজা চন্দ্র সুধর্মা (চান্ডা থুদাম্মা) একটি নৌবাহিনী নিয়ে ঢাকা আক্রমণ করেন। তাঁর রণতরী বহরে ছিল ৭০টি বড়ো গ্যালিয়ট যুদ্ধ জাহাজ আর প্রায় পাঁচশ' জেলে ডিঙি। মগ রাজার বাহিনীতে ছিলো ত্রিশজন পর্তুগিজ নৌযোদ্ধা।

পর্তুগিজ পাদ্রি মান্‌রিক এই হামলার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেনঃ 'নদীর তীর পাহারায় নিয়োজিত মুগল সৈন্যরা হানাদারদের পর্তুগিজ জলদস্যু ভেবে হতোদ্যম হয়ে পড়ে। নিজেদের অবস্থান ছেড়ে তারা অশ্বারোহী ফৌজের ঘাঁটিতে চলে যায়।

www.pathagar.com

সুবাদার মুকাররম খান তখন ঢাকায় ছিলেন না। মগ রাজা প্রায় বিনা বাধায় সুধর্মা শহরে ঢুকে দখল করলেন নবাবের প্রাসাদ। সেখান থেকে লুট করলেন প্রচুর সোনাদানা। ব্যবসায়ীদের আড়ত থেকেও অনেক মূল্যবান পণ্যসম্ভার লুট করা হলো। মগরাজা তিনদিন থাকলেন শহরে। এরপর যখন শুনলেন বিশাল একটি অশ্বারোহী বাহিনী পাল্টা আক্রমণের জন্য ছুটে আসছে, দ্রুত তখন এই মনোরম নগরীর বিরাট এলাকাকে আগুনে পুড়িয়ে ছারখার করে পালিয়ে গেলেন বোম্বেটে নৌবহর নিয়ে।'

ইসলাম খানের পরে বাংলার সুবাদার হয়েছিলেন কাসিম খান, ইবরাহীম খান, খান-খানান আবদুর রহিম এবং মহব্বত খান। এরপরে সুবাদার হলেন খানজাদ খান এবং তাঁর পরে মুকাররম খান। মুকাররম-এর সময়েই ঢাকা লুণ্ঠিত হয় মগরাজার আক্রমণে। ১৬১৩ সালে ভাওয়াল গড়ে শিকার করতে গিয়ে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে হঠাৎ মারা গেলেন ইসলাম খান। কার্জন হলের উত্তরে বর্তমান সুপ্রিম কোর্ট সংলগ্ন একটি জায়গায় তাঁকে কবর দেয়া হলো। পরে সেখান থেকে লাশ তুলে নিয়ে শেষ বারের মতো তাঁকে সমাধিস্থ করা হলো আগ্রার ফতেহপুর সিক্রিতে।

বর্তমান সোহ্‌রাওয়ার্দি উদ্যানের দক্ষিণ-পুব তল্লাট ঘেঁষে ছিলো চিশ্‌তিয়া মহল্লা। এখানেই পরে উঠে আসেন ইসলাম খানের পরিবারের লোকেরা। এই বংশের বিখ্যাত দরবেশ খাজা শরফুদ্দিন চিশ্‌তিকে সমাহিত করা হয় পুরাতন হাইকোর্ট ভবন প্রাংগণে। তাঁর এই মাজারই এখন 'হাইকোর্টের মাজার' নামে পরিচিত।

বর্তমানে যেখানে সেন্ট্রাল জেল রাজা মানসিংয়ের দুর্গ ছিলো সেখানে। ইসলাম খান দুর্গ সংস্কার করে এবং ভেতরে একটি টাকশাল নির্মাণ করেন। চাঁদির এক টাকা, আধুলি আর সোনার মোহর তৈরি হতো এই টাকশালে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে ১৭৭২ সাল পর্যন্ত মুদ্রা তৈরি হতো এখানে। কোম্পানির আমলের ঢাকার প্রথম নবাব-নাজিম জসারত খান এই পুরনো দুর্গে বাস করতেন। পশ্চিম এবংপূর্ব দরওয়াজা নামে দুটি প্রধান ফটক ছিলো দুর্গের। জেলখানার দুপাশের দুটি মহল্লা আজো এ নামেই পরিচিত।

দুর্গের আশেপাশে আছে সেকালের স্মৃতিজড়িত চকবাজার, বেগমবাজার, উর্দুবাজার এবং দেওয়ানবাজার, বখ্‌শিবাজার প্রভৃতি। 'উর্দু' শব্দটির ফার্সি অর্থ সেনানিবাস। সেকালে উর্দুবাজার এলাকায় মুগলদের একটি সেনা ছাউনি ছিলো। কাছেই আতশখানা। এখানে ছিলো গোলাবারুদের কারখানা। 'দেওয়ান' কথাটার অর্থ সচিব। দেওয়ানবাজারে ছিলো তখনকার প্রাদেশিক সেক্রেটারিয়েট। এখানে সচিবদের বাসস্থানও ছিলো। মাহুতটুলিতে থাকতো হাতিচালক মাহুতেরা, কশাইটুলিতে কশাইরা। পুরনো দুর্গের একপাশের একটি এলাকার নাম গার্দে-কিল্লা। অর্থাৎ দুর্গ সংলগ্ন স্থান। 'কিল্লা' কথাটার মানে দুর্গ। বর্তমান ওয়াটার ওয়ার্কস্ রোড এবং নওয়াবগঞ্জে বুড়িগঙ্গার তীরে দুটি মহল্লার নাম কাসরহাট্রা। 'কাস্‌র' শব্দের মানে প্রাসাদ। মহল্লা দুটির পুরো বাংলা নাম 'প্রাসাদের হাট।' সেকালে এই দুই এলাকায়

www.pathagar.com

বাস করতেন মন্ত্রী পর্যায়ের উচ্চপদস্থ আমির-ওমরাহ্গণ। জায়গা দুটিকে এখনকার মিন্টো রোডের মন্ত্রিপাড়ার সংগে তুলনা করা চলে।

ঢাকার তাঁতিবাজার, শাঁখারিবাজার, রায়েরবাজার এবং আর যেখানেই যাই শুনি কেবল অতীতের কণ্ঠস্বর। এ শহর যেন প্রাচ্যের রোম। তার রূপময় কিংবদন্তির নগর।

আটচল্লিশের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন প্রসংগে কথা বলছিলাম। সেই ঐতিহাসিক আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ। তাদের পেছনে সক্রিয় কর্মী আর স্বেচ্ছাসৈনিকের ভূমিকা পালন করেছিলো সারাদেশের তাবৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাধারণ ছাত্ররা। আন্দোলনে প্রেরণা যুগিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, লেখক-সাহিত্যিক, সাংবাদিক আর বুদ্ধিজীবী শ্রেণী। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ছিলেন তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর। ভাষার প্রশ্নে বরাবরই তিনি ছিলেন একজন অগ্রচারণ। ১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর যখন ভারতকে সীমিত স্বায়ত্তশাসন তথা লিমিটেড হোম-রুল দেবার কথা ওঠে তখন থেকে বিতর্ক শুরু হয় উপমহাদেশীয় রাষ্ট্রভাষা নিয়ে।

১৯১৯-২০সালে অসহযোগ-খিলাফত আন্দোলনের প্রচণ্ড উৎক্ষেপের যুগে রাজনৈতিক মঞ্চে এবং সংবাদপত্রে আলোড়ন তোলে ভাষাগত প্রশ্ন। তখন কংগ্রেসের নেতৃত্বে ছিলেন মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ আর মতিলাল নেহরু প্রমুখের পাশাপাশি বিখ্যাত আলী ভ্রাতৃদ্বয় অর্থাৎ মওলানা মুহম্মদ আলী এবং শওকত আলী। এঁদের যৌথ নেতৃত্বে হাত ধরাধরি করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী অহিংস সত্যাগ্রহ, বিলাতি বস্ত্র বর্জন তথা স্বদেশী আন্দোলন আর তুরস্ককে খণ্ডিত করার ভার্সাই চুক্তি বিরোধী খিলাফত আন্দোলন একযোগে এগিয়ে চললেও ভাষা নিয়ে ভিন্ন-ভিন্ন অবস্থান নিলেন নেতারা। হিন্দির পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখলেন মতিলাল নেহরু, রাজা গোপালাচারী, ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, ডঃ মালব্য এবং অন্যান্যরা। এদিকে উর্দুর পক্ষে দাবি তুললেন দুই আলী ভাই, ডাঃ আনসারী, ভারতের প্রথম স্বাধীনতার ঘোষক হসরত মুহানি, কবি ডক্টর মুহম্মদ ইকবাল প্রমুখ। দক্ষিণ ভারতের নেতারা বললেন, তামিল এবং মারাঠিকে রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। কেউ কেউ গুজরাতির কথা বললেন।

হিন্দির পক্ষের নেতারা বললেন বহু জাতি, বর্ণ এবং ধর্ম সম্প্রদায় অধ্যুষিত ভারতে যেখানে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী কমবেশি সাতশ' ভাষায় কথা বলে সেখানে একটি 'লিংগুয়া-ফ্রাংকাই' হবে রাষ্ট্রভাষা। তাঁরা হিন্দিকে এই লিংগুয়া-ফ্রাংকা অর্থাৎ সকল জনগোষ্ঠীর মতবিনিময়ের মাধ্যম একটি সাধারণ বোধগম্য ভাষা হিসেবে ঘোষণা দিলেন। উর্দুর দাবিদাররা বললেন হরফ ছাড়া হিন্দি এবং উর্দুর মধ্যে তেমন কোনো তফাৎ নেই। তাঁদের আরো দাবি ছিলো কাব্যকলা এবং সাহিত্য সম্ভারের দিক থেকে উর্দু বেশি সমৃদ্ধ। সুতরাং, উর্দু-ই ভারতের প্রধান লিংগুয়া-ফ্রাংকা। এই যুক্তিতে স্বাধীন ও অবিভাজ্য ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে উর্দুর দাবিই অগ্রগণ্য। এ নিয়ে ত্রিশ দশকের শেষ পর্ব অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনাকাল পর্যন্ত

www.pathagar.com

একটানা কুড়ি বছর ধরে চললো তুমুল বিতর্ক।

বাংলাদেশও তখন চুপ করে ছিলো না। যে কয়জন বাঙালি বুদ্ধিজীবী সেই সংকট-সন্ধিক্ষণে বাংলার পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের পুরোধা ছিলেন ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। তিনি তখন ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের একজন প্রভাষক। বাংলা, সংস্কৃত, লাতিন, ইংরেজি আর ফরাসি ছাড়াও হিন্দি - উর্দু-আরবি, ফার্সি এবং তামিল-মারাঠি- গুজরাতিসহ আঠারোটি ভাষায় ছিলো তাঁর ব্যুৎপত্তি। ভাষাবেত্তা হিসাবে সেই তরুণ বয়সেই তিনি অর্জন করেছিলেন দেশজোড়া খ্যাতি। ১৯২১ সালে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকায়' প্রকাশিত এক সারগর্ভ নিবন্ধে শহীদুল্লাহ্ লিখলেনঃ কোনো ভাষাকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করতে হলে সবার আগে বিবেচনা করতে হবে বাংলা ভাষার কথা। কেননা আন্তর্জাতিক ভাষা-বিশেষজ্ঞগণ তালিকায় অষ্টম স্থান দিয়েছেন। ভারতের অন্য কোনো ভাষাই এই ঈর্ষণীয় মর্যাদার আসন দখল করতে পারেনি।

তিনি আরো লিখলেনঃ শব্দসম্ভার, ভাষাশৈলী, অলংকার, উপমা- উৎপ্রেক্ষা, স্বচ্ছন্দ উচ্চারণ এবং সর্বোপরি ভাবপ্রকাশের মাধ্যম হিসাবে ভারতের যে কোনো ভাষার তুলনায় বাংলা ভাষা শ্রেষ্ঠ। তাছাড়া এটি বাংলা এবং আসাম ছাড়াও বিহার ও উড়িষ্যার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে গণভাষা। সুতরাং বাংলাও একটি লিংগুয়া-ফ্রাংকা। হিন্দি এবং উর্দুর চাইতে বেশি লোক কথা বলে বাংলায়। এটি শুধু কোটি কোটি মানুষের মুখের বুলিই নয়- তাদের পঠন-পাঠন-লিখন এবং মত ও ভাব প্রকাশেরও একমাত্র বাহন। উর্দু ও হিন্দির মতন এটি কোনো খন্ডিত এবং মিশ্র ভাষা নয়। উর্দুর জন্ম হয়েছিল মুগল আমলে শাসকদের সামরিক ছাউনিতে। ফার্সি-আরবি শব্দ এবং বাক্ গঠন রীতির সংগে রাজস্থানি ও পশ্চিমী প্রাকৃত বুলির সংমিশ্রণে এর উদ্ভব। 'উর্দু' কথাটার মানেই হলো সেনানিবাস। সম্রাট জাহাংগিরের আমলে 'উর্দু' বলতে বোঝাতো সৈনিক বা ফৌজ। উর্দু ভাষা ভেঙ্গে জন্ম হয়েছে হিন্দির। লেখন রীতি ছাড়া দুই ভাষার বাচনভংগি, উচ্চারণ, ক্রিয়াপদ এবং বিশেষণ, লিঙ্গভেদ, শব্দালংকার সবই এক রকম।

তিনি আরো যুক্তি দেখালেন এই দুই ভাষাই ভারতের মাত্র কয়েকটি শহরের চৌহদ্দিতে আবর্তিত। রামপুর, দিল্লি, জয়পুরের বাইরে কেবল লাখনও, কাঁনপুর আর এলাহাবাদ, পাটনা এবং লাহোরের অভিজাত লোকেরাই এ ভাষায় কথা বলে। অথচ বাংলাভাষীর সংখ্যা হবে এর দ্বিগুণ। শহরাঞ্চল ছাড়াও এরা ছড়িয়ে আছে দক্ষিণ-মধ্য এবং পূর্ব ভারতের প্রায় দুই লাখ গ্রামে। অতএব গণতান্ত্রিক দিক থেকেও ভারতের রাষ্ট্রভাষা হওয়ার দাবি রাখে বাংলা। ডঃ শহীদুল্লাহ্র ভাষার এ দাবিকে সমর্থন করেছিলেন সেকালের বিখ্যাত সাহিত্যিক ও ব্যারিস্টার এস ওয়াজেদ আলী, শান্তিপুরের প্রবীণ কবি মোজাম্মেল হক, রাজনীতিক এ কে ফজলুল হক, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সভাপতি ও ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'দ্য মুসলমান'-এর সম্পাদক মৌলবি মুজিবুর রহমান, সাপ্তাহিক ও মাসিক 'মোহাম্মদী'

www.pathagar.com

সম্পাদক মওলানা আকরম খাঁ,'দৈনিক সুলতান' সম্পাদক মওলানা মুনিরুজ্জামান ইসলামাবাদি প্রমুখ। এর আগে ১৯১৮ সালে মওলানা আকরম খাঁ 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'মাতৃভাষা' শীর্ষক একটি নিবন্ধে বাংলাভাষাকে সর্বস্তরের শিক্ষার মাধ্যম করার দাবি জানিয়েছিলেন।

বিশের দশকের তরুণ কবি, লেখক ও সাংবাদিকদের মধ্যে বাংলাভাষার সোচ্চার সমর্থক ছিলেন। বিদ্রোহী কবি এবং সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' এবং শেরে-বাংলা এ কে ফজলুল হক প্রতিষ্ঠিত 'দৈনিক নবযুগ' সম্পাদক কাজী নজরুল ইসলাম, 'লাঙল' পত্রিকার সম্পাদক ও 'দৈনিক নবযুগ'-এর সহযোগী সম্পাদক কমরেড মুজাফফর আহ্‌মদ, সাংবাদিক আবুল কালাম শামসুদ্দিন, আবুল মনসুর আহমদ, মোহাম্মদ মোদাব্বের, 'মাসিক মোহাম্মদী'র সহকারী সম্পাদক ওয়াজেদ আলী, কলামিস্ট হাবীবুল্লাহ্ বাহার, সাংবাদিক-সাহিত্যিক মুজীবুর রহমান খাঁ, খালেকদাদ চৌধুরী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাভাষার অধ্যাপক মোহিতলাল মজুমদার, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলনের নেতা কবি বুদ্ধদেব বসু, দর্শনের ছাত্র দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, ঢাকা থেকে প্রকাশিত বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকা 'শিখা' সম্পাদক আবুল হোসেন এবং তাঁর ভাবশিষ্য কাজী মোতাহার হোসেন (পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের প্রধান ও ফজলুল হক হলের প্রভোস্ট), কাজী আকরম হোসেন প্রমুখ। আবুল হোসেন ছিলেন সেকালের মুক্তবুদ্ধি আন্দোলনের প্রখ্যাত নেতা।

১৯৪৭-৪৮ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সূচনা পর্বে প্রথম যে বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে তাতে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বাংলা ভাষার অধ্যাপক গণেশ ঘোষ বর্ণিত ব্যক্তিদের অনেকেরই অবদান ছিলো স্মরণীয়। ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের প্রভাষক অধ্যাপক আবুল কাসেমের নেতৃত্বে ১৯৪৭ সালের পয়লা সেপ্টেম্বর গঠিত হয়েছিল তমদ্দুন মজলিস। সাংস্কৃতিক এই সংগঠনের সংগে জড়িত হলেন ডঃ শহীদুল্লাহ্, ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন, অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, কবি প্রজেশ কুমার, কবি জসীমউদ্‌দীন, অধ্যাপক নূরুল হক, সৈয়দ নজরুল ইসলাম (পরে স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি) এবং কথাশিল্পী শাহেদ আলী, আবদুল গফুর ও কাজী গোলাম মাহবুবসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু ছাত্র।

১৯৪৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর ঢাকা কলেজ হোসেন নূরপুর ভিলা'য় সংগঠনটির উদ্যোগে প্রথম বাংলাভাষার ওপর অনুষ্ঠিত হলো একটি সেমিনার। সভাপতি ছিলেন ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। এতে গোড়াতেই পাঠ করা হলো তিনটি নিবন্ধ নিয়ে প্রকাশিত একটি পুস্তিকা। যার শিরোনাম ছিলোঃ রাষ্ট্রভাষা 'বাংলা না উর্দু'। লেখক ছিলেন ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন, কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক ইত্তেহাদ সম্পাদক আবুল মনসুর আহ্‌মদ ও অধ্যাপক আবুল কাসেম। আলোচনায় অংশ নিলেন অধ্যক্ষ ইবরাহীম খাঁ, কবি জসীমউদ্‌দীন, কাজী আকরম হোসেন, শাহেদ

www.pathagar.com

আলী আরো কয়েকজন। আমরা তখন জগন্নাথ কলেজে রাষ্ট্রভাষা নিয়ে আন্দোলন শুরু করেছিলাম। এ সময় কলেজের লাগোয়া সখা প্রেস আর রায়সাহেব বাজারসংলগ্ন চাবুক প্রিন্টিং প্রেস থেকে ভাষার দাবিতে কলেজ ইউনিয়নের উদ্যোগে ছাপা হয়েছিলো পর-পর কয়েকটি প্রচারপত্র। এগুলোর লেখার ভার পড়েছিলো আমার ওপর। আবুল কাসেম বোধকরি প্রচারপত্রগুলো দেখেছিলেন। তাই হঠাৎ একদিন এসে তিনি ঢুঁ মারলেন আমার রুমে। আমরা কয়েকজন থাকতাম তখন কলেজ প্রাংগণের পুব-দক্ষিণ কোণে অধ্যক্ষের খালি বাড়িতে।

সে সময় আগেকার অধ্যক্ষ আমেরিকা চলে যাওয়ায় ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হলেন রসায়ন বিভাগের প্রধান যোগেশ চন্দ্র ঘোষ। তিনি ছিলেন সাধনা ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং বিখ্যাত আয়ুর্বেদ শাস্ত্রী। গেণ্ডারিয়ায় সাধনা ঔষধালয়ের কারখানাসংলগ্ন নিজের বাড়িতেই তিনি থাকতেন।

আলাদা বাড়ির দরকার না-হওয়ায় অধ্যক্ষের বাড়িটি তিনি আমাদের ছেড়ে দিলেন। সাতচল্লিশের জুলাই থেকেই কয়েক কক্ষের দ্বিতল এ বাড়িটির বাসিন্দা বনে যাই আমরা। দুইজনের ভাগে পড়েছিলো বড়ো আয়তনের একেকটি রুম। বলতে গেলে রাজার হালেই ছিলাম। এই রুম থেকেই সাতচল্লিশের ডিসেম্বরে আমরা বের করেছিলাম অর্ধসাপ্তাহিক 'ইনসান' পত্রিকা। কলেজের ছাত্ররাই ছিলো এই কাগজের পাঠক, প্রচারক এবং হকার। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের সিনিয়র বন্ধুরাও কাগজের সার্কুলেশন বাড়ানোর কাজে সাহায্য করতেন। ভাষা আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া পত্রিকাটির মুখ্য নীতি ছিলো। মন্ত্রিপাড়ার অন্দর মহলের টুকিটাকি সংবাদও রসালো ভাষায় আমরা ছাপাতাম। ফলে ছাত্র মহলে এবং পলাশী আর নীলক্ষেত ব্যারাকের কেরানিকুলে কাগজটির জনপ্রিয়তা বেড়েছিলো। এই দুই ব্যারাকের অধিবাসীরা ছিলেন তখনকার ক্ষমতাসীন মুসলীম লীগ সরকারের জনবিমুখ নীতির কট্টর সমালোচক। পরে আটচল্লিশের গোড়ার দিকে শাহ্ আজিজুর রহমানকে বাদ দিয়ে নবপর্যায়ে মুসলিম ছাত্রলীগ গঠিত হলে কাগজটির প্রচার আরো বাড়লো। সে সময় শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন ছাত্র এবং যুব আন্দোলনের অগ্রনায়ক। তিনি ছিলেন ঢাকার উর্দু সমর্থক নবাব গোষ্ঠী আর কায়েমি স্বার্থবাদীদের দ্বারা পরিচালিত নব্য মুসলিম লীগ দল এবং সরকারের ঘোর বিরোধী। হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দিকে অগণতান্ত্রিকভাবে সরিয়ে খাজা নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বাধীন এই দলটি প্রথম সুযোগেই ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছিলো পূর্ববঙ্গে। মুসলিম লীগের যে প্রগতিশীল অংশটি শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দি, আবুল হাশিম প্রমুখের নেতৃত্বে ছেচল্লিশের সাধারণ নির্বাচনে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিলো নবগঠিত মুসলিম ছাত্রলীগ ছিলো তাঁদের গণমুখি নীতির সমর্থক। লীগের এই বৃহত্তর অংশটি ছিলো বাংলা ভাষার বিরোধী এবং উর্দুর তাবেদার।

আমরা 'ইনসান' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বাংলা ভাষার পক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন গড়ে তোলায় শেখ সাহেব আমাদের পৃষ্ঠপোষকতা দিতে এগিয়ে এলেন। তিনি কাগজটি নিয়মিত রাখতেন এবং বেশ কিছু কপি পুশিং সেল করে দিতেন। তিনি

www.pathagar.com

যখন বঙ্গবন্ধু এবং স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সেই সময় একবার তাঁর সংগে দেখা হলে সেই পুরনো স্মৃতির রোমন্থন করলেন তিনি। বললেনঃ জানিস্ নূরী, তোদের 'ইনসান পত্রিকার' পুরো ফাইল এখনো আমার কাছে রক্ষিত। স্মৃতির ঝিনুক নাড়া দিতে গিয়ে তাঁর চোখ সজল হয়ে উঠেছিলো। কথায় কথায় বললেনঃ সে যুগে আমাদের মধ্যে কী নিবিড় সম্পর্কই না ছিলরে। আজ কী ছাত্র রাজনীতি, কী ক্ষমতার রাজনীতি সবখানেই রেষারেষি। আহা, সেই সোনালি দিনগুলো বুঝি আর ফিরে আসবে না।

সেই সাক্ষাৎকারটির কথা আজো আমার প্রায়ই মনে পড়ে। যাক যা বলছিলাম। আবুল কাসেমের আমন্ত্রণে সাতচল্লিশের সেই ভাষা-সেমিনারে আমিও যোগ দিয়েছিলাম। এবং মিনিট দশেক ধরে জোরালো একটা বক্তৃতাও রেখেছিলাম। কিন্তু কী বলেছিলাম তা আর মনে নেই।

বিশ্বখ্যাত ঐতিহাসিক ফিলিপ কে হিট্টি চীন আরব কবিদের তুলনা করেছেন একালের সাংবাদিকের সঙ্গে। তিনি তাঁর হিস্ট্রি অভ্ অ্যারাব'স' (আরব জাতির ইতিহাস) গ্রন্থে লিখেছেনঃ 'সেকালে কবিই ছিলেন মরুসমাজের প্রেস-রিপোর্টার এবং জার্নালিস্ট। তিনি ছিলেন রাজনীতিক, বাগ্মী, ঐতিহাসিক আর একই সঙ্গে জনমত সংগঠক। তলোয়ারের বদলে তিনি ব্যবহার করতেন তাঁর ক্ষুরধার জিভ আর কবিতার জ্বালাময়ী ভাষা। তখন ভাষাই ছিলো কবির শাণিত অস্ত্র। এই অস্ত্র দিয়ে তিনি তাঁর গোত্রকে উদ্দীপ্ত করতেন শত্রুগোত্রের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হতে। তাঁর কবিতার বানবর্ষণে ঘায়েল হতো বিপক্ষ দল। তিনি জয় করতেন যুদ্ধ। আবার শান্তি স্থাপনেও ব্যবহার করতেন তাঁর কবিতার যাদুময় ভাষা।'

মানব সভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাসের ওপর চোখ রাখলে বোঝা যাবে কতোখানি সত্য হিট্টির এই কথাগুলো। প্রাচীন পৃথিবীতে লেবানন উপকূলের ফিনিশীয়, নীলনদ তটের মিসরীয়, ইরাকের ব্যাবিলোনীয়, দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের রোমান আর পীত নদীর দেশের চৈনিকরা ছিলেন সভ্যতার পথিকৃৎ। মিসরীয়রা হিয়ারোগ্লিফিক্স (চিত্রলিপি), প্যাগিরার্স আর বর্ষপঞ্জি উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে পটভূমি নির্মাণ করে গেছেন অগ্রসর-সভ্যতার। ফিনিশীয়রা তাঁদের চিত্রলিপিকে অ্যালফাবেটে তথা বর্ণমালায় রূপ দিয়ে গোড়াপত্তন করেছেন আধুনিক লেখনরীতির। ব্যাবিলোনিয়ানরা তাঁদের মাটির ফলকের কিউনিফরম হরফে প্রথম ইতিহাস, প্রশাসনিক রিপোর্ট আর কাব্যগ্রন্থ লিপিবদ্ধ করে উন্মোচন করে গেছেন জ্ঞানচর্চার হাজার ফুল ফোটার দুয়ার। ফিনিশীয় বর্ণমালাকে পরিশীলিত করে মহাকবি হোমারের ট্রয়যুদ্ধের উপাখ্যান 'ইলিয়াড' কাব্য গ্রন্থবদ্ধ করবার উপাদান যুগিয়েছেন গ্রিকরা। এই হরফেই প্ল্যাটো (খ্রিস্টপূর্ব ৪২৭-৩৪৭) এবং অ্যারিস্‌টোটল রচনা করেছেন তাঁদের কালজয়ী গ্রন্থাবলী। প্ল্যাটো'র হাতে 'রিপাবলিক' (Republic), 'ফিড্রাস্' (Phaedrus), 'ক্রাটিলাস' আর 'অ্যাপোলজি' এবং 'ইটোপিয়া' (Eutopia) রচিত না হলে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পাশাপাশি নন্দন শাস্ত্রেরও জন্ম হতো না। তেমনি আারিস্‌টোটলের

www.pathagar.com

(খ্রিস্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২) 'অর্গানাম' (Organum), 'দ্য এনিমা' (De Anima), 'মেটাফিজিক্স' (Metaphisics) 'ফিজিক্স' (Phisics) এবং 'পলিটিকস্' (Politics) রচিত না হলে দর্শন আর রাজনীতির বুদ্ধিবৃত্তি চর্চা পিছিয়ে থাকতো কম করে হলেও আরও হাজার বছর।

আধুনিক রোমান আর তার উন্নত সংস্করণ ইংরেজি হরফের জন্যে বিশ্ব সভ্যতা বহু গুণে ঋণী ফিনিশিয়ান আর তাঁদের উত্তরসূরি গ্রিক এবং রোমানদের কাছে। যেমন সংবাদপত্রের গোড়াপত্তনের জন্যে আমরা ঋণী রোমান বাগ্মী, সিনেটর, যোদ্ধা এবং লাতিন-পন্ডিত জুলিয়াস সীজার (খ্রিস্টপূর্ব ১০২-৪৪)-এর কাছে। দু'টি লাতিন নাটকের প্রণেতা এবং একটি কাব্য সংকলনের সম্পাদক এই সর্বশ্রেষ্ঠ রোমান (দ্য গ্রেটেস্ট অভ্ অল রোমানস)-ই সংবাদপত্রের জনক। খ্রিস্টপূর্ব ৪৯ অব্দে রোম থেকে প্রকাশিত পৃথিবীর প্রথম সাময়িক পত্র 'অ্যাকটা ডায়আরনা' (Acta diurna)'র প্রতিষ্ঠাতা এবং সম্পাদক ছিলেন তিনি। খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ অব্দে মিসরীয়দের উদ্ভাবিত প্যাপিরাস তাঁর সময়ে উন্নত হয়ে পেপার তথা কাগজে রূপলাভ করে। সেই কাগজে সংবাদ লিপিবদ্ধ করে পোস্টারের মতন লাগিয়ে রাখা হতো রোম নগরীর দেয়ালে। প্রাচীন রোমের এই জীর্ণ দেয়াল, তার পুরনো সিনেট ভবন এবং খ্রিস্টপূর্ব ৪৪ সনে যেখানে এককালের অন্তরঙ্গ বন্ধু জুনিয়াস ব্রুটাসের হাতে নিহত হয়েছিলেন সীজার সেই জায়গাটি দেখেছি আমি।

নিহত হওয়ার সময় সীজারের পকেটে ছিলো তাঁর বিখ্যাত কলম 'স্টাইলাস'। ময়ুর পালকের তৈরি ছিলো এটি। সিনেটে যাওয়ার সময় ঝোপের আড়ালে পালিয়ে থাকা ব্রুটাসের ছুরিকাঘাতে নিহত হন তিনি। ঘাতক ব্রুটাসকে দেখে সবিস্ময়ে তিনি উচ্চারণ করেছিলেনঃ 'এট দ্য ব্রুটাস!' কথাটার মানে ছিলো- শেষে তুমিও ব্রুটাস। অনেক রাজনৈতিক শত্রু ছিলো সীজারের। কিন্তু তার বাল্যবন্ধু ব্রুটাস এই দলে ভিড়বে এটা ভাবতেই পারেননি তিনি। তাই রক্তাক্ত বুকের ক্ষতস্থান চেপে ধরে অবাক হয়ে কথাগুলি বলেছিলেন মুমূর্ষু সীজার।

জায়গাটায় আছে সীজারের একটি আবক্ষ মূর্তি। তাঁর গায়ে ছিলো পাঞ্জাবির মতন দেখতে একটি কোর্তা, পরনে প্যাঁচ-দেয়া দুই প্রস্ত কাপড় আর কাঁধে একটি ঝোলানো-চাদর। সেকালে এ ধরনের পোশাকই পরতেন সিনেটররা। জায়গাটায় এখন আর কোনো জংগল নেই। আছে গোটা কয়েক ঝাঁকড়া গাছ। অদূরেই দাঁড়িয়ে আছে দ্বিতল সিনেট ভবনটি। মার্বেল পাথরের তৈরি হলেও গড়নটা এর আমাদের কৃষকদের দোচালা খড়ের ঘরের মতন। ভবনটার সারা গায়ে জমে আছে শ্যাওলা। এখন এটি একটি পরিত্যক্ত বাড়ি। চামচিকা আর কবুতরের বাসস্থান। বিদেশি পর্যটক এবং সাংবাদিকরা বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থেকে স্মরণ করে প্রাচীন রোমান রিপাবলিক, রোমান আইন আর সেকালের সিনেটের অসামান্য প্রভাবের কথা। এর কিছুই এখন আর নেই। রোমানদের উত্তরসূরি একালের ইতালিয়ানরা পুরনো শহরের শ্বেতপাথরের জীর্ণ ভবন আর ভাস্কর্য-মূর্তিগুলো দেখলে কখনো-সখনো রোমন্থন করে অতীত স্মৃতি।

www.pathagar.com

রোমান রিপাবলিকের গোড়াপত্তন খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ অব্দে। এর আগে রোম শাসন করতো অ্যাটরুস্‌কানরা। তারাই ভব্যতা শিখিয়েছিলো টাইবার নদী তীরের অশিক্ষিত-অমার্জিত রোমানদের। অ্যাটরুসকানদের পরে শুরু হয়েছিল লাতিয়াম আধিপত্য। লাতিন জনগোষ্ঠীই ছিলো রোম নগরীর ফাউন্ডিং ফাদার্স।

তারা ছিলো প্রাচীন ঢাকার আদি বসতকারদের মতো। যাদের ভাষা ছিলো চর্যাপদ যুগের বাংলা এবং প্রাকৃত বুলি। রোমেও তেমনি লাতিনরা ছিলো সাধারণ জনশ্রেণীর অন্তর্গত। পরে তুর্কি, পাঠান আর মুগলরা এসে যেমন ঢাকায় আধিপত্য বিস্তার করে

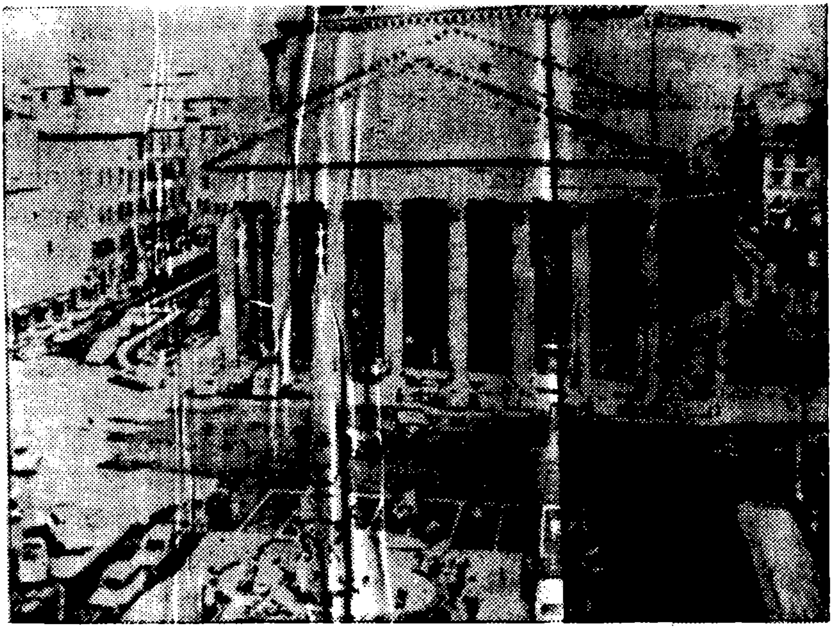

প্রাচীন রোমের একটি নিদর্শন

তেমনি রোমে এসে শিকড় গাড়ে পাত্‌রিসিয়ানরা। এরা নীলরক্তের লোক বলে গর্ববোধ করতো। আর লাতিনদের বলতো 'প্লেব' অর্থাৎ অনার্য। অথচ প্লেবরাই ছিলো জনসংখ্যার প্রধান অংশ। শহরের অভিজাত স্যাবিয়ান বংশোদ্ভূত ছিলো প্যাট্রিসিয়ান তথা পাত্‌রিসীয়রা। এরাই নিয়ন্ত্রণ করতো রাজনীতি, ধর্ম এবং সংস্কৃতি। রোমান সিনেটও ছিলো এদের হাতের মুঠোয়। পরে প্লেবরা সিনেট নির্বাচনে ভোটাধিকার পেলেও তাদের নির্যাতিত হতে হতো এই শাসক শ্রেণীর হাতে।

অনেক বিদ্রোহ এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের পর সিনেটে মাত্র দু'জন প্লেবিয়ান নির্বাচিত হন। ট্রিবিউন অথাৎ শাসনকর্তা হিসাবে এই দু'জনকেই কেবল নিয়োগ করা হয়েছিলো। ক্রমে এই প্রজা সাধারণের চাপের মুখে শাসক শ্রেণী বাধ্য হলো

www.pathagar.com

তিনটি 'কমিটিয়া' তথা গণপরিষদ গঠন করতে। এভাবে এক সময় প্লেবদের হাতে চলে যায় ক্ষমতা। পরিবর্তনের এই পর্বে সংগঠিত হয় সিনেট। সিনেটই ছিলো রোমান রিপাবলিক আর রোমান সাম্রাজ্যের নিয়ন্তা। মুষ্টিমেয় কয়েকজন ট্রিবিউন, কন্সাল এবং সিনেটরের হতে ছিলো রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় অব্দ পর্যন্ত অপ্রতিহত ছিলো সিনেটের ক্ষমতা। প্রকৃত অর্থে সিনেটই ছিলো রোমানদের বিশ্বজোড়া আধিপত্যের চালিকাশক্তি। সিনেটে গৃহীত সিদ্ধান্তেই রোমান লিজিয়ন তথা সেনাবাহিনী দুর্বল দেশগুলো কুক্ষিগত করতো। অভিযান চালাতো দেশে দেশে। সেনাপতিরা এবং প্রাদেশিক শাসকরা ছিলেন সিনেটের হাতের পুতুল।

একালের রাজনৈতিক দলের মতন প্রভাবশালী সিনেটরদের ছিলো আলাদা আলাদা দল। বাগ্মীতা ছিলো তাঁদের সবচেয়ে বড় গুণ। সিনেটের ছাদ ফাটাতেন তাঁরা চড়া গলার বক্তৃতায়। তর্কযুদ্ধে যিনি জিতে যেতেন বড়ো নেতা হতেন তিনি। আসলে সিনেটের শাসন ছিলো অভিজাততন্ত্রের শাসন। প্রকৃত গণতন্ত্র বলতে এখানে কিছুই ছিলো না। রাজার বদলে একটি গোষ্ঠী অন্য কথায় কয়েকটি অভিজাত পরিবার শাসন করতো বিশাল সাম্রাজ্য। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে গ্রিকদের সংস্পর্শে এসে সংস্কৃতিবান এবং সামরিক-বিজেতা হয়েছিলো রোমানরা।

তারা গর্ব করতো তাদের বীরত্ব, নৈতিকতা, বাগ্মিতা আর উন্নত লাতিন ভাষা এবংসাহিত্যের জন্যে। কেউ তাদের অহমিকায় আঘাত হানলে কিংবা তাদের আধিপত্য মানতে না চাইলে যুগ যুগ ধরে যুদ্ধ করতেও তারা পিছপা হতো না। রোমানদের এই অহংকারের প্রতীক ছিলেন সেকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মী এবং সিনেটর ক্যাটো দ্য এণ্ডার। উত্তর আফ্রিকার শক্তিশালী নাবিক জাতি কার্থেজিয়ানরা ভূমধ্যসাগরে রোমানদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিলো বলে ক্যাটো তাঁর জ্বালাময়ী বক্তৃতায় কার্থেজকে ধ্বংস করবার জন্যে উত্তেজিত করে তুলেছিলেন রোমানদের। সিনেটে বক্তৃতার অনল বর্ষণ করে বলেছিলেনঃ 'ধ্বংস কর কার্থেজকে। ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দাও তাদের রাজধানী। তাদের অজেয় সেনাপতি হ্যানিবলকে খতম করে দাও।'

শেষ পর্যন্ত সুকৌশলে আল্পস পর্বত বিজেতা হ্যানিবলকে তারা বাধ্য করেছিলো পরাভূত হতে। ক্যাটোর জিভের ডগায় যে আগুন ছিলো তার শিখা দাবানল হয়ে পুড়ে ছারখার করলো প্রাচীন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নগর কার্থেজ এবং কার্থেজীয় সভ্যতাকে। কার্থেজিয়ানদের আর কোনো নাম নিশানাও থাকলো না।

ম্যারিয়াস, ক্রাসিয়াস, পম্পি, সুল্লা এবং সিসেরো ছিলেন এ রকম অনলবর্ষী বাগ্মী। জুলিয়াস সীজার ছিলেন যোদ্ধা এবং বাগ্মী হিসাবে এঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। প্যাট্রিসিয়ান রক্তধারার লোক হলেও তিনি ছিলেন জনপ্রিয় নেতা। রিপাবলিকান দলের প্রধান ছিলেন তিনি। আর প্রতিক্রিয়াশীল রক্ষণশীল গ্রুপের নেতা ছিলেন সুল্লা এবং সিসেরো। ক্ষমতালোভী পম্পি রিপাবলিকান দলে যোগ দিয়েছিলেন সীজারের সঙ্গে। কিন্তু বছর কয়েকের মধ্যেই ফাটল ধরলো তাঁদের ঐক্যে। পম্পি যোগ দিলেন সিনেটের সীজার বিরোধী গ্রুপের সঙ্গে। ব্রুটাস গোপনে ভিড়লেন এই

www.pathagar.com

ষড়যন্ত্রী দলে। এই রাজনৈতিক বিভেদই হলো রোমের অবিসংবাদিত জননায়ক সীজারের হত্যাকাণ্ডের মূল কারণ।

কিন্তু সীজারের শিষ্য বিখ্যাত বাগ্মী মার্ক অ্যান্টনি সীজারের মৃতদেহের সামনে যে আবেগাত্মক ভাষণ রেখেছিলেন বিশ্বের ইতিহাসে তার জুড়ি নেই। শেক্সপীয়র তাঁর নাটক 'জুলিয়াস সীজার'-এ যেমন এই রোমান নেতা সীজারকে অবিস্মরণীয় করে রেখে গেছেন তেমনি মার্ক অ্যান্টনিকে অমর করে রেখে গেছেন তাঁর 'অ্যান্টনি এবং ক্লিওপেট্রা'নাটকে। এই একটি মাত্র বক্তৃতার জোরে অ্যান্টনি রোমানদের বিদ্রোহী করে তুলেছিলেন মাত্র মিনিট কয়েকের ব্যবধানে। বিক্ষুব্ধ বিদ্রোহীরা সীজারের বিরুদ্ধবাদীদের চূর্ণবিচুর্ণ করে দিয়েছিলো। সিনা নামক এক ষড়যন্ত্রী ছিলো বিপক্ষ দলে। এদিকে কবি সিনা ছিলেন নির্দলীয় এবং গোবেচারা গোছের মানুষ। কেন তাঁর নাম সিনা হলো এই অভিযোগে তাঁকেও ক্ষমা করা হলো না। উত্তেজিত বিপ্লবীদের হাতে প্রাণ দিতে হলো এই নিরীহ কবিকে।

মার্ক অ্যান্টনিও তাঁর ভাষণের শুরুতে রোমানদের সংবোধন করে বলেছিলেনঃ 'রোমানস, ফ্রেণ্ডস অ্যান্ড কান্ট্রিমেন।' এরপর ভাষার চাতুর্য এবং ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে ঘটনাপ্রবাহকে নিয়ে গেলেন তিনি সীজারের অনুকূলে। সীজারের গণমুখী রাজনীতি আর তাঁর মহৎ গুণাবলী তুলে ধরে ঘায়েল করলেন বিরোধী গ্রুপকে। তাদের দেশের নিকৃষ্টতম শত্রু বলে প্রমাণ করলেন। ফলে গণরোষে নিশ্চিহ্নতে হয়ে গেলো ষড়যন্ত্রীদের গোটা দলটি।

হিস্ট্রির ভাষায় বলা যায়, মার্ক অ্যান্টনি এখানে প্রাচীন যুগের আরব কবিদের মতন কলমের বদলে তলোয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন ভাষাকে। আর বিরুদ্ধপক্ষের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করে তিনি পালন করেছিলেন আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ কলমযোদ্ধা সাংবাদিকের ভূমিকা।

কোথা থেকে এলাম আমি- এ এক চিরকেলে প্রশ্ন মানব-শিশুর। মায়ের কাছে রাখা শিশুর এ প্রশ্নের জবাব মায়ের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন সাদামাটা ভাষায়। কোনোরকম আলো-আঁধারিতে ঝাঁপ না দিয়ে এক কথায় বলেছিলেনঃ আমার মনের মাঝারে স্বপ্ন হয়ে ছিলে তুমি। তারপর আমার কোল আলো করে এলে পৃথিবীতে।

তারপরও ভরেনি শিশুর মন। সে জানতে চায় আরো আরো কথা। জানতে চায় তার মা কোথা থেকে এলো? তার বাবা, দাদা আর তাঁদের পিতা, পিতামহরা? অর্থাৎ সে জানতে চায় মানুষের ইতিহাস, পৃথিবীর ইতিহাস। তার অবুঝ মনে কতো প্রশ্নই-না উঁকিবুকি দেয়। মায়ের মনে তার স্বপ্ন হয়ে থাকার মধ্যে যে-রহস্য তার কোনো কূল কিনারাই খুঁজে পায় না সে। তার মনের প্রশ্নগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করলে বুঝতে পারা যায় অনেক দূর অতীতে সে পাড়ি দিতে চায়। যেখান থেকে হাজারো চড়াই-উতরাই আর কান্তার পর্বত-মরু পেরিয়ে মানুষের বর্তমানে উত্তরণ। তাঁর সভ্যতার শুরু এবং ক্রমবিকাশ।

www.pathagar.com

যখন শিশু ছিলাম আমার ইতিহাসবেত্তা বাবাকেও এ রকম প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেছি। তিনি জবাব দিয়েছিলেন আরো বড়ো হলে জানতে পারবে সবকিছু। টেবিল জোড়া বিশাল সব গ্রন্থ নিয়ে নিমগ্ন হয়ে থাকতেন তিনি। বই নিয়ে বসলে বেলা কোথায় গড়িয়ে যেতো তার হিসেব রাখতেন না বাবা। দুপুরের খাবার বরফ হয়ে পড়ে থাকতো। মায়ের ডাকাডাকি যেনো কানেই যেতো না তাঁর। তিনি পড়াশোনা করেছেন সেকালের যুক্ত প্রদেশের রামপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। এটি ছিলো একটি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি। এখান থেকে এক সংগে অনেকগুলো বিষয় নিয়ে পিএইচডি'র সমতুল্য সর্বোচ্চ ডিগ্রি লাভ করেছিলেন তিনি।

প্রাচ্য সাহিত্য ছাড়াও তাঁর পঠিত বিষয়গুলোর মধ্যে ছিলো ইতিহাস, গ্রিক এবং ইসলামিক মেটাফিজিক্স আর ভূগোল গণিত এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান। মধ্যযুগে বাগদাদের নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় আর ইরানের নিশাপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রিক পণ্ডিতদের দর্শন, সৃষ্টিতত্ত্ব, জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত, ভূবিজ্ঞান প্রভৃতি নিয়ে পঠন-পাঠন এবং নতুন নতুন গবেষণা হতো। ভারতে মুসলমান আমলে স্থাপিত উচ্চ শিক্ষা কেন্দ্রগুলোতে অনুসরণ করা হতো এই মিশ্রিত শিক্ষারীতি। খলিফা মামুনের আমলে প্রতিষ্ঠিত বাগদাদের 'বায়তুল হিকমা' তথা জ্ঞান নিকেতনে গ্রিক দর্শন গুরু সক্রেটিস এবং তাঁর স্থাপিত এথিনিয়ান একাডেমির ছাত্র প্ল্যাটো, আর অ্যারিস্টটলের তত্ত্বের ওপর বিতর্ক চলতো। ইউক্লিডের উদ্ভাবিত জ্যামিতির বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্র, ত্রিভুজ ইত্যাদির সূত্রের সংগে বীজগাণিতিক সূত্রের সমীকরণ করা হয়েছে এই জ্ঞান নিকেতনে।

ভারতের গুপ্ত সম্রাট সমুদ্র গুপ্ত বিক্রমাদিত্য (খ্রিস্টীয় চতুর্থ অব্দ) -এর সভাসদ পণ্ডিত বানভট্ট দশমিক সূত্রের উদ্ভাবক। বাগদাদের আরব পণ্ডিতেরা এই সূত্রের ওপর গবেষণা করে প্রথম এলজাবরা তথা বীজগণিত প্রণয়ন করেন। আরবি ভাষায় এলজাব্রার নাম হলোঃ 'আল-জবর ওয়াল মুকাবিলা।' কথাটির মানে 'বৈপরীতের সমাহার।' নিশাপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতশাস্ত্র এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের অধ্যাপক বিশ্বখ্যাত কবি উমর খৈয়াম (খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতক) ইউক্লিডের জ্যামিতিক সূত্রের সংগে বীজগণিতের যোগসূত্র নির্ণয় করেন। বানভট্ট রচিত গণিতগ্রন্থ 'সিদ্ধান্ত' অনূদিত হয় বাগদাদের সংস্কৃত ভাষাবিদ ও অংকশাস্ত্রবিদ অনুবাদকদের হাতে। এখানে জাতকের গল্প 'পঞ্চতন্ত্র' 'কথাসরিৎসাগর' আর এবং গণিতগ্রন্থ 'লীলাবতি'সহ বৌদ্ধযুগের জ্ঞানবিজ্ঞানের বিখ্যাত গ্রন্থাবলীরও আরবি ভাষান্তর হয়।

ক্রুসেড যুদ্ধের (অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতক) আগে ইউরোপীয়রা গ্রিক মনীষা সম্পর্কে কোনো ধারণাই রাখতো না। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ করতে এসে তারা সবিস্ময়ে দেখলো বল্কান পর্বতমালার দেশের বিখ্যাত পণ্ডিতদের সমস্ত তত্ত্ব আর গ্রন্থমালা অনুবাদ করে বিশ্বসভ্যতার নির্মাতার আসন অলংকৃত করছে আরবরা। যাদের তারা বলতো বারবেরিয়ান আর আইডোলেটর তথা পৌত্তলিক। গ্রিকদের জ্ঞান ভান্ডারের সংগে ফেরদৌসি, আবু রুশদ, গাজ্জালি এবং উমর খৈয়াম, আলফারাবি, হাফিজ-সাদি আর ইবনে সিনা প্রমুখের গ্রন্থাবলীও ইউরোপে নিয়ে যায় ক্রুসেডাররা। এভাবে

www.pathagar.com

জ্ঞানের জগতে ত্রয়োদশ শতকের অন্ধকার যুগের ইউরোপ দীক্ষিত হলো বুদ্ধিদীপ্ত প্রাচ্যের হাতে। সেই প্রথম তারা জানতে পারলো গ্রিকদর্শনের আদিগুরু থালিজ (Thales), পিথাগোরাস (Phytha gorus), তাঁর শিষ্য ফিলোপাস, সিবিস এবং পিথাগোরিয়ান চিন্তাধারার পণ্ডিত সক্রেটিসের কথা। থালিজ ছিলেন খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকের লোক। থালিজ (খ্রিস্টপূর্ব ৬৩৬-৫৪৬) প্রথম গ্রহমণ্ডলের গতিতত্ত্বের উদ্ভাবক। পৃথিবী, সূর্য এবং অন্যান্য গ্রহ নিজ নিজ অবস্থানের চারদিকে প্রদক্ষিণ করে বলে তাঁর ধারণা ছিলো। গ্রহগুলো কেন স্থানচ্যুত হয় না এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজেন তাঁর শিষ্য অ্যানাক্সিমান্দার (Anaximander) (৫৪৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)। তিনি মাধ্যাকর্ষণের ওপর প্রথম গবেষণা করেন। এই অর্থে তিনি ছিলেন নিউটনের আদি গুরু।

থালিজ ভারতের 'উপনিষদ' যুগের দার্শনিকদের মতো মনে করতেন একটি একক মৌলিক পদার্থ অর্থাৎ পানি থেকে পৃথিবীর উদ্ভব। বৈদিক পণ্ডিতেরা বিশ্ব সৃষ্টির রাসায়নিক উপাদানকে কারণ-বারি বলে উল্লেখ করেছেন। এর আরও চারটি পদার্থ যথা অগ্নি, বায়ু, মাটি এবং পানিকে মনে করা হতো পৃথিবী সৃষ্টির মৌলিক উপাদান। থালিজ এবং তাঁর শিষ্যরা এই ধারণাটিকে নাকচ করে দেন। আরব

মধ্যযুগে পাণ্ডুলিপিতে অংকিত মিনিয়েচার ছবি

বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকেরা এই চার পদার্থকে বলতেন আব্, আতশ, খাক্ এবং বাদ, আব্ বলতে বুঝায় পানি হলো আগুন। আর খাক্ হলো মাটি এবং বাদ্ হলো বাতাস। আব্ থেকে আবহাওয়া কথাটির উৎপত্তি। বাংলায় ম্যাগনিফাইং গ্লাসকে আমরা বলি আতশ কিংবা আতশি-কাচ। আমাদের কালের বাংলা সংবাদপত্রে এই দুটি শব্দ-বিশেষণের সহজ বিকল্প বোধকরি আর কিছু নেই। এর অর্থ হলো প্রাচীন

www.pathagar.com

পৃথিবীর দর্শন-বিজ্ঞান এবং শব্দ ভাণ্ডারের সংগে আজো আমরা এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ।

আমার পিতার পঠন-পাঠন এবং জ্ঞানের জগতের কথা বলছিলাম। আদি যুগের গ্রিক পণ্ডিতদের সম্পর্কে ভালো ধারণা ছিলো তাঁর। তিনি প্রাচীন গ্রিস্‌কে বলতেন ইউনান। বিজ্ঞানকে বলতেন হিকমত। লজিককে বলতেন মুন্‌তেক। ফিলসফিকে বলতেন ফাল্‌সোফা। দর্শনগুরু থালিজকে বলতেন জালিয়ানুস। তাঁর কাছে সক্রেটিস (৪৭০-৩৯৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)-এর নাম ছিলো হাকিম সোক্রাত্‌। প্ল্যাটোর নাম ছিলো হাকিম আফলাতুন। অ্যারিস্টটলের নাম ছিলো হাকিম আরাস্তু। ইউক্লিডের নাম ছিলো উক্‌লিদাস্‌। আলেকজান্দারকে বলতেন ইস্কান্দার। আর টলেমিকে বলতেন তালামিস্‌। আরব পণ্ডিতেরা অনুবাদ করবার সময় নিজেদের উচ্চারণ ভঙ্গির সঙ্গে সংমিশ্রণ ঘিটয়ে ছিলেন মূল গ্রিক নামের। যেমন ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক আবু রুশদ'কে অ্যাবারোস (Aba Roes) এবং ইবনে সিনাকে বলতেন অ্যাবে সিনা (Ave Cenna)।

বাগদাদের অনুবাদ আকাদেমি-তে এঁদের সবার জ্ঞানসূত্র এবং গ্রন্থাবলী অনূদিত হয়েছে। আর এসব গ্রন্থ পড়ানো হতো মধ্যযুগের প্রখ্যাত রাজনীতিক এবং পণ্ডিত নিজাম-উল্‌-মুলক প্রতিষ্ঠিত বাগদাদের নিজামিয়া ইউনিভার্সিটিতে। থালিজ এবং পিথাগোরাস প্রাচীন গণিত এবং সংখ্যাতত্ত্বেরও উদ্ভাবক ছিলেন। থালিজ মনে করতেন মহাবিশ্বের অযুত কোটি গ্রহের আবর্তন-বিবর্তনের গাণিতিক সংখ্যার মধ্যেই রয়েছে ইউনিভার্স তথা মহাবিশ্বের অনন্ত বিস্তারের পরিমিতি। যার অসীমতাকে নিউটন বলেছেন 'ইন্‌ফিনিটাম' (Infinitum) আর এই বিজ্ঞানীদের গাণিতিক সূত্র অনুসরণ করে আইনস্টাইন উদ্ভাবন করেছেন তাঁর থিওরি অভ রিল্যাটিভিটি আর মহাশূন্যের গাণিতিক এবং জ্যামিতিক তত্ত্ব। আইনস্টাইন বলেন, গ্রহমণ্ডল তার ঘূর্ণন প্রক্রিয়ার দ্বারা সৃষ্টি করে নতুন-নতুন মহাশূন্য। বীজগণিতের সূত্রের দ্বারা নির্ণয় করা সম্ভব এর বিস্তারের আয়তন। আর মহাশূন্য জ্যামিতি আর মহাশূন্যের গতি ও সময় নিরূপক ঘড়ি আবিষ্কার করা সম্ভব হলে এর সীমারেখা কতোটা তার ধারণা পাওয়া যাবে।

এই সংখ্যাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি মহাশূন্যকে সসীম তথা 'ফিনিটাম' বলেছেন। তবে সংগে সংগে তিনি এ-ও বলেছেন মানব-মতিস্তষ্কের যে ধারণ ক্ষমতা তাতে ক্রমবিস্তারণশীল এই স্পেস-এর সীমারেখার যোগফল বের করা কোনো ক্ষণজন্মা বিজ্ঞানীর পক্ষেই সম্ভব হবে না। বাগদাদ এবং নিশাপুরের বিশ্ববিদ্যালয়ে মহাশূন্যের বিস্তার, পৃথিবীর সূর্য প্রদক্ষিণ এবং অণুবিজ্ঞান নিয়ে হয়েছে ব্যাপক গবেষণা। সূফি-দার্শনিক ইবনুল আরাবি মনে করতেন প্রতিটি বস্তু এবং অণুকণার মধ্যেই আছে এক অসাধারণ শক্তি। তিনি জড়বস্তুর মধ্যেও প্রাণের অস্তিত্বের কথা বলেছেন যা একটি নিউক্লিয়াস অর্থাৎ কেন্দ্রবিন্দুকে ঘিরে আবর্তিত। আমাদের কালে পরমাণুতত্ত্ব আর অ্যাটমিক এবং নিউক্লিয়ার বোমার বিস্ফোরণ ঘটানোর প্রক্রিয়া উদ্ভাবনের পর জড়বস্তুর অর্থাৎ পরমাণুর অসামান্য ক্ষমতার কথা

www.pathagar.com

প্রমাণিত হয়েছে একটি বৈজ্ঞানিক সত্য হিসাবে। আমার পিতা মহাবিশ্বের সৃষ্টি এবং বস্তু ও অণুর অন্তর্নিহিত এই ক্ষমতাকে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান তথা মেটাফিজিক্স-এর অন্তর্গত বিষয় বলে মনে করতেন। সক্রেটিসের কাছে যা ছিলো মহাজ্ঞান অর্থাৎ সুপ্রিম নলেজ (Supreme Knowledge)-এর অভিব্যক্তি। আইনস্টাইন জ্ঞানের এই উৎসকে বলেছেন 'উইল অভ্ দ্য মাস্টার -মাইন্ড (Will of the Mastermind)।

পদার্থবিদ্যা এবং প্রাচীন গ্রিক সোফিস্টদের (Sophists) উদ্ভাবিত অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের যে নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে একথা বিশ্বাস করতেন আইনস্টাইন। তিনি প্যারিসে অনুষ্ঠিত বিজ্ঞানীদের সম্মেলনে দেয়া তাঁর ভাষণে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। তাঁর ভাষণটির শিরোনাম ছিলো 'এ মেসেজ্ টু দ্য সায়েনটিস্ট্স, (A message to the scientists) আমার সৌভাগ্য হয়েছে আইনস্টাইনের এই ভাষণটির বাংলা রূপান্তর করবার। এটি পঁয়তাল্লিশ বছর আগেকার কথা।

সময়টা ছিলো ১৯৫২ সাল। তখন তুঙ্গে উঠেছিলো রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন। দৈনিক আজাদে দেড়শ' টাকা মাসোহারার সিনিয়র-সাব-এডিটর ছিলাম। রাতের পালার শিফট ইন-চার্জের দায়িত্ব পালন করতে হতো। ইচ্ছে করেই আমি রাতের কাজ নিয়েছিলাম। দিনের বেলা ভাষা আন্দোলনের প্রচারপত্র লিখতাম। যোগাযোগ রাখতাম আন্দোলনের নেতাদের সংগে। এই অর্থে আমি ছিলাম ইংল্যান্ডের পিওরিটান-বিপ্লবের সময়কার প্যাম্পলেটিয়ারদের মতো। যাঁদের মধ্যমণি ছিলেন কবি, রাজনীতিক এবং সাংবাদিক মিল্টন। রাজা প্রথম চার্লস-এর রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচার আর সংবাদপত্র দলন নীতির বিরুদ্ধে গোপনে প্রচারপত্র এবং পুস্তিকা প্রকাশের জন্যে যাঁকে ভোগ করতে হয়েছিলো কারাদণ্ড। আমি বোধকরি ইংল্যান্ডে সংবাদপত্র বিকাশের প্রাথমিক যুগের এই পুরোধা সাংবাদিকের ভাবশিষ্য বনে গিয়েছিলাম নিজের অজান্তে।

বায়ান্ন সালের সেসব ঘটনা ছিলো আমার অনিশ্চিত সাংবাদিক জীবনের বহু স্মরণীয় ঘটনার একটি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের প্রভাষক আবুল কাসেম ফেব্রুয়ারির গোড়ার দিকে একটি ইংরেজি বই এনে দিলেন আমার হাতে। মলাটের গায়ে লেখা ছিলোঃ 'স্পীচেস্ অভ্ আলবার্ট আইনস্টাইন।' তিনি আইনস্টাইনের প্যারিস ভাষণটি তরজমা করে দেবার জন্যে অনুরোধ জানালেন আমাকে। বললেন লেখাটি ছাপা হবে একটি সাময়িক পত্রিকায়। কয়েকদিন ধরে বইটি পড়লাম। কিন্তু দাঁত ফোটাতে পারছিলাম না। আপেক্ষিক তত্ত্ব, গতিবিজ্ঞান, স্পেস্ অ্যান্ড ইউনিভার্স ইত্যাদি জটিল বিষয়ের ওপর মত প্রকাশ করেছিলেন পদার্থ শাস্ত্রের অতল মন্থনকারী এই বিজ্ঞানী।

কাজটা ছিলো একজন বিষয় বিশেষজ্ঞের। একজন সংবাদ-অনুবাদকের পক্ষে সম্ভব ছিলো না বিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দ আর তার অন্তরালের সূক্ষ্ম বিষয়কে জলবৎ তরলং করে তুলে ধরবার। তারপরও সাহস সঞ্চয় করতে লাগলাম। কারণ আমার বিশ্বাস ছিলো ভাবপ্রকাশে বাংলা ভাষার ক্ষমতা অসাধারণ। যে-কোনো বৈদেশিক ভাষাতেই লেখা হোক না কেন শুধু সেই ভাষা আর প্রাসংগিক বিষয়টি

www.pathagar.com

হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেই হলো। তারপর বাংলায় ভাষান্তর নিজের গতিতেই মূল বিষয়টির ভাবানুষঙ্গ অনুসরণ করে চলবে। যাঁরা গ্রিক ভাষার জিওমেট্রিকে, জিওগ্রাফিকে, অ্যারিথমেটিককে আর আরবি অ্যালজাবরাকে জ্যামিতি, ভূগোল, পাটিগণিত এবং বীজগণিত নামে ভাষান্তরিত করেছিলেন সেই বিখ্যাত অনুবাদকগণ নেপথ্যে থেকে অনুপ্রাণিত করে তুললেন আমায়।

আমি তখন আইনস্টাইন এবং আমার বাবার পরিচিত গ্রিক পণ্ডিতদের জগতে বিচরণ করছিলাম। রাত দুইটার দিকে সবাই নিউজ টেবিল থেকে চলে গেলে বইটা নিয়ে বসতাম। আগেই যোগাড় করে নিয়েছিলাম বিজ্ঞানের একটি অভিধান। দুই-এক পাতা করে ভাষণটি অনুবাদ করতে লাগলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞান পড়াতেন এমন কয়েকজন শিক্ষক ছিলেন আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। কোনো পারিভাষিক শব্দ দুর্বোধ্য ঠেকলে তাঁদের কাছ থেকে জেনে নিতাম। দিন সাতেকের মধ্যেই আইনস্টাইনের 'এ মেসেজ টু দ্য সায়েনটিস্ট' ভাষণটির অনুবাদ শেষ করলাম। পরে এটি ঢাকার ১৯ নম্বর আজিমপুর থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক 'দ্যুতি' পত্রিকায় ছাপা হলো।

এই সময় পল্টন ময়দানে উর্দুর পক্ষে দেয়া খাজা নাজিমুদ্দিনের বক্তৃতা নিয়ে তোলপাড় চলছিলো ঢাকায়। ১৯৪৮-এর ভাষা আন্দোলনের সময় নাজিমুদ্দিন ছিলেন পূর্ববংগ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী। সে সময় প্রাদেশিক আইন পরিষদ ঘেরাও হওয়ার পর তিনি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করবার প্রস্তাব মেনে নিয়েছিলেন। ১৯৫১ সালের অক্টোবরে রাওয়ালপিন্ডিতে আততায়ীর গুলিতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি নিহত হলে পরে নাজিমুদ্দিনকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হলো। কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রী হবার পর ভোল পাল্টে গেলো খাজার। বায়ান্ন সালের ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝিতে করাচি থেকে ঢাকা এসেই তিনি উর্দুর পৈতে গলায় ঝুলিয়ে এক বক্তৃতা ফাঁদলেন পল্টনে। সংগে সংগে তুমুল প্রতিক্রিয়া। ছাত্রসমাজ আর বাংলার পক্ষের রাজনৈতিক দলগুলো বেঈমান, বিশ্বাসঘাতক বলে অভিহিত করতে লাগলো তাঁকে। ঢাকা হয়ে উঠলো বিক্ষোভ আর মিছিলের নগরী। দেয়ালগুলো ছেয়ে গেলো পোস্টারে পোস্টারে। বিক্ষোভ-মিছিল বন্ধ করবার জন্যে জারি করা হলো ১৪৪ ধারা। বাঁধাভাঙ্গা তরংগের মতো একুশ ফেব্রুয়ারির বিশাল ছাত্র মিছিল চুয়াল্লিশ ধারাকে গুঁড়িয়ে দিলে বেধড়ক গুলিবর্ষণ করলো পুলিশ। শহীদ হলেন বরকত-সালাম, শফিক-রফিক এবং আরো অনেকে।

তখন মেডিক্যাল কলেজের উত্তরের রাস্তার ধারে কৃষ্ণচূড়ার গাছগুলো লাল হয়ে উঠেছিলো রক্তরং ফুলে। এদিকে মেডিক্যাল কলেজের পশ্চিম আঙিনার সবুজ ঘাস রুধিরাক্ত শহীদদের বুকের তাজা খুনে। খবর শুনে ছুটে গেলাম সেখানে। লোকে লোকারণ্য এখনকার শহীদ মিনারের চারপাশ। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা কাছের একটা ছাত্রাবাসে মাইক ফিট্ করে অগ্নিবর্ষণ করছিলো ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে। আমাকে দেখে দৈনিক সংবাদের সাব-এডিটর আবদুল খালেক (খালেক দা নামে পরিচিত) ধরে নিয়ে গেলেন মাইকের সামনে। ১৯৪৭ থেকে জড়িত ছিলাম ভাষা আন্দোলনের সংগে।

www.pathagar.com

সুতরাং ভাষা সৈনিকদের হত্যাকাণ্ডে আগুন হয়ে উঠেছিলো অনুভূতি। সরকারের মুণ্ডুপাত করে তীব্র শ্লেষাত্মক ভাষায় বক্তৃতা দিলাম মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে।

আজাদ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিন ছাত্রহত্যার প্রতিবাদে কড়া সম্পাদকীয় লিখলেও ভাষা বিরোধী এক প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ছিলো আজাদ অফিসে। তারা আমাদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করতো। মেডিক্যাল কলেজ ছাত্রাবাসে দেয়া আমার সরকার-বিরোধী বক্তৃতার কথা তারা আজাদ কর্তৃপক্ষের কানে তুললো। মওলানা আকরম খাঁর মেজো ছেলে সদরুল আনাম খাঁ ছিলেন পত্রিকার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। তিনি পরেরদিন আমাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন আমি নাকি নাশকতামূলক কাজ করেছি ওই বক্তৃতা দিয়ে। তারস্বরে প্রতিবাদ করলাম তাঁর অভিযোগের। বললাম বাংলার পক্ষে কথা বললে নাশকতা হয় না। আমি আকরম খাঁর উত্তরাধিকারীর চৌদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার করলাম ভাষাবিরোধী টিকটিকি পোষার জন্যে। তখন আমার বয়স কেবল তেইশে পা দিয়েছিলো। রক্ত ছিলো গরম। ক্রোধে থু থু ছিটালাম তাঁর সামনেই। ছেড়ে দিলাম আজাদের চাকরি।

আমার সাংবাদিক জীবনের এ ছিলো এক বিরাট ঘটনা। এর জন্যে অনুপ্রাণিত বোধ করেছি আগাগোড়া। সান্ত্বনা পেয়েছি অন্তত বাংলাভাষার জন্যে বৈরী পরিবেশের সাংবাদিকতার চাকরি ছাড়তে পেরেছি বলে।

আমার বাবার গ্রন্থের জগতের কথা বলছিলাম। তাঁর কিতাবগুলোতে আমি শিল্পীর আঁকা ছবি দেখেছি। দেখেছি সমরকন্দের বিশ্বখ্যাত কবি আবদুর রহমান জামি রচিত কাব্যগ্রন্থ 'সিকান্দার নামা'য় মধ্যযুগের নন্দিত শিল্পী বেহ্জাদের আঁকা মিনিয়েচার ছবি। দেখেছি ফেরদৌসির 'শাহ্নামা'য় আলেকজান্দার ও পারস্য সম্রাট তৃতীয় দারায়ুসের মধ্যকার যুদ্ধের দৃশ্য। এখন থেকে হাজার বছর আগে মুসলমান পণ্ডিতেরা তাঁদের গ্রন্থে ছবি ব্যবহার করতেন। এ ছিলো আমার কাছে এক বিস্ময়কর ঘটনা। কারণ এ শতকের তৃতীয় দশকেও মুসলমান সম্পাদিত বাংলা পত্রপত্রিকায় মানুষ এবং জীবজন্তুর ছবি দেয়া ছিলো নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার মত এক মহাগর্হিত কাজ।

শিল্পী বিহ্জাদের জন্মস্থান সমরকন্দ ভ্রমণের সুযোগ ঘটে গেলো হঠাৎ। এটা কোনো কাকতালীয় ব্যাপার ছিলো কিনা জানি না। তবে একথা ঠিক বিহ্জাদের আঁকা ছবি আমার মনের অনেকখানি জায়গা দখল করে বসেছিলো। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন সম্পাদিত মাসিক 'সওগাতে'র কোনো একটি পুরনো সংখ্যায় দেখেছিলাম বিহ্জাদের যাদুময় হাতের কয়েকটি ছবি। সংখ্যাটি বোধ করি সওগাতের প্রতিষ্ঠাকাল ১৯১৮ কিংবা তার কাছাকাছি কোনো সময়ের হবে।

নাসির উদ্দিন সাহেবই প্রথম মুসলমান-সম্পাদিত বাংলা কাগজে ফটো এবং শিল্পীর আঁকা ছবি প্রকাশ করে প্রকৃত অর্থে বিপ্লব সৃষ্টি করেন। ১৯১৮ সালে প্রকাশিত সওগাতের প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যাতেই নাসিরউদ্দিন ছেপেছিলেন পটে-আঁকা ছবির পাশাপাশি নারী-পুরুষের আলোকচিত্র। এর ন্যে অগ্রগামী এই সাংবাদিককে রক্ষণশীল শ্রেণীর হাতে কম নাকাল হতে হয়নি। তারা মানুষ এবং জীবজন্তুর ছবি

www.pathagar.com

আঁকা এবং প্রকাশ করা হারাম বলে ফতুয়া দিয়ে তাঁর পথে খাড়া করেছিলো বিধিনিষেধের এক শক্ত দেয়াল।

কিন্তু নাসিরউদ্দিন ছিলেন এক দুঃসাহসী কলমযোদ্ধা। তিনি দেড় হাজার বছর আগে খলিফা উমরের আমলের মুদ্রায় মানুষের মাথার ছবি অংকিত হবার নজির তুলে ধরলেন। কয়েকজন প্রখ্যাত প্রাচ্যবেত্তার বক্তব্য তুলে ধরে জানালেন মধ্যপ্রাচ্যে আবিষ্কৃত একটি পুরনো দিনারে উমরের যুগের বিখ্যাত সেনাপতি খালেদ-বিন-ওয়ালিদের মস্তক অংকিত ছিলো। এছাড়া উমাইয়া এবং আব্বাসীয় আমলের খলিফারা মুদ্রায় তাঁদের মাথার ছবি ব্যবহার করতেন। কার্পেটের মাঝখানের নকশায় থাকতো শিকারের দৃশ্য। উমাইয়া খলিফা মালেক এবং আব্বাসীয় খলিফা হারুনুর রশিদের দরবার হল শোভিত থাকতো শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের আঁকা মনোরম চিত্রে। এসব ছবির মধ্যে নর-নারীর ছবিও ছিলো।

সমরকন্দে এবং হিরাতে ছিলো বিহ্জাদের প্রতিষ্ঠিত আর্ট স্কুল। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন অনেক প্রতিভাধর শিল্পী। এঁরা মধ্যযুগের বিখ্যাত লেখক এবং কবিদের গ্রন্থ চিত্রশোভিত করতেন। বিহ্জাদের ছাত্রদের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিভাশালী ছিলেন চারুশিল্পী আবদুস সামাদ। মুগল যুগে সামাদের অনেক ডাকনাম ছিলো।

সম্রাট বাবুর (১৪৮০-১৫৩০)-এর সময়কার লোক ছিলেন বিহ্জাদ। বিহ্জাদের অন্তরঙ্গ এবং অনুরাগী ছিলেন বাবুর। তৈমুর বংশীয় এই ভারত বিজেতা নিজেও ছিলেন একজন চিত্রশিল্পী। পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন উঁচুদরের লেখক, কবি, ঐতিহাসিক এবং সঙ্গীত সাধক। রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ছিলো তাঁর অসাধারণ। তাঁর রচিত 'তুজুক-ই-বাবুরি' বিশ্বখ্যাত আত্মজীবনী গ্রন্থ। এটি 'বাবুরনামা' হিসাবে বেশি পরিচিত। গ্রন্থটিতে চিত্রশোভিত করেছেন সম্ভবত বিহ্জাদ। বাবুর তাঁর এ আত্মকথায় নিজের উত্থান-পতনের ঘটনাবলীসহ মধ্য এশিয়া, পারস্য এবং ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতি-শিল্পকলা আর সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের ইতিহাস তুলে ধরেছেন মনোজ্ঞ ভাষায়। আমু এবং সির দরিয়া বিধৌত উজবেকিস্তানের ফারগনা উপত্যকা ছিলো বাবুরের জন্মস্থান। তাঁর যৌবন কাটে ঐতিহাসিক রেশম সড়কের প্রাণকেন্দ্র সমরকন্দ শহরে। তিনি এশিয়ার প্রাচীনতম সভ্যতার পীঠস্থান এই উদ্যান নগরী এক সময় দখল করে নিলেন। তারপর আলেকজান্দারের মতো আফগানিস্তান বগলদাবা করে জয় করলেন ভারত। প্রতিষ্ঠা করলেন বিশাল মুগল-সাম্রাজ্য। তাঁর উত্তরসূরি হুমায়ুন, আকবর, জাহাংগির, শাহ্জাহান এবং শাহ্জাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারা শিকোহ্ ছিলেন সাহিত্য, সঙ্গীত, চারুশিল্প এবং স্থাপত্যকলার পৃষ্ঠপোষক।

আকবর এবং জাহাংগিরের আমলে ভারতে বিহ্জাদর পারসিক শিল্পরীতি অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করে। মুগল দরবারে তাঁর অংকিত কোনো কোনো ভালো চিত্র সেকালের মুদ্রামানে এক লাখ টাকারও বেশি দামে বিক্রি হতো বলে জানা যায়। আকবর পারসিক রীতির সংগে ভারতীয় রীতির সমন্বয় ঘটিয়ে নতুন চিত্রাংকন ধারা প্রবর্তন করেন। তিনি বিহ্জাদের শিষ্য আবদুস সামাদকে তাঁর

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠিত দিল্লির চারুশিল্প বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। তাঁর সময়ে আগ্রা, লাহোর এবং আরো কয়েকটি শহরে স্থাপিত হয়েছিলো আর্ট স্কুল। এসব চারুকলা বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের জন্যে ভারত ছাড়াও পারস্য এবং ইরানের নানান স্থান থেকে আসতেন চিত্রাংকনবিদ্যা আর লিপি শিল্পের ছাত্রগণ। এঁদের অংকিত চিত্রে এবং লিপি সৌকর্যে শোভিত হতো সেকালের লাইব্রেরি আর জাদুঘরসমূহে রক্ষিত মৌলিক ও বিদেশি ভাষা থেকে অনূদিত গ্রন্থাবলী। তখনকার যুগে দিল্লি, আগ্রা, লাহোর, এলাহাবাদ এবং দক্ষিণ ভারতের বিজয়পুর, গোলকুণ্ডা প্রভৃতি শহরের উচ্চশিক্ষিত উমরাহগণ চিত্রশিল্পের কদর করতেন। তাঁদের প্রায় সবার বাড়িতেই থাকতো সুসমৃদ্ধ গ্রন্থাগার। এসব গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি বাঁধাই হতো মরক্কো-লেদারে। আর ভেতরের পৃষ্ঠাগুলো অলংকৃত হতো বর্ণাঢ্য ছবি এবং লতা-পাতায়। আকবরের সভাসদ ঐতিহাসিক আবুল ফজল, তাঁর ভাই দার্শনিক-পণ্ডিত ফৈজি, ভূমিমন্ত্রী তোডরমল্ল, সেনাপ্রধান মানসিংহ প্রমুখের বাড়িতে ছিলো বিরাট বিরাট গ্রন্থাগার।

আবুল ফজল নিজেও ছিলেন একজন অংকন শিল্পী। তিনি তাঁর রচিত বিশ্ববিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ 'আইন-ই-আকবরি'র প্রচ্ছদ এবং ভেতরকার মূল্যবান অধ্যায়গুলো নিজেই চিত্রশোভিত করেছিলেন। দারা শিকোহ্ ছিলেন শাহ্জাহান আমলের একজন প্রতিভাধর শিল্পী। তাঁর অংকিত 'বুনো হাঁসের ঝাঁক' ছবিটি অর্জন করে বিশ্বখ্যাতি। মনসুর, সারোয়ান, জগন্নাথ প্রমুখ ছিলেন বিহ্জাদ ধারার বিখ্যাত শিল্পী। জগন্নাথের অংকিত 'ময়ূর', মনসুর অংকিত 'মোরগ' আর সারোয়ান অংকিত 'বুনো মোষ' ছিলো সেকালের বহুল প্রশংসিত চিত্রকর্ম। মধ্যএশিয়া, পারস্য ও ভারতের বিখ্যাত কারুকলাবিদদের আঁকা নৈসর্গিক দৃশ্য আর দুর্লভ জীবজন্তুর চিত্রখচিত একটি এলবাম নিজের শয়ন কক্ষে রাখতেন সম্রাট জাহাংগির।

মধ্যযুগের বিশ্বখ্যাত স্থপতি সিনান

www.pathagar.com

মুগলরা ছিলেন তুর্কি রক্তধারার লোক। ইউরোপে অটোম্যান তুর্কি সাম্রাজ্যের (Ottoman Empire) প্রতিষ্ঠাতা সুলতান উস্‌মানের উত্তরসূরি বায়াজিদ এবং মহান সুলায়মান (রাজত্বকাল ১৫২০-৬৬) -এর আমলে চিত্রকলা, স্থাপত্য এবং গ্রন্থ অলংকরণ শিল্প উৎকর্ষতার তুঙ্গে ওঠে। সুলায়মানের নাম উচ্চারণের পাশাপাশি উচ্চারিত হতো স্থাপত্যশিল্পী সিনানের নাম। সিনান বাইজান্তাইন স্থাপত্যরীতির সঙ্গে ইসলামিক স্থাপত্যরীতির সমন্বয় ঘটিয়ে উদ্ভাবন করেন এক অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত স্থাপত্যকলা। এই রীতির ভিত্তিতে প্রাচীন কন্‌স্ট্যান্টিনোপলে তথা ইস্তাম্বুল শহরে তিনি নির্মাণ করেন অনেক অতুলনীয় অলংকরণখচিত ইমারত। এই স্থাপত্যের অনন্য সুষমার মধ্যে অমর হয়ে আছেন সিনান। তাঁর রচিত কীর্তিমালা সৌকর্যের দিক থেকে অতিক্রম করে যায় পূর্বেকার গ্রিকো-রোমান এবং বাইজান্তাইন স্থাপত্যকলাকে।

চিত্রশিল্প এবং গ্রন্থ অলংকরণের ক্ষেত্রেও উস্‌মানীয় তুর্কি সম্রাট সুলায়মান দ্য গ্রেটের আমল ছিলো এক সোনালি যুগ। তাঁর সময়ে ইবনে সিনার চিকিৎসা শাস্ত্র, আবু রশিদের ভেষজবিদ্যার ও নিউপ্ল্যাটোনিক দর্শনের পাঠ্যপুস্তক, আল-ইদ্রিসির ভূগোল, পর্যটক সুলায়মানের ভ্রমণ বৃত্তান্ত এবং অন্যান্য বিখ্যাত গ্রন্থ শোভিত করা হয় গ্রাফিক চিত্রে। ইস্তাম্বুলের বিশাল লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে চিত্রখচিত এসব দুর্লভ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি। বাবুরের পূর্বপুরুষ তৈমুরও (১৩৩৫-১৪০৬) ছিলেন তুর্কি রক্তধারার লোক। তিনি নিজেকে মঙ্গোলীয় বিজেতা চেঙ্গিজ খানের বংশধর বলে দাবি করতেন। স্বভাবে অনেকটা চেঙ্গিজের মতন নিষ্ঠুর হলেও শিল্পকলা, স্থাপত্য, সংস্কৃতি এবং কাব্য-সাহিত্যের একজন উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তৈমুর। তিনি খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ অব্দে নির্মিত এশিয়ার প্রাচীনতম সভ্যতার লীলাভূমি আফ্‌রাসিয়াব শহরের ধ্বংসস্তূপের পাশে নির্মাণ করেছিলেন নতুন সমরকন্দ। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ অব্দে সমরকন্দ দখল করেছিলেন আলেকজান্দার। তখন গ্রিকদের কাছে সমরকন্দের নাম ছিলো মারাকান্দা। চীনের ইয়াংসি নদীর তীর থেকে বিস্তৃত হয়ে প্রাচীন রেশম সড়ক তথা সিল্ক রোড সমরকন্দ ছুঁয়ে ককেশাস পর্বতমালার মাঝখান দিয়ে গিয়ে পৌঁছেছে ভূমধ্যসাগর তীরে।

প্রাচীনকালে এশিয়া-ইউরোপের বাণিজ্যিক সভ্যতা এবং আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির মিলনকেন্দ্র ছিলো রেশম সড়কের স্নায়ুতন্ত্রীর শহর সমরকন্দ। চেঙ্গিজ খান, রুশ বিজেতা আইভান (আইভান দ্য ক্রুয়েল), পিটার দা গ্রেট এবং আরো অনেক। দিগ্বিজয়ীর হাতে বার বার ধবংস হয় এই শহর। চতুর্দশ শতকের মধ্যপর্বে তৈমুর শহরটিকে নতুন করে গড়ে তোলেন তার ধ্বংসস্তূপের ওপর। তিনি একে নয়নমুগ্ধ করে তোলেন অপূর্ব সুন্দর সৌধমালায় আর পুষ্পশোভিত সবুজ উদ্যানে। এখানেই স্থাপিত হয় তাঁর সাম্রাজ্যের রাজধানী।

চীনের পর খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে সমরকন্দেই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো কাগজকল আর কাঠের ফলকের ছাপমুদ্রাযন্ত্র অর্থাৎ ছাপাখানা। আধুনিক যুগের ট্রেডল মেশিনের

www.pathagar.com

মতন এসব ছাপাখানার হরফ অংকিত ফলকে একটা চাপ দিয়ে ছাপা হতো বইয়ের একটা করে পৃষ্ঠা। কাগজকল আর ছাপাখানা স্থাপিত হওয়ায় প্রকাশনা শিল্পের অগ্রচারণের ভূমিকা পালন করেছিলো সমরকন্দ। এই শহরের ছাপাখানাগুলো থেকে মধ্যযুগের গোড়ার দিকে সরকারের নোটিফিকেশন এবং এক ধরনের তথ্য বিবরণী জাতীয় সংবাদপত্রও ছাপা হতো বলে জানা যায়।

জ্ঞানী-বিজ্ঞানী, লেখক-কবি, চিত্রশিল্পী আর স্থাপত্য শিল্পীদের মিলনকেন্দ্র হয়ে ওঠে তৈমুরের রাজধানী সমরকন্দ। পাশেই ছিলো জ্ঞানের আরেকটি পীঠস্থান বোখারা শহর। কবি হাফিজ তাঁর একটি আবেগাত্মক কবিতায় তাঁর প্রিয়ার গালের একটি তিলের জন্যে বিলিয়ে দিতে চেয়েছিলেন এই দুই বিখ্যাত শহরকে। লোকের মুখে-মুখে ফিরতে-ফিরতে একদিন তৈমুরের কানে গেলো এই পংক্তিমালার কথা। তৈমুর সমরকন্দে ডেকে পাঠালেন হাফিজকে। বললেন, এই দুই শহর জয় করে নিতে আর গড়ে তুলতে আমাকে অনেক ক্ষয়ক্ষতি পোহাতে হয়েছে। খরচ করতে হয়েছে অপরিমেয় সোনাদানা। আর তুমি কিনা এক নারীর সামান্য একটি তিলের জন্যে বিলিয়ে দিতে চাও আমার এত কষ্টের অমন দুটো মনোরম শহর ! পরে মৌখিক ভয় দেখিয়ে বললেন, এত বড়ো সাহস হলো তোমার কেমন করে? আসলে হাফিজের কবিতায় অভিভূত হয়েছিলেন তৈমুর। তিনি তাঁকে কাছে এনে খতিয়ে দেখতে চেয়েছিলেন তাঁর প্রজ্ঞা। একটু শংকিত হলেও হাফিজ বুদ্ধি খাটিয়ে বলেছিলেনঃ আমি তো সামান্য এক কবি মাত্র ! দিন ভিক্ষা করে তনু রক্ষা করি। ফকিরের কী আসে যায় মুখের কথায় সারাটা দুনিয়া বিলিয়ে দিতে। আমার মতন একটি ক্ষুদ্র লোক বিশ্বজয়ী একজন রাজার কষ্ট কেমন করে বুঝবে? রাজ্যের দামই-বা কেমন করে পরখ করবে সর্বহারা এক ফকির। তাই আবেগ তাড়িত হয়ে বিলাতে চেয়েছিলাম আমি আপনার প্রিয় দুই শহর। আরো বললেনঃ আবেগ তো আবেগই হে মহামান্য।

হাফিজের বাকচাতুর্যে খুশি হলেন তৈমুর। বিদায়ের সময় এক তোড়া স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে পুরস্কৃত করলেন কবিকে। হেসে বললেন, অতো বড়ো দরাজ-দিল আর হয়ো না কবি। তাহলে তো গোটা সাম্রাজ্যটাই আমার বিক্রি হয়ে যাবে পানির দামে।

সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিনের চিত্রশোভিত সংবাদপত্রের প্রতি অনুরাগের কথা বলতে গিয়ে বলে ফেললাম অনেক কথা। ১৯৫৪ থেকে '৬০ সাল পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলাম আমি 'সওগাত'-এর। সেই সুবাদে খুব কাছাকাছি ছিলাম তাঁর। তিনি প্রায়ই অবসর সময়ে বলতেন তাঁর অতীত দিনগুলোর গল্প। একবার বললেনঃ 'নারী-পুরুষের ফটো আর শিল্পীর অংকিত চিত্র ছাপবার ব্যাপারে যুক্তি দিয়ে 'সওগাতে' প্রবন্ধ ছাপলেও গোঁড়ারা তাতে কান দিলো না। একবার কলকাতার এক গলিতে একা পেয়ে আমার কপাল ফাটিয়ে দিলো লাঠি মেরে। তারপরও দমাতে পারলো না তারা আমায়। সামনে এগোতেই থাকলাম আমি।'

এই সাহসী সম্পাদকের কাছে আমাদের সাংবাদিক সমাজের ঋণ অপরিশোধ্য। তাঁকে কখনো আমরা ভুলতে পারবো না। মনীষার নগরী সমরকন্দ ভ্রমণের কথা

www.pathagar.com

এখন থাক। পরে বলবো এ কাহিনী।

সত্তরের দশকটা কম ঘটনাবহুল ছিলো না তার আগের তিন দশকের তুলনায়। এ সময় আরো অনেক পাল্টে গেলো পৃথিবীর চেহারা। রদবদল হলো মানচিত্রে। শেকল ভাঙার গান গেয়ে স্বাধীন হলো এশিয়া-আফ্রিকা আর প্যাসিফিক-আটলান্টিকের আরো নতুন নতুন দেশ। এ দশকের সবচেয়ে বড়ো ঘটনা ছিলা বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম। এবং পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে তার সাড়া জাগানো অভ্যুদয়।

কবি সুকান্ত ছিলেন এই সংগ্রামী এবং অপরাজেয় বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা। তিনি ছিলেন আমাদের সমসাময়িক। তাঁর জন্ম ১৯২৬-এর পনেরো আগস্ট। আর আমার ১৯২৮-এর আটাশ মে। আমার চেয়ে পৌনে দুই বছরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন চল্লিশ দশকের বিদ্রোহী কিশোর-কবি সুকান্ত। সে সময় গোগ্রাসে তাঁর কবিতা পড়তাম 'জনযুদ্ধ' এবং 'স্বাধীনতা' পত্রিকায়। দুটো কাগজই বেরিয়েছিলো অবিভক্ত বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে। চল্লিশে বিশ্বযুদ্ধের তাণ্ডব এবং তেতাল্লিশে মন্বন্তরের মরণ-ছোবলের মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠছিলাম আমরা।

যুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষে ঝাঁঝরা হলেও মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়িয়ে থেকেছিলো বাংলাদেশ। যুদ্ধের খরচ যোগান দিতে গিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে নিঃশেষ করে চলছিলো ব্রিটিশ সরকার। দুই হাতে মোক্ষণ করছিলো তার বুকের রক্ত। তারপরও মাথা নোয়ানো যায়নি তার। আগের বছর হলো আগস্ট বিপ্লব। হলো কুইট-ইণ্ডিয়া মুভমেন্ট তথা 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলন। যুদ্ধের সময় স্বাধীনতার উৎক্ষেপে গদি কেঁপে উঠলো ব্রিটিশ রাজের। আন্দোলন দমানোর জন্যে হানা দেয়া হলো ঘরে ঘরে। জেলে ভরা হলো এক লাখের বেশি স্বাধীনতাকামী রাজনীতিক আর তরুণ-তরুণীকে। ব্রিটিশ-বিরোধী মুক্তিসংগ্রামের লক্ষ্য নিয়ে একদিন রাতের অন্ধকারে দেশত্যাগ করলেন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু। সিঙ্গাপুরে গিয়ে গড়ে তুললেন আজাদ হিন্দু ফৌজ।

দুর্ভিক্ষে লাশ-হওয়া মানুষের কংকালের ওপর দিয়ে চললো ব্রিটিশের যুদ্ধের অভিযান। মৃত মানুষের হাড় গুঁড়িয়ে চললো ট্যাংক, সাঁজোয়া যানের বহর। কিন্তু সেই বিচূর্ণ হাড়ের ভেতর থেকে জ্বলতে থাকলো আগুন। জ্বলে উঠলো প্রতিরোধের দাবানল। কোটি শিখা হয়ে দিকে দিকে-জ্বললো স্বাধীনতার মশাল। সেদিনকার সেই নবজাগ্রত বাংলাদেশকে বিপ্লবী কবি সুকান্ত দেখেছেন তার তিমির-বিদারী উদার-অভ্যুদয়ের এক রক্তিম সূর্যালোকে। 'দুর্মর' শিরোনামের কবিতায় এই জাগরণকে নন্দিত করে তিনি লিখলেনঃ 'হিমালয় থেকে সুন্দরবন হঠাৎ বাংলাদেশ, কেঁপে কেঁপে ওঠে পদ্মার উচ্ছ্বাসে; সেই কোলাহলে রুদ্ধস্বরের আমি পাই উদ্দেশ্য। জলে ও মাটিতে ভাঙনের বেগ আসে।'

এরপরের স্তবকে লিখলেনঃ 'হঠাৎ নিরীহ মাটিতে কখন, জন্ম নিয়েছে সচেতনতার ধান; গত আকালের মৃত্যুকে মুছে-আবার এসেছে বাংলাদেশের প্রাণ।'

www.pathagar.com

শেষে রক্তের হরফে আগাম বিজয়ের ঘোষণা রাখলেন বিপ্লবী তরুণ কবিঃ 'সাবাস, বাংলাদেশ, এ পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়ঃ জ্বলে-পুড়ে ছারখার তবু মাথা নোয়াবার নয়। ......এবার লোকের ঘরে-ঘরে যাবে সোনালি-নয়তো রক্তে রঙিন ধান। দেখবে সকলে সেখানে জ্বলছে দাউ দাউ করে বাংলাদেশের প্রাণ।'

চল্লিশ দশকের শেষ দিকে এই কথাগুলো উচ্চারণ করেছিলেন সুকান্ত ভবিতব্যের মতো। দুই দশক পরে সত্তরে এসে জ্বলে-পুড়ে ছারখার হওয়া বাংলাদেশের মাঠ থেকে আমরা তুলেছি স্বাধীনতার সোনালি ফসল। একথা ঠিক সেই ফসল ছিলো রক্তধোয়া। কারণ ত্রিশ লাখ শহীদের খুনে রাঙ্গা ছিলো আমাদের মাঠের সেই ধান। কিন্তু কেন অমন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো বাংলাদেশের গোটা প্রাণ? কেন অমন ঘরে-ঘরে গড়ে উঠলো এত রণাঙ্গন? এবং কেন এত রক্ত বিসর্জন? সুকান্ত সেদিন এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন এই 'ছাড়পত্রের' পংক্তিমালায়ঃ 'এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান; জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ পিঠে-চলে যেতে হবে আমাদের। চলে যাবো- তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ; প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল।

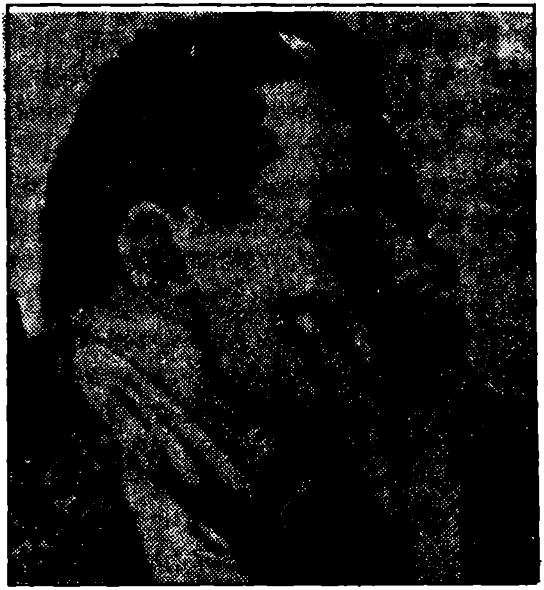

ম্যাক্সিম গোর্কি

অঙ্গীকার ঘোষণা করলেনঃ 'এ-বিশ্বকে এ-শিশুর বাসযোগ্য করে যাবো আমি; নবজাতকের কাছে আমার দৃঢ় অঙ্গীকার। অবশেষে সব কাজ সেরে, আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুরে- করে যাবো আর্শীবাদ। তারপর হবো ইতিহাস।'

কী আশ্চর্য মিল সুকান্তর এই পংক্তিগুলোর সঙ্গে সত্তর দশকের স্বাধীনতা যুদ্ধের কবির। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাণে আগামী দিনের শিশুদের জন্যে নিরাপদ-ভবিষ্যৎ রচনার প্রত্যয় জাগিয়ে তুললেন এই নতুন সংগ্রামের কবি। উচ্চকিত স্বরে গাইলেনঃ 'একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে আমরা যুদ্ধ করি; একটি শিশুর মুখে হাসি ফোটাবো বলে আমরা যুদ্ধ করি।'

www.pathagar.com

মহৎ কবিরা আগামী দিনকে ধারণ করেন তাঁদের অনুভবে। তাঁদের ধ্যানে এবং চিন্তায়। যেমন দিব্য চোখে ভবিষ্যতের এক উজ্জ্বল পৃথিবীর রূপ অবলোকন করেছিলেন শেক্সপীয়র, মিল্টন আর অকাল-পরলোকগত শেলী এবং কীট্‌স। মিল্টন স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের জন্যে অহোরাত্র কলমযুদ্ধে নিয়োজিত থেকে হারিয়েছিলেন দুই চোখের দৃষ্টি। স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটার পর একটা প্রচারপত্র লিখতে গিয়ে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন অল্প বয়সে। 'প্রমিথিয়ুস আনবাউন্ড' (Prometheus Unbound) - এর মতো পরাধীনতাবিরোধী কবিতা লিখতে গিয়ে সীমাহীন যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন বিদ্রোহী কবি শেলী (১৭৯২-১৮২২)। শেষে মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে বিদেশের মাটিতে আত্মবিসর্জন দিতে হলো তাঁকে। কিন্তু ব্যর্থ হয়নি তাঁর কবিতার উচ্চারণ। কবি দেখে যেতে না পারলেও তাঁর মৃত্যুর এক শতাব্দীর ব্যবধানে সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলো তাঁর স্বদেশে। গ্রন্থিমোচন ঘটলো গণতন্ত্র আর মুক্তবুদ্ধির।

প্রেম এবং নিসর্গ সৌন্দর্যের এক অসাধারণ রূপকার হলেও জন কীট্‌স (১৭৯৫-১৮২১) ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম মানবতাবাদী কবিদের একজন। যেমন ছিলেন বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল এবং সুকান্ত। কীট্‌স-এর বিখ্যাত 'লামিয়া' (Lamia) আর 'ফার্স্ট লুকিং অন চ্যাপম্যান্স হোমার' কবিতায় রয়েছে এর উচ্চকিত প্রতিফলন। শেলী এবং কীট্‌স দু'জনের কবিতাই আত্মস্থ করেছিলেন সুকান্ত তাঁর স্কুল জীবনে। দু'জনেরই একান্ত অনুরাগী ছিলেন তিনি।

অবাক হওয়ার মতো ঘটনা হলো, বাংলা কাব্যের শরীরে ব্যতিক্রমী এক বিদ্রোহের সুর সঞ্চারিত করে শেলী এবং কীট্‌স-এর মতো অকাল-প্রয়াত হলেন এই তরুণ সাম্যবাদী কবি। কীট্‌স ছিলেন পা থেকে মাথা পর্যন্ত একজন মানব প্রেমিক। পরের দুঃখে যন্ত্রণাক্লিষ্ট হতো তাঁর প্রাণ। রুগ্ন-পীড়িতের পাশে ছুটে যেতেন তিনি। এভাবে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত এক রোগীর সেবা করতে গিয়ে কবিও সংক্রমিত হলেন সেকালের দুরারোগ্য এই কালান্তর ব্যাধিতে। চল্লিশ দশকের কিশোর সুকান্তকেও দেখতে পাওয়া যায় দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে। তাঁর গঠিত 'কিশোর বাহিনীর' সদস্যদের কাজ ছিলো আর্ত-দুর্গতজনের সেবা। আর যুদ্ধের বিরুদ্ধে কিশোরদের সংগঠিত করা। এ সময়ে তিনি এক কবিতায় উচ্চারণ করলেনঃ 'বেজে উঠলো কী সময়ের ঘড়ি? এসো তবে আজ বিদ্রোহ করি। .... পরের জন্যে করেছি যুদ্ধ অনেক, এবার যুদ্ধ তোমার আর আমার জন্যে।'

যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে কীট্‌স মারা গেলেন ছাব্বিশ বছর বয়েসে। সুকান্তও যক্ষ্মায় ধুঁকে ধুঁকে মরলেন পঁচিশে পা রেখে। কীট্‌স জানতেন মৃত্যু তাঁর ছায়াসঙ্গী। যে-কোনো সময় ঢলে পড়বেন তিনি তাঁর শীতল বাহুর পেষণে। কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন এই সুন্দর পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে। তাই মৃত্যুচিন্তা তাঁকে ক্লিষ্ট করে তুললো। তিনি লিখলেনঃ 'আমি আতংকিত হই যখন ভাবি আমি আর থাকবো না' (When I have fears that I may cease to be')। যক্ষ্মাগ্রস্ত সুকান্তও মৃত্যুচিন্তায়

www.pathagar.com

যাতনাবোধ করেছিলেন। কীট্স-এর মতন তিনিও লিখলেনঃ 'বাঁশি তোমার বাজাও বন্ধু আমার মরণকালে। মরণ আমার আসুক আজি বাঁশির তালে-তালে।...... ডেকো না গো তোমরা আমার চলে যাবার বেলা।'

রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন দীর্ঘায়ু। তবু তাঁর সাধ ছিলো আরো বেঁচে থাকবার। স্বাধীনতাকে দুই চোখ ভরে দেখে যাবার। বোধকরি তার জন্যেই তিনি লিখেছিলেনঃ 'মরিতে চাই না আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাহি।' বিশ্বকবি তাঁর এ-প্রত্যাশার মধ্য দিয়ে মানুষের আত্মার আর্তিকে এক শাশ্বত-সত্যের মতো ধ্বনিত করেছেন কুম্ভকণ্ঠে।

রাশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি আলেকজান্দার পুশকিনও (১৭৯৯-১৮৩৭) চেয়েছিলেন আয়ুষ্মান হতে। কিন্তু মাত্র আটত্রিশ বছরে মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হলো তাঁকে। তাঁর অতুলনীয় বিপ্লবাত্মক কবিতা 'স্বাধীনতার গান'(Ode to Liberty) এবং ককেশাস-এর বন্দী (The Prisoner of the Caucasus) এবং 'রুসলান ও লুডমিলা' কাব্যে তিনি চেয়েছিলেন স্বাধীন সত্তা নিয়ে বেঁচে থাকতে নিসর্গের অপার সৌন্দর্যের মধ্যে।

ককেশাস পর্বতমালার প্রাকৃতিক উদ্যানখচিত উপত্যকা, তুষার-মৌলি আর খরস্রোতা রূপালি নদী বিমুগ্ধ করেছিলো কবিচিত্তকে। একইভাবে তাঁকে বিমোহিত করেছিলো কৃষ্ণসাগর তটের ক্রিমিয়া উপদ্বীপের চিরহরিৎ বৃক্ষকুঞ্জখচিত উদ্যানমালা। যেখানে আছে ইয়াল্টা, সসি আর সেভাস্তপোলের মতন মনোরম নগর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফ্যাসিস্ট অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধরত মিত্রশক্তিপুঞ্জের শীর্ষ সম্মেলন হয়েছিলো ইয়াল্টা শহরে। ইয়াল্টার সঙ্গে সেই চল্লিশ দশক থেকেই সংবাদপত্রের হেডলাইন নিউজের সুবাদে আমাদের পরিচয়।

'স্বাধীনতার গান' এবং অন্যান্য বিপ্লবাত্মক কবিতার জন্যে ১৮২০ সালে একুশ বছর বয়সে পুশকিনকে নির্বাসন দেয়া হয়েছিলো ককেশাস অঞ্চলে। অমর রুশ কথাশিল্পী এবং দার্শনিক লিও টলস্টয় (১৮২৮-১৯১০)-কেও অভিভূত করে ককেশাসের সৌন্দর্য আর ককেশাসবাসীদের বীরত্ব। 'হাজী মুরাদ' উপন্যাসে তিনি তুলে ধরেছিলেন ককেশান তথা কশাস্কদের বীরত্বগাঁথা। 'ওয়ার অ্যান্ড পীস্' (War and Peace) তাঁর বিশ্বখ্যাত উপন্যাস। রুশ সাহিত্যের এটি সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এই উপন্যাসে যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির বিজয় ঘোষণা করেছেন মহাত্মা গান্ধীর অহিংস সত্যাগ্রহের গুরু টলস্টয়।

বিপ্লব যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ রুশ কথাশিল্পী ম্যাক্সিম গোর্কিও (১৮৬৮-১৯৩৬) তাঁর বিখ্যাত 'মাদার' (মা) উপন্যাসে তুলে ধরেছেন উৎপীড়ক শক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতার শক্তি আর লাঞ্ছিত -বঞ্চিত মেহনতি মানুষের বিজয়।

পুশকিন, টলস্টয় আর গোর্কির দেশ সফরের আমন্ত্রণ পেলাম ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে। মনটা ভরে উঠলো আনন্দে। স্বাধীন বাংলাদেশের একদল সাংবাদিক প্রথম শুভেচ্ছা সফরের সুযোগ পেলেন সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে।

www.pathagar.com

আমার জীবন-বৃক্ষ থেকে ঝরে গেলো আরেকটি বছর। আরো বর্ষীয়ান হয়ে পড়লাম উনিশ শ আটানব্বইয়ের এই জানুয়ারিতে। আর কটি সিঁড়ি সামনে আছে জানি না। এই মুহূর্তে মনে পড়ছে তেইশ বছর আগেকার আরেকটি জানুয়ারির কথা। তখনো পৌষের শীত ছিলো। কিন্তু ক্লান্তির কাছে অমন করে নতজানু হইনি। একবারও বলতে হয়নি 'ক্লান্তি আমায় ক্ষমা করো প্রভু।' বরং শীতকে চোখ রাঙিয়ে অবলীলায় ভেঙে চলছিলাম একটার পর একটা সিঁড়ি। যৌবনে ভাটার টান পড়লেও তখনো মনে হয়নি বুড়িয়ে যাবো আর কয়েকটা শীতের পরেই।

সেবার জানুয়ারিতে একদিন গিয়েছিলাম মিরপুর চিড়িয়াখানায়। বিকেলে দক্ষিণের লেকটায় দেখলাম সাইবেরিয়ান হাঁসেদের মেলা। আসর জমিয়ে গোটা তল্লাটটাকে বিচিত্র কলতানে মুখর করে তুলছিলো হাজার কয়েক রাজহাঁস এবং বালিহাঁস। আরো নানান জাতের পাখি ছিলো এদের ক্লাসিক্যাল মিউজিকের জলসায়। চোখ ফেরাতে পারছিলাম না এই হংস মিথুনদের বাহারি ডানার জৌলুস দেখে। সাদার সংগে হলুদ, কালোর সংগে লাল আর নীলের সংগে জাফরানির কি বর্ণাঢ্য এক সমাহার-ই না ছিলো। মাথার মুকুট আর ঠোঁটের রঙেও ছিলো এদের বর্ণধনুর লীলা।

একবার এক বিদেশি জাদুঘরে দেখেছিলাম বিশ্বখ্যাত ফরাসি শিল্পী ফাঁসওয়া রাফায়েলের আঁকা দুর্লভ কয়েকটি পাখির ছবি। তাঁর জাদুময় তুলির ছোঁয়ায় জীবন্ত মনে হচ্ছিলো সবকটি ছবিকে। যেনো ছুঁলেই ওরা নড়ে উঠবে এবং ডানা মেলে দেবে। নৈসর্গিক রঙের নিখুঁত সুষমা ফুটিয়ে তুলতে জুড়ি ছিলো না এই প্রকৃতি-প্রেমিক শিল্পীর।

মিরপুর লেকে কূজনরত হাঁসগুলোকে দেখে সেদিন আমার মনে হলো রাফায়েলের ছবির কথা। যেনো বাংলাদেশের দৃশ্যপটকে সামনে রেখে তিনি রাশিয়ার সাইবেরিয়া থেকে এদের তুলে এনেছেন আমাদের শাপলা আর কলমি বন ঘেরা ছোটো একটি বিলে। জানতাম সাইবেরিয়ার বৈকাল হ্রদ এই হাঁসেদের দেশ। বছরের আট মাস এরা কাটায় সেখানে। বাকি চারমাস বঙ্গোপসাগরের উপকূলে। আমাদের নদী, হাওড় আর বিলগুলো হয় তখন এদের আস্তানা। ছোটো বেলায় লক্ষ্মীপুর এবং ভোলার দক্ষিণে কার্তিক অর্থাৎ অক্টোবর এলেই দেখতাম মেঘনার মোহনায় রৌদ্রস্নান করতে এসেছে ঝাঁকে ঝাঁকে সাইবেরিয়ান বেলেহাঁস। শরৎ শেষ হতেই আকাশে শোনা যেতো এদের ডানার শাঁ-শাঁ শব্দ। আমাদের ওদিককার লোকেরা বেলেহাঁসকে বলে বাইদ্যা হাঁস। লোকজ 'বাইদ্যা' কথাটির মানে বাজনদার। এদের ডানা থেকে কাঁসর-ঘন্টার দূরাগত ধ্বনির মতন বাজনার শব্দ শোনা যায় বলে এই হাঁসেদের স্থানীয় নাম হয়েছে বাইদ্যা হাঁস।

আকাশের অনেক উঁচু দিয়ে চক্রাকারে উড়ে চলতো এরা। গন্তব্যের কাছাকাছি এলে আস্তে-আস্তে নিচে নামতে থাকতো ডানা গুটিয়ে। ঝাঁকের একেবারে সামনের পাখিটা ছিলো দলপতি। শিকারীদের মুখে শুনেছি- দলপতির যেমন আছে আমাদের এই মৃদু আবহাওয়ার দেশ সফরের পুরনো অভিজ্ঞতা তেমনি আছে তার টনটনে

www.pathagar.com

নিরাপত্তা-জ্ঞান। এখানকার কোনো নদী কিংবা হাওড়ে লোকের বেশি আনাগোনা দেখলে আকাশের মাথায় এসেই সতর্ক সংকেত দিতো সে। তারপর মোড় ঘুরে পুরো দলটাকে নিয়ে যেতো অন্য কোনো জায়গায়। যেখানে ভয় নেই শিকারীর হাতে বেঘোরে মারা পড়বার।

কিন্তু এত সতর্কতার পরও প্রকৃতির এই নিরীহ সন্তানেরা বিভ্রান্ত হতো। হাওড়ের কচুরিপানার স্তূপের আড়ালে লুকিয়ে থেকে বন্দুকের গুলিতে এদের প্রাণ সংহার করতো ঘাতক-শিকারীর দল। শীতের কুয়াশায় জালের ফাঁদ পেতে শিকারীরা জীবন্ত বন্দী করতো শয়ে-শয়ে বালিহাঁস। আমি অনেক সারস, রাজহাঁস, চখাচখি আর নীলম হাঁসকে দেখেছি ফাঁদে আটকা পড়ে ছটফট করতে। এদের কালো চোখে যে-করুণ চাহনি ফুটে উঠতো তা আমার স্মৃতিকে আজও নাড়া দেয় ; অথচ দেখতাম কী অপার আনন্দেই-না এদের মাংসে ভূরি ভোজের উৎসব করতেন গর্বিত শিকারী আর তাদের অভ্যাগতের দল। শিকার এদের কাছে এক দুরন্ত নেশা। এদের এই উগ্র উন্মাদনার কবলে পড়ে আজ পৃথিবীর বুক থেকে নির্বংশ হয়ে যেতে বসেছে পশু-পাখি সবই। নিঃশেষ হয়ে চলেছে ঘন নিবিড় সব অরণ্য, তরুলতা এবংসবুজের সমস্ত দৃশ্যপট।

ব্রিটিশ যুগে দশম শ্রেণীর বাংলা সাহিত্য পুস্তকে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পালামৌ' ভ্রমণ কাহিনীটি পড়েছিলাম সেখানকার অরণ্যের শ্যামল সুবাস বুকের ভেতর টেনে নিয়ে। পালামৌর বনে নিরাপদে চরে বেড়াতো হরিণ শিশুরা। হ্রদের বুকে আনন্দে সাঁতার কাটতো বুনো পাখিরা। এখানে-ওখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিলো সাঁওতালদের কুঁড়েঘর। তারাও একাকার হয়ে গিয়েছিলো প্রকৃতির সংগে। বনের পশুপাখিরা ছিলো এই অরণ্যচারী আদিবাসীদের নিত্য সহচর। যেনো সবাই এরা ছিলো প্রকৃতির আপন ঘরের সন্তান।

পালামৌর প্রাণিকুল আর তার আদিম মানবের সখ্যতার এই বিরল সৌন্দর্যে অভিভূত হয়েছিলেন সঞ্জীবচন্দ্র। তাই ভ্রমণ বৃত্তান্তের এক জায়গায় তিনি লিখেছিলেনঃ 'পালামৌ দেখে আমার মনে হয়েছে সত্যি বন্যেরা বনে সুন্দর যেমন শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।' উক্তিটির ব্যাখ্যা আসতো আমাদের প্রায় প্রতিটি পরীক্ষায়। প্রশ্নোত্তরের শুরুর অংশে গতানুগতিক নিয়মে বেশ কিছু বাক্য খরচের পর উপসংহারে লিখতামঃ বনবাসীদের বনের পরিবেশেই মানায় বেশি। আর মায়ের কোলেই তো মানায় শিশুদের।

লেখকের এ উক্তিটি ছিলো একটি প্রবাদ বাক্যতুল্য। কতোবার যে এটি আওড়িয়েছি তার হিসেব নেই। আজো এর অনুকরণ অনুভব করি যখন কথাটা ভাবতে বসি। কিন্তু প্রকৃতির এ সৌন্দর্য আজ কোথায়? সবই তো তার লোপাট করেছে মানব বংশধরেরা। নিজের হাতে নিজের বাসস্থানকেই তারা নরক বানিয়ে তুলেছে। যেখানে আজ শোনা যায় না পাখির গান। বৃক্ষ ঘাতকদের অনাচারে বেশিরভাগ বনই তো উজাড়। যেখানে আর চরতে দেখা যায় না হরিণ শাবকদের। সবুজ আর সুন্দর বলতে যা-কিছু ছিলো একে-একে সবই মানুষের ছুরিকাঘাতে

www.pathagar.com

রক্তাক্ত এবং বিবর্ণ হয়েছে। এরপর আর কোন গ্রহে স্থান হবে আমাদের ? কোথায় পালিয়ে গিয়ে বাঁচবো আমরা।

সমাজবেত্তারা বলেন, প্রাণিকুলের মধ্যে মানুষই হলো সব থেকে হিংস্র এবং নিষ্ঠুর। পেট-ভরা থাকলে হাতের নাগালে পেলেও সিংহ তার খাদ্যের জন্য বাড়তি কোনো প্রাণী হত্যা করে না। যে-ভয়ংকর রয়্যাল-বেঙ্গল টাইগার সে-ও নাকি উদর পূর্তির পর আর উচ্চবাচ্য করে না। টানা ঘুম দেয় দিনভর। আর মানুষ ? তার লোভের শেষ কখনো হয়নি। ক্ষমতার চূড়ায় উঠেও সে চেয়েছে আকাশকে টেনে নিয়ে এসে নিজের পায়ের কাছে বসাতে। লোভের এ নেশায় পড়ে আদিমকাল থেকে শুরু করে বিশ শতকের এই বিদায়-পর্ব পর্যন্ত সে যুদ্ধ করে চলেছে অনবরত।

ঐতিহাসিকদের হিসেবে দেখা যায়- খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ অব্দ থেকে খ্রিস্টীয় এই ১৯৯৮ সালের জানুয়ারির পূর্ব পর্যন্ত মোট ছয় হাজার বছরে পৃথিবীতে বড়ো ধরনের যুদ্ধ হয়েছে দেড় লাখের মতো। এর মধ্যে কোনো কোনো যুদ্ধ চলেছে একটানা চারশ বছর। যেমন ক্রুসেড যুদ্ধ। খ্রিস্টপূর্ব যুগে রোম এবং কার্থেজের মধ্যে পিউনিক - ওয়ার চলেছে থেমে থেমে প্রায় তিনশ বছর। মধ্যযুগে ইউরোপে হয়েছে শতবর্ষের যুদ্ধ এবং ৩০ বছর স্থায়ী ওয়ার অভ্ রোজেজ (War of Roses) তথা গোলাপের যুদ্ধ। উনিশ শতকের গোড়াতে হয়েছে একযুগ স্থায়ী নেপোলিয়নিক ওয়ারস (Napoleonic Wars /1803-15)। যার মধ্যে ছিলো ফ্রাংকো -রাশিয়ান যুদ্ধ।

আমাদের প্রায় বিদায় নিতে-যাওয়া এই বিশ শতকে হয়েছে দুই-দুটি বিশ্বযুদ্ধ। মাঝখানে হয়েছে রক্তক্ষয়ী কোরিয়ান যুদ্ধ, তিন-তিনটি আরব-ইসরাইল যুদ্ধ এবং দেড় যুগ স্থায়ী ভিয়েতনাম যুদ্ধ। তাম্রযুগ এবং আজকের মহাশূন্য যুগের মাঝখানে বড়ো যুদ্ধগুলো ছাড়াও দেশে-দেশে আর জাতিতে জাতিতে হয়েছে আরো বেশুমার যুদ্ধ। অংকের হিসাবে কয়েক লাখ হবে এসব যুদ্ধের সংখ্যা। জাতিগত এবং বর্ণগত দাঙ্গার সংখ্যা তো হিসাবের বাইরে। মানুষের জিঘাংসায় এতোসব যুদ্ধ এবং হানাহানিতে নিশ্চিহ্ন হয়েছে দশ কোটিরও বেশি মানুষ। এটা সামরিক গবেষকদের হিসাব।

আর জীবজন্তু, নগর-বন্দর, গ্রামগঞ্জ, ঘরবাড়ি বিনাশের কথা ভাবলে তো রীতিমত শিউরে উঠতে হয়। এর সবই মানুষের অকল্পনীয় দুরাকাঙ্ক্ষা, লোভাতুরতা আর প্রতিহিংসার সাক্ষাৎ ফলশ্রুতি। আইন করে এবং বিবেকের ডাক দিয়েও মানুষকে সংযত করা যায়নি। আর দু-বছর পরেই তো আমরা পা বাড়াচ্ছি একুশ শতকে। এই নতুন শতক শান্তিপ্রিয় মানুষের জন্য কি বার্তা বয়ে আনবে জানি না। বিবেকী মানুষেরা সর্বক্ষণ শুভকর কিছুর চিন্তা করে থাকেন। এখন দুই সুপার পাওয়ারের একটি আর মাঠে নেই। খালি ময়দানে গোলপোস্টে একা একা বল ছুড়ছে প্রতিদ্বন্দ্বীবিহীন একটি মাত্র শীর্ষ শক্তি। আন্তর্জাতিক স্নায়ুযুদ্ধের টানাপোড়েনও আর তেমন নেই। কিন্তু তাহলেও কী শান্তির নাগাল খুঁজে পাবো আমরা? নাকি আগের যুগগুলোর মতোই সোনার হরিণ হয়ে থাকবে সে? এখনো পারমাণবিক বোমার গোপন ভাণ্ডার আছে অনেক দেশের হাতে। আছে আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের

www.pathagar.com

চোখরাঙানো। যদি হিরোশিমা এবং নাগাসাকিকে ধ্বংসস্তূপ বানাবার মতন কোনো নতুন ফ্রাংকেস্টাইন গজিয়ে ওঠে তা হলে তো কবরের শান্তিই হবে আমাদের এই ক্ষয়িত, বিবর্ণ পৃথিবীর বিধিলিপি। চাঁদ, মঙ্গল কিংবা অন্য কোনো গ্রহে গিয়ে আশ্রয় খুঁজবারও তখন আর কারো সুযোগ অথবা সময় থাকবে না।

আমি অতিথি পাখিদের কথায় ফিরে যাচ্ছি। তারা শান্তির সন্ধানে প্রায় নয় হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে আসে আমাদের দেশে। ঘন্টায় ওড়ে ৮০ থেকে একশ মাইল। ক্লান্তিহীন তাদের এ উড়েচলা। নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, বিশ্রাম নেই। শুধু চলা আর চলা। তিন-চার দিনের ব্যবধানে উত্তর মেরুর প্রতিবেশির দেশ সাইবেরিয়া লেকে একেবারে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে এসে ডানা-গোটানো।

এ-যে একবার পাল তুলেই গোটা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করবার মতন ব্যাপার। কিন্তু কেন তাদের এই অক্লান্ত পথ চলা? শুধু কিছু নিরাপদ জলাভূমিতে প্রবাসী হয়ে থাকবার জন্যই তো। মাত্র কয়েকটা মাস আমাদের ঈষৎ-শীতল আর ঈষদুষ্ণ পানিতে শান্তিতে কাটিয়ে যাবার জন্য তাদের এই সুদীর্ঘ ভ্রমণ। কারণ, অক্টোবরে সাইবেরিয়ায় তুষারপাত শুরু হলে তাদের বাসস্থান আর নিরাপদ থাকে না। সাগরের মতন দেখতে চারশ মাইল দীর্ঘ আর ৫০ মাইল চওড়া বিশাল হ্রদ বৈকাল তখন ঢেকে যায় বরফে। রাশিয়ার ভয়ংকর শীত তাদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় তাই তাদের এই গৃহত্যাগ। আর এভাবে তাদের অতিথি হয়ে আসা। আমরা খবর কাগজের পাতায় প্রতি শীত মওসুমেই এই পর্যটক পাখিদের কথা লিখি। তাদের ওপর ঘাতক-মানুষদের অত্যাচার যাতে না হয়, সেই উপদেশও ছুড়তে থাকি। কিন্তু যারা স্বভাবে হিংস্র সেই শান্তির শত্রু তস্করের দল কেন শুনবে ধর্মের কাহিনী? এই জানুয়ারিতে একবার রাজধানী ঢাকার মোড়ে দাঁড়ালেই দেখা যাবে এই ডাকাতদের হাতে বন্দী হয়ে ডানা ঝাপটাচ্ছে কত শত অতিথি পাখি। করুণ চোখ তুলে ধরে মুক্ত বিহংগ হবার আর্তি জানাচ্ছে এই অসহায়েরা। অথচ কত বাহারি রূপই না এদের।

কিন্তু এদের সৌন্দর্যে কার কী আসে-যায়। সন্ত্রাসির ছুরিতে যারা নিজের ভাইয়ের গলা কাটে, কঠোর কুঠারে হত্যা করে আপন প্রকৃতির প্রিয় সন্তানদের- তাদের কাছে কী মূল্য আছে এসব নিরীহ প্রাণের? মরণ ভয়ে তাই এরাও এখন আতংকিত। বাংলাদেশের নদী-হাওড়ে কমে গেছে এদের আনাগোনা। মিরপুর লেকেও এবার আসেনি এরা। এরা দেখছে যেখানে মানুষেরই নিরাপত্তা নেই সেখানে কেমন করে এরা খুঁজে পাবে নিরাপদ আশ্রয়। শান্তি যে দেশে ফেরারি সেখানে আশ্বাস কোথায় নিরাপত্তার?

বোবা প্রাণী হলেও বোধকরি এই নিষ্ঠুর সত্যটা ভালোমতন আঁচ করে নিয়েছে অতিথি পাখিরা। এর জন্যই হয়তো বাংলাদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে শুরু করেছে তারা। অন্য কোনো দেশের নিরাপদ জলাভূমির দিকে এদের চোখ এখন। হয়তো সামনের বছরগুলোতে বিশ্ব পর্যটক এই পাখিদের আর দেখাই পাবো না

www.pathagar.com

আমরা। এদের আনন্দময় সঙ্গীতে আর মুখরিত হবে না সিলেটের হাওড়, বঙ্গোপসাগরের মোহনা-নদী আর ঢাকার ঝিল-বাঁওড়। এমনিতেই আমরা বৃক্ষশূন্য হওয়ার পাশাপাশি প্রায় সবরকম জলচর এবং স্থলচর প্রাণীশূন্য হয়ে পড়েছি। এককালে কোকিলের ডাকে বসন্তের ভোর বেলা ঘুম ভাঙতো আমাদের। বউ-কথা-কও পাখির সুরেলা গলার গানে দূর হতো রোদজ্বলা দুপুরের ক্লান্তি। সকালে বিকেলে ঘুঘুর ডাকে ভরে উঠতো প্রাণ। দোয়েলের শিসে গুলজার হয়ে উঠতো আধো-রাত আধো-আঁধারির স্তব্ধ প্রকৃতি। সন্ধ্যায় তিতিরের কাকলিতে মুখর হতো আকাশ।

এখন খুব কমই এদের দেখা পাওয়া যায়। এক সময় বলাকার ঝাঁক দেখে বিমুগ্ধ হতেন আমাদের কবিরা। অগ্রান-পৌষের ন্যাড়া মাঠ শুভ্রতায় ছেয়ে থাকতো যখন সাদা বকেদের ঝাঁক পড়তো ঝরা-ধান কুড়োতে। এখন কালেভদ্রে পাওয়া যায় এদের সাক্ষাৎ। আমাদের আর সব প্রিয় পাখিও যেন ধর্মঘটে যোগ দিয়েছে। অথবা তাদের উজাড় করেছে ঘাতক শিকারীরা। আমাদের ভোর, দুপুর এবং সন্ধ্যাগুলো এখন নিরানন্দ। কারণ অতিথি পাখি দূরে থাক ঘরোয়া পাখিগুলোও বিমুখ আমাদের প্রতি তারাও দলে দলে পাড়ি জমিয়েছে দূর দেশের অভয় অরণ্যে।

আর কিছু কাল পরে হয়তো দেখবো কোন পাখিই নেই এ-দেশে। যেভাবে বনবাদাড় উজাড় হয়ে চলেছে তাতে সবুজের দেখা পাওয়াই ভার হবে। পাখি কিংবা বন্য প্রাণিকুলের তো কথাই আসে না। 'বন্যেরা বনে সুন্দর' উক্তিটিকে তখন একটা নিষ্ঠুর ঠাট্টা বলে মনে হবে। এসব কথা ভাবলে আমার মনে ভয় হয় স্বভাব-ঘাতক মানুষ হয়তো আগামী দিনের পৃথিবীটাকে আরো অসুন্দর এবং আবাসযোগ্য করে তুলবে।

সে বছর জানুয়ারিতেই হাড়কাঁপানো শীতের মধ্যে হঠাৎ একদিন একটি সুখবর পেলাম। সরকারের প্রধান তথ্য কর্মকর্তা ফোনে খবরটা দিলেন। বললেনঃ তৈরি হয়ে নিন। আপনাকে যেতে হবে সোভিয়েত ইউনিয়ন। ওঁরা আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। একটি শুভেচ্ছা সাংবাদিক প্রতিনিধি দল পাঠাতে বলেছেন ওঁদের তথ্য মন্ত্রণালয়। আপনাকে মনোনীত করেছেন আমাদের সরকার। আপনি হবেন দলের প্রধান। যাত্রার দিন-তারিখ ঠিক হবে মস্কো থেকে গ্রিন-সিগন্যাল আসবার সঙ্গে সঙ্গে। আমরা সফরের দরকারি কাগজপত্র ঠিকঠাক করছি। পারলে আজই আপনার পাসপোর্টখানা পাঠিয়ে দেবেন। হয়তো দু-এক সপ্তাহের মধ্যেই রওয়ানা দিতে হবে।

আনন্দে তক্ষুণি আকাশে ডানা মেলতে ইচ্ছা করলো। এ-যে না চাইতেই তৃষ্ণার্ত চাতকের জন্যে এক পশলা বৃষ্টি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে হিটলারের আগ্রাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে লালফৌজের একটানা অগ্রাভিযান রোমাঞ্চিত করেছিলো আমার কৈশোর অনুভূতিকে। স্তালিনগ্রাদ আর লেনিনগ্রাদের যুদ্ধে যে মরণপণ লড়াই দিয়েছিলো সোভিয়েত মুক্তিযোদ্ধারা, সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় সে সব বীরত্বের কাহিনী পড়ে রক্ত টগবগ করে ফুটতে থাকতো তখন। দু-শ ডিভিশন সেনার এক বিশাল বাহিনী নিয়ে ১৯৪১ সালে রাশিয়াকে বাল্টিক সাগর উপকূল থেকে কৃষ্ণসাগর

www.pathagar.com

তটের ট্রান্স ককেশাস, উত্তর-পুবের উরাল পর্বতমালা থেকে দক্ষিণ-পুবের কাস্পিয়ান উপকূল রেখা পর্যন্ত ঘিরে ফেলেছিলো নাজি কমান্ড। ১৯৪২-৪৩ সালে হানাদার নাজি সেনার সংখ্যা দাঁড়িয়েছিলো বিশ লাখের মতো। এ রকম অপরিমেয় সেনা সমাবেশের কথা আগে কেউ কখনো কল্পনাও করেনি। সমর বিজ্ঞানের ইতিহাসেও এ ছিলো এক অবিশ্বাস্য ঘটনা।

আসলে হিটলার চেয়েছিলেন তিনদিক থেকে একযোগে আক্রমণ করে সোভিয়েত ইউনিয়নকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে বিশ্ব মানচিত্র থেকে একেবারে মুছে ফেলতে। কিন্তু আত্মগর্বী হিটলারের এ স্বপ্নকে দু'বছরের ব্যবধানে দুঃস্বপ্নে পরিণত করেছিলো লালফৌজ। ভল্গা এবং ডন নদীর অববাহিকার বন্দর-নগরী স্তালিনগ্রাদ ছিলো রাশিয়া বিজয়ের জন্যে জার্মানির প্রথম লক্ষ্যবস্তু। ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বরে বাইশ ডিভিশন সৈন্য নিয়ে শহরটিকে ঘিরে ফেলে তারা। জার্মান বাহিনীর সংগে ছিলো ইতালি, হাঙ্গেরি এবং রুমানিয়ার তাঁবেদার ফৌজ। সোভিয়েত জেনারেল চুকভ ষোলো ডিভিশন সেনা নিয়ে এদের মোকাবিলা করলেন। দু'মাস ধরে হাতাহাতি যুদ্ধের পর শহরের একাংশ জার্মানরা দখল করে নিতে পারলেও শেষ পর্যন্ত এক প্রচণ্ড প্রতিরোধযুদ্ধে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় হানাদার বাহিনী। প্রতিরোধে অংশ নিয়েছিলেন নগরের সাধারণ নারী- পুরুষ এবং শিশুরা।

স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধের খবর প্রতিদিনই ফলাও করে বেরুতো স্ট্যাটসম্যান, যুগান্তর, আনন্দবাজার, আজাদ এবং অমৃতবাজারে। এসব খবর পড়ে মনে হতো এভাবে একদিন আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের অবরোধের মুখে ব্রিটিশকেও ছাড়তে হবে ভারত। দুর্ধর্ষ জার্মান বাহিনীকে দুই মাস গণমুক্তি ফৌজের হাতে অবরুদ্ধ হয়ে থাকতে হয় স্তালিনগ্রাদের উপকণ্ঠে। এরই সুযোগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধখ্যাত সোভিয়েত সেনাপতি জেনারেল চুকভ উত্তর এবং দক্ষিণ দিক থেকে দুটি শক্তিশালী রুশ বাহিনী নিয়ে ভল্গা এবং ডন নদীর মাঝখানে মিলিত হয়ে স্যান্ডউইচের মতন পিষে ফেলতে শুরু করেন নাজি বাহিনীকে। কেটে দেয়া হলো তাদের সরবরাহ লাইন। হিটলার তাঁর বিচ্ছিন্ন ফৌজের মদদের জন্যে আরেকটি বড়ো বাহিনী পাঠালেন। এদেরও পিষে ফেলা হলো।

স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধে কবর রচিত হলো সাড়ে তিন লাখ জার্মান সেনার। ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারির দুই তারিখে আত্মসমর্পণ করলেন জার্মান সেনাপতি জেনারেল পওলাস। হিটলার এবং নাজি জার্মানির পতন শুরু হলো স্তালিনগ্রাদ যুদ্ধের পর থেকেই। লালফৌজ এখান থেকেই শুরু করে পশ্চিমে ইউরোপমুখো বিজয় অভিযান। ১৯৪৫ সালের শুরুতে বার্লিন অবরোধ এবং জার্মানির চূড়ান্ত পতনের মাহেন্দ্রক্ষণ পর্যন্ত চললো রুশ অগ্রাভিযান। একইভাবে দুই বছর লেনিনগ্রাদ অবরোধ করে রাখবার পরও দেশপ্রেমিক গণফৌজের তীব্রতম প্রতিরোধের মুখে পরাজিত হতে হলো নাজি হানাদারদের। আসলে এই দুই ঐতিহাসিক গণযুদ্ধই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গতিধারা পাল্টে দিয়েছিলো। দ্রুতায়িত করেছিলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিস্ট অক্ষ শক্তিবিরোধী

www.pathagar.com

মিত্রবাহিনীর বিজয়। আর এর সুবাদে অনিবার্য হয়ে উঠেছিলো হিটলারের আত্মহনন।

কাগজে পড়েছিলাম জার্মান হানাদারদের আরো কয়েকটি বাহিনী কৃষ্ণসাগর উপকূল ধরে ককেশাস পর্বতমালার গিরিপথ ধরে ঢুকে পড়েছিলো রাশিয়ার ফেডারেল সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রে। তারা মস্কোর উপকণ্ঠের পঁচিশ মাইলের মধ্যে এসে পড়ে। এই বেষ্টনিটি ছিলো সাড়ে তিন হাজার মাইল দীর্ঘ। গণফৌজের গেরিলারা ককেশাসের গিরিগহ্বরে আড়ালে থেকে পেছন দিক দিয়ে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয় এদের। কেটে দেয় এদের রসদ সরবরাহ লাইন। ফলে খাদ্যাভাবে ঘোড়া, খচ্চর ইত্যাদি খেয়ে সাবাড় করতে হয় জার্মানিদের। শেষে দুর্ভিক্ষে মরতে হয় অসংখ্য নাজি সেনাকে। এভাবে যুদ্ধের সাধ মিটিয়ে পালাতে হলো তাদের মস্কো থেকে। গেরিলাদের চোরাগোপ্তা হামলায় এবং লালফৌজের পাল্টা আক্রমণে মারা পড়লো লাখ লাখ নাজি সেনা। মুক্তিসেনাদের মধ্যে ছিলেন জানবাজ চেচন, আবখাজ আর ককেশাসান যোদ্ধারা। যাদের বীরত্বের কাহিনী লিউ টলস্টয় তাঁর 'হাজী মুরাদ' উপন্যাসে লিখেছিলেন এই শতকের গোড়ার দিকে।

সংবাদপত্রে এবং রুশ সাহিত্যে পড়া এসব কথা নতুন করে খুঁচিয়ে তুললো আমার স্মৃতিকে। দিন গুনতে থাকলাম কখন পাড়ি দেবো ককেশাস, উরাল আর পৃথিবীর ছাদ পামির পর্বতমালার দেশে। যে দেশটি মহাদেশীয় ইউরোপের চাইতে আয়তনে প্রায় সোয়া দুই গুণ বড়ো। পৃথিবীর মোট স্থলভাগের সাত ভাগের এক ভাগ। ষোলটি প্রজাতন্ত্র মিলিয়ে যার মোট আয়তন ৮৫ লাখ ৭০ হাজার বর্গমাইল। আর মহাদেশীয় ইউরোপের আয়তন তো মোটে ৪০ লাখ বর্গমাইল। যেখানে বাস করে দু'শ'রও বেশি জাতিগোষ্ঠীর লোক। যার উত্তরপ্রান্তে উত্তর মেরু মহাসাগর আর পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর। এশিয়ায় সাইবেরিয়া নিয়ে যার আয়তন ৬৪ লাখ ৬০ হাজার বর্গমাইল। আর ইউরোপ খণ্ডে মাত্র একুশ লাখ সাড়ে দশ হাজার বর্গমাইল। অথচ তেত্রিশ লাখ বর্গমাইল হলো কেবল সাইবেরিয়ারই পরিধি।

পূর্ব এবং উত্তর এশিয়া জুড়ে চার-চারটি পৃথক আবহাওয়ামণ্ডলের এই বিশাল ভূমি। যেনো স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি মহাদেশ এটি। যেখানে আছে উত্তর মেরুর তুন্দ্রা অঞ্চলের তীব্রতম শীত। মধ্য অঞ্চলে আর্দ্র জলবায়ু আর চিরহরিৎ অরণ্যভূমি। দক্ষিণ অঞ্চলে মহাদেশীয় উষ্ণ আবহাওয়া মণ্ডল। পশ্চিমে ইউরোপীয় এলাকা থেকে ত্রিভুজ হয়ে যার রেখা এসে মিলেছে সাইবেরিয়ার মাথায়। যার বেশিরভাগই উর্বর কালো মাটির চাদর বিছানো স্তেপভূমি। এদিকে সাইবেরিয়া এবং পামির ঘেঁষে মধ্য এশীয় অঞ্চল। যেখানে আছে শ্যামল মরুদ্যানখচিত বিশাল কিজিলকুম এবং কারাকুম মরুভূমি।

এছাড়া আছে একটি আধা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল। এটি কৃষ্ণসাগরের দক্ষিণ ক্রিমিয়ার সংকীর্ণ তটরেখা ছুঁয়ে ইউরোপীয় এবং এশীয় ককেশাস পর্যন্ত বিস্তৃত। মনোরম এখানকার আবহাওয়া। ঘন সবুজ এই উপকূল ভূমির তরুলতা। এই বিশাল কনফেডারেশনের তিন ভাগের এক ভাগ অরণ্যময়। এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত

www.pathagar.com

চারটি সাগর। কৃষ্ণ, বাল্টিক, আরল আর কাস্পিয়ান। যেখানে আছে ডন, ভল্গা, নিপার, ভিনা আর আমুর, লেনা এবং ওব ই'র মতন খরস্রোতা নদী। বাঁকের পর বাঁক নিয়ে কয়েকশ' মাইল ঘুরে ইউরোপের দীর্ঘতম নদী ভল্গা এসে পড়েছে অস্ত্রাখানের মুখে কাস্পিয়ান সাগরে। নিপার এবং ডন পড়েছে কৃষ্ণসাগরে। ভিনা এবং নিয়েমিন বাল্টিকে। বিশাল ওনেগা হ্রদের ভেতর দিয়ে পূর্ব ভিনা আর পেকোরা নদী পড়েছে উত্তর মেরু মহাসাগরে। আর আঠারো শ' ত্রিশ মাইল পথ ঘুরে শাখালিন দ্বীপের কাছে প্রশান্ত মহাসাগরের তাতার প্রণালীতে পড়েছে আমুর নদী।

এছাড়া আছে এখানে পৃথিবীর উচ্চতম পর্বত চূড়া। যার মধ্যে পামিরের মাউন্ট স্তালিন উঁচুতে ২৪ হাজার ৫৯০ ফুট। হিন্দুকুশের তিরামির চূড়ার পরেই এর উচ্চতা। তিরামির হলো উচ্চতায় ২৫ হাজার চারশ' ২৬ ফুট। ককেশাসের আলবুরুজ চূড়া পৃথিবীর চতুর্থ সর্বোচ্চ চূড়া। উঁচুতে এটি সাড়ে আঠারো হাজার ফুট। চিরতুষারের শিখর এটি। আরারাত পর্বতমালার সতেরো হাজার ফুট উঁচু মাউন্ট আরারাত হলো পঞ্চম সর্বোচ্চ চূড়া। মহাপ্লাবনের সময় নূহের জাহাজ নাকি ছুঁয়েছিলো এটি। এর জন্যে ইরানি আর তুর্কিরা একে বলে কুহে-নূহ। অর্থাৎ নূহের চূড়া।

বিস্ময়কর রকমের বর্ণিল আর বৈচিত্র্যময় এমন এক দেশ দেখতে কার না মন চায়। বিশেষ করে যার মধ্যে বাস করে মার্কোপলো কিংবা ইবনে বতুতার মতন কোনো যাযাবর বিশ্ব পর্যটক। তার মনের অবস্থা তো সহজেই আঁচ করতে পারা যায়। আমারও অমন হালই হয়েছিলো।

আমন্ত্রণের কাগজ হাতে আসবার আগেই আটখানা হলাম আহ্লাদে। ঘুম হলো না কয়েক রাত। এ সময় রাশিয়ায় যে ডিইন্টার-জেনারেল অর্থাৎ প্রবল প্রতাপান্বিত শীত বাহাদুরের রাজত্ব সেকথা মনের কানাচেও ঠাঁই পেলো না। চোখে ভাসতে থাকলো কেবল মস্কোর রেড স্কোয়ার, আকাশচুম্বি ক্রেমলিন প্রাসাদ আর স্তালিনগ্রাদ-লেনিনগ্রাদের কল্পনায় আঁকা ছবি। চারপাশে ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলে চললো ভল্গা, ডন, নিপার আর আমুর নদী।

যেনো বাঁকে বাঁকে মোড় নিয়ে কিজিলকুম-কারাকুম মরু পেরিয়ে ধেয়ে চলেছে আমু এবং সির দরিয়া। মেঘ ছুঁয়ে যেনো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম পামির, আলবুরুজ আর আরারাতের তুষার-ছাওয়া চূড়াগুলোকে। নেপাল ভ্রমণের সময় পৃথিবীর সর্বোচ্চ চূড়া মাউন্ট অ্যাভারেস্ট -এর উপর দিয়ে উড়ে এসেছিলাম। হিমালয়ের মাথায় রাশি রাশি তুষারের মুকুট ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়লো না।

মনে হলো আমাদের পুঁথি-সাহিত্যের পরীরাজ্য কুহে-কাফ্ অর্থাৎ ককেশাস পর্বতমালার উপর দিয়ে উড়ে চলেছি দুই ডানা মেলে দিয়ে। সাজগোছ করতে শুরু করে দিলাম। তথ্য দফতর থেকে বলা হয়েছিলো মোটা পশমি স্যুট বানিয়ে রাখতে। উলের ভারি ওভারকোট অথবা লংকোট যেনো সংগে থাকে। এছাড়া দস্তানা, পায়ের কয়েক জোড়া মোজা। বুট জুতাও রাখতে হবে বলা হলোঃ পৌষের কী শীত দেখছেন? রাশিয়ার শীতের তুলনায় এটা নস্যি। এয়ারকণ্ডিশন ঘর থেকে রাস্তায়

www.pathagar.com

নামলেই হিমে জমে যাবেন।

তুষারপাতের কাণ্ড তো আরো ভয়ংকর। আপদমস্তক মোটা পশমি কাপড়ে মোড়া না-থাকলে একেবারে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে নিরেট পাথর। তুষার ঝড়ের ঝাপ্টা লাগলে মুখের মানচিত্রই যাবে বদলে। অ্যাম্বুলেন্সে সওয়ার হয়ে যেতে হবে হাসপাতালে। বরাত-জোর থাকলে তবে সুস্থ হয়ে দেশে ফেরা। অতএব সাধু সাবধান!

এতকিছু বলা-কওয়ার পরও আতংকিত হলাম না। সেবারও তীব্র শীতে বাংলাদেশে মারা গিয়েছিলো অনেক বুড়োবুড়ি এবং দরিদ্র পরিবারের শিশু। কিন্তু রাশিয়ার উইন্টার কী সে ধারণা তো তখনো হয়নি। শুধু এদেশের প্রবাদটা মনে রেখেছিলাম। মা বলতেন- 'পৌষের শীতে মোষ কাঁপে আর মাঘের শীতে বাঘ কাঁপে।' কিন্তু জানতাম, ওদের পিঠে ভারি গরম কাপড় চড়ালে অমন করে আর ওদের কাঁপতে হতো না। এদেশে গরম কাপড়চোপড় পরবার সুবিধা থাকলে বস্ত্রহীন গরীবদেরও মরতে হতো না উত্তরের হিমপ্রবাহে।

এসব কথা ভেবে সাধ্যমতন কিছু গরম পোশাক বানালাম। ধার করে নিলাম এক আত্মীয়ের কাছ থেকে জাম্বু ওভারকোট। তৈরি হতে থাকলাম গ্রোগ্রাসে ভাত গেলার মতন। শেষবারের মতন ইন্টারন্যাশনাল পাসপোর্ট করেছিলাম ১৯৬৬ সালে। সেটা ছিলো পাকিস্তান আমল। সেবার গিয়েছিলাম পূর্ব আফ্রিকা। লোহিত সাগরের দেশ ইথিওপিয়া, ইরিত্রিয়া আর সোমালিয়ার সীমান্ত এলাকা দেখবার সুযোগ ঘটেছিলো। তখন মুক্তি সংগ্রাম চলছিলো ইরিত্রিয়ায়।

স্বাভাবিক কারণেই সেই পাসপোর্টটি তামাদি হয়ে গিয়েছিলো। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর পঁচাত্তরের আগে আর পা বাড়াইনি বিদেশে। সুতরাং নতুন পাসপোর্ট আর করা হলো না, হয়নি। তাড়াহুড়া করে আন্তর্জাতিক ছাড়পত্র করে নিলাম। তথ্য অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে যোগাড় করে দিলেন বৈদেশিক মুদ্রা। বিদেশ ভ্রমণের সব আনুষংগিক কাগজপত্রও তাঁরা হাতে তুলে দিলেন। চার দৈনিক কাগজ থেকে চারজন সিনিয়র সাংবাদিকের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হলো প্রতিনিধি দলে। এখন কেবল রওয়ানা দেবার পালা। সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর শেষে ইউরোপের আরো কয়েকটি দেশ সফরের পরিকল্পনা ঘুরপাক খেতে থাকলো মাথায়। গোটা ইউরোপ না হোক পোল্যান্ড, পূর্ব জার্মানি, ইংল্যান্ড আর ফ্রান্স দেখবার সাধটা বড়ো হয়ে উঠলো। ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে আমি তখন বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস এবং প্রাগৈতিহাসিক যুগ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলাম। 'হিউয়েন সাং যখন এলেন এ দেশে' শিরোনামে বাংলাদেশের সভ্যতার ওপর আমার একটি ধারাবাহিক লেখা ছাপা হচ্ছিল অধুনালুপ্ত দৈনিক বাংলায়। বাংলাদেশের ভূতাত্ত্বিক মহাকাল এবং প্রস্তরযুগীয় সভ্যতার সংগে ব্রিটেনের ক্যাম্ব্রিয়ান ভূতাত্ত্বিক মহাকাল আর সভ্যতার যোগসূত্র খুঁজছিলাম প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে।

এর জন্যে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত ক্যাম্ব্রিয়ান সভ্যতার নিদর্শনগুলো দেখবার একটা তীব্র তাড়না অনুভব করছিলাম। ব্রিটেনে না গেলে এর সুযোগ কোথায়?

www.pathagar.com

একদিন ঢাকাস্থ ব্রিটিশ হাইকমিশনারের বাড়িতে আমন্ত্রণ পেলাম ডিনারের। কথায় কথায় আমার একান্ত ইচ্ছাটার কথাটা জানালাম তাঁর কাছে। কিন্তু ইতিহাসের লোক ছিলেন না বলে ক্যাম্ব্রিয়ান সিভিলাইজেশন আর ব্রিটেনের আদিম কিম্‌রি জনগোষ্ঠী সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণা ছিলো না। এই কিম্‌রি থেকেই ক্যাম্ব্রিজ নামের উদ্ভব।

প্রথমে রাহা খরচ নিয়ে তিনি ইতিউতি করলেন। ব্রিটিশ সরকারের অর্থ সংকটের বাহানা তুললেন। আমি বললামঃ মস্কো থেকে বার্লিন যাবো। তোমাদের কেবল বার্লিন -লণ্ডনের সামান্য বিমান ভাড়াটা দিতে হবে।

আমার চাপাচাপিতে রাজি হয়ে গেলেন ব্রিটিশ হাইকমিশনার। বললেনঃ এখন বলো কবে নাগাদ যাচ্ছো তুমি মস্কো। ক'দিন থাকবে সোভিয়েতে। সফরসূচি মতন আমি তাঁকে সময় বলে দিলাম। দিন কয়েক বাদেই আমার ব্রিটেন ভ্রমণের একটা চূড়ান্ত প্রোগ্রাম পাঠিয়ে দিলেন তিনি। তাতে লেখা ছিলো রাজকীয় অতিথি হিসাবে ব্রিটেনে দশ দিনের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে আমায়। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে গবেষণার কাজ ছাড়াও লণ্ডনের ঐতিহাসিক স্থানগুলো দেখবার সুযোগও পাবো। বার্লিনে আমাকে অভ্যর্থনা জানাবেন সেখানকার ব্রিটিশ দূতাবাসের একজন কর্মকর্তা। তিনি আমার লণ্ডন ভ্রমণের বিমান টিকেট এবং বার্লিনে থাকতে হলে সে ব্যবস্থাও করে দেবেন। আর হিথরো বিমান বন্দরে আমাকে অভ্যর্থনা করবেন ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন পদস্থ অফিসার।

বৃটিশ হাইকমিশনার ফোন করে জানালেন ঃ দ্যাখো মিঃ নূরী তোমার যেনো সফরসূচির কোনো নড়চড় না হয়। হলে আমাদের প্রোগ্রাম উল্টে যাবে। যা কিছু হয় আগাম জানিয়ে দিয়ো।

তাঁকে বললাম ঃ হোপ্ ফর দ্য বেস্ট। আশা করি, অনাকাঙ্খিত কিছু হবে না। আরো বললাম ঃ অশেষ -অশেষ ধন্যবাদ তোমার এই সৌজন্যের জন্যে। জীবনে কখনো ভুলবো না তোমার সহৃদয়তার কথা।

এদিকে জার্মান আর পোলিশ দূতাবাসের সংগেও কথা বলে রাখলাম। তাঁরা বললেন মস্কো থেকে ভিসা আর সফরের সুবিধা ওঁরাই করে দেবেন। অহেতুক চিন্তা করো না। কিন্তু এত দৌড়ঝাঁপের পরও কেমন করে যে বিধি বাম হলো তা ছিলো আমাদের কল্পনার বাইরে। সময় পিছুতে থাকলো। জানুয়ারি ঘুরে ফেব্রুয়ারি এলো। পার হলো মার্চ-এপ্রিল। বিদায় নিলো সাইবেরিয়ার অতিথি পাখিরা। মনে করেছিলাম তারা বুঝি ঠোঁটে করে আমাদের জন্য নেমন্তন্ন এনেছিলো তাদের দেশ সফরের। দীর্ঘ বিলম্বে মন দমে যেতে থাকলো। হা-পিত্যেশ করতে থাকলাম।

যাত্রানাস্তিতে দমে গেলো মনটা। ভাটা পড়তে থাকলো নবান্নের পংক্তি ভোজের সেই দারুণ উৎসাহটায়। নিজের কাছেই প্রশ্ন রাখলাম ঃ উত্তর মেরুর বরফ তাহলে আর কবে গলবে ? নাকি গলবেই না ? আমার বাড়ির আঙিনায় তখন বৈশাখের ঠা-ঠা রোদ। সূর্যের খরতাপে ওষ্ঠাগত প্রাণ সবার। আকাশে ধোঁয়ার মতন একটু-আধটু- সাদাটে মেঘ। তার বাইরে সমস্তটাই তামাটে। বৃষ্টির জন্যে হা-করে আছে

www.pathagar.com

কাঠফাটা মাঠ। ভাঁপসা গরমে পাখার নিচেও হুল ফোটে শরীরে। ছুটির দিনগুলোতে বিশ্রাম নেবার চেষ্টা করি শীতল পাটিতে আশ্রয় নিয়ে। কানে ভেসে আসে তখন শ্রান্ত বায়সকুলের ডানা-ঝাঁপটানোর শব্দ। সামনের তাল গাছগুলোর ডালের ছায়ায় বসে হাঁসফাঁস করে ওরা গ্রীষ্মের দুরন্ত দাপটে।

এসময়ও কী তুষারপাতের গর্জন আছে উরাল পর্বতের দেশে? জানুয়ারির শেষ দিকে ওঁরা বলেছিলেন সফর-প্রোগ্রামটা পিছিয়ে দিতে হচ্ছে শীতের তীব্রতার জন্যে। বলেছিলেনঃ বড়ো সাংঘাতিক আমাদের ওখানকার শীত। আপনারা সইতে পারবেন না। এবার সেপ্টেম্বরেই শুরু হয়েছে ভয়ংকর তুষার ঝড়। থিতিয়ে আসতে সময় লাগবে। এপ্রিলের শেষাশেষি হয়তো কড়াকড়ি কমে যাবে শীতের। ততোদিন অপেক্ষা করতে হবে আপনাদের। জানেনই তো সাত থেকে আট মাস জাঁকিয়ে থাকে রুশ দেশের শীত। মে মাসে শুরু ক্ষণস্থায়ী বসন্তের। তখনো কিন্তু মাঝেমধ্যে প্রচন্ড হিমেল বাতাসের ঝাপ্টা আসে নর্থ আর্কটিক থেকে। তাহলেও আবহাওয়াটা এ সময় গা-সওয়াই থাকে সাউথ-ইস্ট এশিয়ার লোকেদের জন্যে।

দেখতে-দেখতে এসে গেলো মে। তখনো কোনো খবর নেই। তাহলে বুঝি আর যাওয়াই হলো না। আক্ষেপ করে কথাটা বললাম। সামনে বসা ছিলেন এক সহযাত্রী বন্ধু। তিনি কথাটা লুফে নিয়ে বললেনঃ কেমন করে হবে? পেছনে যে ফেউ লেগেছে।

ফেউ। এরা আবার কারা? অবাক হলাম ওঁর কথা শুনে। অবাক হচ্ছেন কেন? আমরা যে জাতে বাঙালি একথা ভুলে যাচ্ছেন? বললেন তিনি। আমাদের মতন পরশ্রীকাতর মানুষ আর কোথায় আছে বিশ্বসংসারে। হ্যাঁ একথা ঠিক, বিদেশে থাকলে মুহূর্তে আমরা বুকে তুলে নেই অনাত্মীয় বঙ্গভাষীকে। তার বিপদে জান হালাক করতে চাই। আর দেশে সামান্য কারণেই জুতোপেটা করি তাকে। লাঠালাঠি করি ক্ষুদ্র স্বার্থে। আপন ভাইকেও ঘরছাড়া করি। চোখ টাটাই তার সুখে।

বিদেশ ভ্রমণ শিকোয় ঝুল্‌ছে দেখে বোধকরি একেবারে আশাহত হয়ে পড়েছিলেন বন্ধুটি। তার জন্যেই অমন ক্ষুব্ধ তিনি। সমস্ত ক্রোধ ঝাড়তে লাগলেন আপন জাতের ওপর। কিছুতেই যতিচিহ্ন পড়ছিলো না তাঁর দীর্ঘ ভাষণে। বাঙালির পরশ্রীকাতরতার বয়ান দিতে থাকলেন উপন্যাসের উপমা ঘেঁটে। তাদের ভীরুতার নজির তুলে ধরলেন বঙ্কিম-শরতের -রবীন্দ্রনাথের কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে। গরীব পড়শির ছেলে জজ হলে কেন পাশের বাড়ির ধনাঢ্য অশিক্ষিত বাঙালি সেই ছেলেকে চাপরাশি হয়েছে বলে সাতমুখে প্রচার করে তারও একটা জুতসই ব্যাখ্যা দিলেন। বললেন, এর সবই হলো আমাদের হিংসুটেপনার জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত।

শুধুই কী পরশ্রীকাতর বাঙালি ? ভীরুতারও সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি সে। যার জন্যে ভোগে সংকীর্ণতায়, কুসংস্কারে। পোড়ে হিংসার অনলে। চড়া গলায় আবৃত্তি করে তিনি শোনালেন রবীন্দ্রনাথের সেই দুই বিখ্যাত পংক্তি ঃ সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধা জননী, রেখেছো বাঙালি করে মানুষ করোনি।'

www.pathagar.com

অনুচ্চ স্বরে প্রতিবাদ জানালাম তাঁর ক্ষুব্ধ ভাষণ এবং উপমা-উদ্ধৃতি ইত্যাদির। যদি তিনি রাগে ফেটে পড়েন তার জন্যেই আমার স্বরের এই নিচুগ্রাম। কণ্ঠকে কোমল-পেলব করে বললামঃ একটা কথা কিন্তু আপনাকে মানতেই হবে। বাঙালিকে হিংসুকই বলুন, পরশ্রীকাতর অথবা ভীরুই বলুন কিন্তু সেই বাঙালির ছেলেরাই তো আমাদের জন্যে স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছে। লড়াকু এই ছেলেদের নজির কোথায় আছে বলুন। ওদের জন্যেই তো আজ দেশে-দেশে উড়ছে আমাদের রক্তসূর্য পতাকা। ওরাই তো মরতে শিখেছিলো দেশের জন্যে।

তাঁকে বুঝিয়ে বললাম- দোষগুণ নিয়েই তো মানুষ। যারা নীল রক্তের বড়াই করে সেই ইংরেজের কথাই ধরুন না কেন তাদের কী এক কালে 'রেড-ডেভিল' বলা হতো না? ডার্টি ইয়াংকি তো এক সময় নিজেদেরই বলতো আমেরিকানরা। বোম্বেটেপনার জন্যে পর্তুগিজদের নামের বিশেষণ ছিলো নিউ-ভাইকিংস।

আমাদের ভাষায় হার্মাদ। ডাচদের বিশেষণ ছিলো 'পাইরেট সী-গাল' অর্থাৎ ডাকু গাংচিল। রুশদের বলা হতো তুষার-নেকড়ে। আর জার্মানদের তো এই সেদিনও গাল দেয়া হতো ফ্যাসিস্ট বর্বর বলে।

এসবের তুলনায় আমরা বাঙালিরা তো বলতে গেলে একেবারে নিষ্পাপ। বললাম তাঁকে। তিনি পাল্টা যুক্তি দেখালেন। নিজেদের দোষটা স্বীকার করে নিতে বললেন। জোর দিয়ে বললেনঃ নিষ্ঠুর-বর্বর, ডাকু- ইত্যাদি শত অপবাদ ওদের থাকলেও পরশ্রীকাতর তো ওরা ছিলো না। শব্দটা খুঁজে-খুঁজে আমাদের জন্যেই তো বের করেছেন ভাষা -পণ্ডিতেরা। তাঁরা আমাদের স্বভাব জানতেন। বাংলা অভিধানে তাই শব্দটিকে ঠাঁই দিয়েছেন। পৃথিবীর অন্য কোনো ভাষার অভিধানে এর একটাও বিকল্প শব্দ দেখেছেন কখনো ? দ্যাখেননি। কারণ অন্য জাতের অনেক বড়ো দোষ থাকলেও এরকম ক্ষুদ্র দোষ নেই। আমাদের সফরটাকে বরবাদ করে দিতে চাইছে তো এই ক্ষুদ্র মানসিকতাই। ওদের পাতে ঝোল নেই তাই অন্য কেউ খেতে চাইছে না। দেখলাম তাঁর ক্ষোভের পেছনে অন্তত কিছুটা হলেও যুক্তি আছে।

টানা মাস কয়েক ধরে স্বাগতিকদের গয়ংগচ্ছ ভাব দেখে আমিও ছিলাম দোটানায়। একটা সন্দেহ উঁকিঝুঁকি মারছিলো মনে। কিন্তু কারা এর পেছনে বাগড়া দিচ্ছে এটা আঁচ করতে পারিনি। বন্ধুটিকে বিষণ্ন মুখে বললাম ঃ হয়তো তারা হীনমন্যতায় ভুগছে। নয়তো প্রফেশনাল জেলাসিতে। এরকম তো হতেই পারে। না- হয় এবার নাই-বা গেলাম আমরা। যাদের সাধ বেশি তাদেরই যেতে দিন।

আমার কথা শুনে চটে গেলেন তিনি। কঠিন গলায় বললেনঃ কেন আমরা পথ ছেড়ে দেবো। তাহলে কেন এতদিন নাচানো হলো আমাদের। কেন বলা হলো তৈরি হয়ে থাকতে। তাছাড়া মনোনয়নটা তো দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। বাইরের কারো ইচ্ছায় কী ভেস্তে যাবে সরকারের সিদ্ধান্ত ? কেন আমরা অকারণে অমন করে গুটিয়ে যাবো? আমাদের কী স্বাধীন ইচ্ছার কোনোই দাম নেই? আপনি সরাসরি বঙ্গবন্ধুর কাছে ব্যাপারটা তুলুন। তিনি শক্ত মানুষ। সহজে হাল ছেড়ে দেবেন বলে

www.pathagar.com

তো মনে হয় না। আপনি বললেই হেস্তনেস্ত কিছু একটা করবেন তিনি। আমরা সবাই জানি আপনার কথা ফেলতে পারবেন না বঙ্গবন্ধু।

বললামঃ এই সামান্য ব্যাপারের মধ্যে অত বড়ো একজন মানুষকে কী টানা ঠিক হবে? হাজার হোক তিনি এখন দেশের প্রেসিডেন্ট।

বন্ধুটি ছিলেন নাছোড়বান্দা। বললেনঃ এটা তো তাঁরও মর্যাদার ব্যাপার। কারণ আমাদের মনোনয়নে নিশ্চয় সায় ছিলো তাঁর। এখন গনেশ উল্টে যেতে বসেছে- কথাটা তো তাকে বলতেই হবে।

অগত্যা একদিন টেলিফোন তুললাম। আমার নাম শুনে সংগে সংগে রিসিভার ধরলেন বঙ্গবন্ধু। বললেনঃ কী খবর নূরী। ভালো আছো তো? দেখাই যে পাই না তোমার। আমি তো তোমাদের সবার কথাই ভাবি। সিরাজের কথা, মানিক ভাইয়ের কথা। কে জি-কে তো রাষ্ট্রদূত করে পাঠালাম। সিরাজ বেঁচে থাকলে ওকে একটা বড়ো জায়গায় বসাতাম। দুর্ভাগ্য, ওকে প্রাণ দিতে হলো শয়তানদের হাতে। মানিক ভাই তো আগেই চলে গেলেন।

আমার কিছু বলবার আগেই নিজের একান্ত অনুভূতির কথা অনর্গল বলে যেতে থাকলেন তিনি। সিরাজ বলে ডাকতেন তিনি ইত্তেফাকের সাবেক নির্বাহী সম্পাদক শহীদ সাংবাদিক সিরাজুদ্দিন হোসেনকে। এক সময় কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে তাঁরা দু'জন ছিলেন সহপাঠী। তখন থেকেই নিবিড় অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিলো দুজনের মধ্যে। অল্পবয়সে সাংবাদিকতা শুরু করেছিলো সিরাজ। হাফপ্যান্ট পরে আজাদের নিউজ টেবিলে যেতো। জুনিয়র সাব-এডিটরের কাজ করতো। সেকালের বিখ্যাত নিউজ-এডিটর মোহাম্মদ মোদাব্বেরের কাছে হাতেখড়ি হয়েছিলো তার। যেমন হয়েছিলো আমাদের অনেকেরই।

মোদাব্বের সাহেব যেমন ছিলেন একজন প্রবীণ চৌকস সাংবাদিক তেমনি ছিলেন খ্যাতিমান একজন শিশু সাহিত্যিকও। আজাদের শিশু বিভাগ মুকুল-মহফিলের 'বাগবান' অর্থাৎ পরিচালক ছিলেন তিনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ ইস্টার্ন কমান্ডের সর্বাধিনায়ক লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সাক্ষাৎকার নিতে গিয়েছিলেন তিনি কলম্বো। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই বর্ষীয়ান সাংবাদিক গুরুর মর্যাদা পেয়ে গেছেন আমাদের কাছ থেকে।

মানিক ভাই ছিলেন ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া। এক সময় কলকাতার দৈনিক ইত্তেহাদের সচিব ছিলেন। এই কাগজটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি। সম্পাদক ছিলেন খ্যাতনামা সাংবাদিক-সাহিত্যিক আবুল মনসুর আহমদ। কলকাতার জীবনেই মানিক মিয়ার সংগে মুজিব ভাইয়ের ঘনিষ্ঠতা। মনসুর সাহেবের সংগেও যোগাযোগ একই সময়ে। তিনজনই এঁরা ছিলেন সোহরাওয়ার্দি সাহেবের একান্তজন। 'গণতন্ত্রের মানসপুত্র' নামে খ্যাত এই প্রখ্যাত রাজনীতিক এবং আইনবেত্তার সংগে আমার, সিরাজের আর আমাদের গোত্রের আরো কিছু সাংবাদিক-ছাত্রনেতার ছিলো ঘনিষ্ঠতা।

www.pathagar.com

জেলের বাইরে থাকলে প্রায় প্রতিদিনই সম্পাদক মানিক মিয়ার রুমের রাজনৈতিক আড্ডায় হাজির থাকতেন মুজিব ভাই। মতবিনিময় করতেন তখনকার জটিল পলিটিক্যাল ইস্যুতে। সিরাজের সংগে আমার বন্ধুত্ব ঢাকার জীবনে। অন্তরঙ্গতা গাঢ় হয়েছিলো আজাদে, সংবাদে আর ইত্তেফাকের নিউজ-টেবিলে। কে জি মুস্তাফাও ছিলেন আমাদের এই পুরনো প্রফেশনাল ফ্রেন্ডশিপ ব্লকের একজন। মানিক মিয়া বয়োজ্যেষ্ঠ হলেও তাঁর খুব কাছের লোক ছিলাম আমরা। বয়সের সিনিয়রিটির কিংবা সম্পাদকসুলভ দূরত্বের কোনো দেয়াল ছিলো না তাঁর আর আমাদের মধ্যে। সময় পেলে খোশগল্পে শরিক হতাম আমরা তাঁর আড্ডায়। আসলে তখনকার যুগটাই ছিলো আলাদা। যাকে বলা যায় খোলামেলা এক অন্তরঙ্গতার যুগ।

টেলিফোনে আমার স্বর শুনে কেমন একটা নস্‌টালজিয়ায় পেয়ে বসেছিলো বঙ্গবন্ধুকে। মুহূর্তে চলে গিয়েছিলেন দূর অতীতে। আমি ফাঁক পাচ্ছিলাম না কথা পাড়বার। তিনি বলতে লাগলেন ঃ সেসব দিনের কথা মনে নেই? আমার এখানে আসতে পারো না। কোথায় ঘুরে বেড়াও।

একটু দম নিয়ে বললেনঃ শোনো, একটি বড়ো দৈনিক কাগজ বের করছি আমি। প্রাভদার মতো বড়ো কাগজ। পুঁজি শুরুতেই চার কোটি টাকা। কাগজটার ভার নিতে হবে তোমাকে। তুমি হবে সম্পাদক। বেছে-বেছে পাকা সাংবাদিক নেবে। একজন মন্ত্রীকে তদারকির দায়িত্ব দিয়েছি। দু-চার দিনের মধ্যেই বৈঠকে বসবে তোমরা দুজন। তার জন্যেই খুঁজছিলাম তোমাকে। ভালোই হলো তুমি ফোন করলে। নইলে আমাকেই করতে হতো। এবার সুযোগ পেলাম কথা বলবার। বললামঃ বস্তুনিষ্ঠ কাগজ হলে আছি। আগে পরিকল্পনাটা দেখতে হবে। কিন্তু তার আগে একটি কথা। 'প্রাভদা'র দেশ থেকে একটা আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম আমরা ক'জন। আপনি বোধকরি বিষয়টা জানেন। যাওয়ার কথা ছিলো সেই জানুয়ারিতে। এখন মে মাস শেষ হতে চললো। ওঁরা বার বার তারিখ পাল্টাচ্ছেন। এখন শুনছি আমাদের নাকি যাওয়াই হবে না। কারা নাকি সরকারি মনোনয়ন খারিজ করে দিতে চাইছে।

আমার কথা শুনে গর্জে উঠলেন তিনি। তীব্র স্বরে বললেনঃ শুনে রাখো, আমার সরকারের সিদ্ধান্ত পাল্টানোর ক্ষমতা কারো নেই। আমরা স্বাধীন হয়েছি কারো কাছে নমো-নমো করতে নয়। এক্ষুণি খোঁজ-খবর নিচ্ছি তথ্য মন্ত্রণালয়ে। ব্যাপারটা নিজেই দেখবো আমি। হ্যাঁ, তোমরাই যাবে প্রেস- ডেলিগেশনে। আর খুব শিগ্‌গিরই যাবে।

ফোন ছাড়বার আগে বললেনঃ এ নিয়ে আর মাথা ঘামিয়ো না। কাগজটার ব্যাপারে এখন থেকে ভাবতে থাকো। দু-এক দিনের মধ্যে একবার এসো এখানে। পাকাপাকি কথা হবে।

রিসিভার নামিয়ে রেখে ভাবছিলাম, অ্যাতো ঝামেলার মধ্যে হয়তো তিনি ভুলে যাবেন ডেলিগেশনের ব্যাপারটা। কিন্তু অবাক হলাম দিন তিন-চারেক পরেই। খামের ওপর 'আর্জেন্ট' লেখা একটি চিঠি পেলাম। খুলেই দেখি আমাদের সফরের একেবারে পাকাপোক্ত প্রোগ্রাম। কোথায় যাবো তারও দিনক্ষণ লেখা চিঠিতে।

www.pathagar.com

আমার আস্থা ছিলো মানুষটির ওপর। তাঁর স্মরণশক্তি অসাধারণ এটাও জানতাম। কিন্তু রাষ্ট্রপতির অনেক প্রাইওরিটি অ্যাকশনের মধ্যে একজন ছা-পোষা সাংবাদিকের গরজও যে অমন তাৎক্ষণিক গুরুত্ব পাবে ভাবতে পারছিলাম না। এটি ছিলো সত্যি আমার জীবনের একটি বড়ো স্মরণীয় ঘটনা। চিঠিখানা টেবিলের ওপর রেখে চিন্তা করলাম, এ রকম চট জলদি কাজ বাংলাদেশে কেবল ওই একটি মানুষই করতে পারেন। যাঁর কাছে মানবিক বিবেচনায় সামান্যও ছিলো অসামান্য।

জুনের শুরুতে আমাদের যাত্রা। আমার হতাশ বন্ধুদের মনে তখন বিহঙ্গের কলগুঞ্জন। বলতে চাইছিলাম ওঁদের কবির সেই অমর পংক্তিমালার ভাষায়ঃ 'ওরে বিহঙ্গ-ওরে বিহঙ্গ মোর, এক্ষুণি অন্ধ বন্ধ করো না তব পাখা।' বলতে চাইছিলাম সামনে তো পড়ে আছে এক সুদীর্ঘ যাত্রা। পড়ে আছে বিশ্বজোড়া বিশাল একটা আকাশ। সেটি পাড়ি দেবার আগেই কেন আবেগে বন্ধ করছো চোখ। কেন পাখা গোটাচ্ছো খেয়া পাড়ি দেবার আগেই। যাত্রার একদিন আগে বিনা নোটিশে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম গণভবনে। মন্ত্রিসভার বৈঠকে তিনি তখন সভাপতির আসনে। আমার খবর পেয়েই মহিউদ্দিন সাহেবকে পাঠালেন সদর দরোজায়। বরিশাল থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য এবং আমাদের সময়কার এই ছাত্রনেতা ছিলেন তাঁর কাছের লোকেদের একজন। আমার তাড়া দেখে মহিউদ্দিন সোজাসুজি আমাকে হাজির করলেন তার কাছে। মন্ত্রীরা চোখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন। তাঁদের আলোচনায় হঠাৎ ছেদ পড়ে গেলো। সবাই ওঁরা ছিলেন আমার পরিচিত। কিন্তু হাজার হোক তবু তো এটি ছিলো ক্যাবিনেট মিটিং। বঙ্গবন্ধু অবশ্য ঘনিষ্ঠজনদের ক্ষেত্রে প্রোটোকলের ধার ধারতেন না। আমাকে দেখেই চেয়ার থেকে উঠলেন তিনি। কানের কাছে মাথা রেখে ফিসফিসিয়ে বললেনঃ কবে যাচ্ছো?

বললামঃ কাল রাতে। এরপরেই একটা ঢোক গিলে বললামঃ জরুরি কিছু কথা আছে। এখানে বলা যাবে না। বারান্দায় যদি যেতেন।

সংগে সংগে তিনি আমার হাত ধরে হলঘরের পাশের অলিন্দে গেলেন। দাঁড়িয়ে থেকেই বললেনঃ কী বলবে বলো? আমি তাঁকে সংবাদপত্র বন্ধ না করবার পরামর্শ দিলাম। বোঝাতে চাইলাম বিষয়টি খুবই নাজুক। এটা করা ঠিক হবে না। জানেনই তো সাংবাদিকরা বড়ো স্পর্শকাতর। এরকম পদক্ষেপ নিলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে। আরো বললাম, কোনো সিদ্ধান্ত নেবার আগে বর্ষীয়ান এবং বিচক্ষণ সাংবাদিক-সম্পাদকদের মতামত নেয়া দরকার।

তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনলেন আমার কথা। বললেনঃ এ ব্যাপারে তোমাদের সংগে কথা বলবো। কবে ফিরছো ?

ঃ এক মাস লাগবে হয়তো। পশ্চিম ইউরোপও যেতে পারি। জানালাম তাঁকে।

ঃ এসেই দেখা করবে। তখন কথা হবে।

তাঁর সংগে সেবারই ছিলো আমার শেষ দেখা। আর শেষ সংলাপ। পরেরদিন রাত সাড়ে আটটায় চাপলাম অ্যারোফ্লটের বোয়িং বিমানে। নয়টায় তেজগাঁ

www.pathagar.com

এয়ারপোর্টের আকাশে উড়লো প্লেনটি। যাত্রার আগে নিয়েছিলাম রুশ ভাষার ওপর খানিকটা প্রাথমিক পাঠ। বিশেষ করে ওদেশের মানুষের শিষ্টাচার, সম্ভাষণ ইত্যাদি বিষয়ে। দু-একটা শব্দ জানলেও তো তাদের মনের কলিং বেলে অন্তত কিছু টু-টাং বোল ফোটানো যায়। কথাগুলো বলেছিলেন সোভিয়েত-ফেরত কয়েকজন বন্ধু। বলেছিলেনঃ খুব একটা কঠিন নয় রুশ ভাষা। ইন্দো-ইউরোপিয়ান ভাষা-পরিবারেরই তো সহোদর এটি। বাংলা-সংস্কৃতি, ফার্সি-ইংরেজির বেশ কাছাকাছি। সংস্কৃতি ধাতুমূল থেকে এসেছে এরকম অনেক বাংলা শব্দের ব্যবহার আছে রুশদের বোলচালে। সুতরাং সময় থাকতে শিখে নাও। কাজে লাগবে। ভাষা দিয়েই তো মানুষ গড়েছে সভ্যতা। জয় করেছে পৃথিবী।

উদ্দীপ্ত হলাম তাঁদের কথায়। ছাত্রানং অধ্যায়নং তপঃ। অধ্যয়নই তো ছাত্রের তপস্যা। তাছাড়া সব মানুষই তো আজীবন ছাত্র। একটি শিশু আঁ-উ করতে করতে পুরো রপ্ত করে নেয় আপন মাতৃভাষা। জ্ঞানপিপাসুদের তো কথাই নেই। যেমন ফাহিয়েন, হিউয়েন সাং, মার্কোপোলো। প্রায় বুড়ো বয়সে চীন দেশ থেকে হাজার হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন ফাহিয়েন। ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন সংস্কৃত এবং পালি ভাষার প্রচুর পুঁথিপত্র। অর্জন করেছেন আরো কয়েকটি ভারতীয় ভাষায় পান্ডিত্য। দেশে ফিরে গিয়ে এখানকার জ্যোতিষ, ধর্ম-দর্শন এবং আচার-সাহিত্যের সবই অনুবাদ করলেন চৈনিক ভাষায়। সপ্তম শতকে হর্ষবর্ধনের সময় হিউয়েন সাং এসেছিলেন উপমহাদেশে। বিহারের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বাঙালি বৌদ্ধপন্ডিত শীলভদ্রের ছাত্র হলেন। শীলভদ্রের নিবাস ছিলো ঢাকার বিক্রমপুরে। তাঁর পায়ের কাছে বসে পালি এবং সংস্কৃতে হাতে-খড়ি নিলেন ভিক্ষু হিউয়েন সাং। অধ্যয়ন করলেন হাজার কয়েক পুস্তক। জবরদস্ত পন্ডিত হলেন ভারতের দর্শন বিজ্ঞানে এবং পৌরাণিক সাহিত্যে। বাংলার তাম্রলিপ্তি বন্দর হয়ে সমুদ্রপথে ক্যান্টন ফেরার পথে তিনশ'র মতন পাণ্ডুলিপি ছিলো তাঁর সংগে। সেগুলোর অনুবাদ করে সমৃদ্ধ করলেন চীনা সাহিত্যের ভান্ডার। চীন আর ভারতীয় সভ্যতার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটালেন ভ্রমণ-অভিজ্ঞতার বিবরণ লিখে। যা ঐতিহাসিকদের কাছে আজো এক মূল্যবান সূত্রগ্রন্থ।

কোনো দেশ ভ্রমণে গেলে মার্কো, ইবনে-বতুতা আর আল-বিরুনির কথা সবার আগে মনে পড়ে যায় আমার। চীন সফরে গিয়েছিলেন মার্কো ষোল বছর বয়সে। ১২৭১ সালে। সংগে ছিলেন বাবা এবং চাচা। নিকোলো পোলো, ম্যাফিও পোলো। তাঁরা দুজনই ছিলেন ভেনিসের সওদাগর। ভেনিসকে সেকালে ইউরোপীয়রা বলতো 'সাগরের রানী'। সাগরগুলো ছিলো ঃ আদ্রিয়াতিক, আইওনিয়ান, ইজিয়ান। পূর্ব ভূমধ্যসাগর তো ছিলোই। আদ্রিয়াতিকের উত্তর মাথায় সাগর সাঁতরানো এক উর্বশী এই বন্দরনগরী।

এক শ' আঠারো দ্বীপ আর একশ' ষাট খালের এক আশ্চর্য শহর এটি। খাল হলো শহরের রাস্তা। পারাপার গন্ডোলা নৌকায়। ভেনিসের সাম্পান এগুলো। সবকটি

www.pathagar.com

দ্বীপ জোড়া লাগানো সেতুর জালে। বাড়িঘর সাগরের তলায় গাঁথা পাথরের খুঁটির ওপর দাঁড়ানো। নীল-নীল ঢেউ নেচে বেড়ায় লোকের ঘরের সিঁড়িতে। প্রাসাদ সোপানে। বাইজান্তাইন স্টাইলে গড়া আকাশছোঁয়া গির্জাগুলোর দোরগোড়ায়। এ যেনো পেখমমেলা এক ময়ূরি। কেউ কেউ বলে সাগরের বুকে জলকেলিরত এক প্রকান্ড রাজহাঁস। আড়াই মাইল দূরের উপকূল থেকে চোখ বাড়ালে সত্যি রাজহাঁসই মনে হবে একে। অথচ পানির ওপর বিশাল পাটাতন জুড়ে আছে মনোরম উদ্যানমালা। বড়ো বড়ো পার্ক।

সাগর থেকে সেতু বেয়ে মহাসড়ক চলে গেছে ইউরোপের দেশে-দেশে। এই পানির শহরেই পোলো পরিবারের বাস। তাদের কাছে এ শহর হলো সাগর-সেচা মুক্তো। একশ' লহরের মুক্তোর মালা। চীনের মাটিতে পা রেখে বার-বার দেশের ছবি দেখেন মার্কো। প্রাণ কাঁদে মায়ের জন্যে। জ্যেষ্ঠ পোলোরা তো পোড়খাওয়া মানুষ। প্রাচ্যের বাজারে সওদা করে সোনাদানা ভরেছেন ঝুলিতে। সব ভেনিসিয়ান বণিকই তো ধনপতি। অনেকে আবার ধনকুবের। পোলোরা হতে চান ওদের মতো কেউকেটা।

কিন্তু মার্কো? না, ধনের লালসা নেই তাঁর। তিনি জানতে চান প্রাচ্যের রহস্য। আবিষ্কার করতে চান প্রাচ্যের আত্মা। বিচিত্র নিসর্গের মহাচীন আস্তে-আস্তে কাছে ডাকলো তাঁকে। ভুলতে থাকলেন তিনি ভেনিসের মায়া। আপন হয়ে উঠলো তার ইয়াংসি নদীর দেশ। তাঁকে বিমোহিত করলো তিয়েনশান পর্বতের তুষার মৌলি। চোখে তাঁর সবুজের অঞ্জন বুলিয়ে দিলো ক্যান্টনের শ্যামল অরণ্য, ধানের মাঠ, ফুলে-ফুলে ছাওয়া চিরহরিৎ তরুবীথি।

কুবলাই খানের গড়া পেইপিং নগরীর অলিগলি ঘুরে-ফিরে দেখলেন তিনি। মোঙ্গলরা কামবুলাক বলে এ শহরকে। কুবলাই খানের নামের মঙ্গোলীয় সংস্করণ এটি। মার্কো চীনকে বলতেন ক্যাথে। প্রাচীনকালে চীনারা কাইতান বলতো তাদের দেশকে। অনেক কাল আগে চীনে রাজত্ব করতেন খিতান রাজবংশ। খিতান থেকে হয়েছে কাইতান। মার্কো তাঁর লাটিন জিভের ডগায় উচ্চারণ করতেন ক্যাথে। ইউরোপীয়রা তাঁর জবানিতেই ক্যাথে বলতে শুরু করলো হুয়াং হু'র দেশটাকে। মার্কোর স্মৃতিকে আজো জাগিয়ে রেখেছে হংকংয়ের ক্যাথে এয়ারলাইন্স। তাছাড়া মার্কোর নামে অনেক পর্যটন কেন্দ্র, জাদুঘর, হোটেল-রেস্তোরা আছে জাপানে, ইন্দোনেশিয়ায়, সিঙ্গাপুরে।

পেইপিংয়ের উপকণ্ঠে ছিলো সাবেক সম্রাটদের প্রাসাদ। বিশাল বিশাল ইমারত একেকটি। ছাদের চূড়ায় ডানাওয়ালা পরীমূর্তি। প্রবেশপথে কৃষ্ণ পাথরের জোড়া-জোড়া সিংহ। তারা যেনো অনন্তকাল ধরে পাহারা দিতে থাকবে রাজাদের। এখন যে রাজপুরিকে 'নিষিদ্ধ নগরী' বলা হয় তার পাহারাদার ড্রাগন। এককালে এখানকার বিশাল প্রাংগণে হতো রাজকীয় অভিষেক। হতো নবান্নের উৎসব। বসন্ত- উৎসব। নববর্ষের জমকালো মেলা। আর হতো রাজকীয় ভোজানুষ্ঠান। দরবার হলগুলো মুখরিত থাকতো বিদেশি দূত, আর রাজরাজড়াদের কলগুঞ্জনে। বাতাসে ঝংকার

www.pathagar.com

তুলতো গায়কদের সুরেলা গলার গান। বাজতো নৃত্যপর রূপসি কন্যাদের পায়ের ঘুঙুর। কখনো জমতো এসব দরবার হলে কবিতা পাঠের আসর। এই প্রাসাদ-নগরী দেখে বিস্ময়ে-বিমূঢ় হয়েছেন মার্কো। তাঁর সময়ে কুবলাই খান ছিলেন সারাটা মহাচীন, মোঙ্গলিয়া আর কোরিয়া উপদ্বীপের সম্রাট।

চেঙ্গিজ খানের নাতি ছিলেন কুবলাই। ইউরোপীয়রা তাঁকে বলতো দ্য গ্রেট খান। তাঁর আমলে স্বর্ণ শিখরে ওঠে চীনের সমৃদ্ধি। বিপুল বিকাশ ঘটে সাহিত্য-সংস্কৃতি আর চারুকলার। এসব দেখে মুগ্ধতায় ভরে গিয়েছিল মার্কোর দুই চোখ। তিনি শুরু করলে চীনা সংস্কৃতির চর্চা, হাতেখড়ি নিলেন অংকনবিদ্যার।

'তখনো খানকে দেখবার ভাগ্য হয়নি তাঁর। শুধু দূর থেকে উদ্যান আর পরিখাঘেরা রাজপ্রাসাদের বাহার দেখে জুড়াতেন চোখ। একদিন হঠাৎ দরবারে যাওয়ার পাসপোর্ট পেলেন তিনি এবং জ্যেষ্ঠ পোলোরা। দরবারের শোভা দেখে যেনো আশ মিটছিলো না মার্কোর। দেয়ালে দেয়ালে দেখলেন অপূর্ব সব পেইনটিং। সিংহাসনের দুই বাহুতে দেখলেন স্বর্ণঈগল মূর্তি। মখমলে মোড়া বসবার জায়গা। আলো ফুটে বেরুচ্ছে সম্রাটের জমকালো পোশাক থেকে। রাজকীয় দর্জির নিপুণ হাতে-বোনা এই পোশাক। যার ঝালরে অজস্র হীরকখন্ডের চোখ-ঝলসানো বুটি। সম্রাটের আজানুলম্বিত কোর্তার মাঝখানে ড্রাগনের সাতরঙা ছবি। বর্ণধনুর সাতরং বিচ্ছুরিত তার পদ্মরাগ, লাফেজ লাজুলি, চুনি মোতি-জমরুদ আর নীলকান্ত মণি খচিত নকশা থেকে। সাদা ঘোড়ার কেশর শোভিত সোনার ত্রিকোণ মুকুট তাঁর মাথায়। নিচে মিহি কার্পাস তুলোর অলংকরণ খচিত টুপি।

মার্কো বিস্মিত দৃষ্টি তুলে খানের মুখের পানে তাকালেন। যেনো সিংহাসনে বসে আছেন স্বর্গের কোনো অপরূপ দেবপুত্র। অতলান্ত দুই চোখ তাঁর ঘুরছে দরবারের চারদিকে। সভাসদরা বসে আছেন সামনের জরিদার কুশন চেয়ারগুলোতে। সেখানে আছেন মন্ত্রী, প্রদেশের শাসনকর্তা, সভাকবি, বিদুষক আর অভ্যাগত বিদেশি দূতের দল। রক্ষীরা তীক্ষ্ণধার বর্শা হাতে দাঁড়ানো দরজা-জানালাগুলোর মুখে। সুদর্শন শ্বেতাংগ যুবক মার্কোর গায়ে চৈনিক দরবারি পোশাক। বলা হয়েছিলো ঃ যখন যে-দেশে পা বাড়াবে শিখে নাও সে দেশের বুলি। রপ্ত করো সে দেশের ভব্যতা। গায়ে চড়াও সেদেশের পোশাক। এমন হও যেনো সবাই ভাবে তুমি ওদেরই আত্মজন। 'বি এ রোমান হোয়াইল ইন রোম' প্রবচনটি জানা না থাকলেও তার মর্মার্থ জানতেন বুদ্ধিমান মার্কো। কুবলাই খানের চোখ হঠাৎ নিবদ্ধ হলো মার্কোর মুখে। সংগে সংগে আভূমি নত হয়ে অভিবাদন জানালেন তিনি সম্রাটকে। মুগ্ধ হলেন সম্রাট শ্বেতাঙ্গ বালকের আদব-কায়দায়। প্রাচ্যের প্রতাপান্বিত অধিপতি পরিচয় জিজ্ঞেস করতেই চীনা ভাষায় বিনম্র কণ্ঠে জবাব দিলেন মার্কো। ভয় পেয়েছিলেন তাঁর বাবা নিকলো। কী যেনো কোন্ বেয়াদবি করে বসে মার্কো। তিনি এবং তাঁর ভাই করজোড়ে দাঁড়িয়েছিলেন ছেলের পাশে। মার্কো কিন্তু একটুও ভয় পেলেন না। স্পষ্ট গলায় জবাব দিলেনঃ সোনালি তাঁবুর হে মহিমান্বিত খান,

www.pathagar.com

আমি আপনার দর্শন লাভের আশায় হাজার হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে এসেছি আপনার দরবারে। ইউরোপের ভেনিস আমার দেশ। আমার বাবা এবং চাচা দুজনই বণিক। তাঁরা এসেছেন বাণিজ্যে। আর আমি এসেছি জ্ঞানের সন্ধানে। এসেছি আপনার মহান দেশ দেখতে।

কুবলাই খান অভিভূত হলেন মার্কোর কথায়। সবচেয়ে ভালো লাগলো তাঁর মার্কোর মুখের ভাঙ্গা ভাঙ্গা চীনা বুলি শুনে। তিনি তাঁদের তিনজনকে সামনের সারির আসনে এসে বসতে বললেন। রাজকীয় প্রোটোকল-অফিসারকে নির্দেশ দিলেন যেনো সম্রাটের খাস অতিথিশালায় ভেনেসিয়ানদের বিশেষ যত্নে রাখা হয়। হুকুম দিলেন-যতোদিন খুশি এরা থাকবেন আমার মেহমান হয়ে। পোলোরা ভেনিসে তৈরি সোনার সুতোর কারুকাজ-করা একপ্রস্থ মূল্যবান পোশাক উপঢৌকন দিলেন চেঙ্গিজ খানের সোনালি তাঁবুর উত্তরাধিকারী গ্রেট খানকে। দিলেন আদ্রিয়াতিক সাগরের মুক্তোর কয়েক ছড়া মালা। আর তার সংগে ভেনিসের বিখ্যাত চিত্রশিল্পীদের আঁকা কিছু দুর্লভ ছবি।

ইউরোপের কুইন অভ্ দ্য সী ভেনিসের কথা জানতেন কুবলাই খান। জানতেন ভেনিসিয়ান বণিকদের বাণিজ্য-নিপুণতার কথা। খুশি হলেন তিনি পোলো ভাইদের সৌজন্যে। বেশি আকৃষ্ট করলো তাঁকে মার্কো। তিনি চীনে ফ্রি-ট্রেডের ছাড়পত্র দিলেন পোলো ব্রাদার্সকে। মার্কোকে করলেন দরবারের কনিষ্ঠ সভাসদ। রাজকীয় কাজে মার্কোর উপদেশ নিতেন সম্রাট। মাঝেমধ্যে মার্কোকে শাসন কাজের দায়িত্ব দিয়ে পাঠাতেন দূর-দূর প্রদেশে। একবার চৌকিয়াং শহরের গবর্নর হিসেবে নিয়োগ করলেন তাঁকে। এ কাজে মার্কোর কৃতিত্বে অভিভূত হলেন কুবলাই খান। এরপর একটার পর একটা বড়ো কাজের দায়িত্ব দিতে থাকলেন।

সম্রাট তাঁর ছেলের মতন স্নেহ করতেন মার্কোকে। গোড়াতে সামান্য কয়টি চীনা বুলি দিয়ে কুবলাই খানের মন জয় করে নিয়েছিলেন তিনি। শেষে কাজের গুণে জয় করেছিলেন চীনের হৃদয়। তিনি যে বিদেশি একথা ভুলেই গিয়েছিলো চীনারা।

মার্কোকে ধরে রাখলেন সম্রাট। কিছুতেই তাকে ছাড়তে চাইলেন না তিনি। চীনকে মনের অগোচরেই ভালোবেসেছিলেন মার্কো। দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন সম্রাটের স্নেহের কাছে। বাবা-চাচা- দুজনই কয় বছর ব্যবসা করে চলে গেলেন স্বদেশ। একা মার্কো পড়ে থাকলেন চীনে। দেখতে-দেখতে কেটে গেলো টানা সতেরো বছর। এবার হোম্ সিক ফিল করতে শুরু করলেন। তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকলো ভেনিস। একদিন মনের কথা খুলে বললেন কুবলাই খানকে। সম্রাট বুঝলেন মাতৃভূমির টান তো আসলেই নাড়িছেঁড়া টান। কেমন করে তিনি উপেক্ষা করবেন মার্কোর প্রাণের দাবি?

শেষে তিনি রাজি হলেন অতিকষ্টে বললেনঃ বেশ, যাও তুমি নিজের দেশে। তবে যাওয়ার পথে শেষবারের মতন কিছু কাজ করে যাও আমার। বাংলার সংগে আছে চীনের নিবিড় বাণিজ্য-সম্পর্ক। সেদেশের সুলতান দূত পাঠিয়েছেন আমার দরবারে।

www.pathagar.com

পাঠিয়েছেন বণিকদের একদল প্রতিনিধি। তাদের কাছ থেকে আমরা আনি কার্পাস তুলা, মিহি সুতোর কাপড় আর চাল ডালসহ আরো অনেক কিছু। আর চীন থেকে তারা নেয় রেশম, রেশমি কাপড় আর কারুকাজ করা রকমারি বাসন-পেয়ালা। আমার দূত আর একদল বণিক যাবে গৌড়ে সুলতানের দরবারে তুমি আমার দেয়া উপঢৌকন সসম্মানে তুলে দেবে সুলতানের হাতে। তাঁকে জানাবে আমার সম্ভাষণ।

আরো বললেনঃ আরো দুটি কাজ আছে তোমার। ভারতেও আছে চীনের ব্যবসা। তুমি বছর দুই সেখানে থেকে জোরদার করবে ব্যবসাটাকে। তারপর যাবে পারস্য। সেখানকার শাহ্‌জাদির সংগে আমার বিয়ে ঠিক হয়েছে অনেক আগে। তোমার সংগে থাকবে আমার রক্ষীদল। কয়েকজন সভাসদও থাকবেন। ভারত থেকে আরব সাগর হয়ে এদের নিয়ে যাবে বাদশাহের দরবারে। বেগমকে পৌঁছে দেবে আমার সীমান্ত পর্যন্ত। শাহজাদির দেহরক্ষার জন্যে বাড়তি একটি ঘোড়সওয়ার বাহিনী পাঠাচ্ছি আমি সিংকিয়াং-এর পথে।

মার্কো জাহাজে করে এসে নামলেন চট্টগ্রাম উপকূলে। বঙ্গোপসাগরে ভাসতে দেখলেন সংখ্যাহীন পালতোলা জাহাজ। নদীতে ভাসতে দেখলেন সাম্পান, বজরা, ডিঙি আর পানসি নৌকার বহর। এদেশের ছায়াঘেরা গ্রাম আর ফসলভরা মাঠ দেখে চোখ ধাঁধিয়ে গেলো তাঁর। ধান-পাট-তুলা, দুধ-দই, ফলফলারি, মাছ-মুরগি-হাঁস আর তাঁতে বোনা বাহারি কাপড়ে উপছে পড়তে দেখলেন বাংলাদেশের হাটবাজার। শহর-বন্দর। মার্কো পোলোর চোখ ছিলো আধুনিক ক্যামেরার চোখ। একবার যা কিছু দেখতেন তার সবই বন্দি হয়ে থাকতো তাঁর চোখের লেন্সে। সেখান থেকে জমা হতো স্মৃতির ঝিনুকে। আর ভোলা নয়। বিস্মরণ নয়। কোথায় কী দেখেছো তুমি-একবার জিজ্ঞেস করলেই হলো। অমনি তরতরিয়ে আওড়িয়ে যেতেন তাঁর দেখা লোকজনের কথা। তাদের চেহারা, ছবি, হালচাল, পোশাক আশাকের কথা। পথে কোথাও কোনো দেশ, তার নিসর্গ কিংবা দৃশ্যপট দেখলে হুবহু তার বর্ণনা দিয়ে যেতে পারতেন। মুখ থেকে ফুলঝুরির মতন ছুটতো বর্ণনার অনুপুংখ কথামালা।

তাঁর চোখে একটি স্বপ্ন ঝরছিলো যখন জাহাজ থেকে দেখলেন তিনি বাংলাদেশের উপকূল। এ কোথায় এলেন তিনি- কোন স্বর্গে? সবুজে-শ্যামলে ছেয়ে আছে একটি দেশ। অনুচ্চ পাহাড়ের টিলায়, তার নিচের সমতলে আকাশ-ছোঁয়া তরুবীথির অরণ্য। জায়গাটা ছিলো হয়তো নাফ নদীর মোহনার পশ্চিম তীরের টেকনাফ। পাহাড়-টিলার গাছগুলো ছিলো সেগুন-জারুল-চাম্বল। গরজন- গামার আর তাল-তমালের অরণ্য ছিলো তার আঁচলে। ছিলো আম-কাঁঠাল এবং নারকেল-সুপোরির ঘন বন। এসব গাছের নাম জানতেন না মার্কো। আগেও কোথাও দেখেননি অমন বিচিত্রবর্ণ রকমারি গাছের মেলা।

মনে হলো চীন কিংবা ভেনিসের কোনো নিপুণ শিল্পী নিসর্গের রংমাখা তুলি দিয়ে এঁকে রেখেছে ভূস্বর্গের একটি চিত্রপট। কর্ণফুলির তীরে এসে আরো অবাক হওয়ার পালা। এ কী দেখছেন মার্কো ! সাগরের সংগে কোলাকুলি পাহাড়- অরণ্য

www.pathagar.com

আর সমতলের। কোলাকুলি গ্রামের আর ফসল-ভরা মাঠের। সাগরের তীরে কাশ আর হোগলার বন। বলাকার ঝাঁকের মতন মাথা নুইয়ে ঝুলছে রাশি রাশি কাশফুলের থোকা। বাতাসে মৌ-মৌ গন্ধ ফুটন্ত হোগলা থোড়ের। কিছু দূরেই আদিগন্ত মাঠ। সেখানে ক্ষেত জুড়ে ধান, পাট, সর্ষে এবং আখের ছড়াছড়ি। সবুজ যেনো ধুয়ে-ধুয়ে পড়ছে কচি ধানের পাতা বেয়ে।

বাংলাদেশের চিনির খ্যাতির কথা শুনেছেন মার্কো। শুনেছেন তাঁর সংগেকার বণিকেরা। এ দেশ থেকেই চিনি জাহাজ-ভরতি হয়ে যায় চীনে, পারস্যে, মধ্য এশিয়ায়। যায় মার্কোর দেশ ভেনিসেও। কিন্তু চিনির গাছ অর্থাৎ আখ গাছ এর আগে কখনো দ্যাখেননি তিনি। কাছেই কার্পাস তুলোর সার-সার ক্ষেত। এই তুলোর মিহি কাপড় যায় চীনে এবং এশিয়া ইউরোপের নানান দেশে। ভেনিসের সওদাগরেরা ল্যাভন্টির বন্দরগুলো থেকে বাংলার কার্পাস বস্ত্রের সওদা নিয়ে চালান দেয় ইউরোপের বন্দরে-বন্দরে। বেসাতি করে রোমে, জেনোয়ায়, ভার্সাই এবং এথেন্সে।

ইউরোপীয়রা ল্যাভন্টি বলতো পূর্ব ভূমধ্যসাগরের দেশগুলোকে। যার তালিকায় পড়ে মিসর, প্যালেস্টাইন, লেবানন এবং সিরিয়া। বাংলাদেশের মসলিন কাপড়ও যায় এসব দেশ হয়ে ইউরোপে। এখানকার কার্পাস তুলো থেকেই তৈরি কুয়াশার হালকা চাদরের মতন দেখতে এই অতি মিহি কাপড়। ছোটো একটি কৌটোয় ভরা যায় একশ'-দুশ' গজ মসলিন। ভেনিসে থাকতে মার্কো শুনেছেন সেই আশ্চর্য প্রবাদটি প্রাচ্যের ভেনিসিয়ান বণিকরা গল্পটি ছাড়েন বাজারে। তাঁদের ভাষ্য ছিলোঃ অমন সূক্ষ্ম কাপড় মানুষের হাতে বোনা সম্ভব নয়। কোনো সেরা তাঁতির পক্ষে এ কাজ দুঃসাধ্য। বাংলাদেশ তো যাদুরই দেশ। সেখানকার তাঁতিদের বশে আছে স্বর্গের পরীর দল। সেই পরীরাই তাদের কোমল হাতে শিশির কণা দিয়ে বোনে মসলিন। বোনা হয়ে গেলে তারা তাতদের ডালা সাজিয়ে দেয় এ-কাপড়ে। এরপর বাংলার বণিকদের হাত হয়ে মসলিন আসে ভূমধ্যসাগরের পূর্বপারের বন্দরগুলোতে।

গল্প শুনে অবাক হয়ে যেতেন মার্কো। স্বপ্নের মতন কথাটা, দাগ কেটে থাকতো তাঁর শিশুমনে। এখন, বাংলায় এসে কার্পাস তুলার সেই ক্ষেতগুলো দেখে বিস্ময় ধরে রাখতে পারলেন না তিনি। সারা মাঠ জুড়ে ডানামেলা বকের মতন আঁশের পাখনা ছড়ানো তুলতুলে ফুলের জলসা। এ এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা তাঁর। ইউরোপেরও কার্পাস হয়। কিন্তু এমন কোমল-পেলব আঁশ নেই সেই কার্পাসের। স্বর্গের যাদুর হাতে-বোনা বাংলাদেশের সেই বিশ্বখ্যাত তাঁতিদের দেখতে গেলেন তিনি।

পথে চলতে-চলতে ভাবলেন যারা চাঁদের জোছনার মতন অমন নরোম ঝিকিমিকি সুতোয় কাপড় বোনে না-জানি দেখতে তারা কেমন! তারা কী এই দেশেরই লোক? নাকি আর কোনো গ্রহ থেকে আনা বয়ন শিল্পী? কিন্তু ওখানে তো যাওয়া বারণ। চীনের 'ফরবিডেন সিটির' মতোই এক নিষিদ্ধ নগরী মসলিন শিল্পের তল্লাট। কাঠের উঁচু দেয়াল দিয়ে ঢাকা তাঁত ঘরগুলোর চারদিক। পাহারা বসানো প্রবেশ মুখে। কেবল কারিগররাই ঢুকতে পারে তাঁত ঘরে। আর ঢুকতে পারে সেই বণিকরা

www.pathagar.com

যারা দাদন দেয় তাঁতিদের। আর দূর দেশে বেসাতি করে মসলিনের।

এই তাঁতিদের জাতটাই আলাদা। বংশ পরম্পরায় মসলিনের কাজই করে তারা। বাবার কাছ থেকে বয়ন-কৌশল শেখে ছেলে। তার কাছ থেকে শেখে তার বংশধরেরা। যুগের পর যুগ ধরে চলে আসছে এই পারিবারিক ঐতিহ্যের। বাইরের কারো উপায় নেই এর আশপাশ ঘেঁষবার। যদি বয়নকলাটা নকল হয়ে যায়? সুনাম নষ্ট হয়ে যায় হাত-বদল হয়ে? তখন খ্যাতি থাকবে কোথায় মসলিন শিল্পী-পরিবারের? এ যে এক বিশেষ বিদ্যা।

সেই কবে কোনকালে বিদ্যাটা আয়ত্ত করেছিলেন বাংলার তাঁতি সমাজের কোনো এক নিপুণ শিল্পী। যিনি ছিলেন কার্পাস বিশারদ। যিনি জানতেন তুলোর আঁশকে কেমন করে মিহি থেকে মিহি করে সুতো তৈরি করা যায়। আর সেই সুতো দিয়ে বয়ন করা যায় কুয়াশার চাদরের মতন কাপড়। যা হবে গোলাপ ফুলের পাপড়ির মতন নরোম, কোমল এবং তুলতুলে। তন্তুবায়কুল শিরোমণি সেই মানুষটির কাছ থেকেই তাঁর বংশধরেরা পেয়ে এসেছে এ বিশেষ বয়ন বিদ্যার উত্তরাধিকার।

সেই বংশ বাড়তে-বাড়তে হয়েছে অনেক ক'টি গোষ্ঠী। এদেরই কেবল মৌরসি পাট্টা মসলিন বয়নের। এটি ছিলো বাংলার এই একই গোত্রের বিশেষ ট্রেড মার্ক। মসলিন শিল্পী হিসাবে এরা গৌরববোধ করতো। অহংকারও ছিলো এদের টনটনে। মসলিন শিল্পীর সংগে মোটা কাপড়ের তাঁতির কী তুলনা চলে? গৌরবটা রক্ষার জন্যেই এত কড়াকড়ি এদের চৌহদ্দিতে।

কিন্তু মার্কো তো ছিলেন বিদেশি। মাত্র কিছুকালের জন্যে দেখতে এসেছেন বাংলা মুলুক। তাছাড়া তিনি চীনের সম্রাট কুবলাই খানের দূত। তাঁকে তো আর হেলাফেলা করা যায় না। সুতরাং মার্কো এবং তাঁর দলের লোকদের ছাড়পত্র মিললো মসলিন বয়নাগারগুলো দেখবার। প্রথমেই তাঁর চোখ পড়লো তন্তুকারদের হাতের দিকে। এ যেনো সত্যি কোনো যাদুর হাত। এক আশ্চর্য অবলীলায় রূপোলি আঁশ মিহি করে নিয়ে গোটানো হচ্ছে আঙুলের মাথায়। আঙুল তো নয় যেনো চম্পককলি। কেমন একটা ঝকমকে আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে পাঁচ আঙুলের গা থেকে। অবাক চোখে এদের কারুকাজ দেখছিলেন ভেনিসের পর্যটক।

সামনে নরোম কাঠের এক ধরনের তাঁত। কী সতর্কতা তন্তুকারদের! আঙুল থেকে গোটানো সুতোর দলা পোরা হচ্ছে সূক্ষ্মাগ্র একরকম চিকন মাকুতে। তারপর সুতোগুলো টান-টান করে বিছিয়ে দেয়া হচ্ছে লম্বাটে তাঁতে। আগে ঝকঝকে পরিষ্কার পানিতে গুলিয়ে নিয়ে রোদে শুকানো হয়েছিলো সুতো। তাঁতে বিছানোর পর আস্তে আস্তে ঘুরতে লাগলো তাঁতকল। সুতোর ভেতর সুতো জড়িয়ে বোনা হতে লাগলো মসলিন। কাপড়ের বুক জুড়ে ফুটতে থাকলো মিহিদার নকশি।

বিচিত্র রঙের সেসব ফুল। কোনো কোনোটির রং পদ্মরাগ মণির। কোনোটি গোলাপ কলির। আবার অনেক ফুলে আসমানি রং, শিউলি, জুইচাঁপার পাপড়ির নকশা। এমন কারুকাজ নেই যা এরা ফুটিয়ে তুলতে পারে না। বাংলাদেশের

www.pathagar.com

হরেক ফুলের নকশার সমরোহ এই যাদুশিল্পীদের তাঁত ঘরে। এদের হাত যাদুর, মন যাদুর এবং চোখেও যাদুর ছবি। একটি নকশায় ছিলো মুক্তোর ঝিকিমিকি ফুল। আরেকটি শিশির কণা আর অশ্রুবিন্দুর মতন টলটলে।

স্বপ্নের ঘোর নামলো মার্কোর চোখে। সুতোর গায়ে কেউ শিশির কণা আর অশ্রুবিন্দুর নকশা ফোটাতে পারে এ ছিলো তাঁর কল্পনার বাইরে। এদেশের লোকেরা এই নরম-কোমল শুভ্র মসলিনকে বলে শিশির বিন্দু। পরবর্তীকালে মুগল যুগে শাহ্‌জাহান-কন্যা শাহ্‌জাদি জাহানারা এ জাতের মসলিনের নাম দিয়েছিলেন 'আবে-রাঁওয়া।' যার মানে ছিল 'শিশির জল।'

মার্কো তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখেছেনঃ বাংলাদেশের মসলিন-শিল্পীদের মতন কোনো কারুকলাবিদ পৃথিবীর কোথাও নেই। না ইউরোপে, না এশিয়ায়। এদের হাতে আছে সত্যি কারুকলার যাদু। এদের বোনা মসলিনের জুড়ি নেই পৃথিবীর তামাম বস্ত্র শিল্পে। বাংলাদেশেরই একান্ত সম্পদ এটি, তারই গৌরবের ধন। কেমন করে এ দেশের তন্তুকাররা এক হাতে শিশির কণার মতন সূক্ষ্ম একশ'-দুশ' গজের একপ্রস্ত কাপড় বয়ন করে, না-দেখলে তা বিশ্বাসই করা যায় না। নকশার ফুল-তোলা একখন্ড মসলিন বুনতে একজন শিল্পীর কেন ছয় মাস, এক বছর লেগে যায় তার রহস্য আছে এর বুনন-সৌকর্যে। বাংলার সেরা মসলিনের দাম এ-কারণে তো হীরের টুকরোর দামের চেয়েও বেশি।

মসলিন ছাড়াও মার্কো বাংলাদেশে দেখেছেন জামদানি, তাপেতা, আর রেশমি এবং কার্পাস তুলোর আরো কয়েক জাতের দামি কাপড়। মার্কোর পরে ১৪০৫ সালে চীন সম্রাট উংলো'র দরবার থেকে একদল দূত এসেছিলেন বাংলার রাজধানী সোনারগাঁয়। গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ্‌ ছিলেন তখন বাংলার স্বাধীন সুলতান। এই প্রতিনিধিদলের দোভাষী হয়ে আসেন পর্যটক মা-হুয়ান। সুমাত্রা থেকে সমুদ্র পথে একুশ দিনের মাথায় এঁরা পৌছেন চাটগাঁ বন্দরে। সেকালে চীনে চাটগাঁ বন্দরকে বলা হতো 'চেহ্‌-তি গান'। সোনারগাঁকে বলা হতো 'সোনা-উর-কোং।' বাংলাদেশকে বলা হতো 'বুনজালা'। মা- হুয়ানের বর্ণনায় আছে 'চাটগাঁ থেকে নদী পথে পাঁচশ 'লী' পেরিয়ে আমরা এসে পৌছই সোনারগাঁয় সুলতানের দরবারে।' চীনা পাঁচশ' লী মানে ছিলা একশ' ষাট মাইল। এর আগে আরো দুটি চীনা প্রতিনিধিদল দূত হয়ে এসেছিলেন সোনারগাঁয়।

একশ' বছর পর বাংলাদেশের মসলিন শিল্প, চিনি শিল্প আর কৃষি- বাণিজ্যের উৎকর্ষের যে-বর্ণনা দিয়েছিলেন মা-হুয়ান তার সংগে হুবহু মিলে যায় মার্কোর দেয়া বিবরণ। মার্কো বলেছেনঃ বুনজালা দেশটি একটি নিখাদ ভূস্বর্গ। এখানকার গ্রামগুলো ঘন নিবিড় উদ্যানের মতন। গাছের ছায়ায় হাঁটা যায় মাইলের পর মাইল। কৃষকরা খুব পরিশ্রমী। রকমারি ফসল ফলে তাদের উর্বর জমিতে। ধান হয় প্রচুর। সারা বছরের খাবার জোটার পরও উদ্বৃত্ত থাকে অনেক। যার জন্যে সব জিনিসই সস্তা এখানে। লোকেরা সহজ সরল, অতিথিবৎসল। অপরাধ নেই বললেই চলে।

www.pathagar.com

বলেছেনঃ বেশ বিত্তবান। অনেক বন্দর আছে নদী এবং সাগর তীরে। পণ্যসম্ভার নিয়ে সওদাগরেরা যায় দূর-দূর দেশে। বস্ত্র শিল্প বিশেষ করে মসলিন আর রকমারি উৎকৃষ্ট কাপড়ের খুব প্রসার দেশ জুড়ে। চিনি শিল্প খুবই উন্নত। বাইরের দুনিয়ায় ব্যাপক চাহিদা এ-দেশের চিনির। বণিকেরা ন্যায্য দাম নেয় তাদের পণ্যের। তাঁরা ক্রেতার সংগে প্রতারণা করে না। গ্রামের লোকেদের ঘরবাড়ি খুব ছিমছাম। বাগানে এবং মাঠে ফলে নানান জাতের ফল। গোসম্পদ বেশুমার।

মা-হুয়ান লিখেছেনঃ খুব সমৃদ্ধ-বুনজালা (বাংলা) দেশ। ভূম সুজলা-সুফলা। কৃষকেরা যেমন পরিশ্রমী তেমনি সচ্ছল। শ্রমই তাদের সুখের স্বর্গের উৎস। দেশের প্রধান ফসল ধান। এ ফসল দুবার ফলে বছরে। এছাড়া উৎপন্ন হয় প্রচুর বজ্‌রা, গম, তিল-তিসি-সর্ষে। আর পেঁয়াজ-রসুন, শশা, বেগুন- তরমুজ ইত্যাদি। আম-কাঁঠাল-নারকেল, কলা-খেজুর হয় অফুরন্ত। ডালিম, আম, কাঁঠাল, পেয়ারা সুপ্রিয় ফল। আখ এবং কার্পাস তুলার প্রাচুর্য সর্বত্র।

আরো লিখেছেনঃ এখানকার আখ থেকে হয় সবচেয়ে ভালো জাতের চিনি। কার্পাস তুলা থেকে হয় দুনিয়ার সেরা মসলিন এবং নানান জাতের মূল্যবান মিহি কাপড়। রেশমি কাপড়ও তৈরি হয়। মসলিন আর তাপেতা কাপড়ের কদর বেশি। এসব সামগ্রি রফতানি হয় বিদেশে। ধনী বণিকেরা পণ্যসম্ভার নিয়ে সমুদ্রপথে যায় বিদেশে। কাগজের অনেক কারখানা আছ এখানে।

জনজীবন সম্পর্কে লিখেছেনঃ ব্যবসায় লোকসান হলেও প্রতারণা করে না বণিকেরা। গ্রামের মহিলারা সুতি শাড়ি পরেন। তাঁদের নাকে নাকফুল, হাতে বালা, গলায় থাকে হার। বাহুতে থাকে বাজুবন্ধ, আঙুলে আংটি। আর কান শোভিত থাকে কানফুলে। ধনী মহিলারা পরেন জরির পাড়ের শাড়ি এবং সিল্কের খাটো জামা। তাঁরা পা চিত্রিত করেন কুমকুমে।

আরেক জায়গায় তিনি লিখেছেন ঃ এদেশের লোকেরা বাংলা ভাষায় কথা বলে। তাদের মুদ্রার নাম টংকা। ছোট মুদ্রা হিসাবে কড়িও ব্যবহার করে তারা। দরবারের ভাষা ফার্সি। দেশে অনেক নাট্যশিল্পী, গায়ক, ক্রীড়াবিদ আর বাজিকর আছে। বাজিকরেরা হাটে-বাজারে কৌতুক অভিনয় করে। যাদুকরেরা দেখায় যাদুর খেলা। শীতের সময় বসে কত কী পণ্যের মেলা! মেলায় বসে গান এবং নাটকের আসর। কুস্তি আর ষাঁড়ের যুদ্ধও হয় সেখানে। হিন্দু-মুসলিম পদস্থ আমলারা গায়ে লম্বা কোর্তা এবং মাথায় পরেন পাগড়ি। এদেশে শহর বন্দরের সংখ্যা অনেক। এগুলো দেয়ালঘেরা। সোনারগাঁ একটি মনোরম শহর। সবচেয়ে বড় শহর গৌড় এবং লক্ষণাবতি।

গন্তব্যটা ছিলো আমাদের একই দিকে। বাংলাদেশ থেকে ইউরোপ। গ্রিক রূপকথার ইউরোপা। এই প্রথম দেখতে যাচ্ছি হেলেনিক কিংবদন্তির রূপসী কন্যা ইউরোপাকে। মনে পড়লো হোমারের সময়কার গল্পটা। দার্দানেলিসের হেলিসপন্ট।

www.pathagar.com

এপারে বাস রূপবান রাখাল বালক আসিয়া'র। অর্থাৎ এশিয়া নামের ছেলেটির। সাঁতার কাটলেই যাওয়া যায় ওপার। একদিন রাখালটি চাপলো তার ষাঁড়ের পিঠে। সাঁতার কেটে গেলো সে পারে। তুলে নিয়ে এলো সুন্দরী ইউরোপাকে। ষাঁড়ের শিং ধরে দু'জন পার হলো কৃষ্ণসাগরের ক্ষুদে নালাটা। তারপর ঘর বাঁধলো এপারে। কাস্পিয়ানের দেশ এশিয়ায়। হলো দু'জন রাখাল আর রাখালিনী।

কাহিনীকার তাঁর গল্পে বেঁধে দিতে চেয়েছিলেন বুকের সংগে লাগোয়া দুই মহাদেশকে। মাঝখানের দূরত্বটা তো দূরত্বই নয়। মাত্র সামান্য মাইল কয়েকের ব্যবধান। কলার ভেলা ভাসালেই এপারের মাটি। হাত বাড়ালেই হয় ছোঁয়াছুঁয়ি। তা হলে আর ছাড়াছাড়ি কেন? দু'জনাকে থাকতে দাও একঘরে। ভূতত্ত্বের কথাটাও এরকমই। এশিয়ার দোলনায় হেসেখেলে বেড়ে উঠেছে ইউরোপ। এখানকার রাখালেরা বাল্টিক-উত্তর সাগরের তীরে গিয়ে পুষেছে মেষপাল। কৃষকেরা আবাদ করেছে হেলাসের অলিম্পিয়ান পাহাড়ের সমতল। এশিয়ার প্রশান্ত মহাসাগর হাত বাড়িয়ে কোলাকুলি করেছে উত্তর মেরু মহাসাগরের তুষার সৈকতের সংগে। সেখানেও দূরত্ব কেবল মাইল কুড়িয়েক।

কে জানতো সেখানেও ঘুমিয়েছিলো অপার এক রহস্য। নিশ্চুপ হয়েছিলো ইতিহাস লাখো কোটি বছর ধরে। এ-ও যেন ইউরোপা আর আসিয়ার সেই মিলনের অবাক-করা এক রূপকথা। ১৭২৫ সাল। রাশিয়ার জার প্রথম পিটারের রাজত্বকাল। এক ডেনিশ নাবিককে পিটার নিয়োগ করলেন তাঁর নৌবাহিনীতে। লোকটির নাম জোনাসেন বেরিং। কথা ছিলো তিনি আবিষ্কার করবেন উত্তর-পূর্ব সাইবেরিয়ার দূরতম উপকূল।

১৭২৮ সাল। বেরিং জাহাজ ভাসালেন প্রশান্ত মহাসাগরের কামচাটকা দ্বীপের ঘাট থেকে। আবিষ্কার করলেন দ্বীপের চারদিকের চৌহদ্দি। আরো বড়ো একটা অভিযাত্রার পরিকল্পনা নিয়ে গেলেন রুশ রাজধানী সেন্টপিটার্সবার্গ। তৈরি করলেন সাইবেরিয়ান মেরু অঞ্চলের ম্যাপ। তাঁর মন বলছিলো সাইবেরিয়ার সংগে নির্ঘাত একটা যোগাযোগ আছে কলাম্বাসের আবিষ্কার করা পশ্চিমের নতুন দুনিয়ার। প্রশান্ত মহাসাগর আর উত্তর মেরু মহাসাগর। রাশি-রাশি বরফের স্তূপ মাঝখানে।

কিছু একটা আছে এখানে। কিন্তু কী সেটি ? মে মাসে অল্প-অল্প করে গলতে শুরু করলো তুষার। দেখা গেলো নীল জলরাশির স্বচ্ছ একটি রেখা। এটা চলে গেছে পশ্চিমে। মেরু মহাসাগরের মাথার দিকে ১৭৩০ এসে গেলো। সেন্টপিটাসবার্গে টেবিলের ওপর নকশা রেখে ভাবতে বসলেন তিনি। মাথা ঘামাতে লাগলেন দিনের পর দিন। পাশে বয়ে চলেছে মেরু সাগরে গিয়ে পড়া নেভা নদী। নদীর দিকে চোখ রেখে ভাবলেন উত্তরের বরফের নিচে নিশ্চয় দুই মহাসাগরের মাঝখানে পানির একটা ক্ষুদে সেতু আছে। অর্থাৎ একটা প্রণালী। নইলে কোথা থেকে এলো নীল রেখাটা? রহস্যটা বের করতেই হবে বেরিংকে। একটা বড়ো নৌবহর চাই তাঁর। কথাটা বলা হলো পিটারকে। তিনি যোগান দিলেন খরচের। অভিযাত্রা শুরু হলো

www.pathagar.com

নতুন করে। এডমিরাল বেরিংয়ের কমান্ডে নৌবহর এগিয়ে চললো পশ্চিমে। তাঁর সংগে থাকলেন রুশ অভিযাত্রী দিমিত্রি ল্যানটেভ। বেরিং খুঁজে পেলেন প্রণালীটি। বিশ্বজয় করবার মতন অসাধারণ এক সাফল্য। গ্যালিলিও'র মতন নতুন উদ্ভাবনার আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলেন বেরিংঃ ইউরেকা! ইউরেকা । পেয়েছি। পেয়েছি।

মাত্র মাইল কয়েক পাড়ি দিয়েই পেয়ে গেলেন তিনি উত্তর আমেরিকার মাটি। পায়ের নিচে তাঁর আলাস্কার বুনো ঘাস। কুড়ি মাইলের মাথায় এখানে কোলাকুলি তিন মহাদেশের। এশিয়া, ইউরোপ আর আমেরিকার! এ কি কখনো কেউ ভাবতে পেরেছিলেন। কলাম্বাস, ভাস্কো ডা গামা? নাকি কাপ্তান কুক ? হাতের ডগার কাছে বিশাল পৃথিবীটা। অবিকল আসিয়া-ইউরোপার রূপকথার মতন।

কিন্তু বেরিং সেদিন জানতেন না এর আগের গল্পটা। জানতেন না তাঁর আগেও এ পথটা আবিষ্কার করেছিলো এশিয়ারই একদল মানুষ। শুধু দু-এক'শ' বছর আগে নয়, চল্লিশ হাজার বছর আগে। তারা সাইবেরিয়ার লোক। মোঙ্গলিয়ান। তাদের আমেরিকা আবাদের সময়টা বের করেছেন প্রত্ন এবং নৃতত্ত্বের আধুনিক গবেষকরা। হয়তো সে সময় কোনো এক গ্রীষ্মের মে মাস ছিলো। মে এবং জুনে বরফ গলে উত্তর মেরুর। পানির নীল রেখা জাগে দুই মহাসাগরের মাঝখানে। প্রশান্ত মহাসাগরের পুব-উত্তর উপকূলে দাঁড়িয়ে হয়তো তারা যুগ যুগ ধরে দেখে এসেছে আবহাওয়ার এই রূপবদল।

তখনো তল্লাটটা ছিলো সীল মাছের রাজ্য। তারা কাঠের ভেলায় করে শিকার করতো বরফের তলার মাছ। এ রকম গ্রীষ্মে পরিবার- পরিজন নিয়ে ভেলায় চেপে বেরিয়েছিলো তারা। মাছের লোভে গোটা একটা গোষ্ঠী ভাসিয়েছিলো ভেলার বহর। বেরিংয়ের নৌবহরের মতন এগিয়ে চলছিলো প্রণালীর নীল রেখা ধরে। চলবার নেশা ছিলো তাদের চোখে। একদিন কী দু-দিন চলতে-চলতেই পেয়ে গেলো উত্তর আমেরিকার আলাস্কা উপদ্বীপ।

মাছের মেলা চারপাশে। প্রলুব্ধ করলো তাদের সমুদ্রের এই খাদ্য। ইগলু অর্থাৎ বরফের ঘর বাঁধলো তাদের একদল। সীলের চামড়া আর মাছ খেকো ভোঁদড়ের পশম হলো তাদের শীতবস্ত্র। এরাই হলো এস্কিমো। বরফের দুনিয়া এদের বাসভূমি। সীলের তেল এদের জ্বালানি। ঘর আলো করে এরা এই তেলের প্রদীপে। মেরু কুকুরে টানা স্লেজ আর চামড়ার নৌকা 'কাইয়াক' এস্কিমোদের যানবাহন। অপূর্ব সুন্দর কাইয়াক-এর নির্মাণ কলা। ভাসমান কাঠ, ঘাসের চাপড়া আর পাথর দিয়েও বসত গড়ে এরা। হাতির দাঁত, হরিণের শিং আর হাড়ের তৈরি এদের শিল্পকর্ম অতুলনীয়। এখনো উত্তর-পূর্ব সাইবেরিয়ায় আছে এদের রক্তধারার লোক। মধ্য কানাডায়, রাশিয়ার আর্কটিক অঞ্চলে এবং গ্রিনল্যান্ডে বাস বেশ কয়েকটি এস্কিমো জনগোষ্ঠীর। ভাষা এদের একই। আদি মোঙ্গলিয়ান।

এদের অন্য দলগুলো জনাকীর্ণ করেছিলো উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকার পাহাড়-অরণ্য, সমুদ্র আর নদনদীর তটভূমি। ভূতাত্ত্বিক মহাকাল থেকে অনাবাদি পড়ে থাকা বিচ্ছিন্ন, নিভৃতচারী আমেরিকার প্রথম আবাদকার মানুষ এরা। তার প্রকৃতির

www.pathagar.com

আপন ঘরের সন্তান। তার সভ্যতার স্রষ্টা। মিসিসিপি-আমাজন নদীতটের শত কোটি বছরের নির্জনতা প্রথম মুখরিত হয়েছিলো এই আদিম এশিয়ানদেরই কলগুঞ্জনে। খাঁটি, নির্ভেজাল আমেরিকান বলতে যদি কাউকে বোঝায় তবে এরাই তো সেই জনগোষ্ঠী।

তুলনা কোথায় এদের মেক্সিকান 'মায়া সভ্যতার'? কোথায় উপমা খুঁজে পাওয়া যাবে এদের মিসিসিপি-টেনিসি এবং মোহক সংস্কৃতির? আমাজন নদীতটে যে-নগররাষ্ট্র এরা গড়ে তুলেছিলো প্রাচীন মিসরীয় এবং ব্যাবিলন-সভ্যতাও ছিলো তার কাছে ম্লান। এদের শিল্পকলা, সংগীত, লোকাচার আর পণ্যবিনিময় ব্যবস্থাই ছিলো আলাদা। অনন্য। আপন বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর ছিলো এদের কৃষি-সংস্কৃতি, সংঘবদ্ধ গ্রামীণ জীবন এবং নগর-স্থাপত্য। এদের অলংকৃত মুদ্রা, সুরক্ষিত- স্বাস্থ্যপ্রদ নগর নির্মাণশৈলী আর দেয়াল-গাত্রে উৎকীর্ণ চিত্রসৌকর্যের কাছে ম্লান আধুনিক কৃত্রিম সভ্যতা। তুলনা ছিলো না ভূমি সংলগ্ন এসব মানুষের দেশপ্রেমের। আপন শ্রমে আবাদ-করা মাটির প্রতি ছিলো অগাধ ভালোবাসা এদের।

আজ আপন ঘরে পরবাসী এরা। এদের কপাল পুড়লো যেদিন কলম্বাস ইউরোপ থেকে জাহাজ ভাসিয়ে নামলেন আমেরিকার আটলান্টিক উপকূলে। ইন্ডিয়া আবিষ্কার করতে গিয়ে তিনি সন্ধান পেলেন আমেরিকার। আর ভাবলেন এরাই বুঝি ইন্ডিয়ান। ভিন্ন গোত্রের সংগে বিরোধ ঘটলে এরা লাল রং মাখতো কপালে এবং গালের দু-পাশে। তার জন্যে পরেকার যুগে নাম হলো এদের রেড-ইন্ডিয়ান। কলম্বাসের সংগে ছিলো ইউরোপের শ্বেতাঙ্গ দখলদার বাহিনী। গায়ে রং মুখে রণডংকা বাজিয়ে এরা বাধা দিলো শ্বেতাংগ হানাদারদের। গুলি চালিয়ে পাখির মতন মারা হলো এই সাহসী এশিয়ান আবাদকারদের। দখল হলো তাদের জোতজমি, গ্রাম-জনপদ।

কলম্বাসের পা পড়বার পরেই গড়ে উঠতে লাগলো আমেরিকার মাটিতে একটার পর একটা শ্বেতাংগ উপনিবেশ। মেরে-কেটে সাফ করা হলো আদিম আমেরিকানদের গোষ্ঠীর পর গোষ্ঠী। দেখতে দেখতে মহাদেশটা বেহাত হয়ে গেলো রূপকথার ইউরোপার বংশধরদের কাছে। রেড ইন্ডিয়ানরা দেখতে ছিলো তামাটে। নাক-মুখ-চোখের আদল ছিলো এদের মোঙ্গলিয়ান আকৃতির। কিন্তু স্বভাবে ছিলো সহজ-সরল। কেউ ক্ষতি করলে রেগে যেতো অল্পতেই। ঝাঁপিয়ে পড়তো তখন শত্রুর ওপর। তাই এদের খেতাব ছিলো ওরা জংলি, বর্বর। অঢেল ছিলো এদের সোনাদানা, মণিমুক্তো। দু-চার প্রস্ত সুতিকাপড়, পুঁতির মালা, জামা-জুতো আর তামাকের বিনিময়ে সেসব হাতিয়ে নিলো ধড়িবাজ ইউরোপীয়রা। তাহলে বর্বর ছিলো কারা?

রেড-ইন্ডিয়ান বলতে এখন দুই আমেরিকায় আছে মাত্র দু-চার লাখ লোক। বাস এদের সংরক্ষিত এলাকায়। কালেভদ্রে চোখে পড়বে বিষণ্ন মুখ দু-একজনকে। এদের উন্নত চারুকলা আর সভ্যতার প্রাচীন নিদর্শনের মতোই এরাও এখন স্থান নিয়েছে মার্কিন জাদুঘরে।

ইউরোপ এবং আমেরিকার মাত্র মাইল কয়েক ব্যবধানে থেকেও হাজার-হাজার

www.pathagar.com

যোজন দূরত্ব যেনো এশিয়ার মাঝখানে এই দুই শ্বেতাঙ্গ মহাদেশের। অথচ এশিয়ার জঠরেই এদের জন্ম। সভ্যতা শিখিয়েছে এদের এশিয়া। অন্ধকার যুগের ইউরোপকে সাংস্কৃতিক জাগরণের মন্ত্রে দীক্ষাও দিয়েছে এশিয়া। তারপরও ট্রয়ের যুগ থেকে এই শতাব্দীর বিদায়-পর্ব পর্যন্ত সামরিক-বাণিজ্যিক আগ্রাসনে এশিয়াকে তছনছ করে চলেছে পশ্চিমের শ্বেতাঙ্গ-দুনিয়া। তাদের গণতন্ত্র, মানবিকতা আর শান্তির ললিতবাণী আজ এক নিষ্ঠুর, ব্যর্থ পরিহাসই কেবল। মিথ্যে আজ গ্রিক রূপকথার রাখলিনী ইউরোপা আর রাখাল যুবক এশিয়ার ঘর বাঁধার কাহিনী। তেল এবং পানির মতোই তারা আলাদা। বাস তাদের পৃথক ঘরে।

বোধকরি এ সত্যটা বুঝতে পেরেই কবি কিপলিং বলেছিলেনঃ 'ইস্ট ইজ ইস্ট এ্যান্ড ওয়েস্ট ইজ ওয়েস্ট। টুইন শ্যাল নেভার মিট।' (East is East and West is West. Twin shall never meet.) ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস, গুরুকে আজ লাঠি ঠ্যাঙা করছে শিষ্য। শিক্ষাদীক্ষা, ধনজন, পণ্যসম্ভার দিয়েও অকৃতজ্ঞ-অভাজন শিষ্যের মন যোগাতে পারলো না দরাজ প্রাণের গুরু। এ দুঃখ রাখা যাবে কোথায়?

শ্বেতাঙ্গ পর্যটক মার্কো পোলো তাঁর কাঁধের ঝুলিতে জ্ঞানের এসব উপাচার ভরে নিয়েই দূরপ্রাচ্য থেকে বাংলাদেশ ছুঁয়ে যাত্রা করেছিলেন ইউরোপের পথে। তাঁর স্বদেশ ভেনিসের দিকে। ঝুলিতে ছিলো তাঁর পেইপিংয়ের ছাপাখানায় মুদ্রিত সংবাদপত্রের কপি, সংস্কৃতে লেখা কয়েক খন্ড বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ। ছিলো চীনের তুলোট কাগজ, বাংলার শীতলক্ষ্যা তীরের কাগজকলে গাছের বাকলের মণ্ডে তৈরি কিছু ইয়েলো পেপার। হয়তো দু-এক প্রস্ত মসলিন ও ছিলো তাঁর ব্যাগে।

চীনা ভাষা শিখেছিলেন মার্কো। চীনারা তাদের দেশকে বলতো চিন্‌চিয়া। কুবলাই খান মার্কোর বিদায়ের সময় বারবার উচ্চারণ করেছিলেন ঃ চায়ে-চিয়েন । চায়ে-চিয়েনঃ ফান ইও। যার মানে ছিলঃ বিদায়, বিদায়! হে বন্ধু। মার্কো জবাবে বলেছিলেন ঃ চু-নি, চু-নি। আপনার মঙ্গল হোক। মঙ্গল হোক আপনার। বাংলাদেশের লোকেরা জাহাজ পর্যন্ত এগিয়ে তাঁকে জানিয়েছিলো বিদায়। বলেছিলো ঃ শুভ হোক যাত্রা তোমার। শুভ হোক। এ রকম ভালোবাসা ভুলেও কী কখনো এশিয়ানদের দিয়েছে শ্বেতাঙ্গরা? সুন্দরবনের দক্ষিণে আধুনিক হিরণ-পয়েন্ট ধরে হুগলির সপ্তগ্রাম বন্দরে নোঙর করেছিলেন মার্কো। সেখানে দেখাশোনা করলেন চীনের ব্যবসাপতি। মাস কয়েক থাকলেন। তারপর জাহাজ ভাসালেন উড়িষ্যার মহানদী, অন্ধ্রের কৃষ্ণা-গোদাবরির মোহনার দিকে। সেখান থেকে ধরলেন মাদ্রাজ বন্দর হয়ে তামিলনাড়ু আর শ্রীলংকার মাঝখানের পক্ প্রণালির তটরেখা। সামনে কেরালার শেষ মাথায় ভারতের সর্বদক্ষিণ অন্তরীপ কন্যাকুমারিকা। এখানে কিছুকাল থেকে পাড়ি দিলেন কোচিন-কালিকট-মাহি বন্দর হয়ে কর্ণাটকের গোয়ায়। সেখানে থেকে আরব সাগরের পূর্বতটে মহারাষ্ট্রের সমুদ্রবন্দর বোম্বাইতে এসে নামলেন। সামনে কাম্বে উপসাগরের দমন, দিও এবং প্রাচীন সুরাট বন্দর। আরো কচ্ছ উপসাগর তটে গুজরাটের পোর

www.pathagar.com

বন্দর। মার্কোর ভারত ভ্রমণের পাঁচশ' বছর পরে যেখানে বাস করেছেন গান্ধীজির পূর্ব-পুরুষেরা। গান্ধীজি নিজও এই শহরে ছিলেন অনেক বছর।

এখান থেকে কয়েক বাঁক উত্তরেই সিন্ধু নদের মোহনা। কাছেই একালের করাচি। উত্তর দিকটায় দ্রাবিড়-সুমার সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র মহেনজোদারোর ধ্বংসাবশেষ। যার মানে এখন মৃতের নগরী। মার্কো এই দীর্ঘ তটরেখা ধরে মোড় নিলেন পারস্য উপসাগরের দিকে। থামলেন বন্দর আব্বাসে। উপসাগরের যেখানে শেষ তার মাথায় শাতিল-আরব। অর্থাৎ দজলা-ফোরাতের মোহনা। মুখে বসরা বন্দর। এখানে এসে শেষবারের মতন জাহাজ ভিড়ালেন মার্কো। চাপলেন উটের পিঠে। পেছনে চললো তাঁর লোকজনের কাফেলা। মরুভূমি পেরিয়ে গেলেন ইস্পাহান। কুবলাই খানের নববধূ ইরানের শাহজাদিকে পৌঁছে দিলেন চীনের উরুমচি সীমান্তে। ফিরে এলেন ফের বসরায়। সেখান থেকে হারুনুর রশিদের রূপময় নগরী বাগদাদ। উত্তরে তুরস্ক- আর্মেনিয়ার তুষার গিরি আরারত। তারপরেই কাস্পিয়ান সাগর তীর থেকে উত্তর-পশ্চিমে কৃষ্ণসাগর তীর পর্যন্ত ককেশাস পর্বতমালার সুদীর্ঘ বাহু। দেড় হাজার মাইল যার বিস্তার।

স্থলপথ ছেড়ে ফের সাগর ধরলেন মার্কো। কৃষ্ণসাগর পেরিয়ে নামলেন ওপারের ক্রিমিয়া উপদ্বীপে। এখান থেকে দানিয়ুব চলে গেছে দক্ষিণে এথেন্সের দিকে। তার মোড় ঘুরে ইজিয়ান সাগরে জাহাজ ভাসালেন এবার মার্কো। এলেন তাঁর আপন ভূবন ভেনিসে। চোখ জুড়ে নামলো অশ্রু। ফিস্‌ফিসিয়ে বললেনঃ ভেনিস, ভেনিস মাই লাভ!

কত বছর কেটে গেলো তাঁর প্রাচ্যে! সতেরোটা বছর। প্রায় পুরো দেড় যুগ! হাফ এশিয়ান তিনি এখন। চলন-বলনে একজন চৈনিক, খানিকটা ইন্ডিয়ান, খানিকটা পারসিক। আর কিছুটা বাঙালি।

এক আজব, ব্যতিক্রমী মানুষ মার্কো। একমাত্র তাঁর মাধ্যমেই ঘটেছে ইউরোপ-এশিয়ার মিলন। তিনি ছিলেন ওয়াইজম্যান অভ্‌ দ্য ইস্ট। আমাদের আধুনিক সাংবাদিকতার ভাষায় তিনি ছিলেন মধ্যযুগের প্রথম এশিয়ান রোবিং রিপোর্টার। আত্মা আবিষ্কার করেছিলেন তিনি প্রাচ্যের। অগ্রসর এশিয়ার জ্ঞানের মশাল হাতে নিয়ে ফিরেছিলেন ইউরোপ। প্রথমেই তার আলোকে জাগিয়ে তুললেন ভেনিসকে। চীনের ধাঁচে কাগজকল, ছাপাখানা গড়ে উঠলো সেখানে। সীজারের রোমের পর অষ্টম শতকে চীনের পেইপিং শহর থেকে বেরিয়েছিলো এশিয়ার প্রথম সংবাদপত্র। তার দেখাদেখি ভেনিস থেকে বেরুলো তৃতীয় সংবাদপত্র। নাম হলো তার 'নোটিজে ব্রিতে'। পাঠকদের কাছে ডাকে যেতো এ কাগজ। সামান্য চাঁদা দিতে হতো পড়ুয়াদের। পয়সা দিয়ে কাগজ কেনার নিয়ম প্রথম চালু হলো ভেনিসেই। মার্কোর শহরই হলো ইউরোপের সংবাদপত্র জগতের শুরু। প্রেরণার উৎস ছিলেন মার্কো স্বয়ং। চীনের ব্লকের ছাপাখানায় তিনি দেখে এসেছিলেন সংবাদপত্র ছাপা হতে। চীনের ধাঁচে দেখতে দেখতে রেশম শিল্প কারখানা গড়ে উঠতে লাগলো এথেন্সে।

www.pathagar.com

গড়ে উঠলো চিত্রশালা। একটার পর একটা। কদর বাড়লো চিত্রকরদের।

মার্কোই ছিলেন ইউরোপের রেনেসাঁর অগ্রচারণ। ভেনিসের পর রেনেসাঁর জোয়ার বইলো ফ্লোরেন্সে। ১৩২৪ সাল পর্যন্ত প্রায় আশি বছর বেঁচে ছিলেন মার্কো। এ সময় থেকেই শুরু এখানে সাহিত্য- চিত্রকলা আর বুদ্ধিবৃত্তির নবজাগরণের। ফ্লোরেন্সেই জন্ম মহাকবি দান্তের, মাইকেলঅ্যান্‌জেলো এবং লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চির। ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য 'ডিভাইন কমেডি'র রচয়িতা দান্তে ছিলেন মার্কোর সমসাময়িক। মাইকেলঅ্যানজেলো ছিলেন একাধারে শিল্পী এবং কবি। দা-ভিঞ্চি ছিলেন শিল্পী এবং লেখক। সনেটিয়ার পেটরার্ক, কথাশিল্পী বোকাসিও এবং ঐতিহাসিক ভিলানি ছিলেন একই যুগের লোক। রেনেসাঁর মধ্যমণি ছিলেন এই কবিকুল, লেখক এবং শিল্পীগোত্র। এঁদের মেলবন্ধনের সূত্র ছিলেন মার্কো।

ইতালি থেকে জ্ঞানের জাগরণ তরংগিত হলো প্রথম ফ্রান্সে। সেখান থেকে পল্লবিত হলো স্পেনে, জার্মানিতে, পর্তুগালে, নেদারল্যাণ্ডস্। সবশেষে ইংল্যান্ডে। জার্মানির পুনর্জাগরণের যুগে জন্ম আধুনিক মুদ্রণ জগতের প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ গুটেনবার্গের। মার্কোর মৃত্যুর ছয় দশক পরে তার আবির্ভাব। জার্মানির মেইন্‌জ শহর জন্মস্থান তাঁর। স্ট্রাসবুর্গ তার কর্মকেন্দ্র। এখানেই ছাঁচে গড়ে আবিষ্কার করলেন তিনি চলমান টাইপ-কাস্টিংয়ের আধুনিক রীতি। মার্কোর 'প্রাচ্য ভ্রমণ বৃত্তান্তে' বর্ণিত চীনের ব্লক ছাপাখানার কাহিনী পড়েছিলেন গুটেনবার্গ। সেই অধ্যয়ন থেকেই তার এ বিস্ময়কর আবিষ্কার। যার কল্যাণে হাজার দুয়ার খুলে গেলো আজ মুদ্রণ শিল্পের। তার পাশাপাশি সংবাদপত্র দুনিয়ারও।

বিশ্ব সভ্যতায় মার্কোর এই বিচিত্রগামী ভূমিকার জন্যেই আমার এত কথা তাঁকে নিয়ে। তাঁর পথ ধরেই বাগদাদ হয়ে যাচ্ছিলাম আমি উত্তর-পূর্ব ইউরোপে। সেকালের সোভিয়েত দেশে।

আরব্য-রজনীর শহরে এসে ডানা গুটিয়ে বসেছিলো সিন্দ্‌বাদের প্রকাণ্ড রক পাখিটা। এখানে তা এক ঘন্টা বিশ্রাম। সংগে ছিলেন পাবলভ্। ঢাকার সোভিয়েত দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারী। আমাদের সফর-সহচর এবং গাইড। কখন চোখ জুড়ে ঘুম। নেমেছিলো বলতে পারবো না। কানের কাছে কেবল শাঁ-শাঁ শব্দ হচ্ছিলো এতক্ষণ বিশাল ডানার বোয়িংয়ের। হঠাৎ পাবলভের হাতের ছোঁয়ায় ঘুম ভাংলো। ফিসফিসিয়ে তিনি বললেনঃ বাগদাদ এসে গেছি আমরা। বাগদাদ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। বাগদাদ। সিটি অভ্ দ্য অ্যারাবিয়ান নাইটস। নাবিক সিন্দ্‌বাদের শহর?

চোখ চলে গেলো জানালার বাইরে। বিজলি বাতির ঝকমকে আলো এয়ারপোর্ট জুড়ে। এ-দিকে ও-দিকে সার সার প্লেন। কখনো-সখনো আকাশের চূড়ায় সার্চ লাইটের ঝলক। কোনো আন্তর্জাতিক রুটের আধুনিক রক পাখির নামবার সংকেত। বিমান বন্দরের বাইরে জমাট অন্ধকার। ইতিহাস আবার এক্কা-দুক্কা খেলতে শুরু করলো আমার মনে। খুঁজছিলাম আমি পুরনো বাগদাদকে। খুঁজছিলাম দজলার সেই

www.pathagar.com

ঘাটটিকে। যেখান থেকে জাহাজ ভাসিয়ে ভারত মহাসাগর, আরব সাগর পাড়ি দিয়েছিলেন সিন্দবাদ। নোঙর করেছিলেন আফ্রিকার রহস্যঘেরা পাহাড়-অরণ্যের তটরেখায়। পাল তুলে দিয়ে এসে নেমেছিলেন বোম্বের মালাবার উপকূলের তীরে। ভারতের সওদায় জাহাজের খোল ভরে নিয়ে ফিরছিলেন ফের বাগদাদে। দজলা বন্দরে।

পণ্যের লটবহরের সংগে পুরনো পৃথিবীর কত সংবাদই না বয়ে এনেছিলেন বাগদাদের এই সওদাগর। বয়ে এনেছিলেন মালাবার করমন্ডল উপকূলের সভ্যতার সংবাদ। বাংলাদেশের রাজপুরীর গল্পকথা। বাগদাদের বাণিজ্য-মেলায় এক যাদুর ঘোড়ার খেলা দেখাচ্ছিলো কোনো এক কারিগর। আধুনিক বিমানের মতন দুই ডানা ছিলো সেই ঘোড়ার। ডানার নিচে ছিলো একটি বোতাম। ওটা টিপলেই কলের ঘোড়াটি উঠতো আকাশে। উড়ে চলতো মেঘ ছুঁয়ে, সাগর-পাহাড়ের ওপর দিয়ে। ভ্রমণ করতো দেশের পর দেশ। আরেকটি বোতামে হাতের ছোঁয়া না লাগলে শেষ হতো না তার আকাশ বিহারের।

এ রকম এক কলের ঘোড়ায় চেপে বাংলাদেশে এসেছিলো বাগদাদের এক শাহজাদা। রাত ছিলো তখন নিশুতি। আকাশের চূড়া থেকে নিচের এক বাড়িতে বাতি জ্বলতে দেখলো রাজকুমার। অমন গভীর রাতে কেন জ্বলে বাতি? আগ্রহ বাড়তে থাকলো ইরাকের আকাশচারী তরুণের মনে। আরেকটি বোতাম টিপতেই কলের ঘোড়াটি সোজা এসে নামলো বাংলাদেশের এক রাজপুরীর ছাদে। যার নিচের তলায় বাতির আলোতে চলছিলো নাচ-গানের জলসা। নাচিয়ে -গাইয়েরা সবাই ছিলো সুদর্শনা তরুণী। মাঝখানে সোনার পালংকে বসা উর্বশী রাজকন্যা।

বাগদাদের ছেলে ছাদের সিঁড়ি ভেঙে চুপিসারে নেমেছিলো নিচে। একান্তে দাঁড়িয়ে দেখলো দৃশ্যটা। দেখলো খোলা তলোয়ার হাতে চার পাশে দাঁড়ানো একদল নারী-প্রহরী। তাদের চোখ বাইরে ফটকে, আঙিনার সবুজ উদ্যামে। হঠাৎ পায়ের শব্দ শুনে উৎকর্ণ হলো সবাই। দেখলো এক অচেনা যুবক দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়ির এক কোণে। এত রাতে কেমন করে ঢুকলো এক ভিনদেশি এই নিষিদ্ধ পুরীতে তলোয়ারের মুখে তাকে ধরে এনে রাজকুমারীর সামনে দাঁড় করালো প্রতিহারিণীরা।

আপাদমস্তক খুঁটে-খুঁটে তাকে দেখলো বঙ্গোপসাগর তীরের রাজার মেয়ে। দেখলো গায়ে তার রাজকীয় পোশাক। অঙ্গ থেকে চুইয়ে পড়ছে রূপের জৌলুস। ধুয়ে পড়ছে তারুণ্যের দীপ্তি। বিমুগ্ধ দৃষ্টি তার নিবদ্ধ বাংলার মেয়ের কান্তিকলাময় মুখমন্ডলে। অপলক চোখে দুজন দেখছে দুজনকে। মুখের ভাষার বদলে চোখের ভাষায় কথা হলো তাদের। এক সময় হাতের ইশারায় সখিদের সরে যেতে বললো রাজকুমারী। পরে দৃশ্যে ঘটলো এক অভাবনীয় নাটক। বাগদাদের ছেলের হাত ধরে ছাদে উঠে এলো পদ্মা-মেঘনা পারের রাজকন্যা। চেপে বসলো আরব-রাজপুত্রের পাশে, কলের ঘোড়ায়। বোতামে টিপ দিতেই আকাশে উঠলো ডানাঅলা ঘোড়া। বঙ্গোপসাগর, আরব সাগর পেরিয়ে উড়ে এসে সোজা বাগদাদ। এ গল্প আরব্য-

www.pathagar.com

উপন্যাসের। আলেফ-লায়লার। এর অপূর্ব বর্ণনা আছে ওরিয়েন্টাল টেলস-এর 'এন্‌চান্‌টেড হর্স' উপাখ্যানে। বইটি আমরা পড়েছি চল্লিশ দশকে নাইন-টেনের ক্লাসে। সিন্দ্‌বাদের যুগের কাহিনী এটি। সেকালে বাগদাদে নিশ্চয় গবেষণা চলছিলো উড়োজাহাজ আবিষ্কারের খুঁটিনাটি নিয়ে। গল্পের কলের ঘোড়াটি ছিলো অবিকল আধুনিক হেলিকপ্টারের মতন। ইঞ্জিনের বোতাম টিপলেই এটি আকাশ বিহার করে নামতে পারতো যে-কোনো বড়ো বাড়ির ছাদে। কিংবা এক-চিলতে উঠোনে। হাজার এক রজনীর উপন্যাসের লেখক তার কল্পনার আকাশ-যানের সংগে জুড়ে দিয়েছেন একটি নৈশ অভিসার দৃশ্য। যেখানে বাগদাদের রাজকুমার দেড় হাজার বছর আগে উড়োজাহাজে চেপে চলে আসে সরাসরি বাংলাদেশে। আর বাংলার মেয়েকে ঘরণি করে সোজা নিয়ে যায় তাইগ্রিস নদীর পারে। তার দেশের বাড়ি। সেকালে ইরাক আর বাংলার নিবিড় সম্পর্কই ছিলো এ-কাহিনীর মূল বিষয়বস্তু।

সিন্দ্‌বাদের সময় দজলা-ফোরাত বন্দরের বণিকেরা বেসাতি করতে আসতেন আরব সাগরের তীরের মালাবার, কাম্বে, সুরাট বন্দরে। আসতেন বঙ্গোপসাগরের করমন্ডল উপকূলে, কৃষ্ণা-গোদাবরির মোহনায়। জাহাজ ভিড়াতেন বাংলার তাম্রলিপ্তি, সপ্তগ্রাম, সুবর্ণগ্রাম আর চট্টগ্রাম বন্দরে। বাংলার জাহাজ মসলিন, তুলা, মসলাপাতি নিয়ে নোঙর করতো বসরায়, বাগদাদে আর পশ্চিমের আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে। বাংলার লবণ, আদা-রসুন না হলে চলতো না আরবদের। খলিফা হারুনের বাবুর্চিখানায় সুস্বাদু খাবারই জুটতো না আমাদের পেঁয়াজ, মরিচ আর ধনে না হলে।

ঘন্টা চারেক আগে ঢাকা থেকে উড়ে চলেছিলাম একটানা উত্তর-পশ্চিম মুখো হয়ে। মাঝখানে গাঙ্গেয় উপত্যকার শহর কলকাতা। আকাশ থেকে দেখলাম তার আলোর ঝালর। উত্তরে যমুনার উপত্যকা। ঘন্টাখানিক উড়তেই পশ্চিমে ভারতের মধ্যপ্রদেশ। দক্ষিণে ঢালু হয়ে নেমেছে এখানটায় বিন্ধ্য পর্বত। পাশেই বয়ে চলেছে নর্মদার রুপোলি ধারা। মাথার নিচে নীলগিরি পাহাড়টার উঁচু চূড়া। কবি কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যের নায়ক স্বর্গচ্যুত যক্ষ বন্দী ছিলো নীলগিরি গুহায়। বিরহ-বেদনায় প্রিয়তমা সংগিনীর জন্যে ছটফট করছিলো নির্বাসিত যক্ষ। কী করে সে তার বুকভাঙা বেদনার কথা জানাবে তার প্রিয়ংবদাকে?

একটার পর একটা ঋতু চলে যায়, চলে যায় হেমন্ত-শীত, বসন্ত-গ্রীষ্ম। আসে বর্ষা। আসে আষাঢ়। বঙ্গোপসাগর থেকে পূর্বমেঘ এসে ভাসতে থাকে নীলগিরির আকাশে। যক্ষ মিনতি জানায়ঃ ওগো পূর্ব মেঘ, একদণ্ড দাঁড়াও পাহাড় চূড়ায়। দয়া করে আমার দূত হয়ে যাও আমার প্রিয়ার কাছে। সংবাদ দিয়ো তাকে ধুঁকে-ধুঁকে মরছি আমি তার বিরহ-যাতনায়। এই পার্বত-গুহায় বছরের পর বছর কেটে গেলো আমার কেবল তারই ভাবনায়। আর এক মুহূর্তও যে আমার সয় না তার সঙ্গশূন্য এ নির্বাসন। ভাসতে-ভাসতে আসে উত্তুরে মেঘ। তাকেও একই মিনতি জানায় যন্ত্রণাকাতর যক্ষ।

www.pathagar.com

কাছেই ছিলো উজ্জয়িনী নগর। গুপ্ত সম্রাটদের এককালের কিংবদন্তিখ্যাত রাজধানী। তার এক প্রাসাদ-শীর্ষে বসে রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাকবি ছন্দের পর ছন্দ গেঁথে 'মেঘদূত' কাব্যে ফুটিয়ে তুললেন বিরহী যক্ষের মর্মযাতনা। রবীন্দ্রনাথ যক্ষের দুঃখে বিগলিত কালিদাসের পংক্তিমালাকে স্মরণ করে তাঁর 'মেঘদূত' কবিতার ছন্দারোপ করলেন শান্তি নিকেতনে বসে। সময়টা ছিলো ১২৯৭ সনের সাত এবং আট জ্যৈষ্ঠ। লিখলেনঃ 'কবিবর, কবে কোন, বিস্মৃত বরষে, কোন পুণ্য আষাঢ়ের প্রথম দিবসে লিখেছিলেন মেঘদূত। মেঘমন্দ্র শ্লোক, বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক- রাখিয়াছে আপন আঁধার স্তরে-স্তরে, সঘন সংগীত মাঝে পুঞ্জীভূত করে। .... পাঠাতে চাহিয়াছিলো প্রেমের বারতা অশ্রুবাষ্পভরা- দূর বাতায়নে যথা বিরহিনী ছিলো শুয়ে ভূতল-শয়নে, মুক্তবেশে ম্লান বেশে সজল নয়নে।'

অন্য এক অনুচ্ছেদে লিখলেনঃ 'ভারতের পূর্ব শেষে, আমি বসে আছি সেই শ্যাম বঙ্গদেশে- গৃহত্যাগী মন মুক্তসঘন মেঘশীর্ষে লয়েছে আসন, উড়িয়াছে দেশ-দেশান্তরে। কোথা আছে সানুমান আম্রকূট, কোথা বহিয়াছে বিমল বিশীর্ণ রেবা বিন্ধ্যপাদমূলে উপলব্যথিত গতি, বেত্রবতী কূলে পরিণত ফল শ্যামজম্বু বনচ্ছায়ে- কোথায় দশান গ্রাম রয়েছে লুকায়ে, প্রস্ফুটিত কেতকীর বেড়া ঘেরা, পথ-তরু শাখে কোথা গ্রাম-বিহঙ্গরা বর্ষায় বাঁধিছে নীড় কলরবে ঘিরে বনস্পতি। .....এই মতো মেঘরূপে ফিরি দেশে-দেশে হৃদয় ভাসিয়ে চলে উত্তরিতে শেষে, কামনার মোক্ষধাম অলকার মাঝে, বিরহিনী প্রিয়তমা যেথায় বিরাজে- সৌন্দর্যের আদি সৃষ্টি।'....

যক্ষের মতো আমারও কল্পনা ভর করে উড়ে চলছিলো মেঘের পিঠ ছুঁয়ে। পূর্বমেঘকে ভাসতে দেখলাম গঙ্গা-যমুনার আকাশে। আর নীলগিরির চূড়ায় ভাসছিলো উত্তুরে মেঘ। কালিদাসের উজ্জয়িনীনগর এখন ভাঙা ইটের এক ধ্বংসস্তূপ। অতীতের দীর্ঘশ্বাস কেবল। তার ওপর দিয়েই উড়ছিলাম নর্মদার আকাশে। নর্মদা বিন্ধ্য'র পাদমূল ধুয়ে বরোদার দক্ষিণে মোড় নিয়ে পড়েছে আরব সাগরের কাম্বে উপসাগরে। আধুনিক ভূপালের সামান্য পশ্চিমে চম্বল নদীর তীরে প্রাচীন উজ্জয়িনী। চম্বল রাজস্থানের পুর্ব সীমান্তের নদী। এসেছে মথুরা এবং আগ্রা ছুঁয়ে যমুনার বুক থেকে। দেয়াল-চিত্রের ঐতিহাসিক গুহা অজন্তা, ইলোরা বিন্ধ্য সভ্যতার রত্নাগার। ঔরাঙ্গাবাদের ঠিক উত্তরে অশোকের যুগের এই যমজগুহা পশ্চিম-দক্ষিণে আহমদনগর এবং বোম্বে। পশ্চিম-উত্তরে সুরাট বন্দর। কালিদাসের যুগের রেবাই হয়তো একালের নর্মদা। কিন্তু আম্রকূট, বেত্রবতী এখন কোন্ নদীর নাম জানি না। দশান গ্রাম ছিলো নীলগিরির পাদমূলে। যক্ষ যার উদ্যানে বিচিত্রবর্ণ ফুলের সমারোহ দেখতো বর্ষা ঋতুতে।

রাতে পাশের কোনো শহরের আলোর ঝলকে দেখছিলাম বিন্ধ্য'র কালো চূড়াগুলো। তার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিলাম রবীন্দ্রনাথের শ্যাম বঙ্গদেশ থেকে। তার মতোই গৃহত্যাগী মন আমার আসন নিয়েছিলো মেঘের শিখরে। বাগদাদের যুবার যাদুর ঘোড়ার মতন উড়ে চলছিলো অ্যারোক্রাফ্ট দেশ থেকে দেশান্তর। পদ্মা-যমুনা-গঙ্গা আর গোদাবরি নর্মদা বিশাল উপমহাদেশের বুক ছুঁয়ে যাচ্ছিলো সিন্দবাদের

www.pathagar.com

দেশের দিকে। বোম্বের আকাশে উড়তেই একনজর দেখলাম মালাবার পাহাড়ের ঘরবাড়ির আলো। এই পাহাড় আর তার বন্দরকে নিয়েও অনেক গল্প আছে আরব্য উপন্যাসে। সিন্দবাদ একবার এখান থেকে আদা আর তার সংগে দুর্লভ মণিমুক্তো নিয়ে ফিরছিলেন বাগদাদ।

তখনো ঘুম তীর ঘেঁষেনি চোখের। বড়ো সাধ ছিলো আরব সাগরটাকে দেখবার। বোয়িংয়ের জানালা গলিয়ে নিচের দিকে কেবল হাঁটাহাঁটি করছিলো চোখ। কখনো মনে হচ্ছিলো কালিদাসের কথা, তাঁর মেঘদূতের কথা। আর তাঁর কাব্য-উপ্যাখ্যানের নায়ক বিরহী যক্ষের হাহাকারের কথা। রবীন্দ্রনাথও তার কালিদাসের স্মৃতিকথা নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন মনের উপান্তে। এই তো মাত্র কিছুক্ষণ আগে ছাড়িয়ে এলাম কালিদাসের বিন্ধ্যচল, তার মেঘদূতে বর্ণিত নির্বাসিত যক্ষের নীলগিরি।

কিন্তু আরব সাগরের আকাশে সাঁতার দিয়ে দেখা হলো না তার মুখ। শুধু মাঝে মধ্যে অনেক নিচে দেখছিলাম ভাসমান জাহাজের সার্চলাইটের আলো। এক নজর দেখা যাচ্ছিলো কালো কালো। ঢেউয়ের জলতরঙ্গ লীলা। বাস্, এইটুকুই। আর সবই গাঢ়-গভীর তমিস্রা। কানে বোয়িংয়ের একঘেঁয়ে ছন্দোময় ঝাঁঝাঁ শাঁশাঁ। সুতরাং ঘুম জেঁকে তো বসবেই নয়নপাতে। তার আর কী দোষ?

কিন্তু গভীর রাতে নেমে বাগদাদের চেহারাটাও তো দেখা হলো না। শুধু 'অ্যারাবিয়ান নাইটস'-এ পড়া গল্পের স্মৃতি। তার ছবি। নায়ক-নায়িকাদের রহস্যময় মুখ। তাদের ফিসফিসানো শব্দ, হাঁটা-চলার মৃদু আওয়াজ। পাশেকার দজলা নদীর তীর ধরেই তো বণিকের ছদ্মবেশে রাতের বেলা হাঁটাহাঁটি করতেন খলিফা হারুন। কখনো পাশে থাকতেন প্রধানমন্ত্রী জাফর বারমেকি। ইরাকের বিখ্যাত রাজনৈতিক পরিবারের পণ্ডিত ব্যক্তি। কখনো থাকতেন দরবারের রসিক শ্রেষ্ঠ কবি আবু নুয়াস। হারুনের কল্যাণে 'কিং ফর ওয়ান ডে' হয়েছিলেন অতিথিবৎসল ছন্নছাড়া যুবক আবু হোসেন। একদিনের জন্যে খলিফা হয়ে স্বার্থপর, ছিদ্রান্বেষী মোল্লাকে সাজা দিয়েছিলেন তিনি গাধার পিঠে উল্টোমুখে বসিয়ে।

হাজারো উপাখ্যানের শহর এই বাগদাদ। এককালে কত জৌলুস ছিলো তার। দজলার তীর জুড়ে ছিলো প্রাসাদের পর প্রাসাদ। পাথরে বাঁধা রাজপথ। দুপাশে তার ঠান্ডা এবং গরম পানির পাবলিক বাথ। অর্থাৎ জনসাধারণের জন্যে বরাদ্দ স্নানাগার। এখানে-ওখানে খেজুর কুঞ্জ খচিত রকমারি দুর্লভ ফুলের উদ্যান। খলিফা হারুনের যুগের এক রিপোর্টারের প্রতিবেদনে আছে ঃ সেকালের বাগদাদে ঘরোয়া বাথরুম ছাড়াও ছিলো ষাট হাজার পাবলিক টয়লেট এবং স্নানাগার। এগুলোর মেঝে এবং দেয়াল ছিলো শ্বেতপাথর আর মোজাইকের। কোনো কোনো বাথরুম ছিলো তিন কামরার। আলো- বাতাস খেলবার জন্যে কাছের বড়ো জানালা থাকতো দেয়ালে। ঝরণা এবং বাথ-টাব থাকতো গোসল-ঘরে। সাবান, আতর চন্দনচূর্ণ আর কর্পূর ব্যবহার করতেন অভিজাত ঘরের মহিলা এবং পুরুষ স্নানার্থীরা। সুগন্ধি-দ্রব্য আর টাওয়েল থাকতো আরেকটি কামরায়। আরেকটিতে বদলানো হতো পোশাক।

www.pathagar.com

অন্য রিপোর্টারের বর্ণনায় আছে বাগদাদ শহরের গোড়াপত্তনের ইতিহাস। তিনি লিখেছেন : ৭৪৭ খ্রিস্টাব্দে উমাইয়া সাম্রাজ্যের পতন ঘটানোর পর প্রথম আব্বাসীয় খলিফা আল- মনসুর বিমুগ্ধ হলেন, তাইগ্রিস নদীতীরের ভৌগোলিক অবস্থান আর তার নৈসর্গিক সৌন্দর্য এখানে ছিলো তখন খেজুর কুঞ্জের এক বিশাল উদ্যান। বাগানটি ছিলো 'দাদ' নামের এক শেখের। আরবিতে বাগানকে বলা হয় 'বাগ'। দাদ মালিক ছিলেন বাগটির বলে জায়গাটির নাম হয়েছিল বাগ-ই-দাদ। অর্থাৎ দাদের বাগান। বাগ-ই-দাদ থেকেই নতুন গড়া শহরের নাম বাগদাদ।

এছাড়াও অনেক কিংবদন্তি আছে এই শহরের নাম নিয়ে। কিছু দূরেই ইউফ্রেতিস নদী। যার ঐতিহাসিক নাম ফোরাত। এর তীরেই প্রাচীন ব্যাবিলন নগরী। এটি ছিলো সাড়ে চার হাজার বছর আগেকার প্রাচ্য সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র। এখানে এসে মিলিত হয়েছিলো সূমারীয়, আসিরীয়, মিসরীয়, হিব্রু, আরব-পারসিক, গ্রিকো-রোমান এবং বাইজান্তাইন সভ্যতার স্রোতধারা। বাগদাদ থেকে মাত্র মাইল পঁচিশেক দূরে ছিলো এককালে প্রাচীন পৃথিবীর আন্তর্জাতিক জমজমাট বন্দর ব্যাবিলন পোর্ট এবং ব্যাবিলোনিয়ান সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিলো এটি। প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রথম বিধিবদ্ধ ফৌজদারি আইন-প্রণেতা রাজা হাম্মু রাব্বি। এ শহরেই ছিলো পৃথিবীর সাত বিস্ময়ের এক বিস্ময় ঝুলন্ত উদ্যান। যার নির্মাতা ছিলেন সম্রাট নাবুকাদ নিজার। নিজার তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী অমিতার ইচ্ছায় মিসর-পারস্যের স্থপতিদের দিয়ে বানিয়েছিলেন চিরবসন্তের এই আকাশ বাগিচা। যেখানে গাছে-গাছে পাখি ডাকতো, ঝরনা বইতো, ফুটতো বর্ণিল ফুল। হাওয়া বইতো পাশের ফোরাত নদীর।

অমিতা ছিলেন কুর্দিস্তানের এক আরণ্যক দেশের রাজকুমারী। তিনি ইরাকের মরুনগর ব্যাবিলনে চেয়েছিলেন সেই পাহাড়- অরণ্য, ফুল পাখি আর ঝরনার কলধ্বনিময় পরিবেশ। তাঁর জন্যেই গড়া হলো এই সবুজাভ ঝুলন্ত বাগান।

সোভিয়েত দেশ সফরের চার বছর পরে জায়গাটা দেখে এসেছি আমি। সে আশ্চর্য বাগানটা কবে মিশে গেছে ধুলোয়। তার পাশে আছে এখন একটি জাদুঘর। যেখানে দীর্ঘশ্বাস ফেলে কেবল পুরনো স্মৃতি। কিছু দূরেই ব্যাবিলনের লাল ইটের পনেরো ফুট পুরো দেয়ালের ধ্বংসস্তূপ। আর একটি বিশাল খোলা স্কোয়ার। যেখানে এক সময় প্যারেড করতো ব্যাবিলোনিয়ান সেনাবাহিনী। পাশের দরবার হলে সম্রাটের সংগে উপহার বিনিময় করতেন বিদেশি দূতেরা। এখন সেখানে শোনা যায় বুনো কপোতের কূজন।

ঘনিয়ে এলো যাত্রার লগ্ন। বাগদাদের ঘড়িতে রাত দুটো। ঢাকায় এখন ভোরের ঝলকানো রোদ। অন্ধকার মুখে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলো বোয়িং। মাইল তিনেক লম্বা রানওয়ের বুক ছুঁয়ে ছুটতে থাকলো ভোঁ-দৌড়ে। এয়ারপোর্টে শেষ মাথায় এসে দম নিলো কিছুক্ষণ। এ যেনো দীর্ঘ পথ চলবার আগে বালিহাঁসের মতন একটুখানি জিরিয়ে নেওয়া। ডানায় গতি সঞ্চার করবার জন্যে বোধকরি অমন করেই পথে দম নেয় বিশ্বপর্যটক এই পাখিরা। মিনিট দুই বাদেই আমাদের

www.pathagar.com

পংখিরাজটিও উড়লো আকাশে। বারকয়েক চক্কর দিয়ে উঠতে থাকলো উঁচু থেকে উঁচুতে। মাইকে শোনা গেলো এয়ারহোস্টেজের কণ্ঠস্বর ঃ চল্লিশ হাজার ফুট উঁচু দিয়ে আমরা উড়ে যাচ্ছি। সামনে পড়বে কুর্দিস্তানের মালভূমি, মাউন্ট আরারাত আর লেক ভান্। আরো সামনে কাস্পিয়ান সাগর আর ককেশাস পর্বতমালা। কাস্পিয়ানের দক্ষিণ-পশ্চিম তটের ওপর দিয়ে উড়ে আমাদের যাত্রাবিরতি তিফ্লিস এয়ারপোর্টে। এরপর কৃষ্ণসাগরের পুব আর কাস্পিয়ানের পশ্চিম তটের মাঝখান দিয়ে ককেশাস হয়ে মস্কো।

আমার হাতে ছিলো একটি নোটবুক। আসনের পাশে রাখা ছিলো এশিয়া ইউরোপের ছোটো একটি ম্যাপ। হ্যাণ্ডব্যাগে সোভিয়েত দূতাবাস থেকে পাওয়া প্রজাতন্ত্রগুলোর ইতিহাস, রুশ সাহিত্যের কিছু বই আর ইউরোপ এশিয়ার রাজনৈতিক বিবর্তনের একটি ইতিবৃত্ত। এটি আমার নিজের পাঠাগারের। এছাড়া ছিলো স্বাগতিকদের উপহার হিসেবে দেয়ার জন্য কিছু টুকিটাকি। ছিলো স্বাধীন বাংলাদেশের ওপর ইংরেজিতে লেখা কয়েকটি বই, দেশের মানচিত্র। আর আমাদের তথ্য এবং পর্যটন বিভাগ প্রকাশিত বহুবর্ণ চিত্রখচিত গোটা কয়েক পরিচিতি-পুস্তিকা।

আমার মন জুড়ে তখনো বাগদাদের গান। যেনো দজলা নদীর মাঝি তার ভাটিয়ালি সুরে টান দিয়ে বৈঠা হাতে চলছে ফোরাতের দিকে। সিন্দবাদ তার জাহাজের উঁচু মাস্তুলে পাল খাটিয়ে চলছেন দূরের কোনো বন্দরের পথে। আলিবাবার বাড়িটির কোনো চিহ্ন কী আছে নদীতীরের সেই পুরনো মহল্লায় ? যেখানে পিপায় গরম তেল ঢেলে দুর্দান্ত চল্লিশ চোরকে ঘায়েল করেছিলো মর্জিনা নামের দুঃসাহসী এক বুদ্ধিমতী মেয়ে। মনে পড়ছিলো জুবাইদার কথা। হারুনুর রশিদের খাস-বেগম জুবাইদা। অতুল রূপসী বিদ্যাবতী এবং কবি। আরব্য-রজনীর কাহিনীতে কতোবার ঘুরে-ফিরে এসেছে এই মহিলার নাম। এসেছে আরেকজন তিলোত্তমার কথা। যার গালে অপূর্ব সুন্দর একটি কালো তিল। এই তিলটির জন্যেই তার নাম হয়েছিলো তিলোত্তমা। খলিফার মন্ত্রীরা তাকে বলতেন তিলঅলা সুন্দরী। সত্তর হাজার দিনার দিয়ে এই মেয়েকে নিজের মহলবাসিনী করেছিলেন সৌন্দর্যের স্তাবক হারুন।

আরেকজনের প্রশস্তি গাওয়া হয়েছে উপন্যাসে, কবিতায়, আরবি সংগীতে এবং গল্পকথায়। তাওয়াদ্দুদ নামের এই মেয়েটি ছিলেন বিদূষী, বহুশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। কবিতা-সংগীত-সাহিত্য, অলংকার শাস্ত্র আর ব্যাকরণ ছিলো তাঁর নখদর্পণে। ইতিহাস-দর্শন-গণিত-গ্রহবিজ্ঞান এবং চিকিৎসা শাস্ত্রেও তাঁর তুল্য পণ্ডিত সেকালের ইরাকে আর কেউ ছিলেন না। একবার খলিফার দরবারের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতদের সবাইকে তর্কযুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছিলেন সুন্দরী শ্রেষ্ঠা এই তরুণী। অথচ এক সময় তিনি ছিলেন সামান্যা একটি বাঁদী। এক লাখ স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে তাঁকে কিনতে চেয়েছিলেন খলিফা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারেননি জুবাইদার ঈর্ষাকাতরতার জন্যে।

সেকালের ইতিহাসবিদ এবং সংবাদ-লেখকদের বর্ণনায় আছে ঃ আব্বাসীয় আমলের বাগদাদে মহিলাদের প্রতিভা নিষ্প্রভ করে দিয়েছিলো পুরুষদের জ্ঞানগরিমা।

www.pathagar.com

তাঁর অগ্রণী ছিলেন সাহিত্যে, সংগীতে, কাব্যে এবং চিত্রকলায়। বিজ্ঞান এবং রাজনীতির চর্চায়ও তাঁদের জুড়ি মেলা ছিলো ভার। জুবাইদা রাষ্ট্র চালনা করতেন মহলে বসে। বাঁদীদের মধ্যে অনেকেই আপন প্রতিভায় উদ্ভাসিত করেছিলেন মনীষার জগত। গুণপনার জোরে তাঁরা কেড়ে নিয়েছিলেন স্বাধীনতা।

এই প্রথম বাগদাদের দ্বারপ্রান্তে এসে ইতিহাস বার বার পিছু টানছিলো আমায়। কিছুতেই সরতে চাইছিলো না মন। যে শহরের কাহিনী ছোটোবেলায় এবং সাংবাদিক জীবনে এতবার পড়েছি তার ভেতরটা না-দেখেই কী ফিরে যাওয়া যায়? অথচ যেতে যে হবেই। অবশ্য মনের এ-অতৃপ্তি ঘুচেছিলো পরের যাত্রায়। আরো তিন-তিনবার আসতে হয়েছিলো তখন ইরাক সফরে। বাগদাদকে তখন দেখেছি প্রাণভরে।

এয়ারহোস্টেজের ঘোষণা শুনে মনের অজান্তেই হাত বাড়িয়ে টেনে নিয়েছিলাম মানচিত্রটা। চোখ বুলোচ্ছিলাম কোন্ পথ ধরে যাচ্ছি মস্কো। দেখলাম দজলা আর ফোরাতের উজান ধরে মসুলের দিকে পশ্চিমে বাঁক ঘুরে যাচ্ছে বোয়িং। সামনে কুর্দিস্তানের পাহাড় এবং মালভূমি। এখানেই বাস ছিলো পহলভ অর্থাৎ পারসিক রক্তধারার মেয়ে অমিতার। পারসিক ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার শাখা। যার জন্য সংস্কৃতি আর বাংলার মিল আছে কুর্দি এবং ফার্সির। তা ছাড়া কুর্দিরাও তো প্রাচীন পারসিক জাতির বংশধর। তার জন্যেই হাজার তিনেক বছর আগে কুর্দি রাজকন্যাটির নাম হয়েছিলো অমিতা। যার মধ্যে ছিলো সংস্কৃত এবং বাংলার আশ্চর্য এক সৌরভ। আবার কবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম' কাব্য-কাহিনীর সংগেও অবাক হওয়ার মতন সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় অমিতার অভিসারের।

বেত্রবতি নদীটি এখন কোথায় আছে জানি না। এক সময় এই নদীর তটেই কণ্বমুনির আশ্রমে বাস করতো শকুনদের পালিতা কন্যা শকুন্তলা। মুনি তাকে বড়ো করে তুলেছিলেন তাঁর বনের কুটিরে। অরণ্যচারিণী মেয়ে পালন করতো গোধন, বনের পশুপাখি, হরিণ শাবক। পরিচর্যা করতো আশ্রমের তরুলতা, ফলফুলের বাগিচা। গাছের বল্কল ছিলো তার পরিধেয়। বিচরণভূমি ছিলো গহন অরণ্য আর নদীতট। একদিন শিকার করতে এসে হঠাৎ করে রাজা দুষ্মন্ত দেখা পেলো রূপবতী এই আশ্রম কন্যার। হলো দুজনের মনের দেয়ানেয়া। প্রকৃতির কোল ছেড়ে চলে গেলো বনচারিণী মেয়ে রাজার প্রাসাদে। যাওয়ার আগে সে তার প্রিয় ধেনু, হরিণ শাবক, তার যত্নে বেড়ে-ওঠা তরুকুল সবাইকে গা-ছুঁয়ে আদর দিয়ে বিদায় নিয়েছিলো অশ্রুভরা চোখে।

অমিতার উপাখ্যানটিও হুবহু একই রকমের। এই বুনো মেয়ে বাস করতো তাইগ্রিস অর্থাৎ দজলা নদীর তীরে। দজলা নেমেছে আরারাত পাহাড়ের উৎসে স্নান করে। আরারাতের তুষার চূড়া এখন মধ্য তুরস্কে। চারপাশে তার কুর্দিস্তানের বিশাল মালভূমি। এটি ডানদিকে চলে গেছে ইরানে। মাঝখানে ছুঁয়েছে ইরাক। পশ্চিমে তুরস্ক, উত্তর-পুবে আর্মেনিয়া। আরো উত্তরে ছুঁয়েছে কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে রাশিয়ার ককেশাস পর্বতের চূড়া। এর মাঝখানে দজলা-ফোরাতের উজান দেশ। অর্থাৎ দুই নদীর জন্মভূমি এটি। চারদিকে বনের পর বন। আঙুর-

www.pathagar.com

নাশপাতি-খুবানির উদ্যান। উত্তর দিকে বাতাস আসে কাস্পিয়ানের। পশ্চিম-উত্তর থেকে আসে পাখির গুঞ্জনমুখর ভান্‌হ্রদের বসন্ত-হাওয়া।

উপত্যকার বুকে রাতদিন শোনা যায় ঝরনার কলধ্বনি। পাহাড় বেয়ে এঁকেবেঁকে নেমেছে এসব স্রোতস্বিনী। অরণ্যে বুনো পাখি, নায়লা আর ওরিস্ক মৃগকুলের বাস। কুর্দি কবিরা নায়লা হরিণের গভীর কালো চোখের সংগে তুলনা করেছেন তাঁদের দেশের সুন্দরী মেয়েদের ভ্রমন-কালো চোখের। এদের চোখের দৃষ্টি নাকি কাস্পিয়ান সাগরের মতন অতলান্ত। আর দজলার ঢেউয়ের মতন রহস্যময়। এখানে দোলনায় খেলা করতো অমিতা। ছুটতো নায়লা হরিণের পিছু পিছু। আর ঝিনুক কুড়োতো দজলা-সৈকতে। একদিন এখানে ঘোড়ায় চড়ে এসেছিলেন ব্যাবিলনের রাজা নেবুকাদ। কুর্দি-সর্দারের কিশোরী কন্যার কালো চঞ্চল চোখের চাহনি দেখে হয়েছিলেন বিমোহিত। সুদর্শন তরুণ ঘোড়সওয়ারকে দেখে অমিতাও হয়েছিলো বাক্‌হারা। একজিদন সে রাজার হাত ধরে চলে গেলো ব্যাবিলন। তার কালো চোখের পলকপাতে রচিত হলো ব্যাবিলনে প্যারাডাইস্‌ ইন আরথ্‌। ধুলোর ধরায় গ্রথিত হলো স্বর্গের উদ্যান।

আমরা এখন উড়ে যাচ্ছি আর্মেনিয়ার প্রাচীন রাজধানী ভান্‌ শহর এবং ভান্‌ হ্রদের উপর দিয়ে। দেড় হাজার বর্গমাইল জুড়ে নীল পানির এই বিশাল হ্রদ। এর পুব পাড়ে ভান্‌ শহর। এককালে ছিলো দেয়াল ঘেরা। আর্মেনিয়ান সভ্যতার আদি পীঠস্থান ছিলো এখানে। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে এখানে মাটি খুঁড়ে উদ্ধার করেন খ্রিস্টপূর্ব অস্টম শতকের প্রাচীন আর্মেনিয়ান শিলালিপি। আবিস্কার করেন তাদের সভ্যতার বহু মূল্যবান নিদর্শন। শহরটি ছিলো উরার্‌তু রাজ্যের ঐতিহাসিক নগরী। বাইবেলে আরারাতকে বলা হয়েছে উরার্‌তু। এক সময়ে এটি চলে যায় তুর্কিদের হাতে।

বাইবেলের বর্ণনায় আছে- তুষার যুগের শেষ মহাপ্লাবনের সময় নূহের জাহাজ এসে ঠেকেছিলো আরারাত পর্বতের চূড়ায়। সতেরো হাজার ফুট উচ্চতা এই তুষার শিখরটির। ইরানিরা এটিকে বলে কুহে-নূহ। অর্থাৎ নূহের পাহাড়। আধুনিক আর্মেনিয়ানরা বলে মাসিব। তুর্কিরা বলে আগ্‌রি-দাগ্‌। তুর্কি ভাষায় দাগ্‌ মানে পর্বত। নূহের বংশধর বলে নিজেদের দাবি করে আর্মেনিয়ানরা। ঘটনাবহুল এদের ইতিহাস। হাইক নামের এক গোত্রপতি ছিলেন এদের পূর্বপুরুষ। তিনি ছিলেন নূহের সাক্ষাৎ বংশধর। ওল্ট টেস্টামেন্টে নূহের তিন ছেলের কথা বলা হয়েছে। এঁরা সাম, হাম এবং জাফেত্‌। প্লাবনের পর নূহের জাহাজে আশ্রয় নিয়ে বেঁচে ছিলো যে-ক্ষুদ্র মানবগোষ্ঠী এরা তাঁদের পূর্বপুরুষ। এ ভাষ্য বাইবেলের।

নূহের বাসভূমি কোথায় ছিলো? কোনো কোনো পুরাতত্ত্ববিদের মতে মেসোপটেমিয়ায়। গ্রিকরা তাইগ্রিস এবং ইউফ্রেতিসের মাঝখানের উপত্যকাকে বলতো মেসোপটেমিয়া। কথাটার মানে দুই নদীর দেশ। যার নাম এখন ইরাক। আবার অনেকের মতে আনাতোলিয়া ছিলো তাঁর বাসস্থান। গ্রিকভাষায় কথাটির মানে সূর্যোদয়। এটি এশিয়ার পশ্চিমতম অংশ। মালভূমি এবং পর্বতময় এই

www.pathagar.com

উপদ্বীপের উত্তরে কৃষ্ণসাগর। পশ্চিমে ইজিয়ান সাগর। দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর। আর পুবে কাস্পিয়ান সাগর। এশিয়া-মাইনর বলতে আনাতোলিয়াকেই বোঝায়। তুরস্কের সাতানব্বই ভাগ এলাকা এখানে। বাকি তিন ভাগ কেবল ইউরোপে। চারদিক জুড়ে সাগর ছিলো বলে নূহের দেশের লোকেরা ছিলো নাবিক জাতি। এখানকার অরণ্যের কাঠেই তৈরি হয়েছিলো আর্ক অব নোয়াহ্। অর্থাৎ নূহের জাহাজ।

বাইবেল-পুরানের মতে- নূহের বড়ো ছেলে সামের বংশধরদের থেকে ফিনিশিয়ান, হিব্রু, আসিরীয়-সুমারীয়, আরব এবং আর্মেনিয়ান আর তুর্কি জাতির উদ্ভব। এদের বুলি থেকেই জন্ম সেমেটিক ভাষা-পরিবারের। যার মধ্যে প্রধান হলো হিব্রু, সিরিয়াক্, আরামাইক, সাথায়িন এবং আরবি। দ্বিতীয় ছেলে হাম তাঁর বংশধরদের নিয়ে চলে গিয়েছিলেন উত্তর আফ্রিকায়। নীলনদ উপত্যকায়। এই অঞ্চলের লোকেরাই হেমেটিক। মিসরের ফেরাউনরা নাকি হামের রক্তধারার লোক। হেমেটিক বুলি থেকেই প্রাচীন মিসরীয়, নুবিয়ান, ইথিওপিয়ান, আমহারক, তিগ্‌রে প্রভৃতি ভাষার জন্ম।

নূহের কনিষ্ঠ পুত্র জাফেত্ তাঁর পরিবারবর্গ নিয়ে বসত গড়েছিলেন কাস্পিয়ান সাগরের পুব পাড়ে। এদের থেকেই উৎপত্তি আর্য জাতির। প্রাচীন পারসিক, আরিয়ান, আফ্‌গান, স্লাভনিক এবং রুশদের পূর্বপুরুষ এরা। কাস্পিয়ান তীরের প্রাচীন ফারস্ এবং আরিয়ানা অঞ্চল থেকে খ্রিস্টপূর্ব ত্রিশ হাজার অব্দের দিকে এদের কয়েকটি গোত্র চলে গিয়েছিলো উত্তর-ইউরোপ। গিয়েছিলো এরা এশিয়া মাইনরের মধ্য দিয়ে কৃষ্ণসাগর হয়ে দানিয়ুব নদীর পথ ধরে।

এরাই জনাকীর্ণ করেছিলো পূর্ব-পশ্চিম এবং উত্তর-দক্ষিণ ইউরোপ। এদের আরেকটি শাখা হিন্দুকুশের খাইবার গিরিপথ ধরে এসেছিলো ভারতে। এদের মিশ্র বুলি থেকেই উদ্ভব ইন্দো ইউরোপিয়ান ভাষা-পরিবারের। যার মধ্যে ছিলো প্রাচীন পারসিক, বৈদিক, সংস্কৃত, স্লাভনিক, লাতিন আর অ্যাংলো-স্যাক্সন ভাষাগোষ্ঠী। পরে যার অপভ্রংশ থেকে জন্ম হয়েছে ফরাসি, জার্মান, ইংরেজি, স্পেনিশ, ফার্সি ইত্যাদির। এই গ্রুপেরই শাখা হলো পালি-প্রাকৃত এবং আমাদের ভাষা বাংলা।

আর্মেনিয়ান জাতির কথা বলছিলাম। এক সময় প্রাচীনতম খ্রিস্টান রাষ্ট্র ছিলো এদেশ। কখনো এরা ছিলো স্বাধীন, কখনো পরাধীন। কিন্তু স্বাধীনতার জন্যে এদের সংগ্রামে ছেদরেখা পড়েনি একবারও। এক বাংলাদেশ ছাড়া বোধকরি এতো বিদ্রোহ, এতো যুদ্ধ দেখেনি আর কোনো দেশ। সাইরাস, আলেকজান্দার, সেলুকাস থেকে শুরু করে আর্দেশির এবং তৈমুর লং পর্যন্ত কতো বিজেতাই-না রক্তের বন্যা বইয়েছে দেশটির মাটিতে। দজলা-ফোরাত উপত্যকার এই উর্বর ভূমি ছিলো বিজেতাদের পায়ের তলায় দলিত-মথিত। ফোরাতের পুব পারের গ্রেটার আর্মেনিয়ার দখল নিয়ে তুর্কি আর পারসিকদের মধ্যেও হয়নি কম যুদ্ধ। ষোল শতকে গোটা দেশটাই চলে যায় এশিয়া এবং ইউরোপ বিজেতা ওসমানীয় তুর্কিদের হাতে। ইউরোপিয়ানরা যাদের বলে অটোমান টার্কস্।

www.pathagar.com

তুর্কি অভিযানের পর দেশহারা হয়ে পড়লেও এরা দুনিয়াকে জয় করলো বাণিজ্য দিয়ে। ফোরাতের উৎস ভূমির এই দেশ পেয়েছিলো পুবে কাস্পিয়ান আর উত্তর-পশ্চিমে কৃষ্ণসাগরের প্রতিবেশী। তাদের জাহাজ পাড়ি জমালো এশিয়া-ইউরোপের বন্দরে-বন্দরে। ইস্তাম্বুলে গড়ে উঠলো আর্মেনিয়ান বণিকদের উপনিবেশ। বোধকরি সেখান থেকেই তারা এলো ঢাকা। বুড়িগঙ্গার তীরের উপনিবেশে জমজমাট ব্যবসা চলতো তাদের। ঢাকার আর্মানিটোলা আর আর্মেনিয়ান গির্জা আজো ইতিহাসের ফলক হয়ে আছে তাদের স্মৃতির। বাগদাদ থেকে তাব্রিজ হয়ে আজারবাইজানের কাস্পিয়ান বন্দর বাকুর পথে যাওয়ার সময় আর্মানিটোলার ছবিটা ছুঁয়ে যাচ্ছিলো আমার মন। ১৯৪৮ সালে এই ময়দানেই হয়েছিলো বাংলা ভাষা আন্দোলনের প্রথম বড়ো জনসভা। মওলানা ভাসানী ছিলেন সভাপতি। এই সভায় উপস্থিত থাকবার সুযোগ হয়েছিলো আমার।

আকাশের চূড়ায় উঠলে পৃথিবীকে মনে হয় বড়ো বেশি ঘরের কাছের। কাস্পিয়ান সাগরের বাঁয়ে ইরেভান। আর্মেনিয়ার নতুন রাজধানী। ১৯২১ সালে লেনিনের নেতৃত্বে আর্মেনিয়া হয়েছিলো একটি সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র। শুধু দক্ষিণের অংশটাই থাকলো তুরস্কের হাতে। এরপর আর সীমানা বদল হলো না দেশটির। বামে কাস্পিয়ানের দক্ষিণ-পশ্চিম তীরে আজারবাইজান। আর্মেনিয়ার ডানপাশের প্রতিবেশী। দক্ষিণ-পূব-উত্তর জুড়ে এক পুঞ্জ দেশ। তুর্কমেনিস্তান, তাজাকিস্তান, কিরগিজিয়া। উত্তরে উরাল নদী আর বলখাসহ্রদের দেশ বিশাল কাজাকভূমি। কাজাকিস্তানের রাজধানী আলমাআতার পাশ ঘেঁষে দক্ষিণ-পূবে মহাচীন। তার উত্তরে মঙ্গোলিয়া। আরো উত্তর-পূব জুড়ে রাশিয়া। আর্মেনিয়ার লাগোয়া উত্তরে জর্জিয়ার রাজধানী তিফ্লিস। কাস্পিয়ানের বাম তীরে, মাঝামাঝি জায়গায়। তাজিক ভূমির পশ্চিমে আফগানিস্তান, দক্ষিণে সিন্ধুনদের মোহনায় পাকিস্তা এবং ভারত।

আমরা ককেশাসের তুষার চূড়া আল-বুরুজের ওপর দিয়ে নামতে শুরু করেছি জর্জিয়ার তিফ্লিসে। চোখে তখনো ঘুম। মাইকে ভেসে এলো বিমানবালার কণ্ঠস্বরঃ আমরা এখন তিফ্লিস এয়ারপোর্টে নামতে শুরু করেছি। এখানে একঘন্টা যাত্রাবিরতি। এরপর কাস্পিয়ানের উত্তর মাথায় অস্ত্রাখান আর কৃষ্ণসাগরের পুবের ভলগোগ্রাদ এবং ভল্গা-ডন উপত্যকা হয়ে সোজা মস্কো। বাঁয়ে পড়বে সেবাস্তোপোল, মোল্দাভিয়া, ইউক্রেন এবং বেলারুশ। ঘুম টুটে গেলো। সংবাদপত্র এবং ভূগোলে পড়া একরাশ পরিচিত নাম। বাঁয়ের দেশগুলো রক্তাক্ত হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে। জর্জিয়ার কথা শুনে শাহজাহান কন্যা জাহানারার স্মৃতিকথা মনে পড়লো। জর্জিয়ান সুন্দরীরা নাকি এক সময় আলো করে রেখেছিলো শাহ্জাহানের আগ্রাপ্রাসাদের হারেম। এদের প্রতি বৃদ্ধ সম্রাটের দুর্বলতার জন্যে স্মৃতিকথায় পিতার সমালোচনা করেছিলেন বিদুষী জাহানারা।

আমার পদচারণা এখন জর্জিয়ার মাটিতে। চোখে শ্রাবস্তি নগরের কারুকার্যময় চিত্র। ইতিহাসের চিরকেলে ঘড়ির পেণ্ডুলাম দুলছে চারপাশের রহস্যময় অন্ধকারে।

www.pathagar.com

আকাশে মাথা রেখে ঘুমিয়ে আছে পাহাড়। গ্রেটার ককেশাসের চূড়া। শুনতে পাচ্ছি খরস্রোতা কুরা এবং রিয়ন নদীর কলধ্বনি। মাথার চুল এলোমেলো করে দিচ্ছে কাস্পিয়ান সাগরের বাতাস। নাকে এসে লাগছে কৃষ্ণসাগর পাড়ের দ্রাক্ষাকুঞ্জের গন্ধমাখা উষ্ণ হাওয়ার ছোঁয়া। কান পাতলেই শোনা যায় ইতিহাসের দোলনার গান। শোনা যায় গ্রিক আর পারসিকদের বাঁশিতে বাজানো 'দ্য ক্রেডেল সং অভ্ হিস্ট্রি'।

এটি পশ্চিম ককেশাসের দেশ। কত নাম এর। গ্রিকরা বলতো কল্‌কি। একালের রুশরা বলে গ্রুজিয়া। ইংরেজরা বলে জর্জিয়া। প্রাচ্যের পণ্ডিতেরা বলতেন আইবেরিয়া। জর্জিয়ানরা বলে সাকার্ত-ভেলো। বিচিত্র জনগোষ্ঠীর বাস দুই সাগরের মাঝখানের এই দেশে। জর্জিয়ানরা তো আছেই। পাশাপাশি আছে আর্মেনিয়ান, তুর্কি, আজার আর ওসেতিয়ান। আছে রুশ, আবখাজ এবং গ্রিক। গ্রিকরা এসেছিলো আদিম যুগে। যখন ইতিহাস আর রূপকথা চলতো হাত ধরাধরি করে। তারা এসেছিলো কৃষ্ণসাগরের পশ্চিম পাড় থেকে জাহাজ ভাসিয়ে। তখনো এপারে ছিলো আদিম এশিয়ানদের বাস। এদেরই কল্‌কি জাতি বলতো গ্রিকরা। কৃষ্ণসাগরের পুব পারের এ জায়গাটার এখনকার নাম মিংগ্রেলিয়া। এখানে তখন বয়ে চলতো প্রাচীন ফাসিস্ নদী। যার আধুনিক নাম রিয়ন। নদীর চারপাশে বাস করতো আদিম কল্‌কি জনগোষ্ঠী। এরা ককেশাসের ঢালুতে মেষ চরাতো। সাগরে ধরতো মাছ। সমতলে ফলাতো গম, ভুট্টা, আঙুর। পাহাড়ে ছিলো ওক্ তরুর অরণ্য। আর ছিলো তুঁত গাছ। রেশম পোকা বাসা বুনতো তুঁতপাতায়। পরেকার যুগে পাকা রেশম শিল্পী হয়েছিলো এরা তুঁত গাছের কল্যাণে। এদের নাবিকেরা রেশম এবং ভেড়ার পশমের ব্যবসা করতো গ্রিক দ্বীপপুঞ্জের দেশগুলোতে। ককেশাসের ভেড়ার পশমে তৈরি হতো প্রাচীন পৃথিবীর সেরা কম্বল। গ্রিকরা ব্যবহার করতো সোনালি পশমের এই কম্বল। রেশমের সুতোয় হতো জমকালো পোশাক। গ্রিক রাজা এবং নাইটেরা গায়ে চড়াতেন কল্‌কি দেশের বয়ন শিল্পীদের হাতে বোনা এসব রেশমি বস্ত্র। কেন এদের কল্‌কি বলা হতো সেটা গ্রিকরাই জানতো। গ্রিক পুরান 'গোল্ডেন-ফ্লিস' নিয়ে আছে অনেক রসঘন উপাখ্যান। গোল্ডেন ফ্লিস্ (Golden Fleece) কথাটার মানে ছিলো স্বর্ণ-মেষের লোম। এ লোম পাওয়ার জন্য গ্রিক বীর জ্যাসন এবং আরগোনটের নেতৃত্বে সেরা গ্রিক যোদ্ধারা এসেছিলেন কৃষ্ণসাগরের পুব তীরে। এসেছিলেন কল্‌কিদের দেশে অর্থাৎ ককেশাসের অরণ্য-উপত্যকার দেশ জর্জিয়ায়। সম্ভবত তারা এসেছিলেন এখানকার বিখ্যাত ভেড়ার পশমের কম্বল, রেশম বস্ত্র, ওক কাঠ এবং চা-পাতা আর দ্রাক্ষা রসের জন্যে। সেকালে গ্রিকরা অভ্যস্ত ছিলো সোমরস পানে। যা তৈরি হতো দ্রাক্ষা অর্থাৎ আঙুর থেকে। ককেশাসের আঙুরের খ্যাতি দুনিয়া-জোড়া। এখানকার চা-পাতারও তুলনা নেই। ক্লাসিক্যাল যুগের গ্রিকেরা নাকি উৎসব-অনুষ্ঠানে আয়োজন করতো চা-চক্রের। ককেশাসের নাশপাতি, কমলালেবুরও তুলনা নেই।

www.pathagar.com

গ্রিক-পুরাণে অবশ্য এসব কোনো কথারই ইঙ্গিত দেয়া হয়নি। তাদের রূপকথায় নানান রং চড়িয়ে শুধু বলা হয়েছে গোল্ডেন-ফ্লিস উপাখ্যানের কথা। বলা হয়েছে ঝড়ঝঞ্ঝা আর কুহকিনী সমুদ্রপরী সাইরেনের মায়াজাল ডিঙিয়ে কৃষ্ণসাগর পাড়ি দেয়ার কথা। এপারে উঠে কল্‌কিদের দেশ অর্থাৎ এশিয়ার পশ্চিমতম দেশ জর্জিয়ার পাহাড়-অরণ্য জয়ের গল্প। উপাখ্যানে আছে দেবরাজ জিউস, এথেন্স নগরীর প্রতিষ্ঠাত্রী দেবী এথেনা, দেবতা হার্মিস, আথহাম প্রমুখের কথা। অভিযানের নায়কদের মধ্যে ছিলেন প্রাচীন গ্রিসের সব নামকরা যোদ্ধা।

জ্যাসন এবং আরগোনট্‌ ছাড়াও এদের মধ্যে ছিলেন হারকিউলিস, ক্যাস্টর, হাইলাস, পোলাকাস আর গায়কশ্রেষ্ঠ অর্ফিয়াস। পরে রচিত উপাখ্যানে বাড়ানো হয়েছে এশিয়ার কৃষ্ণসাগরতট বিজয়ী অভিযাত্রীদের তালিকা। এদের মধ্যে ছিলেন মিলিয়াগার, পিলিয়াস, অ্যামপিয়া রাস এবং অ্যানকাউস।ছিলেন আরগ্‌স, লিয়ারটস আর টেলামন। একজন বীরাঙ্গনাও ছিলেন দলে। নাম তাঁর আটলান্টা। শিকারিণী হিসাবে খ্যাত ছিলেন। যাঁর নামে হয়েছে প্ল্যাটো বর্ণিত ইউটোপিয়ার অর্থাৎ চিরসুখের দেশ আটলান্টিস-এর নামকরণ। যার নামালংকারে অভিষিক্ত হয়েছে পশ্চিমের মহাসাগর আটলান্টিক।

উপাখ্যানের নায়িকাদের মধ্যে ছিলেন আথ্‌হামের স্ত্রী নেফিলিস, তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী ইনো। আর ছিলো নেফিলিসের রূপসী মেয়ে হিলি। ছিলো জর্জিয়ার নীলচোখো মেয়ে আইতিস। একটি বীর কিশোরও ছিল এদের মধ্যে। নাম তার ফিরিক্‌সাস। নেফিলিসের ছেলে।

জাহাজটির নাম ছিলো 'আরগো'। ক্যাপ্টেন ছিলেন টিপিস্‌। জাহাজের কাঠ এবং সাজসরঞ্জাম নিয়েও উপাখ্যান খচিত ছিলো চিত্রাকর্ষক বর্ণনায়। এটি নাকি ছিলো ডোডোনা অঞ্চলের এক আজব ওক্‌ বৃক্ষের কাঠে তৈরি। গ্রিকদের প্রাচীনতম 'অরাকল'- এর উৎসস্থল ছিলো ডোডোনার অরণ্য। ভূমধ্য সাগরের শাখা আইওনিয়ান সাগরের প্রাচীন গ্রিক দেশ ইপিরাস। কর্সিরা'র পঞ্চাশ মাইল পুবে এই ইপিরাস দেশ। আমব্রাসিয়া উপসাগরের উত্তর উপকূলে এর অবস্থান, দক্ষিণে ইলিরিয়া, পশ্চিমে মেসিডোনিয়া এবং থেসিলি। এখন এটি দক্ষিণ-পশ্চিম গ্রিস আর দক্ষিণ আলবেনিয়ার অন্তর্গত। এপিরোট জনগোষ্ঠীর আদিম বাসস্থান ছিলো সাগরের মধ্যবর্তী পাহাড় এবং উপত্যকাবেষ্টিত এই প্রাচীন ইপিরাস। ডোডোনা ছিলো এর অভ্যন্তর ভূমি।

গ্রিক পুরাণের দেবরাজ জিউস এবং তাঁর স্ত্রী ডিঅন নাকি পবিত্র মনে করতেন ডোডোনা অরণ্যকে। এখানে ছিলো এক 'পবিত্র' ওক্‌ বৃক্ষ আর একটি 'পবিত্র' ঝরনা। ওক্‌ গাছের-শাখায় বাতাসের কাঁপন আর ঝরনার কলধ্বনির ভাষা ব্যাখ্যা করতে পারতেন ইপিরাসের দেবমন্দিরের পুরোহিতরা। গাছের কাঁপুনি আর ঝরনার শব্দে ধ্বনিত হতো ভবিতব্যের কথা অর্থাৎ অরাকল। 'আরগো' জাহাজে ছিলো এই ওক্‌ গাছের ভবিষ্যৎবাণী বলতে পারা একটি বিস্ময়কর কাঠ। এই কাঠই জ্যাসন,

www.pathagar.com

আরগোনট এবং হারকিউলিসকে এশিয়ার তটে নিরাপদে আসতে সাহায্য করেছিলো।

কিন্তু যাঁরা কল্পকথায় বিশ্বাস করেন না তাদের মতে জাহাজের কাঠ ছিলো জর্জিয়ার ককেশাস অরণ্যের। কারণ, জর্জিয়ার আদিম বণিকেরা ককেশাসের মূল্যবান কাঠ নিয়ে যেতেন প্রাচীন গ্রিসে। জর্জিয়ার পশ্চিম ককেশাস পাহাড়ে এখনো আছে ওক্ গাছের ঘননিবিড় অরণ্য। পাহাড়ের ঢালে আর নিচের উপত্যকার তৃণভূমিতে একালেও চরতে দেখা যায় সোনালি পশমের মেষপাল। এরা পুষ্ট হয় এখানকার সবুজ ঘাসে।

গ্রিক কাহিনীতে কল্‌কি দেশের এক দুঃসাহসিক নারী-বাহিনীর কথা বলা হয়েছে। অভিযাত্রীদের জাহাজ কৃষ্ণসাগরের লেমন্‌স দ্বীপে এলে এদের অবরোধের মুখোমুখি হলেন আরগোনট। নারীযোদ্ধারা কিছুতেই কল্‌কিতে যেতে দেবেন না অভিযাত্রীদের। কৃষ্ণসাগরের এপারের কাছাকাছি দ্বীপল লেমন্‌স্ বোধকরি গ্রিকদের কোনো বাণিজ্য-উপনিবেশ। বিবাদ শুরু হলে রণরংগিনী এশিয়ান মহিলারা উপনিবেশের সব বিদেশি পুরুষকে হত্যা করেন। বোধকরি ছিল এই, প্রাচীন জর্জিয়ান মহিলারা গ্রিকদের আগাম বাধা দিতে গিয়েছিলেন তাদের দেশের কৃষ্ণসাগরীয় সীমান্তে। জর্জিয়ানদের মধ্যে সেই আদিম যুগেও কতটা দেশপ্রেম ছিলো এই গ্রিক রূপকথা থেকে পাওয়া যায় তার আভাস। ককেশাসের পর্বতচারী পুরুষেরাই শুধু নয়। এদের মহিলারাও ছিলেন চিরকাল দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। চল্লিশ দশকে গ্রেটার এবং লেসার ককেশাস অভিযানকালে হিটলারের নাজিবাহিনীও এটা টের পেয়েছিলো হাড়ে-হাড়ে। তারা বেশি দূর এগোতে পারেনি এখানকার নারী- পুরুষ গেরিলাদের প্রচণ্ড অবরোধের মুখে।

গোল্ডেন-ফ্লিসের গল্পটি বেশ রোমাঞ্চকর। আথহাম-এর প্রথম স্ত্রী নেফিলিস্‌কে ককেশাসের সোনালি মেষের যাদুর লোম দিয়েছিলেন দেবতা হামিস। এতে প্রতিহিংসায় জ্বললেন নেফিলিস-এর সতীন ইনো। তিনি নেফিলিস পুত্র ফিরিক্‌সাস এবং হিলিকে হত্যার ষড়যন্ত্র আটলেন। মেষটি টের পেয়ে দু'জনকে পিঠে তুলে নিয়ে যায় ককেশাসের দুর্গম অরণ্যে। বনটি পাহারা দিচ্ছিলো এক ড্রাগন। মেষের ইচ্ছামাফিক ফিরিক্‌সাস তাকে উৎসর্গ করে তার সোনালি লোম ঝুলিয়ে রাখে একটি গাছে। পরে এই মেষই হলো অ্যারিস্ নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যমণি। মেষ রাশির প্রতীক এই ভেড়াটি। রাশিচক্রের শীর্ষে তার নাম। দুই শিশুকে রক্ষা করবার জন্যেই নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে তার এই স্বর্ণাসন।

রূপকথা হলেও মানবিকতার বিজয় দেখানো হয়েছে এ কাহিনীতে। দেখানো হয়েছে ককেশাস অঞ্চলের পার্বত্য জনগোষ্ঠীর প্রতিরোধ শক্তির গৌরব গাঁথা। রুশ কবি রুসতা ভ্যালি উনিশ শতকে যাদের গুণকীর্তন করেছেন তাঁর 'নাটট অভ দ্য টাইগার স্কিন' (Night of the Tiger-skin) কবিতায়। পুশকিন, লারমোনটভ এবং টলস্টয় যাদের বীরত্বের অপূর্ব বর্ণনা দিয়েছেন তাঁদের কাব্যে আর উপন্যাসে।

গল্পে আছে ঃ ফিরিকসাস্ কল্‌কিদের অর্থাৎ জর্জিয়ানদের রাজার মেয়ে আইতিসকে বিয়ে করেন। সোনালি মেষ লোমের সন্ধানে এশিয়ার পশ্চিম সাগর উপকূলে

www.pathagar.com

এসেছিলেন জ্যাসন, আর্গোনট হারকিউলিস আর অর্ফিয়াসসহ গ্রিক বীরেরা। জর্জিয়ান মেয়ে আইতিস-এর দেয়া দায়িত্ব পালন করে এঁরা উদ্ধার করলেন ড্রাগনের পাহারা ডিঙিয়ে সোনালি মেষ লোম। ফেরার পথে পাল্লায় পড়লেন সমুদ্রপরী সাইরেনের যাদুময় সংগীতের মোহে। কিন্তু গায়ক অর্ফিয়াসের জন্যে তাঁদের রক্ষা। কারণ অর্ফিয়াসের কণ্ঠ ছিলো অনেক বেশি মধুময় এবং সুরেলা। কিংবদন্তিতে আছে অর্ফিয়াসের গান শুনে গ্রিক দেবকুলও পাগল হতেন। স্তব্ধ হয়ে পড়তো নিজ বহমান পার্বত্য স্রোতস্বিনী এবং ঝরনাধারা।

সাইরেন তার মোহময় কণ্ঠে গান শুরু করলে 'গোল্ডেন-ফ্লিস' জয়ী বীরেরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন। সাইরেন চেয়েছিলো তাদের ভুলিয়ে ভালিয়ে কোনো সমুদ্রদ্বীপে নিয়ে গিয়ে আটক করলে। কিংবা জাহাজডুবি ঘটাতে। ঠিক তখুনি বাঁশিতে সুর ধরলেন অর্ফিয়াস। তাঁর সুরের ঝংকারে চাপা পড়ে গেলো মায়াবিনী পরীর গলা। নিরাপদে বীরেরা পৌঁছে গেলেন ওপারে গ্রিসের সাগরতটে। সাইরেনের নাম থেকেই আধুনিক সাইরেন অর্থাৎ দীর্ঘ বিলম্বলয়ের বাঁশি শব্দের উদ্ভব।

পরের ইতিহাসে জানা যায়, গ্রিকরা এশিয়ার এপারে কৃষ্ণসাগরের রিয়ন নদীর মুখে গড়ে তুলেছিলো তাদের বাণিজ্য -বন্দর। সেই তখন থেকে তাদের রক্তধারার লোকের বাস জর্জিয়ায়। ককেশাসের নানান জায়গায়।

সংখ্যালঘু হলেও নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো জর্জিয়ান, আর্মেনিয়ান এবং রুশদের সঙ্গে এই বিদেশি গ্রিকদের। ঘটেছিলো রক্তের সংমিশ্রণ। জর্জিয়ানদের সংগেই বেশি সামাজিক আদান-প্রদান হয়েছিলো তাদের। হয়েছিলো বিয়েশাদির মেলবন্ধন। বোধকরি এই মিশ্র রক্তধারার কারণেই অনেক জর্জিয়ান মেয়ের চোখ নীল। নাক বাঁশির মতন টিকল, চুল ঘন কৃষ্ণ। শরীরের গড়ন ছিমছাম, লম্বাটে। এদের কথাই আত্মকথায় বলেছিলেন শাহ্জাদি জাহানারা। তিনি ছিলেন উঁচুমাপের একজন কবি, লেখিকা এবং পণ্ডিত। ইতিহাস আর ভূগোলের জ্ঞান ছিলো তাঁর অসাধারণ। ষোল এবং সতেরোশ' শতকে ভারতের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো জর্জিয়ার। জর্জিয়ান বণিকরা ব্যবসা করতেন বাংলার হুগলি এবং সপ্তগ্রামে। পশ্চিমে সুরাট, কালিকটে ছিলো তাদের বাণিজ্য কুঠি। খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারের জন্যে আসতেন ইস্টার্ন অর্থোডক্স চার্চের জর্জিয়ান পাদ্রিরা। আর সে দেশের সুন্দরী মেয়েরা আসতো মুগল বাদশাদের হারেমে। তাদের রূপলাবণ্যে সহজেই মুগ্ধ হতেন সম্রাট এবং শাহ্জাদারা। বিমোহিত হতেন রাজপুরুষেরা। এরই কিঞ্চিৎ আভাস দিয়েছেন জাহানারা তাঁর রচিত সমকালীন যুগের ইতিহাসে। যা ছিলো তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ এক অপূর্ব আত্মকথন।

তিফ্লিস। ট্রান্স ককেশিয়ার এক রহস্যময় নগরী। দু'হাজার বছরের শ্যাওলা জমে আছে শহরের পুরনো ইট-পাথরে। আবার আধুনিকতার ছোঁয়া লেপ্টে আছে নতুন শহরের বুলিবার্ডে, পার্কে, আর মাউন্ট ডেভিডের প্রমোদ উদ্যানগুলোতে। এখানকার প্রতিটি রাজপথই খোলামেলা, চওড়া। ইউরোপীয় ধাঁচের নতুন দালানকোঠার

www.pathagar.com

মাথা ছুঁয়েছে আকাশ। শীতকালে ককেশাসের শুভ্র তুষারের টুপি মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে পুরনো গির্জা আর উঁচু ইমারতের চূড়া। ভোরবেলা রোদ উঠলে সেগুলো ঝলমল করে সোনালি-রূপোলির বর্ণচ্ছটায়।

পার্ক জুড়ে রকমারি ফুলের বাহার। উদ্যানে পাইন, সিট্রাস আর ঝাউ গাছের লাবণ্য-ধোয়া সবুজ।

উত্তর ককেশাসের দাগিস্তান, চেচনিয়া হয়ে পাইনের অরণ্য পাহাড়ের সানুদেশ বেয়ে বেয়ে চলে গেছে মস্কোর উপান্তে ইসমাইলভ্ পার্ক অব্দি। দেশটা যেন পাইনেরই দেশ। দক্ষিণ ধারে কুরা নদী। দুই তীরে পুরনো শহর। পাহাড়ের ঢালের থাকে-থাকে সাবেক কালের ঘরবাড়ি, হাট-বাজার, রাস্তা। কিছুটা মিল আছে দার্জিলিং এবং আমাদের চট্টগ্রামের সঙ্গে। বুনো কপোতের নীড়ের ভেতর জুটাজুট নিয়ে এখানে ঘুমিয়ে আছে জর্জিয়ানদের আদি শহর তিফ্‌লিসি। রুশরা যাকে বলে তুবলিস। কিছু দূরে উত্তর-পশ্চিমে আছে আরো প্রাচীন আমতাস্‌খিয়েতের ধ্বংসস্তূপ। রুশ প্রত্নবেত্তারা মাটির তলা খুড়ে উদ্ধার করেছিলেন শহরটির জীর্ণ কাঠের কংকাল। জর্জিয়ার প্রাচীনতম রাজধানী এই আমতাস্‌খিয়েত। এখানে ককেশাসের উপত্যকায় ধুলোবালির সঙ্গে মিশে আছে আদিম যুগের শ্রমজীবী মানুষের রক্তধারা। মিশে আছে সেই কৃষক এবং রাখালদের বুকের খুন যারা কাকহোতিয়া আর চিয়াতুরার মাঠে ফলাতো গম-ভুট্টা, ধান। আর পাহাড়ের তৃণভূমিতে পালন করতো মেষ। হুন, পারসিক, গ্রিক এবং মোঙ্গল। বিজেতাদের অশ্বখুরে দলিত নিষ্পেষিত হয়েছিল এই মেহনতি মানুষের দল।

নদীর পারে এখনও শুকিয়ে কালো বিবর্ণ হয়ে আছে তাদের রক্ত এবং অশ্রু। পুরনো তিফলিস শহরের মুখ থুবড়ে পড়া দেয়ালে কান পাতলে শোনা যাবে সাইরাস, আলেকজাণ্ডার এবং শাহপুরের বিজয়ী বাহিনীর উল্লাস। শোনা যাবে বিশ্বত্রাস চেঙ্গিজ, বতুখান আর তৈমুরের নরমেধযজ্ঞের হুংকার ধ্বনি। আর সেই সঙ্গে কানে ভেসে আসবে ভয়ার্ত নরনারী-শিশুর পরিত্রাহী চিৎকার। বতুখান এখান থেকে তার পায়ের তলায় একটার পর একটা দেশ দুমড়ে-মুচড়ে শেষে হানা দিয়েছিল উত্তরে মস্কো এবং কিয়েভে। দুই শহরেই ছারখার হয়েছিলো চেঙ্গিজ-পৌত্র বতুর জ্বালানো আগুনের লেলিহান শিখায়।

শেষ অব্দি সাহসী জর্জিয়ান, আজারি-আবখাজি এবং রুশিরা রুখে দাঁড়িয়েছিল হানাদারদের। তাদের গেরিলা যোদ্ধাদের তীরের বৃষ্টিধারার মুখে টিকতে না পেরে কিজিলকুম এবং গোবি মরুভূমির দিকে পালিয়ে গিয়েছিল মোঙ্গলরা। মুক্ত হলো আরাস নদী, কুরা, রিয়ন, তেরেক আর ভল্গা এবং ডন পারের দেশগুলো। ফিরে পেলো স্বাধীনতা মস্কোর গ্রেট ডিউকের দেশ রাশিয়া। শত্রুমুক্ত হয়ে স্বস্তির শ্বাস ফেললো জর্জিয়া, আজারবাইন এবং আবখাজিয়া।

পুরনো তিফ্‌লিস শহরে ককেশাসের গায়ে আছে একটি উষ্ণপ্রস্রবণ। এই ঝরনার পানিতে স্নান করে রোগমুক্ত হতো আশপাশের পল্লীবাসীরা। জর্জিয়ান ভাষায়

www.pathagar.com

গরম পানির ঝরনাকে বলা হয় তিবিলিসি। পরে এই নাম থেকেই হয়েছে শহরের নাম। কুরা নদীর স্বচ্ছ পানিতে ঢেউয়ের সঙ্গে খেলা করে পাহাড়ের চড়াই-উৎরাই আর দুই ঢাল জুড়ে থাকা সার সার ইমরাতে ছায়া। পুরনো শহরের চৌকোনো বাজারগুলোও অপূর্ব। প্রাচ্যের স্থাপত্যের মনোরম বৈশিষ্ট্য আছে এর নকশায় এবং নির্মাণ শৈলীতে।

সোভিয়েত রাষ্ট্রনায়ক জোসেফ স্তালিনের বাল্যস্মৃতি আছে পুরনো শহরের ইস্টার্ন চার্চে। এখানকার এক গির্জা স্কুলে ভর্তি হন তিনি ১৮৯৪ সালে। উদ্দেশ্য ছিলো ধর্মযাজক হবেন। তখন তাঁর বয়স ছিলো পনের।

স্তালিন ছিলেন জন্মগতভাবে একজন জর্জিয়ান। তাঁর বাবা ছিলেন পুরনো তিফ্লিস শহরের একজন শু-মেকার অর্থাৎ মুচি। জর্জিয়ান রক্ষণশীল ধর্মীয় পরিবেশে লালিত হয়েছিলেন এদের পূর্ব পুরুষেরা। উনিশ শতকের শেষ পর্বের এই যুগটা ছিলো রুশ বিপ্লববাদের যুগ। সেন্ট পিটাসবার্গ এবং মস্কোর একদল তরুণ ছাত্র এ সময় মার্কসের বইপত্র গোপনে লণ্ডন-প্যারিস-বার্লিন থেকে নিয়ে আসেন রাশিয়ায়। এসব পুস্তক জারের সামন্তবাদী অরাজক শাসন এবং শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিপ্লবের আগুন ধরিয়ে দেয় রুশ যুবশ্রেণীর চৈতন্যে। জর্জিয়াসহ গোটা ককেশাস অঞ্চল তখন ধুঁকছিলো জারের আমলা-বরকন্দাজ, জমিদার-তালুকদারদের উৎপীড়নে। ককেশাসের কৃষকরা ছিলো এদের ভূমিদাস।

সেন্ট পিটার্সবার্গের নেভা নদী থেকে বিপ্লবের এক উত্তাল তরঙ্গ এসে আলোড়ন তোলে তিফ্লিসের কুরা নদীতে। তার অভিঘাতে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে পশ্চিম জর্জিয়ার রিয়ন, আর্মেনিয়ার নদী আরস। আলোড়ন জাগে উত্তর ককেশাসের দারেগ এবং মধ্য-পশ্চিম রাশিয়ার নীপার, ভল্গা আর ডন নদীতে। বিদ্রোহের জন্যে উত্তপ্ত হয়ে উঠতে থাকে সাইবেরিয়ার প্রশান্ত মহাসাগর তট থেকে উরাল পর্বতের উত্তর মহাসাগরীয় তুন্দ্রা অঞ্চল পর্যন্ত বিশাল জার সাম্রাজ্যের মাটি। মোঙ্গল হানাদারদের উৎখাতের জন্য যেমন করে টগবগ করে ফুটছিলো ভল্গা-ডন পাড়ের কৃষকদের বাহুর রক্ত এ উৎক্ষেপ ছিলো অনেকটা সেরকমই।

তিফ্লিসের গিজা স্কুলে ধর্মের কেতাব পড়তে পড়তে অনেক তরুণ ধর্মযাজকই হলেন মার্কসীয় মন্ত্রে দীক্ষিত। এদের মধ্যে ছিলেন জোসেফ ভিসারিওনোভিস্ স্তালিন। এটা ছিলো তাঁর ছদ্মনাম। আসল নাম ছিলো দুশাস্ভিলি। তাঁর পারিবারিক পদবি এটি। জর্জিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লববাদী দলে যোগ দেবার পর স্তালিন নাম নিলেন এই যুবক। জর্জিয়ান ভাষায় 'স্তালিন' কথাটির মানে 'ইস্পাত দিয়ে গড়া'। অর্থাৎ স্টিলম্যান। অন্য কথায় লৌহমানব। ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের পর ধীরে ধীরে এই লোকটি নিখাদ লৌহমানবই হয়ে ওঠেন। গোড়াতে পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্যেই স্তালিন ছদ্মনামটি বেছে নিয়েছিলেন এই জর্জিয়ান বিপ্লবী। জন্ম তাঁর ১৮৭৯ সালে। পাঁচ বছর তিনি অধ্যয়ন করেন খ্রিস্ট ধর্মের আকর গ্রন্থাবলী। রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের জন্যে মিশনারি স্কুল থেকে তাঁকে বের করে

www.pathagar.com

দেয়া হলো। সেটা ছিলো ১৮৯৯ সাল।

১৯০৩ সালে রুশ ডেমোক্রাটিক সোশ্যালিস্ট পার্টি খণ্ডিত হলে তিনি দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বলশেভিক গ্রুপে যোগ দিলেন। এই গ্রুপের নেতা ছিলেন ভি আই লেনিন। রুশ ভাষায় 'বলশেভিক বলা হয় সংখ্যাগরিষ্ঠদের। আর 'মেনশেভিক' হলো দলের সংখ্যালঘুরা। মেনশেভিক গ্রুপের নেতা ছিলেন প্লেখানভ্। সমাজ বিপ্লবের পথে জারদের বংশানুক্রমিক পীড়নমূলক শাসন ব্যবস্থার উৎখাতই ছিলো বলশেভিকদের নীতি। আর মেনশেভিকরা ছিলেন পশ্চিমা ধাঁচের মাঝারি গোছের গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার উৎখাতই ছিলো বলশেভিকদের নীতি। আর মেনশেভিকরা ছিলেন পশ্চিমা ধাঁচের মাঝারি গোছের গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সমর্থক। মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া শ্রেণীকে সঙ্গে রেখে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে যেতে চেয়েছিলেন তাঁরা। এঁরা ছিলেন নরমপন্থী।

গোড়াতে অবশ্য দুই গ্রুপই ছিলেন একই দলে। ১৯০৩ সালের পার্টি কংগ্রেসে নীতিগত প্রশ্নে বিচ্ছিন্নতা শুরু হলো দুই গ্রুপে। সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা সমর্থন করলেন লেনিনকে। লেনিন বিশ্বাস করতেন, কৃষক-শ্রমিক আর সৈনিকদের নেতৃত্বে বদলানো সম্ভব ঘুণেধরা সমাজের অবকাঠামো। সম্ভব সর্বহারাদের শোষণহীন, শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েম। এটি ছিলো কার্ল মার্কস-এর রাষ্ট্রতত্ত্বের মর্মবস্তু। ১৯১৮ সালের বিপ্লবে জয়ী হলেন বলশেভিকরা। আর মেনশেভিকদের স্থান হলো প্রতিবিপ্লবীদের সারিতে। তাদের হতে হলো গণবিচ্ছিন্ন।

কিছু নেতা ছাড়া মেনশেভিক গ্রুপের বাদবাকি সবাই যোগ দিলেন বলশেভিক দলে। ১৯১৮ সালেই সোশ্যাল ডেমোক্রাটির পার্টির জায়গায় লেনিন গড়ে তুললেন সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি। গড়ে উঠলো জারদের সুবিশাল দুই মহাদেশীয় সাম্রাজ্যে সোভিয়েত সোশ্যালিস্ট ফেডারেল ইউনিয়ন। লেনিন হলেন পার্টিপ্রধান। পাটির পলিটব্যুরো হলো সরকারের নীতিনির্ধারক। ককেশাস অঞ্চলের দেশগুলো ১৯২১ সালে স্বাধীন প্রজাতন্ত্র হিসাবে যোগ দিলো সোভিয়েত ইউনিয়নে। জর্জিয়া ইউনিয়নে এলো ১৯২২ সালে। তার আগে গির্জা থেকে বেরিয়ে ১৯০২ সালে গ্রেটার এবং ট্রান্স ককেশিয়ায় স্তালিন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সোশ্যালিস্ট ডেমোক্রাটিক পার্টি। তখন তাঁর বয়স মাত্র তেইশ। বয়সে লেনিনের নয় বছরের ছোট ছিলেন তিনি। লেনিনের জন্ম ১৮৭০ সালে রাশিয়ার সিম্‌ব্রিস্‌ক শহরে। তাঁর পৈতৃক নাম ছিলো নিকোলাই উলিয়ানভ। স্তালিনের মতো তিনিও নাম পাল্টেছিলেন। পরে উলিয়ানভের সঙ্গে মিল রেখে তাঁর জন্মস্থান সিম্‌ব্রিসক-এর নামকরণ করা হোল উলিয়ানভস্ক্।

গোড়ার দিকে জর্জিয়ান বিপ্লবী স্তালিন রুশ রাজনীতিতে তেমন একটা প্রভাব ফেলতে পারেননি। তবে একজন সাংবাদিক এবং বিপ্লববাদী বলশেভিক কর্মী হিসেবে তিনি আসেন লেনিনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে। ১৯১১ সালে সেন্টপিটাসবার্গ শহর থেকে তিনি প্রকাশ করলেন 'প্রাভদা' কাগজ। এটি ছাপা হতো গোপন ছাপাখানায়। বিপ্লবীদের মধ্যে বিলি করা হতো পর্দার অন্তরালে। স্তালিন ছিলেন

www.pathagar.com

রাশিয়ার এই প্রগতিশীল কাগজের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক।

স্তালিনের প্রখ্যাতির পেছনে 'প্রাভদা' এবং তাঁর বৈপ্লবিক সাংবাদিকতার অবদান অসামান্য। প্রাভদা প্রকাশকালে তাঁর বয়স ছিলো বত্রিশ। একজন তরুণ সম্পাদক হিসাবে বিপ্লববাদী রুশ সাংবাদিক, কবি, লেখক এবং বুদ্ধিজীবীদের প্রচুর প্রশংসা কুড়াতে দেখা যায় তাঁকে। সংবাদপত্রে বিপ্লবের আগুন ছড়ানোর জন্যে ১৯১৩ সালে জার সরকারের গোয়েন্দারা স্তালিনকে গ্রেফতার করে। তাঁকে যাবজ্জীবন নির্বাসন দেয়া হলো উত্তর সাইবেরিয়ায়। বন্ধ হয়ে গেলো প্রাভদা। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হলে চার বছর নির্বাসনদণ্ড ভুগে মুক্তি পেলেন স্তালিন। সেন্টপিটার্সবার্গে ফিরে এসে আবার বের করলেন প্রাভদা। এবার লেনিন হলেন তাঁর সহযোগী। দু'জনের যৌথ সম্পাদনায় বের হতে থাকলো কাগজটি। নামডাক পড়ে গেলো স্তালিনের। ১৯১৭ সালে অক্টোবর বিপ্লব পাল্টে দিলো তাঁর জীবনের গতিধারা। সাংবাদিকতা তাঁকে দ্রুত নিয়ে এলো পাদপ্রদীপের সামনে। সিঁড়ির পর সিঁড়ি ভেঙ্গে তিনি উঠতে থাকলেন রাজনৈতিক নেতৃত্বের শিখরে। অক্টোবর বিপ্লব-উত্তর সোভিয়েত মন্ত্রিসভার সদস্য হলেন তিনি। দেয়া হলো তাঁকে ককেশাস, ভল্গা অঞ্চল এবং মধ্য এশিয়ার জাতিগোষ্ঠীর উন্নয়নের দায়িত্ব। হলেন তিনি এই বিশেষ দফতরটির পিপল্স-কমিসার। পাঁচ বছর পর আরো একটি বড়ো সিঁড়ি ভাঙলেন স্তালিন। এসময় লেনিনের সঙ্গে উচ্চারিত হতে থাকলো তাঁর নাম। ১৯২২ সালে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারির দায়িত্ব পেলেন এই বিপ্লবী সাংবাদিক-রাজনীতিক। এবার ভাগ্যনক্ষত্র তাঁকে তুললো ক্ষমতার চূড়ায়। ১৯২৪ সালে চুয়ান্ন বছর বয়সে লেনিন শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলে তাঁর সামনে মুক্ত হলো আদিগন্ত আকাশ। ভাগ্যবিধাতা হলেন তিনি গোটা সোভিয়েত ইউনিয়নের। সোজাসুজি উঠলেন ককেশাসের সর্বোচ্চ চূড়া আল-বুরুজে। যার মাথায় উঠলে জরিপ করা যায় পঁচাশি লাখ বর্গমাইল জোড়া পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো দেশটির মানচিত্র। তিফ্লিসে এসে প্রথমেই আমার মনে পড়লো সাংবাদিক জোসেফ স্তালিনকে। কুরা নদীর কোন্ পাড়ে ছিলো তাঁর শৈশবের খেলাঘর সে নিয়ে ঘোড়দৌড় শুরু করেছিলো আমার ভাবনা। বাইবেল পড়ুয়া একজন ছাত্র কেমন করে একজন ইস্পাতে গড়া বিপ্লবী এবং তুখোড় সাংবাদিক হলেন এটা ছিলো আমার চিন্তার বাইরে।

আরেকজন সাংবাদিকের কথাও মনে পড়লো আমার। ভাসিলি ইয়ান তাঁর নাম। সারা ইউরো-আমেরিকা চুঁড়ে তিফ্লিসে এসেছিলেন ইয়ান। একটানা দুই বছর ঐতিহাসিকের চোখ নিয়ে খুঁটে খুঁটে দেখলেন ককেশাসের তুষারগিরি। দেখলেন কাস্পিয়ান কৃষ্ণ সাগর, উরাল-সাইবেরিয়া আর বেলুচিস্তানের সীমান্ত পর্যন্ত মধ্য এশিয়ার প্রতিটি দেশ। সাংবাদিক ছাড়াও তিনি ছিলেন একজন কবি, উপন্যাসিক এবং ইতিহাসবেত্তা। তাঁর চোখ দিয়েই দেখছিলাম আমি স্তালিনের জন্মস্থান তিফ্লিস শহরটিকে।

www.pathagar.com

এক সময় সাংবাদিকদের বলা হতো 'জ্যাক্ অভ্ অল ট্রেড্স'। অর্থাৎ সব বিষয়ে সবজান্তা। কথাটি ছিলো একটি পরিহাস। প্রবাদটি ব্যবহার করতেন পশ্চিমা দুনিয়ার নাকউঁচু লোকেরা। এঁরা নিজেদের আঁতেল ভাবতেন। গর্ব করতেন উচ্চবর্গের বুদ্ধির জাহাজের চড়নদার হিসেবে। চায়ের পেয়ালায় ঝড় তুলে জাহির করতেন নিজেদের বিদ্যা। আর সাংবাদিকদের ভাবতেন ভাসা-আসা জ্ঞান নিয়ে সবকিছুতেই টুঁ মারে এরা। অবশ্য পরের দিকে খানিকটা নমনীয় হয়ে যোগ করলেন ঃ হ্যাঁ, সব বিষয়ে এদের অল্পবিস্তর জ্ঞান আছে বটে তবে কোনো বিষয়েরই পণ্ডিত অর্থাৎ অথরিটি এরা নন। পুরো প্রবচনটি শেষে দাঁড়ালো ঃ 'এ জার্নালিস্ট ইজ্ এ জ্যাক অভ্ অল ট্রেড্স বাট্ মাস্টার অভ নান্।'

সবজান্তা বলে গোড়ার দিকে সমালোচনার বাণ ছোঁড়া হলেও পরেকার বিশেষণে কিছুটা হলেও স্বীকৃতি মিলেছে এই বিদ্যাবাচস্পতিদের কাছ থাকে। সাংবাদিক সমাজের লোকেরাও অবশ্য নিজেদের পণ্ডিত কিংবা বিষয়-বিশেষজ্ঞ বলে দাবি করেননি। তাঁরা বরাবরই ছিলেন সাধারণ মানুষের কাতারের লোক। 'নিউজ-লেটার' প্রকাশের মধ্য দিয়ে যখন আধুনিক সংবাদপত্রের গোড়াপত্তন হলো তখন থেকে এই পেশাটি আর হাবাগোবাদের পেশা হয়ে থাকলো না। বরং সাংবাদিকের কলম হলো সমাজ-পরিবর্তনের ধারালো হাতিয়ার। ব্যাস্টিল দুর্গের অবরোধ কী সম্ভব হতো যদি তার পেছনে সাংবাদিক কামি-দা মুলের কাগজ 'ট্রিবিউন ডেস্ প্যাট্রিয়টিস্'-এর জ্বালাময়ী ভাষা আর গণনেতৃত্ব না থাকতো? ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লবের সূত্রধর তো ছিলেন এই কলম সৈনিক।

দা মুলের 'রেভ্যুলিশন দ্য ফ্রান্সের' আগুনই তো বারো জুলাইয়ের জন্ম দিয়েছিলো। ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিলো পুরনো সমাজ ব্যবস্থার ইমারত। মর্যাদার তুঙ্গে উঠিয়েছিলো ফোর্থ-স্টেট তথা সংবাদপত্র দুনিয়াকে। এর আছে সামন্ত সমাজের ছিলো তিন স্তম্ভ। সবার ওপরে ছিলো পোপ, মাঝখানে রাজা আর ভূমি মালিক ডিউক-লর্ডের দল। আর সবার নিচে ভূমিদাস কৃষক শ্রেণী। এরা ছিলো দ্য পিপল অর্থাৎ আপামর জনশ্রেণী। বিপ্লবের পর এদের অনুভূতিকে রূপ দেয়ার জন্যে সামনে পা বাড়ালো ফোর্থ-স্টেট তথা সংবাদপত্র। সব থেকে জোরালো হলো সমাজের এই নতুন স্তম্ভটি। একে পাশ কাটিয়ে আর আগ বাড়াতে পারলো না রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য এবং সংস্কৃতি।

আঠারো এবং উনিশ শতক ছিলো সাংবাদিকতার স্বর্ণযুগ। এ সময় আধুনিক সভ্যতা আর চিন্তার জগতের বাহন হয়ে দাঁড়ালো সংবাদপত্র। বিশ্বখ্যাত রাষ্ট্রদার্শনিক, সমাজবেত্তা, কবি, ঔপন্যাসিক, গবেষক এবং ইতিহাসবিদদের মধ্যে এমন ব্যক্তিত্ব খুব কমই ছিলেন যাঁরা এ সময় জড়িত ছিলেন না সংবাদপত্রের সংগে। ভলতেয়ার, রুশো, দিদেরো'র মতন ফরাসি কবি এবং চিন্তানায়করা ছিলেন তাঁদের যুগের বিখ্যাত সাময়িকপত্রের লেখক-সম্পাদক। ফরাসি বিপ্লবের অনুপ্রেরণার উৎস ছিলো ভলতেয়ারের কবিতা, রুশোর প্রাকৃতিক সাম্যের তত্ত্ব, দিদেরোর শিক্ষা-দর্শন।

www.pathagar.com

যাজকতন্ত্রের অনাচার এবং রক্ষণশীলতার কঠোর সমালোচক ছিলেন এঁরা। বিপ্লবের মূলমন্ত্রঃ স্বাধীনতা, সাম্য এবং ভ্রাতৃত্ব তথা লিবার্টি, ইকুয়ালিটি অ্যান্ড ফ্রেটারনিটির ধারণা এসেছে এঁদের লেখা থেকে।

স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে নিপীড়িত মানুষের নিরন্তর সংগ্রামের অনিবার্য বিজয়ের কথা বলেছেন রুশো। তিনি বিশ্বাস করতেন মানবিক সাম্য এবং বুদ্ধির মুক্তি ছাড়া টিকতে পারে না সমাজ এবং রাষ্ট্র। কারণ আদিম প্রাকৃতিক সমাজে কোনো বর্ণভেদ, শ্রেণীভেদ ছিলো না। অবারিত প্রকৃতির মাটি, ফল-ফসল, আলো-বাতাস সবকিছুই চাহিদা-মাফিক ভোগ করতো আদিম মানবশ্রেণী। সম্পদের এই ভোগের চালিকা শক্তি ছিলো বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক আইন। যার ওপর হাত নেই কোনো শক্তিধর দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় পক্ষের। এই আইন কেউ নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলে প্রকৃতি তার প্রতিশোধ নেবেই। আধুনিক রাষ্ট্রের নিয়ন্তারা জোর করে মানুষের এই মৌলিক অধিকারে ভাগ বসাতে এলে ধ্বংস তার অবধারিত। কারণ, বঞ্চিত নিগৃহীতদের রুদ্ররোষ তাকে ঘায়েল করবেই।

রুশো তাঁর দর্শনতত্ত্বে প্রকৃতির এই সন্তানদের চিহ্নিত করেছেন রাষ্ট্রের মৌলস্তম্ভ হিসেবে। যাদের তিনি বলেছেন দ্য পিপল। সমাজ বিবর্তনের সুযোগে যাজক এবং

জ্যাঁ জাক রুশো

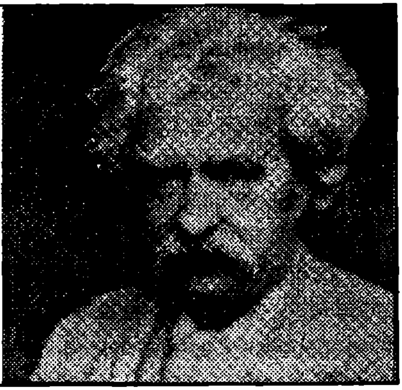

মার্ক টোরাইন

ভুস্বামী শ্রেণী চড়ে বসে এদের ঘাড়ে। ঠিক সিন্দ্‌বাদের ভূতের মতন। উৎপাদক না হয়েও এরা ভাগ বসায় শ্রমজীবী মানুষের উৎপাদনে। এই শোষকরা সমাজের পরগাছা। কৃত্রিম উপায়ে এরা প্রথম এবং দ্বিতীয় শক্তি হিসাবে আবির্ভূত। এরা মাথার ওপর চেপে বসলেও সব থেকে শক্তিশালী হলো তৃতীয় স্তর অর্থাৎ জনশ্রেণী। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের উৎস এরাই। তাঁর কথা হলোঃ 'সভরেনিটি লাইজ উইথ দ্য পিপলসনট উইথ দ্য কিংস্ অর এমপারর্স।' রাজা কিংবা সম্রাটরা সার্বভৌম নন। জনগণই সাবভৌমত্বের অধিকারী। আর এ অধিকার ক্ষুণ্ন হলেই আসবে বিপ্লব। আর সেই বিপ্লবের দাবানলে পুড়ে ছারখার হবে পুরনো সব আবর্জনা। ভস্মসাৎ

www.pathagar.com

হবে জনগণের ঘাড়ে চেপে বসা ভূতেরা ।

আরেকটি কথা বলেছেন রুশো। বলেছেনঃ জনগণের পক্ষে তাদের সংগে একাত্ম হয়ে, তাদের অধিকার নিয়ে যাঁরা কথা বলবেন তাঁরা চতুর্থ শক্তি। চতুর্থ স্টেটের লোক। সংবাদপত্র এবং সাংবাদিক এই স্তরের অন্তর্গত। জনগণের মুখপাত্র এই শক্তি। যাদের বলা হয়েছে মাস্‌মিডিয়া। বলা হয়েছে- ভয়েস্ অভ্ দ্য পিপল রুশোর এই ভাষ্য থেকেই সংবাদপত্রের নাম হয়েছে গণমাধ্যম। সাংবাদিকরা হয়েছে জনমতের সংগঠন। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ফরাসি বিপ্লবের পর ধুলো থেকে তুলে নিয়েছিলেন রাজমুকুট। রাজা বনে গেলেও তিনি রুশোর তত্ত্বকে অস্বীকার করেননি। 'ফোর্থ-স্টেট' অভিধায় আনুষ্ঠানিকভাবে ভূষিত করেছেন তিনি সংবাদপত্র জগৎকে। আর সাংবাদিকদের আখ্যায়িত করেছেন 'জেন্টেলম্যান অভ্ দ্য প্রেস' অর্থাৎ 'সংবাদপত্রের ভদ্রলোক' বিশেষণে। কথাটা শুনতে বেশ ভালোই লাগে। অহংকারও বোধ হয়। একালে এই মহৎ পেশায় স্তাবকতা, ব্ল্যাকমেইলিং আর ব্রাউন জার্নালিজমের অনুপ্রবেশ না ঘটলে রুশো, ভলতেয়ার এবং স্টুয়ার্ড মিলের উত্তরাধিকারীরা সত্যিকার গর্বই বোধ করতেন। সতেরো শতকের গোড়ার দিকে যাঁরা সাংবাদিকদের জ্যাক, ছিদ্রান্বেষী এবং সবজান্তা বলে টিটকারি করতেন তাঁদের মুখ একালেও চুন হতো যদি নিখাদ সাংবাদিকতার সেই নিরাপোস, গণমুখী ধারাটি বজায় রাখা যেতো। যদি জেন মিল্টন, বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিন, ন্যাথানিয়েল বাটার, লী হান্ট, জন ডিলেন প্রথম পূর্বসূরিদের আদর্শ টিকে থাকতো দু'হাজার সালের এই যাত্রালগ্নে। রুশোর সংবাদপত্রের নিবন্ধমালা, তাঁর সমাজচিন্তা, তাঁর 'কনফেশন'- এর আত্মবিশ্লেষণ প্রভাব ফেলেছে সারাবিশ্বের চিন্তার জগতে। জার্মান দার্শনিক কান্ট, মহাকবি গ্যাটে, রুশ কথাশিল্পী লিও টলস্টয়ের মতন মনীষারা ছিলেন তাঁর ভাবশিষ্য। সেই যুগটি ছিলো সংবাদপত্র, সাহিত্য এবং সমাজ বিবর্তনের রেনেসাঁর যুগ। মনীষীর একপুঞ্জ নক্ষত্রের আবির্ভাব ঘটে তখন সংবাদপত্রের জগতে। যাঁদের অন্বেষা ছিলো স্বাধীনতা, গণতন্ত্র আর মানবিক সাম্য। মুক্তবুদ্ধি ছিলো যার আত্মার স্পন্দন। রুশ সাংবাদিক ভাসিলি ইয়ানের কথা বলতে গিয়ে মনের অজান্তেই কড়া নাড়তে হলো আমায় পুরনো যুগের দুয়ারের। ভাসিলি ছিলেন সাংবাদিকতার সোনালি যুগের একজন বিশ্বস্ত প্রতিনিধি। সংবাদপত্রের লোক হলেও তিনি ছিলেন একজন বিশ্বখ্যাত ঐতিহাসিক, কথাশিল্পী এবং ভূপর্যটক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান কবি, সমালোচক এবং সংবাদপত্র সম্পাদক এডগার অ্যালান পো'র মতন জীবনকে দেখেছেন তিনি বাস্তবতার জমিনে দাঁড়িয়ে। ক্লিমেন্স মার্ক টোয়াইনেরও সমগোত্রীয় ছিলেন তিনি। এক সময় সেন্ট লুইজ এবং নিউ অর্নিয়েন্স থেকে প্রকাশিত সাময়িকপত্রগুলোতে হাতেখড়ি হয় ক্লিমেন্সের সাংবাদিক হিসাবে। পরে তিনি 'ভার্জিনিয়া সিটি এন্টারপ্রাইজ' এবং নিউইয়র্ক স্যাটারডে প্রেসে 'মার্ক টোয়াইন' ছদ্মনামে লিখতে থাকেন ধারাবাহিকভাবে। 'নিউইয়র্ক স্যাটারডে' কাগজে প্রকাশিত হয় তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'দ্য সেলিব্রেটেড জাম্পিং ফ্রগ।' তাঁর পৈতৃক নাম ছিলো স্যামুয়েল ল্যাংহোর্ন ক্লিমেন্স।

www.pathagar.com

লেখার উপাদান আর অনুসন্ধান রিপোর্ট সংগ্রহ করতে গিয়ে আমেরিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল সফর করতে হয় তাঁকে। এই অভিজ্ঞতার আলোকে লিখলেন তিনি জনপ্রিয় ভ্রমণ কাহিনী 'ইন্‌নোসেন্টস অ্যাব্‌রড।'

মিসিসিপি নদীতে নৌকার লগির মাল্লা হিসাবে কয়েক বছর কাজ করেন তিনি। তার পেশা ছিলো নদীর পানির গভীরতা যাচাইয়ের কাজ। মার্ক টোয়াইন কথাটির মানে হলো 'দুই বাঁও পানি'। এই বাস্তব অবিজ্ঞতার ফসল হলো তাঁর বিশ্বখ্যাত উপন্যাস 'দ্য আডভেঞ্চারস অভ্‌ টম সয়্যার', 'লাইফ অন্‌ দ্য মিসিসিপি', ভ্রমণ বৃত্তান্ত' 'এ ট্রাম্প অ্যাব্‌রভ' এবং ঐতিহাসিক উপন্যাস 'দ্য প্রিন্স অ্যান্ড পপার'। কানেটিকাট ইয়াংকি ইন কিং আর্থারস কোর্ট, তাঁর সমাজবিষয়ক বিখ্যাত ব্যঙ্গ রচনা। সাংবাদিক হিসাবে জীবন শুরু করে ক্লিমেন্স হলেন একজন প্রখ্যাত কলাসাহিত্যিক, পর্যটক, ঐতিহাসিক এবং অধ্যাপক। তাঁর সাংবাদিক এবং সাহিত্যিক ছদ্মনাম মার্ক টোয়াইনের আড়ালে চাপা পড়ে যায় তাঁর আসল নাম মার্ক টোয়াইন। হিসাবেই বিশ্বনন্দিত হলেন এই মনীষী সাংবাদিক-কথাসাহিত্যিক-ঐতিহাসিক। ভাসিলি ইয়ানও ছিলেন এরকম অসাধারণ প্রতিভাধর একজন সংবাদপত্র প্রতিনিধি, ভূপর্যটক, অধ্যাপক এবং ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখক। তিনি ছিলেন প্রাচ্যভাষাবিদ একজন পণ্ডিত। তিনি ব্যাপকভাবে সফর করেন ইউরোপ, উত্তর-দক্ষিণ আমেরিকা, এশিয়া এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মেরু অঞ্চল। ককেশাস পর্বতমালার দেশগুলোতেও চলে তাঁর ভ্রমণ অভিযান। নৃশংস মোঙ্গল বিজয়ীদের ধ্বংসযজ্ঞের পোড়ামাটি অনুসরণ করে গোটা মধ্য এশিয়া, প্রাচীন খারেজম আর ইরান সফর করেন তিনি। যান ভারতের সীমান্ত সংলগ্ন বেলুচিস্তানে।

দুর্ধর্ষ বিজেতা চেঙ্গিজ খান, তাঁর পৌত্র বতু খানের আগুনের লেলিহান শিখায় পুড়ে ছারখার হয়ে-যাওয়া এক গ্রামের বুড়োর সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন তিনি। তাঁর কাগজ আর উপন্যাসের উপাদানের জন্যে। এই বৃদ্ধ লোকটি ছিলেন বেলুচিস্তানের মরুভূমির দেশের লোক। যার নাম 'দাশত-ই লুত'। অর্থাৎ লুত মরুভূমি। লোকটির পূর্বপুরুষদের বাস ছিলো এখানকার এক শ্যামল মরূদ্যানে। এককালে এসব মরূদ্যান ছিল ফল-ফুল-ফসল আর তরুলতায় শোভিত। মানুষগুলো ছিলো সুখী। কিন্তু চেঙ্গিজের আক্রমণের পর থেকে শ-শ বছর ধরে বিরান, জলশূন্য পড়ে আছে বেলুচদের এসব বসত আর তাদের মরূদ্যান।

বুড়ো দীর্ঘশ্বাস ফেলে পৃথিবীর মূর্ত-অভিশাপ চেঙ্গিজের এই ধ্বংসযজ্ঞের কাহিনী শুনিয়েছিলেন ভাসিলি ইয়ানকে। মোঙ্গলদের অশ্বখুরে দলিত-মথিত তাদের জনপদের এ ভয়াল অভিশাপের কাহিনী বুড়ো শুনেছেন তাঁর পিতামহের কাছে থেকে। তিনি শুনেছেন তাঁর পূর্বপুরুষদের মুখে। ভাসিলি তাঁর কাগজে ছেপেছেন প্রতিবেদনটি। তিনি ছিলেন সে সময় পেত্রোগ্রাদের একটি কাগজের লণ্ডন সংবাদদাতা। পরে তিনি এই কাহিনীর সংগে একটি মধ্যএশিয়া সফরের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা জুড়ে দিয়ে রচনা করলেন তাঁর বিশ্বখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাস 'চেঙ্গিজ খান'। এতে ছিলো

www.pathagar.com

বাস্তবতার নিখুঁত প্রতিফলন। এই উপন্যাসের জন্যে তিনি ভূষিত হন রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে। তাঁর বাকি উপন্যাসগুলোর মধ্যে রয়েছে 'লোস্পার্টাকাস', 'ফিনিশিয়া', 'আলেকজাণ্ডার' এবং 'বতু খান।' ভাসিলি ইয়ান রুশ সাহিত্যের একজন পুরোধা-পুরুষ। ইংরেজি, স্পনিশসহ বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে তাঁর উপন্যাসগুলো।

আমার সফরের চার যুগ আগে তিনি তিফ্লিস আসেন। তাঁর জন্ম ১৮৭৫ সালে। আমি যখন দৈনিক সংবাদে ১৯৫৪ সালে একজন সিনিয়র সাব-এডিটর, সে বছর পরলোকবাসী হন তিনি। ১৯৭৫ সালে আমার মস্কো সফরের তিন বছর পর সেখানে বাংলায় তরজমা হয় তাঁর চেঙ্গিজ খান উপন্যাসটি। প্রকাশক ছিলো মস্কোর নভোস্তি প্রেসের অন্তর্গত প্রগতি প্রকাশন।

বাংলা তরজমাটির আমি পড়েছি। এর এক জায়গায় ভাসিলি লিখেছেনঃ 'মোঙ্গল বিজয়ীরা রাখাল আর কৃষকের খুনের দরিয়ায় ভাসিয়ে নিয়ে গেছে হাজার হাজার জনপদ, ফসলের মাঠ এবং জমিন। বিধবা আর শিশুদের চোখের পানিতে নোনা ধরেছে তাদের ক্ষেতে, বাড়ির দাওয়ায়। এই পথ দিয়ে গেছে আলেকজাণ্ডার, বিশ্বত্রাস চেঙ্গিজ, নাদির আর তৈমুর লং।'

১৯০৫ এবং ১৯১৭-র অক্টোবর বিপ্লব দেখেছেন ভাসিলি ইয়ান। বিপ্লবের যুগে বেড়ে যায় তাঁর সাংবাদিক এবং লেখক খ্যাতি। পরিচিতি ঘটে তাঁর বিশ্বজোড়া। বিপ্লবত্তোর যুগে সোভিয়েত সাহিত্য, সাংবাদিকতা এবং সংস্কৃতির মনীষী পুরুষ হিসেবে ব্রত হন তিনি। তিফ্লিসে এসে বার-বার তাঁর নামই জাগিয়ে তোলে আমার স্মৃতিকে। এই লোকটিকে তাঁর ইতিহাস-চেতনার এবং গণমুখী সাংবাদিকতার জন্য ভুলতে পারি না আমি। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন- একজন ভালো সাংবাদিক হতে হলে জানতে হবে জগৎ এবং জীবনকে।

এক আশ্চর্য মিল আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের সংগে রুশ সাহিত্যের। মিল ভাষা আর ভৌগোলিক শব্দাবলীরও। এখানে না এলে এর কিছুই জানতাম না। হদ্দ বোকা বনেই থাকতাম। কথা বলছিলাম ককেশিয়ার ইতিহাস আর সংস্কৃতি নিয়ে। পাথরের ভাঁজে-ভাঁজে এখানে মানুষের দীর্ঘশ্বাস। তার অশ্রুকণা, তার রক্তের কালোশুকনো রেখা।

এসব কথা লেখা আছে পর্যটক সাংবাদিক ভাসিলির প্রতিবেদনে। লেখা আছে তাঁর 'আলেকজান্দার' এবং 'চেঙ্গিজ খান' উপন্যাসে। আছে পিটাসবুর্গ, ব্রিটিশ মিউজিয়াম আর মস্কোর সমৃদ্ধ পাঠাগারের ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলীতে। কিন্তু যুগে যুগে বিজয়ীদে দর্পিত পদচারণার পরও বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ককেশাস। নত হয়নি তার আকাশচুম্বী চূড়া। আছে তার চির তুষারের থাকে, থাকে স্তরে স্তরে হাজারও রহস্য। আছে কত গল্পকথা, কত কল্পকথা।

কত নামে ডাকে এরা এই প্রিয় পাহাড়টাকে। আমাদের গল্পের সাত ভাই চম্পা আর পারুলের মতন আট-আটটি নাম তার। এক বৃন্তে ফোটা আটটি চাঁপা ফুল যেনো। কাস্পিয়ানের দুই পার জুড়ে ছড়িয়ে আছে তারা এক বিশাল তুষার বাগিচায়।

www.pathagar.com

রুশরা তুষার ফুলের এই উদ্যানটিকে বলে কুফকাজ। আমাদের পুঁথিকাররা বলে কুহকাফ। কত কাছাকাছি মিল নামের। জর্জিয়ান আর রুশদের লোকগাঁথায় কুফ্কাজের সাত ছেলে আর এক মেয়ের কথা আছে। মেয়েটির জন্ম সাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম তটে। কুফ্কাজের খাস ফুলের বনে। যেখানে স্বচ্ছসলিলা রেজাই। রেজাই হ্রদ। ডানে সাগরের কুল ঘেঁষে পার্বত্য শহর রেশত। পশ্চিম কোণে ইরানি আজারবাইজানের প্রাচীনতম শহর তাব্রিজ। যার আদি নাম গাজাকা। এর কোণে কবে কোন মহাকালে জন্ম শিশু কুফ্কাজের। এক সময় বয়স্ক হতে থাকে পাহাড়। তার জঠরে তখন জন্ম নিলো কনিষ্ঠ কন্যা খুকি কুফ্কাজ। রুশরা পাহাড়ের এই ছোট মেয়েকে বলে মালিংকি। কেউ কেউ বলে মা-লি। আমাদের কাপ্তাই পাহাড়ের মেয়ে কর্ণফুলির মতন একদিন মালিংকি সাঁতার দিতে গেলো ওপারের আরাগ নদীতে। যে নদী আরারাতে সাড়ে ছয় হাজার ফুট উঁচু থেকে নেমে দ্রুতপায়ে হেঁটে এসেছে এখানে। মাঝখানে আনাতোলিয়ার বুকে এঁকে-বেঁকে ঘুরেছে হাজার মাইল পথ। কাস্পিয়ানে পড়বার আগে আজারবাইজানের সীমান্তে কুরা নদীর সংগে হয়েছে তার কোলাকুলি। কুরা এসেছে ইরান থেকে। এখানে প্রচণ্ড তোড় দুই নদীর স্রোতের। মালিংকির কানের ফুল ভেসে যায় নদীর উত্তাল তরংগে। হয়তো ভেসে যায় সাগরে। কিন্তু ফুল খোঁজা তার আর শেষ হয় না। ফুল খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ একদিন দেখা হয়ে গেলো হারিয়ে যাওয়া বড় ভাইয়ের সংগে।

মালিকিংর এই বড় ভাইয়ের রুশ নাম বল্সই কুফ্কাজ। পশ্চিমারা যাকে বলে গ্রেটার ককেশাস। বড় ভাইয়ের বলসই নামে আছে একটা বাংলা-বাংলা গন্ধ। মালিংকিকে পশ্চিমারা বলে লেসার ককেশাস। সেকি আনন্দ দুই ভাইবোনের মিলনের। সেই আনন্দেই তো ডানা মেলে দিয়েছিলো বলসই উত্তরে-দক্ষিণে, পুবে-পশ্চিমে। হারানো ভাইদের খুঁজবার জন্য মালিংকি-বলসই হাত বাড়ায় এবার মাঝখানের আর ভেতরকার ওক-বার্চ ঘেরা অরণ্যে। এবার দেখা হয়ে গেলো একে একে সাত ভাই চম্পা আর এক বোন পারুলের। পারুল গানের সুরে, তুষার চোখে অশ্রু ঝরিয়ে ডাকলোঃ সাত ভাই চম্পা জাগোরে। ওরা ঘুম ভেঙে সংগে-সংগে জবাব দিলোঃ কেন বোন পারুল ডাকোরে? মহামিলনের এ উল্লাস তাদের দেখে কে? তারা জাগলো কোটি বছরের আচ্ছন্নতা কাটিয়ে। তুষারের কাঁথা গা থেকে সরিয়ে দিয়ে। সেটা ছিলো বসন্ত ঋতু। ফুল ফুটবার সময়, ঘাস গজাবার সময়। আর শীতে ঝরে যাওয়া ন্যাড়া ওক, ম্যাপল্স আর বার্চের ডালে সবুজ পাতার চোখ খোলার মওসুম। অমন এক সুন্দর, সুখের দিনে মিলন সাত ভাই এবং এক বোনের। বলসই ছাড়া বাকি ছয় ভাই হলো ইউঝনি, ক্রাসনোদার, গ্রেশজিয়া। আর ওসেতান, কাকহেতি এবং স্রেদনি। আর এসবই রুশ রূপকথার নাম। ইউঝনি হলো দক্ষিণ কুফ্কাজ। ক্রাসনোদার উত্তরেরটি। যেখানে কুবান নদীর তীরে দক্ষিণ-পুব রাশিয়ার শস্যভান্ডার এর মালভূমিতে। গ্রুজিয়া হলো জর্জিয়ান কুফ্কাজ। কৃষ্ণসাগর তল্লাটের দুই চম্পার নাম ওসেতান আর কাকহেতি। ভেতরে তরুলতার

www.pathagar.com

ছায়ার আড়ালে অনন্ত ঘুমে যে লুটিয়ে পড়েছিলো নাম তার স্রেদনি। ইউরোপিয়ান জিওগ্রাফারদের কাছে ইউঝনি হলো সাউথ ককেশাস। ক্রসেনোদর নর্থ ককেশাস গ্রুজিয়া হলো জর্জিয়া হলো জর্জিয়ান ককেশাস। ওসেতানিয়া এবং কাকহেতিয়া স্বশাসিত অঞ্চলের দুই ক্ষুদে ককেশাস। তাদের নিজ নামেই ভূষিত তারা। ভেতরকার স্রোদনি কুফ্‌কাজ হলো ইনার ককেশাস। উত্তর-পশ্চিমে এই সাত ভাইয়েরই একটি মিলিত সোনার সুতোয় বেঁধে দিয়েছে ইউরোপ আর এশিয়াকে। বেঁধে দিয়েছে 'চলতি হাওয়ার পন্থী' কৃষ্ণ এবং কাস্পিয়ানকে 'এক বন্ধনহীন গ্রন্থিতে'। রুশ নাম এর ত্রানস কুফ্‌কাজ। ইউরোপীয়রা বলে ট্রান্স-ককেশাস।

এখান দিয়ে দুই সাগরকে যুক্তি করেছে ট্রান্স-ককেশিয়ান রেল সড়ক। সাড়ে সাতশ' মাইল দীর্ঘ এ সড়ক অনুসরণ করেছে ককেশাসের প্রাচীন দুই গিরিপথ। ম্যামিসন এবং দারিয়েল। এই পথ দিয়ে ইতিহাসকালের অনেক আগে কাস্পিয়ান সভ্যতার কারাভা গেছে কৃষ্ণসাগর তটে। সেখান থেকে নৌকা ভাসিয়ে ইউরোপীয় সভ্যতা এসেছে এই গিরিপথ ধরে মধ্য এশিয়ায়। এসেছে চীনের পীতনদীর উপকূলে। এই পার্বত্য সড়কের বুক দিয়েই কাস্পিয়ানের বাকু বন্দর থেকে পেট্রোলিয়ামের পাইপ লাইন চলে গেছে কৃষ্ণসাগরের বাতুম আর ওদেসা বন্দরে। সেখান থেকে গেছে উত্তর-পশ্চিমে নীপার এবং ডন নদীর তীরের নগরগুলোতে।

বাকু কাস্পিয়ানের প্রাচীনতম বন্দর। এর বুকের আশফারান উপদ্বীপ আর গ্রেটার ককেশাসের বিশাল পার্বত্য মালভূমি ভাসছে তেলের সাগরের ওপর। ভূবেত্তারা বলেন, আদিমকাল থেকে এখানে অনির্বাণ শিখা হয়ে জ্বলতো তেল আর গ্যাসের কূপ। বাকুর দক্ষিণ কোণে ইরানের তাবরিজের এক পার্বত্য গ্রামে জন্ম ইরানের প্রোফেট জরোথস্‌রুর। যাঁকে ইরানিরা বলে জুর আসতার। প্রাচ্যবেত্তাদের মতে, দু'জন জরোথসরুর আবির্ভাব হয়েছিলো প্রাচীন পারস্যে। প্রথম জনের জন্ম খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দের দিকে। একই সময় রচিত হয়েছিলো বৈদিকদের আদি গাঁথাকাব্য ঋকবেদের শ্লোকসমূহ। জরোথস্‌রুর প্রচারিত অদ্বৈত ধর্মমতের সংগে অনেক মিল দেখা যায় ঋকবেদের। 'শাহ্‌নামা' কাব্য রচয়িতা মহাকবি ফেরদৌসী তাঁর কাহিনীতে দ্বিতীয় জরোথস্‌রুর বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বেঁচেছিলেন বুদ্ধের মতো দীর্ঘ ৮০ বছর। এক যুদ্ধে নাকি নিহত হন তিনি। তার জীবনকাল খ্রিস্টপূর্ব ৬৬০ থেকে ৫৮৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে। প্রাচীন পহলভ তথা পারসিক ভাষায় তাঁর জুর আসতার নামের মানে 'ওল্ড ক্যামেল' অর্থাৎ বুড়ো উট। তাঁরও জন্ম কাস্পিয়ান সাগরতটে। মালিংকি কুফ্‌কাজ তথা ইরানিয়ান লেসার ককেশাসের সৈকতে।

গৌতম বুদ্ধের মতো চল্লিশ বছর বয়েসে ধর্ম প্রচারে বের হন প্রাচীন পৃথিবীর এই প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত বুড়ো উট। পারস্য সম্রাট প্রথম দারায়ুসের পিতা রাজা হিস্‌তাস্‌পাস নাকি দীক্ষিত হন তাঁর হাতে। তার পর থেকে সারা পারস্যে আর গ্রেটার ককেশাস অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর 'আবেস্‌তা' ধর্মমত। তাঁর ধর্মগ্রন্থের নাম 'জেনদাবেস্‌তা।' 'জেন্‌দ' শব্দটির পারসিক মানে ভাষ্য তথ্য কমেনট্রি। আর 'আবেস্‌তা'র মানে ঐশী

www.pathagar.com

আইন তথা অনুশাসন। অর্থাৎ জরোথস্রুর গোটা ধর্মপুস্তকটির অর্থ দাঁড়ায় 'ঐশী আইনের অনুশাসন'। সংস্কৃতে এর মানে হলো 'আদি ঐশ্বরিক বেদ।'

জরোথস্রু স্রষ্টাকে মনে করতেন এক আলোকময় সত্তা। তিনি বিশুদ্ধ এবং পরম জ্ঞানের উৎস। তিনি পবিত্র, চিন্ময়, অদ্বিতীয়, অবিকৃত এবং স্থাবর-জংগমসহ সমস্ত প্রকৃতি জগত, প্রাণি জগত আর গ্রহলোকসমেত মহাবিশ্বের স্রষ্টা। জরোথস্রু মানুষকে সৎচিন্তা, সৎকর্ম, সদাচার আর জ্ঞানচর্চার উপদেশ দিয়েছেন। গৌতম

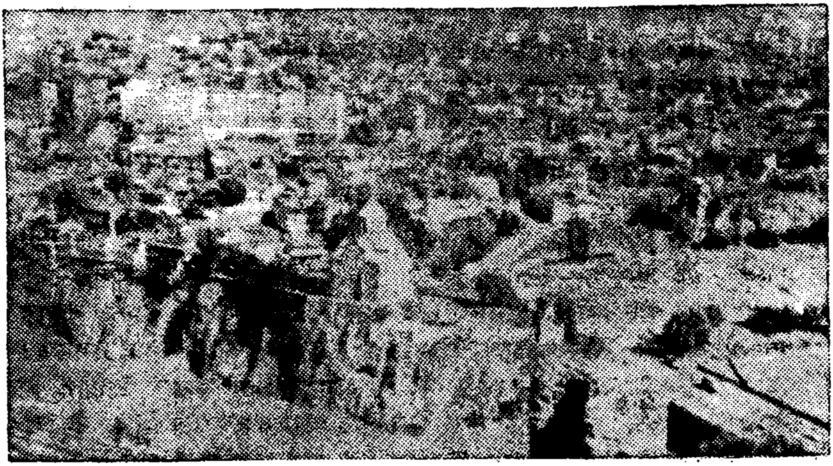

গ্রুজিয়ার রাজধানী তিফলিস

বুদ্ধের মতন কাস্পিয়ানের দুই তীরে পদব্রজে তিনি প্রচার করতেন তাঁর ধর্মমত। তিনি প্রকৃতি থেকে শিক্ষা নিতে বলতেন মানুষকে। সক্রেটিসের মতন বলতেনঃ জ্ঞানই মুক্তি। বলতেন ঃ নো দাইসেলফ'-নিজেকে জানো। বলতেন, 'সার্চ দ্য ট্রথ'- সত্যের সন্ধান করো। তাহলেই খুঁজে পাবে নিজের উৎসকে। খুঁজে পাবে জ্ঞানের বোধিবৃক্ষকে।

জরোথস্রু নিজের অনুসারীদের এক ভ্রাতৃমণ্ডলে আবদ্ধ করতে চেয়েছেন। এরা পরস্পরকে বলতো মিত্র। পারসিক ভাষায় কথাটিকে বলা হয়েছে 'মিত্রা' অর্থাৎ বন্ধু। স্রষ্টাকে জরোথস্রু তুলনা করেছেন অনির্বাণ আলোক শিখার সংগে। যেমন বাকু এবং কাস্পিয়ানের ওপারে কখনো নিভতো না তেলখনির ইটারনাল ফ্লেম তথা চির প্রজ্বলন্ত শিখা। সাধারণ মানুষকে স্রষ্টার মহাজ্ঞানের অনন্ত আলোর ধারণা দিতে গিয়ে তেলকূপের অনির্বাণ শিখাকে তুলে ধরেছিলেন তিনি দৃষ্টান্ত হিসাবে। হোমাগ্নি, পশুহত্যা আর জাগযজ্ঞে তিনি বিশ্বাস করতেন না।

তিনি বলতেন ঃ কল্যাণের এবং সত্যের উৎস হলো আলোকময় 'সুপ্রিম নলেজ' তথা অনন্ত জ্ঞান। তিনি 'আহুরা মাজদা'। অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানময় সত্তা। আর অন্ধকার অর্থাৎ শয়তান হলো 'আহিরমান'। সে অপদেবতা। সমস্ত অন্যায়, অসত্য,

www.pathagar.com

বিভ্রান্তি এবং লোভলালসার প্রতীক। আলোর সংগে অন্ধকারের যেমন আকাশ পাতাল ফারাক তেমনি তার সংগে ব্যবধান কল্যাণ এবং অকল্যাণের, সত্য এবং অসত্যের, ন্যায় এবং অন্যায়ের।

পুরাবেত্তারা বলেন, পারস্য সম্রাটেরা নিজেদের স্বার্থে জরোথস্ত্রুর ধর্মকে বিকৃত করেছেন। প্রবর্তন করেছেন তারা অগ্নিউপাসনা। পরবর্তীকালের জরোথস্ত্রর বিভ্রান্ত শিষ্যরা বাকু এবং ইরানের তেলকূপগুলোর চারপাশে গড়ে তোলে অসংখ্য ধর্মমন্দির। এখানে তারা উপাসনা করতো পবিত্র অগ্নিদেবতার। তেলখনিগুলোর অনির্বাণ শিখাগুলোকে তারা মনে করতো পবিত্রতম শিখা। তেলকূপগুলোকে মনে করতো ঐশী শক্তির বিচ্ছুরিত আলোর উৎস। অথচ আধুনিক বিজ্ঞান এই তেল এবং গ্যাসকে আজ মানুষের দাসে পরিণত করেছে। আগুনের উত্তাপকে বিজ্ঞানীরা মানুষের জ্বালানির কাজে লাগিয়েছেন। অতীতে মানুষের প্রকৃতি-উপাসনাও ছিলো ঠিক একই ভৌতিক পূজা থেকে আহরিত।

দক্ষিণ ভারতের নদী কৃষ্ণা-কাবেরীর কথা হঠাৎ মনে পড়লো আমার এখানে এসে। একটা মিল আছে তার কৃষ্ণ-কাস্পিয়ানের সংগে। অন্তত অনুপ্রাসের দিক থেকে। ওটা বিন্ধ্য পর্বতের দেশ। আর এটা ককেশাস পর্বতের। দুই পর্বতমালাকে ঘিরে বারে বারে পালা বদল হয়েছে ইতিহাসের। বিবর্তিত হয়েছে মানবসভ্যতা। বিন্ধ্য'র দক্ষিণে ছিলো প্রাচীন দাক্ষিণাত্য। দ্রাবিড় জাতির আদিম বাসভূমি সেটি। পর্বতের উত্তরে ছিলো আর্যাবর্ত। আর্যরা কাস্পিয়ানের দক্ষিণ-পুর্ব থেকে এখানে এসে বসত গড়েছিলো গোড়াতে। যার সুবাদে নাম তার আর্যাবর্ত।

তারা এসেছিলো আধুনিক বাকু বন্দরের দক্ষিণের তাব্রিজ আর পুব পারের আসকাবাদ আর মেসেদ থেকে। এর খানিকটা পূবেই হিন্দুকুশ পর্বতমালা। এখানে প্রাচীন আরিয়ানা ভূমি। আর্যদের নামেই আফগানদের এই অঞ্চলটির নাম আরিয়ানা। আফগানিস্তানের আরিয়ানা এয়ার লাইন্স ধরে রেখেছে পুরাকালের সেই স্মৃতিকে।

তৃণভূমির খোঁজে আর্য-রাখালেরা ধীরে ধীরে এগুতে থাকেন তাইগ্রিস-ইউফ্রেতিসের তীর ধরে। ডানদিকে মোড় নিতেই পেয়ে গেলেন তারা হিন্দুকুশের মহাবন পর্বত। এখান থেকে নেমেছে কাবুল নদী। মহাবনের অরণ্য ছিলো তাদের কাছে রহস্যময়। এখানে গড়ে ওঠে তাদের ঋষিদের তপোবন। কাছে প্রাচীন গান্ধারা। পান্ডব এবং কুরুদের পূর্বপুরুষদের বাসস্থান। গান্ধারা সভ্যতার আদি পীঠস্থান এটি। আর্যজননী গান্ধারীর নাম জড়িত প্রাগৈতিহাসিক এই ভূমি এবং শহরের সংগে।

গান্ধারার পুবদিকে সিন্ধু এবং তার শাখা পঞ্চনদ। ইরাবর্তী, শতদ্রু, বিপাসা, বিবস্তা আর চন্দ্রভাগা। আধুনিক পাঞ্জাবের নাম এই পঞ্চনদ থেকে। প্রাচীন আর্যরা ছিলেন অশ্বারোহী। মোঙ্গল, শক আর হুনদের মতোই এই যাযাবরদের ঘরসংসার ছিলো তৃণভূমির তাঁবুতে। তাঁবু গুটিয়ে সামনে চলবার সময় পুরো সংসার উঠতো ঘোড়ার পিঠে। হিন্দুকুশ ধরে চলতেই তাদের সামনে পড়লো খাইবার গিরিপথ। পড়লো সিন্ধুর আর পঞ্চনদের সবুজ উপত্যকা।

www.pathagar.com

তখন মহেনজোদারোতে ছিলো প্রাচীন দ্রাবিড় জাতির উন্নত, সমৃদ্ধ সভ্যতা। দ্রাবিড়রা ছিলেন ইরাকের আদিম সুমার সভ্যতার সমকালীন যুগের মানুষ। তারা ছিলেন দক্ষ সমুদ্রচারী নাবিক। ছিলেন নিপুণ নগর নির্মাতা। সুমারিয়ানদের মতো সেচখাল নেটওয়ার্ক তৈরি করেছিলেন দ্রাবিড় প্রকৌশলীরা। লেখার কাজেও ছিলো তাদের নিপুণতা। ভারতের প্রাচীনতম ব্রাহ্মি লিপির উদ্ভাবক ছিলেন তারা। সোশকট, মেষ এবং উটের শকটের আদি নির্মাতাও এরাই। সিন্ধু থেকে সেচ খাল কেটে কৃষি ভূমিতে নিয়ে যেতেন দ্রাবিড় কৃষকরা।

পানি পেয়ে উপচে পড়তো সিন্ধু এবং পঞ্চনদীর তীরের উর্বর কৃষিভূমি। পাকা শস্য কৃষকেরা মজুদ করে রাখতেন গোলা-ঘরে। মহেনজোদারোর ধ্বংসস্তূপ খুঁজে পেয়েছেন প্রত্নবেত্তারা। দেখেছেন পোড়া ইটের গাঁথুনি দিয়ে তৈরি মহেনজোদারো ছিলা একটি সুপরিকল্পিত নগরী। চওড়া পাকা রাস্তাগুলো চলে গেছে চতুষ্কোণ শহরের প্রধান ফটকগুলোর মাথায়। মাঝখানে বড় বড় পার্ক, স্টেডিয়াম, শস্য গোলা, পৌরসভাগৃহ। ময়লা পানি নিকাশের পাকা পরিখা রাস্তার ধারে ধারে। সব বাড়িতেই খেলতো আলো-বাতাস। ছাদের ওপরকার চিমনি দিয়ে বেরুতো রান্নাঘরের ধোঁয়া। খোলা জানালা দিয়ে আসতো সিন্ধুনদের শীতল বাতাস। প্রত্নবেত্তাদের মতে-মিসরের ফেরাওদের প্রাচীনতম শহর মেমপিস, ইরাকের সুমার এবং ব্যাবিলনের চেয়েও উন্নত ছিলো মহেনজোদারোর সভ্যতা।

শহরের সভ্যগৃহ দেখে বোঝা যায়, প্রাচীন নগররাষ্ট্র ছিলো এটি। আইন তৈরি করতো জনপ্রতিনিধিরা তাঁদের সভাগৃহে বসে। একালের পার্লামেন্ট ভবন ছিলো এই সভাগৃহ। 'ব্রাহ্মি' হরফে এঁরা আইনের বিধি রচনা করতেন। এই লিপি থেকেই অনেক পরে এসেছে দেবনাগরীর হরফ। এসেছে বাংলা, হিন্দি, গুজরাতিসহ ভারতের বিভিন্ন ভাষার বর্ণমালা।

আর্য অনুপ্রবেশের মুখে আলপাইন এবং সুমারিয়ান রক্তধারার দ্রাবিড়রা দাক্ষিণাত্যে সরে গেলেও তাদের সভ্যতা কিন্তু সরে যায়নি। মহেনজোদারো 'মৃতের শহর' হলেও মুছে যায়নি তার সংস্কৃতির প্রভাব। বরং চিরকালের মতন উপমহাদেশের সভ্যতা, শিল্পকলা, বর্ণমালা আর কৃষি জীবনধারাকে আপ্লুত করে রেখে গেছে যুগজয়ী এই সংস্কৃতি।

স্কুলে ইতিহাস পড়বার সময় আমাকে বেশ নাড়া দিতো সিন্ধু-সভ্যতা। গ্রামের হাঁটাপথে মোটের গাড়ি চলতে দেখলেই মনে হতো মহেনজোদারোর ওপাশের কোনো পাড়া গাঁয়ের সড়ক ধরে মোটের কাঁধে জোয়াল বেঁধে দু-চাকার গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে কোনো দ্রাবিড় রাখাল। তার ওপর চাপানো আছে বস্তা-ভরা ধান এবং গম। সাংবাদিক জীবনের গোড়ার দিকে যখন মেতে উঠি পুরাতত্ত্ব নিয়ে- বেশি করে টানতে শুরু করলো আমায় তখন সিন্ধুর মোহনার হারিয়ে যাওয়া এই শহরটি। মনে হতো এই বুঝি হেঁটে বেড়িয়ে এলাম খেজুরকুঞ্জে ঠাসা খোলামেলা একটি পার্ক। ঝকঝক তক্‌তক্‌ করছে শহরের রাস্তা। পৌরসভার পরিদর্শকরা নজরদারি করছেন

www.pathagar.com

আবর্জনা জমে আছে কিনা কোনো সোয়ারেজের মুখে। ঢাকার কার্জন হলের সামনের পথ ধরে যাওয়ার সময় একটা নিটোল ছবি ভাসতো চোখে। মনে হতো লাল ইটের এই ভবনটি মহেনজোদারোর আইনসভাগৃহ। ভেতরে সার সার লম্বাটে আসন। তার ওপর বসে আছেন জনপ্রতিনিধিরা। তাঁরা তর্ক করছেন শহরের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা আর আইন-শৃংখলা নিয়ে। কথা বলছেন কী পরিমাণ ফসল হয়েছে শহরের বাইরের কৃষি খামারগুলোতে। আর খরার মওসুমে অভাবগ্রস্ত চাষীদের মধ্যে বন্টনের জন্য কতটা শস্য মজুদ আছে ধর্মগোলায়। বাড়তি এই শস্য বিনামূল্যে বেঁটে দেয়া হবে কৃষকদের। আবার ফসল কাটার ঋতুতে তাদের কাছ থেকে ফেরৎ নেয়া হবে ধারে-দেয়া গম, ধান, ভুট্টা কিংবা যব।

মনে পড়ে এককালে কার্জন হলও ছিলো পূর্ববঙ্গ- আসামের আইন পরিষদ। আবার কোনো কোনো সময় মনে হতো ওই মহেনজোদারো শহরের পাশের আরেকটি ভবনে বসতো বিচারকদের সভা। এদের বলা হতো প্রবীণ। অর্থাৎ 'ওল্ড মেন অভ্ দ্য কমিনিটি'। এঁরা ছিলেন সিটি-ম্যাজিস্ট্রেট। কেউ আইনভঙ্গ করলে তাকে সাজা দিতেন। কখনো জরিমানা করতেন। অপরাধের মাত্রা বুঝে কখনো দিতেন কারাদন্ড, কখনো বেত্রদন্ড। খুন-খারাবি, রাহাজানি, সন্ত্রাস ইত্যাদির নামগন্ধ ছিলো না সেকালের আদিম ভারতীয় সমাজে। সুতরাং, ব্যাবিলনের মতো নাক-কান- আঙুল কাটা অথবা মৃত্যুদণ্ডের বিধান ছিলো না মহেনজোদারোর আইনের কেতাবে।

ব্যাবিলনের প্রতিষ্ঠাতা রাজা হাম্মুরাব্বিই প্রথম প্রাচীন পৃথিবীতে চালু করেছিলেন ফৌজদারি আইন। তাঁর যুগের মরুচারী বেদুঈনরা ছিলো লুটেরা। তারা তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে প্রতিবেশী গোত্রের ওপর হামলা চালাতো। লুটে নিতো তাদের ধনজন, উটের পাল। যুদ্ধ বাধলে শত্রুপক্ষের লোকের মাথা কেটে নিতো। কাটতো তাদের নাক-কান-হাত।

এই দস্যুদের নিয়ন্ত্রণে রাখবার জন্যেই হাম্মুরাব্বি জারি করেছিলেন কঠোরতম দন্ডবিধি। মৃত্যুদণ্ড ছিলো অপরাধীর সর্বোচ্চ সাজা। আইনের বিধান ছিলো ঃ মাথার বদলে মাথা। কানের বদলে কান, চোখের বদলে চোখ। যার ইংরেজি ভাষ্য ঃ 'হেড ফর হেড। নোজ ফর নোজ অ্যান্ড আইজ ফর আইজ।' এই বিধি চালু করে হাম্মুরাব্বি দাবিয়ে রেখেছিলেন তাঁর যুগের ব্যাবিলোনিয়ার বর্বর, নৃশংস এবং বেপরোয়া বেদুঈনদের। প্রথম মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, রাজা বিম্বিসার আর অশোকের রাজত্বের গোড়ার দিকে ভারতেও চালু ছিলো এই কঠোর দণ্ডবিধি আইন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রধানমন্ত্রী চাণক্য তথা কৌটিল্যের রচিত 'অর্থশাস্ত্রে' এই ফৌজদারি বিধির কথা বলা হয়েছে। তাঁর দরবারের গ্রিক দূত মেগাস্থিনিস-এর বর্ণনায়ও আছে এর আভাস। মেগাস্থিনিস ছিলেন খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ অব্দে ভারতের প্রথম ইউরোপীয় পর্যটক। ভারতের সামাজিক আর রাজনৈতিক জীবনধারার ওপর প্রথম প্রত্যক্ষদর্শীর রিপোর্ট প্রণয়ন করেছিলেন এই ভ্রাম্যমাণ গ্রিক সংবাদদাতা। এই লোকটিও আমার সাংবাদিক-

www.pathagar.com

চেতনায় দাগ কেটেছিলেন গভীরভাবে।

আশ্রমকেন্দ্রিক বৈদিক অনুশাসনের পরেকার ভারতীয় সমাজের একটি নিখুঁত বিবরণ পাই আমরা মেগাস্থিনিসের রিপোর্টে। উপমহাদেশের ইতিহাস রচনার প্রথম উপাদান যুগিয়েছিলেন এই লোকটি। তাঁর পরে জ্ঞানের এ রাজ্যে অবদান রেখেছিলেন

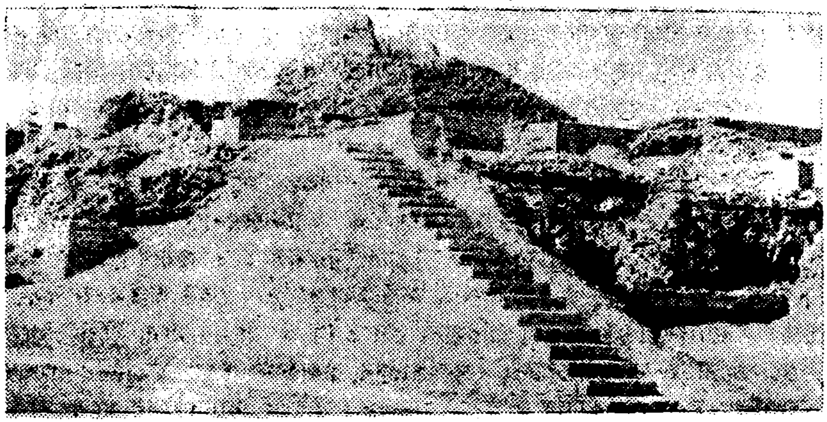

মহেনজোদারোতে প্রাচীন সভ্যতার একটি নিদর্শন

চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন, হিউয়েন-সাং, ই-চিং প্রথম। এঁদের ভ্রমণ বৃত্তান্তের সংগে নতুন মাত্রা যোগ করেছিলেন নবম শতকের আরব ভূগোলবেত্তা আল-ইদ্রিসি, সুলায়মান আর একাদশ শতকের 'ভারত ভ্রমণ বৃত্তান্তে'র ('কিতাবুল হিন্দ') লেখক বিশ্বখ্যাত পণ্ডিত এবং সংস্কৃত ভাষাবিদ আল-বিরুনি।

বিরুনি হিন্দুকুশের পঁচিশ হাজার ফুট উঁচু তিরাসার চূড়ার উচ্চতা নির্ভুলভাবে জরিপ করেছিলেন জ্যামিতিক নিয়মে। কারণ তিনি ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাধর একজন গণিতজ্ঞ এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানী। সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণে আর অলংকার শাস্ত্রে ছিলো তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। এ কারণেই বলা হয়ে থাকেঃ 'ভারতীয় না হয়েও বিরুনি ছিলেন ভারতীয় আর সংস্কৃতভাষী না হয়েও ছিলেন সংস্কৃত পন্ডিত চূড়ামণি।'

বিরুনির পরে ভেনিসিয়ান মার্কোপিলো, মরক্কোর ইবনে বতুতা এবং পর্তুগিজ, আর্মেনিয়ান, জর্জিয়ান, ফরাসি আর ব্রিটিশ পর্যটকেরা পরিপুষ্ট করেছিলেন আমাদের ইতিহাসের পুনর্গঠনের কাজটি। এদের সরজমিন রিপোর্ট থেকে বাংলাদেশ এবং ভারতের অতীতের মুখ আমরা দেখতে পাই বিশাল এক ক্যানভাসে। দেখতে পাই সে মুখ ফটিকের ঝকমকে আয়নায়।

কথা বলছিলাম কাস্পিয়ান তীরের আদিম আর্য জাতি আর তাঁদের চেয়েও পুরনো সিন্ধুতটের দ্রাবিড়দের নিয়ে। 'প্রাচীন বাঙ্গালার ইতিহাস' গ্রন্থের লেখক রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায়ের মতে-আদিম যাযাবর যুগের কোন এক সুদূর অতীতে

www.pathagar.com

ভূমধ্যসাগর তীর থেকে সেখানকার জনগোষ্ঠীর একটি তরঙ্গ এসেছিলো হিমালয় অঞ্চলে। তাঁরা ছিল মেষচালক। আল্পস পর্বতমালার ঢালুতে তারা মেষচারণ করতেন। দক্ষিণ-পুবের আল্পস্, দিনারিক আল্পস আর মধ্য আল্পস্ অঞ্চলে ছিলো তাঁদের বসত। এক সময় নতুন তৃণভূমির খোঁজে তাঁরা দার্দানেলিস-বসফোরাস পার হয়ে এলেন এপারে। এশিয়া মাইনর তথা আনাতোলিয়ায়। সেখান থেকে এলেন কৃষ্ণসাগরের ককেশাস্ হয়ে দক্ষিণ কাস্পিয়ানের ককেশাসে। এখান থেকে শুরু ইরানের মালভূমির।

এ জায়গাটায় ইরানের আলবুর্জ পর্বতমালার পাদভূমি। লেসার ককেশাসের গোড়াও এখানটায়। পুরাবেত্তারা বলেন, কৃষ্ণসাগরের জন্মের আগে আল্পস্ পর্বতমালা ককেশাসের অংশ ছিলো। আবার এই দুই পর্বত দক্ষিণ-পুবে বাহু মেলে ছুঁয়েছিলো হিমালয়ের বুক। অর্থাৎ আল্পস্, ককেশাস আর হিমালয় ছিলো এক অভিন্ন সত্তা। শিখর থেকে শিখরে বাহু মেলে ভূতাত্ত্বিক মহাকালের কোনো এক পর্বে এশিয়া আর ইউরোপকে এরা গেঁথে দিয়েছিলো এক শৈলশিরায়।

এই পথ ধরে প্রাচীন ইরানিয়ান মালভূমির ভেতর দিয়ে পারস্য উপসাগরের তীরে এসেছিলো আল্পাইন এবং দিনারিক মেষচারক জনগোষ্ঠী। পথে ইরাকের দুই নদীর তীরে তাদের দেখা সুমারিয়ান কৃষকদের সংগে। শাত্তিল আরবের মোহনায় এসে তারা হলো কৃষিজীবী। এই তিনধারার জনগোষ্ঠী মিলিত হলো এক জনস্রোতে। পরে এক সংগে বেলুচিস্তানের উত্তরের বোলান গিরিপথ হয়ে এলো এরা সিন্ধুর তটে। বহুকাল পরে এখানে আরব সাগরের প্রতিবেশে সিন্ধুর মোহনায় তারা গড়ে তুললো ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতা। গড়ে তুললো মহেনজোদারো শহর। গড়লো হরপ্পা।

এরও বহুকাল আগে তারা পার হয়ে এসেছিলো হোমারের জন্মস্থান হিসারলিক। যার পরের নাম হয়েছিলো ট্রয়। হোমারের যুগে গ্রিকরা যাকে বলতো ইলিয়াম। এটি ছিলো এশিয়ান নাবিক জাতির শহর। আনাতোলিয়ার প্রাচীনতম সভ্যতার জন্মভূমি এখানে। হোমারের পূর্বপুরুষরা খ্রিস্টপূর্ব নবম-অষ্টম শতকেও এখানে পশুপাল পুষতেন। পুরাতত্ত্ব গবেষকরা বলেন, হোমার নিজেও ছিলেন একজন যাযাবর রাখাল লোককবি। তিনি গ্রিকদের রূপকথার একজন পণ্ডিত ছিলেন। সেকালে গ্রিক রাখালেরা মুখে মুখে গীতিকবিতার আকারে গেয়ে বেড়াতো এসব পুরনো লোকগাথা। ষষ্ঠপদী ছিলো তাদের গানের এককেটি অনুচ্ছেদ।

হোমার ঠিক এই রাখাল সংগীতের নিয়ম অনুসরণ করেই রচনা করেছিলেন তাঁর অমর কাব্য 'ইলিয়াড' এবং 'ওডেসি'। ট্রয়যুদ্ধের উপাখ্যান ছিলো তাঁর দুই কাব্যের উপজীব্য। তিনি ট্রোজান এবং গ্রিক দুই জাতির বীরদের প্রশস্তি গেয়েছেন। মানবিকতা আরোপ করেছেন ট্রয়বাসীদের দেশপ্রেমে আর তাদের ট্র্যাজিডিতে। যেমন তাঁরও দু'হাজার বছর আছে জরোথস্ত্রুর রচিত 'আবেসতা' কাব্যে এবং বৈদিকদের 'ঋকবেদ' কাব্যে গীত হয়েছিলো মানবতার জয়গান।

www.pathagar.com

এই দুই গ্রন্থই রচিত হয়েছিলো কাস্পিয়ানের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে হোমারের যুগের দেড় হাজার বছর পরে কাস্পিয়ানের এই একই জায়গার কৃষক পরিবারের আরেকজন কবি প্রশস্তি গেয়েছিলেন তাঁর জাতির পূর্বগামী বীর পুরুষদের। তিনি ষাট হাজার শ্লোকের মহাকাব্য 'শাহ্‌নামা' রচয়িতা কবি ফিরদৌস। তাঁর কবিতা আজো উচ্চারিত হয় ইরানের ঘরে ঘরে। কারণ মানবিকতার সুর আছে তাঁর ছন্দে, তাঁর উপাখ্যানে।

অশিক্ষিত কৃষকরাও যখন-তখন বলতে পারেন ফিরদৌসীর কাব্যের যে-কোনো শ্লোক। যেমন গ্রিক কৃষকেরা একালেও আবৃত্তি করতে পারেন হোমারের 'ইলিয়াড'-এর যে-কোনো স্তবক।

দ্রাবিড়রা আজ কোথায়? কোথায় বৈদিকরা, আমরা মাথা ঘামিয়েও তাঁদের সঠিক সূত্র উদ্ধার করতে পারিনা। কিন্তু তাঁদের ইতিহাস, তাঁদের কাব্যগাঁথা, তাঁদের লিপি এবং ভাষা? সে তো হারিয়ে যায়নি। হারিয়ে যায়নি তাঁদের নির্মিত সভ্যতা। ইতিহাসে যা মহৎ এবং সৃষ্টিশীল তা তো নিঃশেষিত হয় না কখনো। শুধু নিঃশেষ হয় যা মূল্যহীন এবং অমানবিক।

ইতিহাসের শাসনই এ শিক্ষা দিয়েছে সভ্য এবং মুক্তজ্ঞানের বিবেকী মানুষকে। যাঁরা পড়তে জানেন অতীতের ওপেন-বুক অর্থাৎ খোলামেলা গ্রন্থ। আর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন ইতিহাসের দেয়াল-লিখনের। যাকে বলা হয়, 'রাইটিংস অন দ্য ওয়াল।'

ফর্শা হচ্ছিলো ককেশাসের আকাশ। কিন্তু ভোর হতে অনেক দেরি এখনো। কারণ সামনে পড়ে আছে আরো দীর্ঘ পথ। হাজার দেড়েক মাইল তো হবেই। তিনটি চূড়া পাহারা দিচ্ছিলো কাস্পিয়ানের পশ্চিমের বিশাল দেশটাকে। এরা হলো দ্য থ্রি জায়ান্ট পিক্‌স। ককেশানদের রূপকথায় এদের বলা হতো 'তিন উজ্‌'। যাদের পায়ের পাতা নাকি ছিলো সাগরে। আর মাথা ছিলো আকাশে সাদা মেঘের পেখম ছাড়িয়ে। এদের হাঁটুর নিচের অংশটুকু শুকনো থাকতো কাস্পিয়ানের মাঝখানে দাঁড়ালেও। ককেশানরা উজ্‌ বলতো এক প্রকান্ড দীর্ঘদেহী দৈত্যকে। তার কাছে তিমি মাছকেও মনে হতো পুঁটি মাছ। হাতের খাবলায় এরকম অতিকায় সব মাছ ধরে নিয়ে সে নাকি সূর্যের আগুনে সেঁকে গোগ্রাসে গিলতো। তারই বংশধর হলো ককেশাসের তিন দৈত্যাকৃতি চূড়া। মাউন্ট আল-বরুজ, মাউন্ট দিখ্‌-তাও আর মাউন্ট কাজবেক্‌। দেখতে অনেকটা উনিশ-বিশের মতন। প্রায় কাঁধে-কাঁধে মিল। বড়টি লম্বায় সাড়ে আঠারো হাজার ফুট। মাঝেরটি সতেরো হাজার। আর পরেরটি ষোল হাজার পাঁচশ' একচল্লিশ ফুট।

তিনটিরই পা থেকে মাথা পর্যন্ত তুষারে মোড়া। বলতে গেলে সারা বছরই এদের গায়ে জমাট বেঁধে থাকে বরফ। শুধু মে-জুনে বসন্তের হাওয়া বইলে পায়ের দিকটায় একটু একটু করে গলে বরফ। তখন ভেতরকার স্রোতস্বিনীগুলো উপচে পড়ে পানিতে। ঢল হয়ে নামে খরস্রোত।

www.pathagar.com

ককেশানদের কাছে পাহাড়ি ঝরনার এই পানি হলো অমৃত সুধা। তাদের পরমায়ুর জীবনদায়িনী শক্তি হলো চিরতুষারের এই সুখের নির্যাস। সোনা-রুপা, লোহাসমেত সব ধাতুর জারক মেশানো থাকে এতে। আয়ুর্বেদ সালসাতুল্য এই পানির কল্যাণেই এখানকার লোকের গড় আয়ু প্রায় আশির কোঠায়। অনেকে হেসে খেলে পার করিয়ে দেয় দেড়শ-পৌনে দুশ' বছরের সিঁড়ি।

এরকম বেশ কিছু দীর্ঘায়ু ককেশান বুড়োর সংগে দেখা হয়েছে আমার। চুল-দাড়িতে পাক ধরলেও কালোর ছোপ মেশানো তাতে। শিরদাঁড়া সোজা করে টানটান হয়ে হাঁটেন এঁরা। স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য শরীরে। এরকম লোককে বুড়ো না বলে যুবক বলাই বরং ভালো। কারণ একশ'র পরও হনহনিয়ে হাঁটেন এঁরা। কাজ করেন দৌড় ঝাঁপ দিয়ে।

দু-চারজন তো রীতিমত জীবন্ত ইতিহাস। এঁরা চার-পাঁচ পুরুষের জীবিত পিতামহ। এঁদের প্রপৌত্রেরও আছে নাতি-পুতি। যেন কালবৃদ্ধ বটবৃক্ষ এঁরা। হাজারো শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে দিয়ে ছাতির বাঁটের মতন দাঁড়িয়ে আছেন সবার মাথার ওপর। এরকম দীর্ঘায়ু লোকের বংশধরেরা ভরে রাখে গোটা গোত্র। কিংবা দু-একটা গ্রাম।

আগে খবরের কাগজে এঁদের কাহিনী পড়ে হতবাক হতাম। মনে হতো রূপকথার গল্প পড়ছি। ঝুলতে থাকতাম সংশয়ের দোলাচলে। একবার কাগজে পড়েছিলাম, একশ' পঁচাশি বছর জীবিত থাকবার পর পরলোকবাসী হয়েছেন আজারবাইজানের একটি লোক। পুরনো দাঁত পড়ে গিয়ে নতুন দাঁত গজিয়েছিলো তাঁর। কখনো রোগে ভোগেননি তিনি। নাতিপুতি আর তস্যের তস্য মিলিয়ে আড়াইশ'র বেশি বংশধর রেখে গেছেন তিনি পরিবারে।

এরকম খবর কী বিশ্বাস করা যায়? আমিও পারিনি খবরটির ওপর আস্থা রাখতে। মনে হয়েছিলো রোমাঞ্চ সৃষ্টির জন্যে বিদেশি বার্তা সংস্থার সংবাদদাতা গালগল্প ঠেঁসে দিয়েছেন নিউজটিতে। কিন্তু এদেশে এসে এই আয়ুষ্মান লোকেদের দেখে সেই ভুল আমার পুরোপুরি ভেঙেছে। আসলেই ককেশিয়া অঞ্চল আয়ুবৃক্ষের দেশ। আর এখানকার মানুষের দীর্ঘায়ু হওয়ার মূলে রয়েছে পাহাড়ি ঝরনার বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক পানি। আর এদেশের স্বাস্থ্যপ্রদ আলোবাতাস এবং অক্সিজেনের উৎস সবুজ-শ্যামল গাছপালা, তৃণলতা। সব ক'টি অরণ্যই প্রকাণ্ড এককেটি গ্রিন হাউস।

এখানকার লোকেরা গর্বিত তাদের পানি এবং বরফের জন্যে। বরফ-গলা পানি তাদের কাছে মিনারেল-ওয়াটারের চাইতেও বেশি মূল্যবান। তাদের ভাষায়ঃ কুফ্‌কাজ অর্থাৎ ককেশাস তার মাটির সবরকমের খনিজ মিশিয়ে নিজের হাতেই যোগান দেয় এ বিশুদ্ধ পানির। একজন পাকা চিকিৎসক কিংবা রসায়নবিদও যে বিশুদ্ধতার গ্যারান্টি দিতে পারে না সে কাজটি অনায়াসে করে আমাদের পাহাড়। আর হাত বাড়ালেই পেয়ে যাই আমরা বরফ। আমাদের দরকার হয় না ফ্রিজের। একটু গরম পড়লে মেটে কলসি কি কাচের জারে-রাখা বরফ-পানিতেই প্রাণ জুড়িয়ে নিই।

www.pathagar.com

কাস্পিয়ানের বাষ্পধোঁয়া বৃষ্টির জন্যেও কম নয় তাদের গর্ব। এ বৃষ্টিতে আছে লবণের আরক। কারণ অন্যসব সাগরের পানির চেয়ে কম নোনা হলেও এই সাগরের পানিতেও আছে প্রচুর লবণ। তবে তার মাত্রা ধাতে সইবার মতন। এ পানি গায়ে

ককেশাস পাহাড়

ঢাললে বাত সারে। দূর হয় রোগ-বালাই। তাছাড়া কাস্পিয়ানের বাষ্প মেঘ থেকে যে বৃষ্টি হয় তাতে ককেশাসের ঢালের গাছপালা তেজিয়ান হয়। হয় তরতাজা সবুজ। লাবণ্যের ছোঁয়ায় সুস্বাদু হয় আঙুর, নাশপাতি, বেদানা আর আপেল।

এক স্বাগতিক বন্ধু একবার আমার টেবিলে রাখলেন রেকাবিভরা কয়েক থোকা টাট্‌কা কালো আঙুর। বললেন ঃ মুখে দিয়েই দ্যাখো না কেমন স্বাদ এর। রসে টইটম্বুর করছিলো গোলাকার ফলগুলো। থোকার সংগে ছিলো সবুজ পাতা। যেন এই মাত্র পেড়ে আনা হয়েছে মাচান থেকে। লোভ সামলাতে পারছিলাম না। মুখে দিতেই প্রাণটা ভরে গেলো অপার এক রসালো সৌরভে। আঙুর তো কতই খেয়েছি কিন্তু তার স্বাদ যে অমন অতুলনীয় হতে পারে সেই অভিজ্ঞতা হলো জীবনে এই প্রথম।

বন্ধুটিকে বললামঃ আমার ভাষা নেই তোমার দেশের আঙুরের প্রশস্তি গাইবার। শুধু এইটুকু বলবো, এর কোনো তুলনা হয় না। যেমন অপূর্ব এর স্বাদ তেমনি রূপ-রস-গন্ধে দুনিয়ার সেরা।

চোখ দুটো খুশিতে ঝিকমিকিয়ে উঠলো তাঁর। সংগে সংগে বাড়িয়ে ধরলেন বড় আরেকটি রেকাবি। ওতে ছিলো গুটিকয়েক দশাসই গোছের পাকা বেদানা আর নাশপাতি। কলজে ফুঁড়ে বুকের লাল রং দেখাচ্ছিলো দাড়িম্ব ফলগুলো। আর একপাশ থেকে হলুদাভ রূপের জৌলুস ছড়াচ্ছিলো নাশপাতি কন্যারা। হাসি-হাসি মুখে বললেন তিনিঃ একটু চেখেই দ্যাখো প্রিয়াতেল। দ্যাখো কেমন স্বাদ এই দুই ফলের।

'প্রিয়াতেল' বলে এরা অন্তরঙ্গজনকে। ঠিক আমাদের মতনই সুপ্রিয় সংবোধন

www.pathagar.com

এটি। শুনে চমকে উঠলাম। কেমন করে বাংলার এত কাছাকাছি হলো এদের ভাষা? মনটা ভরে উঠলো আন্তরিকতার সৌগন্ধে। সম্ভাষণের মিলটার কথা তাঁকে জিজ্ঞেস না করে পারলাম না। তিনিও কম অবাক হলেন না। চোখে একরাশ বিস্ময় নিয়ে বললেনঃ তাই নাকি! তোমরাও বুঝি অমন করে সংবোধন করো প্রিয়জনদের? তাহলে নিশ্চয় কোনো কালে কাছাকাছি ছিলাম আমরা। পৃথিবীটা তো আসলে ঘরের কাছেরই। ইতিহাস ঘেঁটে দেখলে এটা ভালো করেই বোঝা যায়। মানুষের আদি বসত তো আসলে এক জায়গাতে ছিলো। এরপর নড়াচড়া করে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়েছে তারা। ইতিহাসের ভালো ধারণা ছিলো লোকটির। আমার দিকে চোখ তুলে বললেন ঃ শুনেছি, আমাদের এই কাস্পিয়ান পারের লোকেরা নাকি অতীতে কোনো এক সময় পাড়ি জমিয়েছিলো তোমাদের ওদিকটায়। হয়তো তার জন্যেই তোমাদের-আমাদের ভাষাতে আছে অমন ধারা মিল।

তিনি কাস্পিয়ান-আর্যদের ভারতমুখো প্রস্থানের কথাই হয়তো বলতে চাইছিলেন। হুঁ-হাঁ করে সায় দিচ্ছিলাম আমি তাঁর কথার। তিনি শেষে শ্বাস বদল করে বললেন ঃ যাকগে অতীতের কথা। এবার ফেরা যাক্ বর্তমানে। আমাদের আনার-নাশপাতি কেমন এবার একটু পরখ করে দ্যাখোই না ?

বললাম ঃ দর্শনেই তো মন ভরলো। গুণ বিচারের আর কী প্রয়োজন ? তিনি জোর করতে লাগলেন। শেষে ছুরি হাতে নিয়ে নিজেই আনারের বুক ফাঁড়লেন। লাল পান্নার মতন প্লেটে জ্বলতে থাকলো দানাদার বেদানা। বাধ্য হলাম মুঠোভরা রসালো দানা মুখে পুরতে। কিছুক্ষণ পরে বাড়িয়ে ধরলেন তিনি নাশপাতির টুকরো। দুটোরই স্বাদ নিলাম পরমানন্দে। তাঁর জানতে চাওয়ার আগেই বললাম ঃ বলেছিলাম না দর্শনেই তো বুঝেছি কেমন হতে পারে এরা ? এখন ভালো মতন বুঝলাম, এসব ফল পৃথিবীর না- স্বর্গের নিখাদ বাগিচার। নিশ্চয় পরীরা পরিচর্যা করে তোমাদের এসব ফলের গাছের।

আমার কথা শুনে হাসিতে ছাদ ফাটালেন বন্ধুটি। আমি তাঁকে আমাদের পুঁথির কুহ্কাফের কাহিনী শোনালাম, বললাম- এখনো আমাদের গ্রামের লোকেরা বিশ্বাস করে তোমাদের ককেশাস পাহাড় পরীদের রাজ্য।

এবার হো- হো করে হাসতে গিয়ে চোখে পানি এলো তাঁর। রুমাল দিয়ে চোখ মুছলেন তিনি। সংগে সংগে টেবিল থেকে উঠে দরজার দিকে পা বাড়ালেন। বলে গেলেন ঃ আমি এখুনি পাকড়াও করে আনছি এক মহিলাকে। ওকেই তুমি জিজ্ঞেস করো-এখানকার মেয়েরা আসলেই পরী, নাকি আর কিছু?

মিনিট পাঁচেক পরে একুশ-বাইশের এক লজ্জাবতী লতাকে নিয়ে হাজির হলেন তিনি। মুহূর্তেই আলোর বিচ্ছুরণ খেলো গেলো সারা কামরাটায়। মেয়েটি লাজনম্র গলায় হাত তুলে অভিবাদন জানালো। প্রায় ফিস্‌ফিসানোর মতো করে বললোঃ 'আস্-তাসিবা'।

ঢাকায় যে দু-চারটি রুশ শব্দ শিখে এসেছিলাম তাতে এটি ছিলো। সুতরাং কষ্ট

www.pathagar.com

হলো না মানে বুঝতে। এঁরা স্বাগত অর্থে 'আস্-তাসিবা' শব্দটি ব্যবহার করেন। কেউ কেউ শুধু 'তাসিবা' বলেন। ইরানি, তুর্কিরা পরিচিত কারো সংগে দেখা হলে যেমন 'তস্লিম' বলে সম্ভাষণ জানান এটি তারই রুশ সংস্করণ। আমি একই উচ্চারণে প্রতি অভিবাদন জানালাম মেয়েটিকে।

ওর পরনে ছিলো সালোয়ার-কামিজ। মাথায় নকশিদার ওড়না। পাকা ডালিমের মতন লাল-হলুদের ছোপ মুখে। মুক্তোর মতন ঝকমকে দাঁতের পাটি। সুডৌল ছিমছাম শরীর জুড়ে উজ্জ্বল গৌরবর্ণের লাবণ্যের আশ্চর্য এক উদ্ভাসন। ত্রিভুজ চিবুক, রক্তিমাভ ঠোঁট আর টিকল নাকের ওপর দুই কালো হরিণচোখ থেকে ঠিক্‌রে পড়ছিলো হীরের আলোর ঝলক। লিওনার্দোর আঁকা মোনালিসার মতন লাজুক-লাজুক কিন্তু মোহনীয় দৃষ্টি বাঁকা-ভুরুর আর প্রশস্ত ললাটের ওপরকার চোখের পাতায়। ওড়নার প্রান্ত ছুঁয়ে কোমর পর্যন্ত লোটাচ্ছিলো কালো দিঘল কেশরাশি। সত্যিকারের পরীকন্যা একটি। শুধু পিঠে ডানা ছিলো না এই যা।

মেয়েটি শরমে যেন মরে যাচ্ছিলো। বোধকরি ভিনদেশি কাউকে দেখলে এরকমই সংকুচিত হয়ে পড়ে এই পার্বত্য দেশের মেয়েরা। টেবিলের হাত চারেক দূরে দাঁড়িয়ে ছিলো সে। চেয়ার দেখিয়ে ইশারায় অনুরোধ করলাম তাকে বসতে। ইংরেজি জানতো না সে। আবখাজ্ ভাষায় কী- যে বললো ঘুণাক্ষরও বুঝতে পারলাম না। স্বাগতিক বন্ধু আনোয়ার বললেন ঃ ভীষণ লাজুক মেয়ে ও। জানতে চাইছে কী খেতে চাও তুমি। চা, না শরবত ?

ওর দিকে তাকিয়ে বললাম ঃ তোমার গলদঘর্ম হওয়ার দরকার নেই। দেখতেই তো পাচ্ছো প্রচুর ফলাহার করেছি। তারচেয়ে বরং ভালো দু-মিনিট এখানে বসে থেকে দু-চারটি কথা বলো। অনেক তাড়া আছে আমার। যেতে হবে কত দূরে! সেই মস্কো। আমার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলো না মেয়েটি। আনোয়ারের দিকে তাকালো চোখে প্রশ্ন তুলে ধরে।

আনোয়ার তরজমা করে দিলে গলায় বাঁশি বাজিয়ে সে বললোঃ না, তা হয় না। অতিথিকে খালিমুখে ফিরিয়ে দেয়ার নিয়ম আমাদের দেশে নেই। তোমাদের জন্যে দু-গ্লাস বেদানার শরবত নিয়ে আসছি। আনোয়ারের ভাষান্তর করবার আগেই সে ছুটে বেরিয়ে গেলো। এবার আনোয়ার বললেন ঃ কী পরী দেখলে তো?

বললাম ঃ পরীরও বাড়া। শিল্পীর আঁকা ছবির মতন এদেশের মেয়েরা। অমন নিখুঁত রূপসী হতে পারে এরা আগে কখনো কল্পনাও করিনি। এখন বুঝলাম, কেন আমাদের পুঁথিকারেরা ককেশিয়ার পাহাড়কে পরীর দেশ বলেছিলেন। জিজ্ঞেস করলাম ঃ তোমাদের সব মেয়েই কী অমন উর্বশী?

ঃ সব না হলেও বেশিরভাগই। জবাবে বললেন আনোয়ার। তাছাড়া আমাদের পুরুষেরাও কী কম সুন্দর ? আমার দাদাকে দেখলে বুঝবে কেমন সুশ্রী তিনি। বয়স তাঁর নব্বই ছুঁই-ছুঁই। কিন্তু এখনো যেন হলুদে ধোয়া রং উপচে পড়ছে তাঁর শরীর থেকে। যৌবনে কেমন ছিলেন এবার আঁচ করে নিতে পারো।

www.pathagar.com

বললামঃ বুঝেছি, কাস্পিয়ান সাগরের লাবণ্য আর ককেশাসের পানি তোমাদের শরীরে আনে অঢেল স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য। আর তার ওপর বুলিয়ে দেয় সৌন্দর্যের সুষমা। বোধকরি এর জন্যেই তোমরা হতে পেরেছো অমৃতের সন্তান। আমাদের গ্রামীণ সমাজে একটা ধারণা আছে-পরী এবং জ্বিনেদের আয়ু নাকি হাজার বছরেরও বেশি। তোমাদের বৃদ্ধদের দেখে কথাটায় অন্তত খানিকটা বিশ্বাস না করে পারা যায় না।

আনোয়ারের কাছ থেকেই শুনেছি ককেশিয়ার রূপকথার সেই দৈত্য- উজের গল্প। বাংলাদেশের আয়তনের তিনগুণ হলেও কাস্পিয়ান তো আসলে পাহাড়ের বুক জোড়া একটি লবণ হ্রদই। গভীরতা সব থেকে বেশি যেখানে তার তলদেশ মাত্র তিন হাজার দুশ' ফুটের মধ্যে। আর সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে বিরানব্বই ফুট নিচে এই হ্রদ। সুতরাং, ককেশাসের সাড়ে আঠারো হাজার ফুট উষ্ণাকৃতি চূড়াটি এর ভেতর পা রাখলে পানি তো সত্যি সত্যি তার হাঁটুর নাগালও পাবে না। দেখা যায় রূপকথার গল্পেও খানিকটা আভাস আছে বাস্তবের।

উজের গল্প পড়েছি বাইবেলে। সেই গল্প ডালপালা মেলে ছুঁয়েছে লোহিত সাগরের ইথিওপিয়া-ইরিত্রিয়ার পার। ওদেশে গিয়েই শুনেছি উপাখ্যানটি। সেখান থেকে বোধকরি পাড়ি জমিয়েছে ককেশিয়ায়। আমাদের দেশেও হয়েছে গল্পটির আমদানি। তাই বলে উজের মতন উজবুক্ নন ককেশানরা। তবে এটা সত্যি, খুব সহজ-সরল এরা। বন্ধুবৎসল এবং অতিথিপরায়ণ। আবার কারো হাতে নির্যাতিত হলে তাকে কচুকাটা করতেও কসুর করে না।

মাঝখানের বিরতিকালে মেয়েটির কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম আনোয়ারকে। তিনি বলে উঠলেন ঃ দ্যাখো কী ভুলো মন আমার ! পরিচয়ই করিয়ে দিলাম না তোমাদের। ও মেয়ে আমার নাতনি। নাম রুখসানা। আবখাজের সুখুম কলেজের ছাত্রী। ও শুধু আবখাজ্ আর রুশ ভাষা জানে।

অবাক হয়ে বললাম ঃ অতবড় মেয়ে তোমার নাতনি ! আনোয়ার ছিলেন তখন আমার সমবয়সী। বয়স পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি। আমার কথা শুনে হেসে বললেন ঃ আমার নয়, আমার বড় ভাইয়ের। তা এক কথাই তো হলো। অল্পবয়সে বিয়ে করলে আমার নাতনির বয়স ওরকমই তো হতো। জানো, আমার গ্র্যাণ্ড ফাদারের আছে একপাল পৌত্রপৌত্রী। আবার তাদেরও আছে এক ঝাঁক ছেলেপুলে। আর প্রশ্ন না করে মনে-মনে বললাম-তা তো হবেই। তোমরা যে বটবৃক্ষ। সঞ্জীবনী সুধা খেয়ে মরণকে দিব্যি চোখ ঠারাও।

মিনিট দশেক পরে ট্রেতে করে দু-বাটি তুর্কি হালুয়া আর দু-গ্লাস বেদানার শরবত নিয়ে ঘরে ঢুকলো রুখসানা। সামনে বাড়িয়ে ধরলো লাজুক ভংগিতে। বললোঃ একটু মুখে দিন দয়া করে।

এবার কাছে এসে বসলো সে। বোধকরি শরমের পর্দা খানিকটা ভেঙেছে।

বললামঃ তুমি তো আমারও নাতনি রুখসানা। তোমার মতন পরীর হাতের

www.pathagar.com

তৈরি করা জিনিস না-খেলে যে যাত্রাই নাস্তি হবে আমার। ওর লাজুক চোখ দুটো চক্‌চক্‌ করে উঠলো আমার কথা শুনে। তৃপ্তি সহকারে পান করলাম ওর বরফ মেশানো শরবত। চাটলাম নাশপাতির সুস্বাদু হালুয়া। কিছুক্ষণ পরে উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লামঃ দাস্‌বিদানিয়া। এবার বিদায় দাও বন্ধুরা।

রুখসানা আর আনোয়ার দুজনই সমস্বরে বলে উঠলেন ঃ দাস্‌বিদানিয়া ! দাস্‌বিদানিয়া ! সামনের সড়ক পর্যন্ত এসে এগিয়ে দিলেন তারা। আনোয়ার করমর্দন করলেন। জাপটে ধরে করলেন উষ্ণ আলিংগন।

বললেন ঃ আবার এসো বন্ধু। রুখসানা হাত তুলে অভিবাদন জানালো।

রাস্তায় দাঁড়ানো ছিলো গাড়ি। মোড় পার না-হওয়া পর্যন্ত হাত তুলে দাঁড়িয়ে ছিলো দুজনই।

এবার সেই তিন তুষার মুকুটের উজ্‌ অর্থাৎ দ্য থ্রি ম্যাজেস্টিক ককেশান পিকের ওপর দিয়ে রওয়ানা দিলাম মস্কোর দিকে। বোয়িংটা বাঁক নিলো অস্‌ত্রাখানের উত্তরের ভল্গা-ডন উপত্যকার পথে।

একটানা ওড়ার ক্লান্তি সারাটা শরীর জুড়ে। এর ফাঁকে কখন দুই চোখ বুঁজে এসেছিলো জানি না। হঠাৎ কিসের একটা শব্দ হতেই টুটে গেলো ঘুম। তাকিয়ে দেখি নাক ডাকাচ্ছেন সহযাত্রীরা। দূরাকাশের তারার মতন টিম টিম করছে মাথার উপরকার ছাদে গুটিকয়েক ম্লান বিজলি বাতি। জানালার দিকে চোখ রাখলাম গভীর এক উৎকণ্ঠা নিয়ে। হঠাৎ দেখি বাইরের সবটুকু জুড়ে তুষারের এক আদিগন্ত রাজ্য। তার ওপর বিছিয়ে ছিলো সোনালি রোদের চাদর। তুষারের ভাঁজে-ভাঁজে ঝলমল করছে সূর্যের নরম, স্নিগ্ধ আলো। রূপালি-সোনালির এক অপূর্ব বর্ণচ্ছটা। বুঝলাম ভোর হয়েছে।

কিন্তু এ কোথায় এলাম ? হাত-ঘড়িটার দিকে চাইলাম। তার কাঁটায় ঢাকার সময়। দিনের দুটো বেজে আরও কয় মিনিট। এখানকার সময়ের সংগে মেলানো হয়নি সময়। সুতরাং টেরই পেলাম না কখন ফুরিয়েছে বাংলাদেশের রাত। রওয়ানা দিয়েছিলাম অন্ধকার মাথায় নিয়ে। জর্জিয়ায় এসেও দেখলাম সেই অন্ধকারই ঝুলছে দাঁড়কাকের ডানায়। তখন মনে হচ্ছিলো- রাত বুঝি সহজে ফুরোবে না। পথে রাত এত দীর্ঘ হতে পারে এ ধারণা আমার ছিলো না। জানতাম, এক ভৌগোলিক বলয় থেকে আরেক বলয়ে আগু-পিছু করে ঘড়ির কাঁটা। দূরত্বই তো শাসন করে সময়কে। আমার হাতে ছিলো বাংলাদেশের সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের হিসেব মেলানো রিস্টওয়াচ। সুতরাং এখানে কখন ভোর হয়েছে তা কিছুমাত্র আঁচ করবার উপায় ছিলো না। তাছাড়া কতখানি পথ রাতারাতি পার হয়ে এসেছি আর এখন কোথায় আছি, জিজ্ঞেস করবো কাকে? সবাই যে বিভোর ঘুমে। একমাত্র বলতে পারতেন পাইলট, কো-পাইলট কিংবা এয়ারহোস্টেজরা। কিন্তু তাঁদের সবাই ককপিটের ওধারে। বিমানবালারা ব্যস্ত ছিলেন পাইলটদের পাশের পর্দা-আঁটা কামরাটায়।

www.pathagar.com

প্লেট আর কাঁটা চামচের টুংটাং শব্দ ভেসে আসছিলো সেদিক থেকে। বোধকরি আয়োজন চলছিলো ব্রেকফাস্ট পরিবেশনের। তাঁদের টুংটাংয়ের সংগে কানের গোড়ায় সুড়সুড়ি দিয়ে চলছিলো বোয়িংয়ের একঘেয়ে ঝাঁঝাঁ- শাঁশাঁ শব্দের বিলাপ। কর্কশ চিৎকারটা শুনতে-শুনতে কানে প্রায় তালা লেগে গিয়েছিলো। মাঝে-মাঝে শোনা যাচ্ছিলো ঘুমন্ত যাত্রীদের নাক ডাকানোর ঘর্ঘর আওয়াজ। শ্বাস ওঠানামার এ বিচ্ছিরি শব্দের মধ্যেও ছিলো দীর্ঘ লয়ের যতিমাত্রার একটা ছন্দ।

একপাল লোকের ঘুমের এ অরণ্যে কেবল আমিই ছিলাম এক নিঃসঙ্গ ভোরের পাখি। মনে তখন জাগছিলো একটার পর একটা প্রশ্ন। এখনো কি ককেশাসে আছি? নাকি অন্য কোথাও? আর গন্তব্য? কতখানি উড়লে নাগাল পাবো তার টিকির? জানালার বাইরে চোখ রেখে তাকিয়ে থাকলাম তুষার চূড়াগুলোর দিকে। মাছে মাঝে দেখা যায় এক চিলতে নীলচে আকাশ। ধবল পাহাড়টার মাথা ছুঁয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে রাশি-রাশি ধোঁয়াটে মেঘ। কখনো তার ফাঁকে দেখা যাচ্ছে কালো মেঘের আনাগোনা। তবে কী বৃষ্টি হচ্ছে সামনে কোথাও ?

ভাবতে-ভাবতে দৃষ্টি টেনে আনলাম ভেতরে। হাতের পাশে রাখা ছিলো পঁচাত্তর সালের একটি সোভিয়েত ইয়ার-বুক। ওটা টেনে নিয়ে সময় কাটাতে বসলাম। পরিষ্কার আলোর বাতিটা জ্বালিয়ে চোখ বুলোতে শুরু করলাম বইয়ের পাতায়। আশা করছিলাম হয়তো পেয়ে যাবো পথের দিশা। সময় মিলিয়ে নিয়ে হয়তো আন্দাজও করতে পারবো কতখানি পথ পাড়ি দিয়ে এসেছি। আর আছি এখন কোথায়।

প্রথম পৃষ্ঠা পড়েই তাজ্জব বনে গেলাম। দুই কোটি চব্বিশ লাখ বর্গ কিলোমিটার জোড়া এই বিশাল দেশে নাকি আছে এগারোটি টাইম-জোন। পৃথিবীর মোট চব্বিশটি টাইম-জোনের মধ্যে এক দেশেই এগারোটি! রীতিমতন চোখ কপালে তুলবার মতন ঘটনা। এক জায়গায় লেখা আছে ঃ সোভিয়েত দূরপ্রাচ্যে যখন উঁকি দেয় ভোরের সূর্য পশ্চিমে তখন নামে রাত। অর্থাৎ সময়ের হিসাবে বারো ঘন্টার ব্যবধান পূব-পশ্চিমের দশ হাজার কিলোমিটার দূরত্বের মাঝখানে। এদিকে উত্তর-দক্ষিণের সময়ের ব্যবধানও কম নয়। পাঁচ ঘন্টা!

সময়ের তারতম্য দিয়েই বোঝা যায় কত বড় দেশ এটি। উত্তরের শেষ প্রান্তরেখা ছুঁয়েছে উত্তর মেরু মহাসাগরের রুডল্‌ফ দ্বীপের মাথা। জায়গাটির নাম কেপ চেলিউস্‌কিন। আর সর্বশেষ দক্ষিণ প্রান্ত ছুঁয়েছে তুর্কমেনিয়ার কুশ্‌কা শহর। প্রায় পাঁচ হাজার কিলোমিটার দুই মাথার দূরত্ব। পশ্চিম-উত্তরে বাল্টিক সাগরের লাগোয়া কালিনিন গ্রাদ শহর। পূবে প্রশান্ত মহাসাগরের বেরিং প্রণালীর কেপ ডেজ্‌নেভ্‌। দুই মহাদেশকে সুদীর্ঘ এক ফিতায় বেঁধে দিয়েছে দুই প্রান্তরেখা।

আমি ইয়ার-বুকটির মানচিত্রে তুর্কমেনিয়ার কুশ্‌কা শহরের অবস্থানের ওপর চোখ বুলোচ্ছিলাম। এখান থেকে আর্কটিকের রুডলফ দ্বীপের সময়ের ব্যবধান পাঁচ ঘন্টাই ধরলাম। তাহলে ঢাকা থেকে কতটা হবে কুশকা শহরের দূরত্ব ? কম করে হলেও তিনি হাজার কিলোমিটার তো হবেই। অথবা সাড়ে তিন হাজার। ঢাকা-

www.pathagar.com

কুশ্‌কার সময়ের ব্যবধান তাহলে হবে আড়ই তিন ঘন্টা। কুশ্‌কা থেকে মস্কোর দূরত্ব মোটামুটি এতটাই হবে। কারণ মস্কোর অবস্থান উত্তর-পুব ইউরোপে, ভল্গা অববাহিকায় উরাল পর্বতমালার পশ্চিমের কাজান মালভূমি এবং ইভানোভ সমতলে।

তুর্কমেনিয়া হয়ে তাবরিজের প্রাচীন রেশম সড়ক ছুঁয়ে কাস্পিয়ানের উত্তরের মেছো বন্দর অস্‌ত্রাখানের পার্বত্য সোপানে উঠেছে মস্কো যাওয়ার প্রাচীন পথ। এখান থেকে ক্রাসনোদার স্তেপের ভেতর দিয়ে এঁকে-বেঁকে ডন চলে গেছে মস্কোভা নদীর দেশে। মনে মনে হিসেব করে দেখলাম আকাশপথে সোজাসুজি এলেও ঢাকা-মস্কোর সময়ের ব্যবধান পাঁচ ঘন্টার কম হবে না। তাছাড়া মাঝখানে তো কয়েকটা টাইম-জোন আছেই।

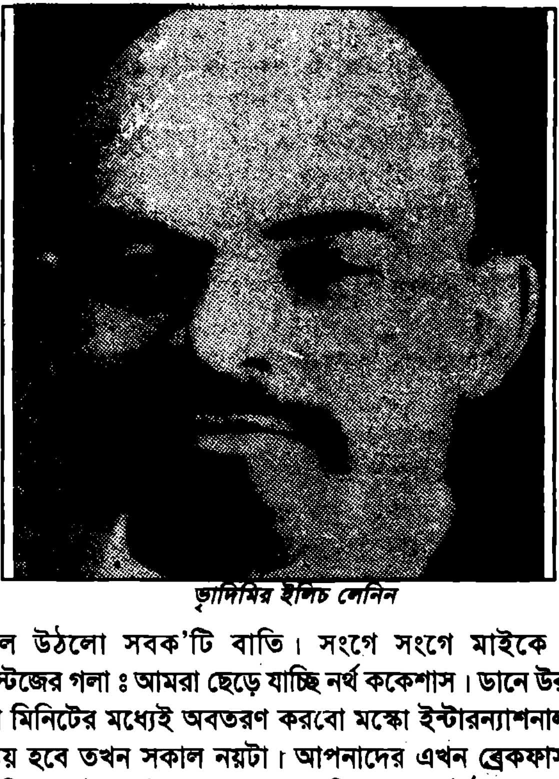

ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন

আসলে সবই তো আমার অনুমান। ঘড়ির কাঁটা যদি ঠিক না থাকে? তাহলে যে সবই ভণ্ডুল হবে। কিন্তু তারপরও খোঁচা খেতে হলো প্রশ্নের। সামনে অত উঁচু-নিচু তুষারের চূড়া দেখছি কেন? এটি কী নর্থ ককেশাস ? নাকি তার শেষ পাদদেশ ? নাকি ওরেল মালভূমি?

হঠাৎ জ্বলে উঠলো সবক'টি বাতি। সংগে সংগে মাইকে বেজে উঠলো এয়ারহোস্টেজের গলা ঃ আমরা ছেড়ে যাচ্ছি নর্থ ককেশাস। ডানে উরাল পর্বতমালা। আর চল্লিশ মিনিটের মধ্যেই অবতরণ করবো মস্কো ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে। স্থানীয় সময় হবে তখন সকাল নয়টা। আপনাদের এখন ব্রেকফাস্ট দেয়া হচ্ছে। তৈরি হয়ে নিন সবাই। মাইকের শব্দে ধড়ফড়িয়ে জেগে উঠলেন ঘুমন্ত যাত্রীর দল। চেয়ে দেখি আমাদের গাইড পাবলভ এগিয়ে আসছেন আমার আসনটির দিকে। সামনে এসে হাসিমুখে বললেনঃ গুডমর্নিং। ভালো ঘুম হয়েছে তো? প্রতি উত্তরে তাঁকেও জানালাম সুপ্রভাত। আর কিছু বলবার আগেই তিনি এক নিঃশ্বাসে বলে গেলেন ঃ মস্কোতে এ বেলা বিশ্রাম। বিকেলে আছে হাল্কা কিছু প্রোগ্রাম। এই দেখা সাক্ষাৎকার, কুশলবিনিময় ইত্যাদি আর কি। কাল সকাল থেকে শুরু হবে পুরোদমে

www.pathagar.com

সফরসূচি। এ বেলাটা কোনো কাজ নেই। খেয়েদেয়ে সটান শুয়ে পড়বেন বিছানায়। ঘুম দেবেন ইচ্ছেমতন। সময় হলে ডেকে নেবো আমি।

পাবলভের কথা শুনে স্বস্তিতে মনটা উপচে উঠলো। তাহলে মস্কোর নাগালে এসে পড়লাম আমরা। রাতের ঘুম-ভাঙা ক্লান্তি উধাও হয়ে গেলো শরীরের ধার পাশ থেকে। মন থেকেও। চোখের সামনে এখন ভাসতে থাকলো দুই মহাদেশের কিংবদন্তির শহর মস্কোর ছবি। ভাসতে থাকলো গ্র্যাণ্ড ডিউকদের আমলে গড়া দুর্গ-নগরী ক্রেমলিনের আকাশছোঁয়া টাওয়ারগুলোর সোনালি চূড়া। সেই সংগে মনের চোখ দিয়ে দেখতে থাকলাম মস্কোভা নদীর কাকচক্ষু জলের থির-অচঞ্চল স্ফটিক দৃশ্যপট। যেন কানের গোড়ায় এসে কম্পন তুলছিলো অক্টোবর বিপ্লবের লাখো কণ্ঠের বিজয়ধ্বনি।

বিমানবালারা সামনের টেবিলে তড়িঘড়ি করে পরিবেশন করতে থাকলেন ব্রেকফাস্ট। গোগ্রাসে গিলতে শুরু করলাম জেলি মাখানো পাউরুটি, সেদ্ধ সবজি, ডিমের ফ্রাই। গলায় ঢাললাম বরফ মেশানো কোকের শীতল নির্যাস।

দেখতে দেখতে আকাশের চূড়া থেকে নিচে নামতে লাগলো বোয়িংটা। নিচে তাকিয়ে দেখি সবুজের মেলা বসেছে উঁচু স্তেপের গা জুড়ে। বার্চ আর দেবদারুর মতন দেখতে পাইন তরুর সমারোহ ঘননিবিড় অরণ্যগুলোতে। বোধকরি জুনের স্নিগ্ধ আবহাওয়া এখন এখানে। শীত কেটে যাওয়ায় ন্যাড়া গাছের ডালে গজিয়েছে কচি সবুজ পাতা। হয়তো গাছের ফাঁকে-ফাঁকে ফুটেছে হলুদ-গোলাপি আর সাদাটে বাসন্তি ফুল। দেখা যাচ্ছিলো গ্রামের মাঠে কৃষকদের ফসলে-ভরা ক্ষেতগুলো। সেখানে নিশ্চয় লকলকিয়ে উঠেছে গম, ভুট্টা আর রকমারি সবজির চারা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পাইন বীথির মাথার ওপর দিয়ে মস্কো এয়ারপোর্টে নামতে থাকলো আকাশ যানটা। মাইকে ফের শোনা গেলো একরাশ মিষ্টি স্বর ঃ ওয়েলকাম টু মস্কো। আশা করি আনন্দদায়ক হয়েছে আপনাদের সফর। ফের আপনাদের শুভাগমনের প্রতীক্ষায় থাকলাম আমরা।

টার্মিনালের মাথায় এসে ইঞ্জিন থামতেই খুলে গেলো দুই দিকের দরোজা। লটবহর গুছিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলাম নিচে। বিদায়ী রুশ ইউন্টার-জেনারেল অভ্যর্থনা জানালেন তাঁর শীতল হাত বাড়িয়ে দিয়ে। মুখে লাগলো মৃদু তুষার হাওয়ার ঝাপটা। মস্কো এয়ারপোর্ট। নিচে নেমে তাকাতেই ধাঁধিয়ে গেলো চোখ। এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলো ছোট-বড় শ'কয়েক প্লেন। মনে হলো খোলা আকাশের নিচের সবটুকু জায়গা জুড়ে আছে আকাশযানের এক আদিগন্ত নগরী। কত বর্গমাইল হবে এর আয়তন ? পাশে আর লম্বাতেই-বা হবে কতটা? চোখে দেখে তার হিসেব মেলানো ছিলো দুঃসাধ্য। জীবনে প্রথমবারের মতন দেখলাম মাইলের পর মাইল দখল করে থাকা অমন এক বিশাল আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্ট। ধূসর আলো ফুটে বেরুচ্ছিলো অপেক্ষমান প্লেনগুলোর রূপোলি শরীর থেকে।

আগেই শুনেছি সোভিয়েত দেশে এয়ার লাইন খোলা হয়েছিলো উনিশশ'

www.pathagar.com

সতেরোর অক্টোবর বিপ্লবের পর। ১৯২৩ সালে। মস্কো এয়ারপোর্টের গোড়াপত্তন তারও আগে। বলা যায় বিশ্বের প্রথম দিককার বিমানবন্দরগুলোর মধ্যে এটি একটি। সেই আদি যুগের পর দ্রুততালে বেড়েছে এর উড্ডয়ন সীমার আয়তন। বেড়েছে পরিবহনের ক্ষমতা আর সুযোগ-সুবিধা। এসেছে নতুন নতুন প্রযুক্তি। যার ফলে বিমানের অঙ্গসজ্জায় যেমন লেগেছে আধুনিকতার ছোঁয়া তেমনি সুপারসনিক গতিবেগের সংযোগ বৈপ্লবিক রূপান্তর এনেছে আকাশ বিহারে।

১৯২৩ সালের পরেকার পঞ্চাশ বছরে এয়ারলাইন্স নেটওয়ার্কে সোভিয়েত দেশের যে-অগ্রগতি তা সত্যি অভাবনীয়। এই পঞ্চাশ বছরে বিমান চলাচল রুটের চৌহদ্দি বাড়তে-বাড়তে হয়েছে আট লাখ কিলোমিটার। এর ভেতরে আড়াই লাখ কিলোমিটার হলো আন্তর্জাতিক রুটের পাল্লা। পঁয়ষট্টিটি দেশের সংগে এ সময়ের ভেতর গড়ে ওঠে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিমান সংযোগ। বাংলাদেশ হলো এদের একটি। বিশ্বের বৃহত্তম এয়ার-সার্ভিস কোম্পানি অ্যারোফ্লট। ১৯৭৪ সালে নয় কোটি যাত্রী চলাচল করে অ্যারোফ্লটের বিমান বহরে। কথাটি জানালেন সফর-সহচর পাবলভ।

দূরপাল্লার বোয়িং-জেট আর হেলিকপ্টারসমেত এক বিশাল বিমান বহরে সজ্জিত ছিলো সোভিয়েত সিভিল অ্যাভিয়েশন। এগুলোর নির্মাতা রুশ প্রকৌশলী আর প্রযুক্তিবিদেরা। টিউ-১০৪ নামের প্রথম জেট যাত্রীবাহী প্লেন এঁরাই চালু করেছিলেন। ভি-১২ আর এএন-২২ নামের বিশালাকারের হেলিকপ্টার এবং পরিবহন বিমানেরও উদ্ভাবক এদেশের বিজ্ঞানীরা। আশি টন ওজনের পণ্য নিয়ে চলাচল করতে পারে পরিবহন বিমানগুলো।

যাত্রীবাহী সুপারসনিক বিমানের উড্ডয়ন-গতিবেগ ঘন্টায় আড়াই হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত বাড়ানোর একটি প্রকল্প নিয়ে তখন কাজ করছিলেন সোভিয়েত প্রযুক্তিবিদেরা। এরকম একটি জেট বিমান ১৪০ জন যাত্রী নিয়ে মাত্র পাঁচ ঘন্টায় পারাপার করবে পৃথিবীর দুই প্রান্ত। যাঁরা চাঁদের পিঠে প্রথম মহাশূন্যযান পাঠিয়েছিলেন তাঁদের পক্ষে ব্যাপারটা পানির মতন সহজ বলে আমার মনে হলো।

স্মৃতিতে জ্বল জ্বল করে উঠলো 'স্পুটনিক' তথা সোভিয়েতের নির্মিত কৃত্রিম উপগ্রহের মহাশূন্য যাত্রার সেই তোলপাড় করা সময়টির কথা। ৪ অক্টোবর, ১৯৫৭। আমি ছিলাম তখন দৈনিক সংবাদে। আমাদের প্রেস ডেলিগেশনের সদস্য তোহা খান ছিলেন এই কাগজটির জন্মলগ্ন থেকে আমার সহকর্মী। বার্তা সম্পাদক সৈয়দ নূরুদ্দিন এ সময় কাগজের পরিচালনা বোর্ডের সংগে জড়িত হয়ে পড়েন। জহুর ভাই অর্থাৎ জহুর হোসেন চৌধুরী ছিলেন ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক। এর আগে ছিলেন সিনিয়র সহকারী সম্পাদক। আবদুর রাজ্জাক চৌধুরী ছিলেন চীফ রিপোর্টার। টেলিপ্রিন্টারের পেপার রোলে খট খট শব্দ তুলে মুদ্রিত হচ্ছিলো সোভিয়েত উপগ্রহের মহাকাশ প্রদক্ষিণের খবর। সবাই আমরা জড়ো হয়েছিলাম খবরটির ওপর চোখ বুলোতে।

www.pathagar.com

আরো অনেকেই ছিলেন। এঁদের মধ্যে ফজলে লোহানী, আনিস চৌধুরী, শহীদুল্লাহ কায়সার আর শহীদ সাবেরও হয়তো থাকতে পারেন। এখন ঠিক মনে করতে পারছি না। তবে একথা মনে আছে নিউজ রুমটিতে তিল ধরবার জায়গা ছিলো না। সবার মধ্যে ছিলো নিদারুণ এক উত্তেজনা। আগের কয়েক দিনের খবরে সোভিয়েত কৃত্রিম উপগ্রহের মহাকাশ যাত্রার দিনক্ষণের কথা বলা ছিলো। এ কারণেই ৪ অক্টোবরের জন্যে উন্মুখ হয়েছিলাম সবাই। শুধু আমরা কেন দুনিয়া জুড়েই তুলকালাম চলছিলো খবরটিকে ঘিরে। আমেরিকাও ভূ-উপগ্রহ তৈরি করছিলো সে সময়। কিন্তু তাদের উৎক্ষেপণের আগেই বাজিমাত করলো সোভিয়েত ইউনিয়ন। পশ্চিমা দুনিয়ার ভয়টা ছিলে। যদি মহাশূন্য চলে যায় সোভিয়েতের দখলে। এমনিতেই তো পারমাণবিক শক্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একাধিপত্যের বেড়াজাল ডিঙিয়েছে তারা। এখন যদি মহাশূন্যটিও চলে যায় তাদের কব্জায়? যদি সেখান থেকে শুরু করে দেয় তারা 'স্টার-ওয়ার! তাহলে কী হবে?

পশ্চিমের বড় শক্তিগুলোর এতসব উৎকণ্ঠা আর চিত্তচাঞ্চল্যের মধ্যেও বিশ্ববাসীর কাছে রুশ উপগ্রহ উৎক্ষেপণের খবরটি ছিলো বিজ্ঞানের জয়যাত্রার দিক থেকে এক অভূতপূর্ব খবর। মানুষ পাখির মতন আকাশে ওড়ার স্বপ্ন দেখেছিলো সেই কবে থেকে! ১৯০৩ সালে স্বপ্নটা রূপ নিলো রাইট নামের দুই ভাইয়ের কল্যাণে। তাঁদের উদ্ভাবিত এয়ার মেশিন মাত্র বারো সেকেন্ড উড়তে পেরেছিলো প্রথম যাত্রায়। গ্যাসোলিন মোটরচালিত সেই উড়ন্ত যান সাত বছরের মাথায় হলো যাত্রীবাহী বিমান। বারো সেকেণ্ড থেকে একটানা বারো ঘন্টা ওড়ার শক্তি পেলো তার ইঞ্জিন। সুপারসনিক জেট যুগান্তর ঘটালো বিমানের অগ্রগমনে। এখানেও সবার মাথায় ছিলো রাশিয়া এবারে পাড়ি তাদের মহাকাশে। সুতরাং দুনিয়া জুড়ে তোলপাড় তো উঠবেই।

অগ্রগামী দেশের লোকেরা টেলিভিশনের পর্দায় দেখেছেন আর্থ-স্যাটেলাইটের সেই উৎক্ষপণের ছবি। আমরা শব্দটি অনুবাদ করেছিলাম ভূ-উপগ্রহ। কেউ কেউ ভাষান্তর করে লিখলেন কৃত্রিম 'উপগ্রহ'। কিন্তু এ দেশে তখনো টেলিভিশন চালু না হওয়ায় টেলিপ্রিন্টারের টাইপ-করা শিট দেখেই দুধের স্বাদ আমাদের মেটাতে হলো ঘোল চেখে। পরের দিন অবশ্য সাদা ধোঁয়ার পুচ্ছসহ কাগজে বেরিয়েছিলো প্রচণ্ড গতিবেগের স্পুটনিকটির ছবি।

কিন্তু তখনকার দিনের লেটার প্রেসে ছাপানো কাগজে কোনো ছবিই ভালো রকম ফুটতো না। কালি লেগে জাবড়া হয়ে থাকতো। সে ছিলো আমাদের মতন অনুন্নত দেশের আরেক দুর্ভাগ্যের কাহিনী। ত্রিশের দশকেই উন্নত বিশ্বের প্রিন্ট মিডিয়ায় এসেছিলো বিপ্লব। পাশাপাশি ইলেকট্রনিক মিডিয়াতেও। ওয়েভ-অফসেট প্রেসে রঙিন ভরাট হয়ে পাঠকের নজর কাড়তো বাইরের দুনিয়ার কাগজগুলো। এদিকে ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পরপরই সাদাকালো এবং রঙিন টিভি চালু হয়েছিলো সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পশ্চিমের শিল্পোন্নত দেশগুলোতে।

টেলিভিশন উদ্ভাবনায়ও অগ্রগামী ছিলো রুশ দেশ। আলবার্ট আইনস্টাইনের

www.pathagar.com

১৯০৫ সালে প্রকাশিত ফটো ইলেকট্রনিক তত্ত্বের ব্যাপক গবেষণা চলে এদেশে, অক্টোবর বিপ্লবের পর। এরই সূত্র ধরে বিজ্ঞানী ভি-কে জরোস্কিন ইলেকট্রনিক স্ক্যানিং ব্যবহার করে ১৯২৮ সালে প্রথম তৈরি করলেন একটি টেলিভিশন-সেট। টিভি বাজারজাত করবার প্যাটেন্টও পেয়েছিলেন তিনি একই বছর। কিছু কালের মধ্যেই একই ছবিকে লাল-নীল সবুজে টিভি'র কালো ছবি বর্ণিল করবার উপায়ও উদ্ভাবিত হলো। ১৯৫০ সালের ভেতর বছরে পঞ্চাশ লাখ সাদা-কালো এবং রঙিন ছবি ছাড়া হতে লাগলো বিশ্ব বাজারে। তথ্য প্রচারে যুগান্তর ঘটালো এই ইলেকট্রনিক মিডিয়া। প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক দুই মিডিয়াতেই বিপ্লব এলো সোভিয়েত দেশে। এর পরেই উপগ্রহ উদ্ভাবন আর মহাশূন্য অভিযানে এক মহাযুগান্তরের সূচনা করতে দেখা গেলো তাকে। সৌরমণ্ডল, চন্দ্রপৃষ্ঠ আর নক্ষত্রলোক তার এতকালের সমস্ত রহস্য ছিন্ন করে এলো মানুষের নাগালের ত্রি-সীমানায়। মহাশূন্য বিজয়ের প্রথম অগ্রচারণ ইউরি গ্যাগারিন। মনুষ্যবিহীন প্রথম স্পুটনিকের দূরাকাশ ভ্রমণের চার বছরের মাথায় তিনি তাঁর উপগ্রহ নিয়ে

প্রথম নভোচারী ইউরি গ্যাগারিন

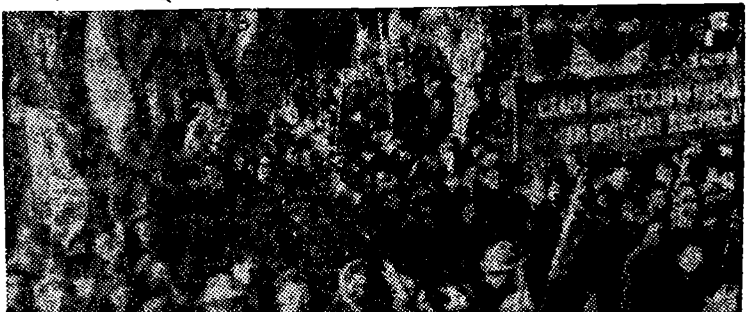

মহাশূন্য থেকে ইউরি গ্যাগারিনের প্রত্যাবর্তনের পর উল্লাসিত রুশ জনগণ

উড়লেন মহাশূন্যে। সেটি ছিলো ১৯৬১ সালের ৪ এপ্রিলের লাল তারকা চিহ্নিত দিন। এর পর থেকে চুয়াত্তরের অক্টোবর নাগাদ বত্রিশজন সোভিয়েত মহাশূন্যচারী প্রদক্ষিণ করলেন পৃথিবীর চারদিক। এক হাজারের বেশি সোভিয়েত স্পেসশিপ

www.pathagar.com

পাঠানো হলো মহাশূন্যে। এরপর সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা সয়ুজ উপগ্রহ পাঠালেন মহাশূন্য-স্টেশন হিসাবে। যুক্তরাষ্ট্রের সংগে চুক্তি হলো তারাও নক্ষত্রলোক, ছায়াপথ আর তাবৎ মহাজাগতিক বিশ্বের ওপর বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে সয়ুজের সংগে একযোগে পাঠাবে তাদের অ্যাপোলো। এটি ছিলো ১৯৭৫ সালের গোড়ার দিকের ঘটনা। এর কিছুকাল পরেই আমরা পৌঁছলাম মস্কো।

দুই সুপার পাওয়ারের শীতল সম্পর্কে তখন বেশ খানিকটা উষ্ণ হয়ে উঠতে শুরু করেছিলো। বিশ্বধ্বংসী পারমাণবিক বোমার পরীক্ষা বন্ধ করে দেয়া, আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র ভাণ্ডারের উৎপাদন, স্নায়ুযুদ্ধের অবসান, বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণ ইত্যাকার জটিল সব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা চলছিলো দুই তরফের মধ্যে। ঘন ঘন বৈঠক হচ্ছিলো জেনেভায়, মস্কোতে আর ওয়াশিংটনে। সমঝোতার সুবাতাস চাঙ্গা করছিলো শুভবুদ্ধির বলয়কে। পৃথিবীর দুই প্রান্তের শান্তিবাদী মানুষ এই গ্রহকে বাসযোগ্য করে তুলবার আশায় উন্মুখ হয়ে চোখ ফেরাচ্ছিলেন মস্কো এবং ওয়াশিংটনের দিকে।

আফ্রো-এশিয়া আর লাতিন আমেরিকার প্রায় প্রতিটি মানুষই চাইছিলেন হিরোশিমা এবং নাগাসাকির বীভৎস, নারকীয় দৃশ্য যেন আর কাউকে দেখতে না হয়। আমরা বাংলাদেশেবাসীরাও নিরীহ মেষ শাবকের মতন ব্যগ্রাকুল হয়ে থেকেছিলাম বিশ্বসংহারী দানবের আগ্রাসন থেকে বাঁচবার জন্যে। একাত্তরের হায়নাকুলের ধ্বংসযজ্ঞের ভয়ংকর সব চিহ্ন তখনো মুখ ব্যাদান করেছিলো আমাদের চারপাশে। আমরা কেবল সেই বিশাল পোড়ামাটির বুক থেকে জেগে উঠে বুনতে শুরু করেছিলাম নতুন ফসলের সবুজ চারা। সুতরাং, শান্তির জলপাই দ্বীপের হাতছানি ছিলো আমাদের কাছে সব থেকে বড় প্রত্যাশা।

এরকম এক ঝাঁক ভাবনা তোলপাড় করে তুলছিলো আমার ক্ষুদ্র প্রাণটিকে। এয়ারপোর্ট সিকিউরিটি জোনের দিকে কখন পা বাড়িয়েছিলাম মনে করতে পারছি না। শুধু কানের কাছে ভেসে এলো পাবলভের কণ্ঠস্বর। তিনি বললেন ঃ ওদিকে চলুন। কিছু আনুষ্ঠানিকতা আছে ওখানে। মাত্র পাঁচ-সাত মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। এর মধ্যেই সেরে নেবো পাসপোর্ট-ভিসা ইত্যাদি পরখের কাজ। পাবলভ আমাদের ছাড়পত্রগুলো দ্রুত ক্লিয়ার করে নিলেন বিশেষ একটি কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে। বোধকরি ওটা ছিলো ভিআইপি কাউন্টার। আগেই নভোস্তি প্রেস এজেন্সির তথা এপিএন-এর একজন পদস্থ কর্মকর্তা তাঁর কার্ড দেখিয়ে ঢুকেছিলেন সিকিউরিটি জোনে। আমাদের দেখেই 'ওয়েলকাম ! ওয়েলকাম ! ফ্রেন্ডস' বলে হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি। তাঁর সারা মুখে ছিলো প্রাণখোলা হাসির অপূর্ব এক উদ্ভাসন। মনটা ভরে গেলো বন্ধুত্বের এই উষ্ণ ছোঁয়ায়। কখনো ওঁকে দেখিনি। কিন্তু মনে হলো যেন কতকালের চেনা মানুষ।

একজন সিনিয়র সাংবাদিক ছিলেন তিনি। পরিচয় না-থাকলেও সব খাঁটি সাংবাদিকই তো 'বার্ডস্ অভ্ দ্য সেম ফেদার'-একই পালকে বাঁধা সব পাখি।

www.pathagar.com

তাদের অনুভূতি জুড়ে আছে একই প্রাণ। গলায় আছে একই ভালোবাসার গান। সুতরাং, এক আশ্চর্য অন্তরঙ্গতার সৌরভ পেলাম উস্তানেভের দরাজ কণ্ঠস্বরে।

মৃদু হেসে তিনি বললেন ঃ লাগেজগুলো এলেই রওয়ানা দেবো আমরা। লাউঞ্জের ফটকের পাশে আরো একদল বন্ধু আছেন আপনাদের অপেক্ষায়। উই আর অল ফ্রেন্ডস্ হিয়ার। সো ফিল ইজি অ্যাণ্ড অ্যাট হোম। মনে হলো, সত্যি যেন নিজের ঘরে আপনজনদের মধ্যে এসেছি। লাগেজে নাম লেখা ছিলো আমাদের সবার। সেগুলি কলের ঘোড়ায় চেপে আসতেই সাপটে ধরে নিচে রাখলাম। পাবলভ দ্রুত সবক'টি টেনে নিয়ে ছাড় করিয়ে নিলেন। চাপালেন হাতলওয়ালা হুইল চেয়ারে। সিকিউরিটি জোনের পাশের চত্বরে অপেক্ষা করছিলেন একদল স্বাগতিক বন্ধু। আমাদের দেখেই হৈ-হৈ করে উঠলেন ওঁরা। সমস্বরে সবাই 'ওয়েলকাম' বলে অভ্যর্থনা জানালেন। কেউ কেউ রুশ ভাষায় বললেন ঃ তাসিবা, তাসিবা ! তাঁদের বাড়ানো হাতের উষ্ণতা নিলাম মুঠো ভরে।

কিছু দূরেই দাঁড়ানো ছিলো বড় আকারের একটি ঝকঝকে কার আর একটি সাদাটে মাইক্রো। লটবহরগুলো আমাদের ছুঁতে দিলেন না তারা। নিজেরাই বয়ে নিয়ে মাইক্রোর পেছনের খোলে পুরলেন। আমাদের বসালেন কারে। খোলামেলা পরিচ্ছন্ন সড়ক ধরে চললাম আমরা রাজধানী শহর মস্কোর দিকে। গায়ে মাখলাম প্রাচ্য- প্রতীচ্যের লীলাময় নগরীর রজনীগন্ধা- ছোঁয়া বাতাস। ড্রাইভারকে ওঁরা বললেন ঃ 'হোটেল রা-সিয়ার দিকে চলো।' রাশিয়াকে এ'রা বলেন রাসিয়া। ভালো লাগলো নরম, কোমল উচ্চারণটি শুনে। সেই প্রথম শুনলাম কথাটি।

সান্তপিতেরবুর্গ মহাসড়ক ধরে এগিয়ে চলছিলো গাড়ি। বিদেশিদের কাছে এই সড়কটির নাম সেন্টপিটার্সবার্গ হাইওয়ে। মস্কো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের পাশ ঘেঁষে এটি সোজাসুজি চলে গেছে শহরের ভেতরে। সেখানে গিয়ে ছুঁয়েছে নগরীর সবচেয়ে মনোরম আর ব্যস্ত সড়ক গোর্কি স্ট্রিট। সাড়ে তিনশ' মাইল দীর্ঘ এই বিশাল হাইওয়ে। উত্তরে শেষ মাথায় গিয়ে এটি ঠেকেছে বেলারুশ, লাত্ভিয়া আর এস্তোনিয়ার পুব সীমান্ত ছুঁয়ে সান্তপিতেরবুর্গ শহর। মহাসড়কের সেই মাথা থেকে যায় ফিনল্যান্ড উপসাগরের ঢেউ। বাল্টিক সাগরের ডান বাহু পিতেরবুর্গের লাগোয়া এই ফিন উপসাগরটি।

গাড়ি পার হলো সুবিশাল দিনামো স্টেডিয়াম। বিশ্ব অলিম্পিক থেকে রাশি-রাশি সোনা জিতে নিয়ে যাঁরা কৃতিত্বের শীর্ষ আসন দখল করেন সেই সেরা ক্রীড়াবিদদের লীলা-নিকেতন এটি। অবাক চোখ তুলে তাকালাম স্টেডিয়ামটির পানে। আধুনিক যুগে শান্তির দূত হলেন খেলোয়াড় নামের বীরেরা। শান্তির শ্বেত কপোত উড়িয়ে, হাতে অলিম্পিক টর্চের আলো জ্বালিয়ে এঁরাই তো মানব জাতিকে ডেকে বলেন ঃ নো মোর ওয়ার। আর যুদ্ধ নয়, সংঘাত নয়। যুদ্ধ যদি করতেই হয় খেলার মাঠে শরীরের কসরত আর কৌশল দেখিয়ে করো। মারণাস্ত্র দিয়ে হত্যাযজ্ঞের ময়দানে বিভীষিকা সৃষ্টি করে নয়। প্রতিযোগিতার মন্ত্র হোক আমাদের ছড়ানো

www.pathagar.com

হাতের মুঠো-মুঠো আনন্দ, মুষ্টিবদ্ধ হাতে-ধরা অস্ত্রের বীভৎস গর্জন নয়। খেলার মাঠের করতালি আর বিজয়ধ্বনি হোক মানুষে-মানুষে, জাতিতে-জাতিতে মিত্রতার সংগীত। বিশ্বশান্তির আন্দোলিত জলপাই শাখা।

গাড়িতে বসে আমরা এই শান্তির কথাই বলছিলাম। বলছিলাম আন্তর্জাতিক সমঝোতার কথা। মানুষের মধ্যে মত-পথের এবং আদর্শের ফারাক থাকতে পারে। আদিম যুগ থেকে একটার পর একটা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে সভ্যতা। একেবারে শুরুতে গুহাবাসী মানুষ আত্মরক্ষার তাগিদে হিংস্র প্রাণিকুলের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়েছে। লড়ছে তার সামান্য সম্বল পাথরের টুকরো, পাথর ঘষে বানানো হাল-হাতিয়ার আর গাছের ডালপালা দিয়ে। কুসংস্কার তাড়িত হলেও তাদের মধ্যে ছিলো একটা মানবিক সাম্যের চেতনা। খাদ্যের জন্যে পশুমাংস কিংবা ফলমূল যা কিছু আহরণ করতো আদিম সমাজের নারী-পুরুষেরা তার সবই তারা সমানভাবে ভাগ করে খেতো। কেড়ে নিতো না অন্যের হিস্যা।

মানুষ স্রেফ জন্তু ছিলো না- তার মধ্যে বিবেক এবং বিচারবোধও ছিলো। অর্জিত প্রাকৃতিক সম্পদের এই সুষম বন্টন আদিম যুগের মানবশ্রেণীর সেই সাম্য চেতনাকেই বড় করে তুলে ধরে তার ক্রমবিকাশের গোড়ার দিকের ইতিহাসের ধারায়। এক সময় সেই সামাজিক সাম্যবোধ এবং ঐক্যচেতনা বরবাদ হয়ে গেলো বলদর্পীদের ক্ষমতা লিপ্সায়। গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে তারা বিভক্ত করলো খাদ্যসন্ধানরত যাযাবর পশুচারক এবং শিকারী মানবশ্রেণীকে। দৈহিক শক্তিতে যারা ছিল বলশালী আর বুদ্ধিতে কূটকুশলী তারাই হলো গোত্রপতি। শেষে দুর্বল জনগোষ্ঠীগুলোকে পদানত করে হলো গোত্রপতি। শেষে দুর্বল জনগোষ্ঠীগুলোকে পদানত করে হলো শক্তিধর রাজা।

গোষ্ঠী সদস্যদের শ্রমে অর্জিত বেশিরভাগ সম্পদই হলো রাজাদের কুক্ষিগত। পশুচারক এবং কৃষিজীবী মানুষকে ক্ষমতার দাপটে সেনাবাহিনীভুক্তি করে তারা একের পর এক দখল করতে থাকলো মানবজাতির প্রাচীন শান্তিপূর্ণ বসতগুলো। দখল করতে থাকলো তাইগ্রিস-ইউফ্রেতিস, নীলনদ-সিন্ধুনদ, টাইবার-দানিয়ুব-ভল্গা, হুয়াংহু-ইয়াংসি, বাল্টিক-ভূমধ্যসাগর, কৃষ্ণ আর কাস্পিয়ান সাগর উপকূলের বাণিজ্যসভ্যতার প্রাণকেন্দ্রসমূহ। সমাজ, সভ্যতা আর দুর্বল জনগোষ্ঠীর বিনাশ সাধক এই রাজারা হলো সর্বসংহারী দেবতার মতন মহাশক্তিধর।

এরাই ক্রমে গড়ে তুললো সুমারিয়ান, ব্যাবিলোনিয়ান, ইজিপশিয়ান, গ্রিক, রোমান এবং পার্সিয়ান সাম্রাজ্য। গড়ে তুললো চৈনিক, মোঙ্গোলিয়ান আর তাতার-তুর্কি আধিপত্যবাদ। মধ্যযুগে এই রাজতন্ত্রের পরাক্রমেই পৃথিবীর দেশে-দেশে ডালপালা বিস্তার করলো পর্তুগিজ, ডাচ, ব্রিটিশ, ফরাসি আর স্পেনিশ এবং জার্মান উপনিবেশবাদ। রাশিয়ার নব্যশক্তিধর জারেরাও এই পাঁয়তারা থেকে দূরে থাকলো না।

রাজতন্ত্রের খুঁটি হয়ে দাঁড়ালো সামন্ততন্ত্র তথা ভূমি মালিক শ্রেণী। এরাই করের বোঝা চাপিয়ে আর জমির মালিকানা ছিনিয়ে নিয়ে কৃষক সমাজকে পরিণত করেছে সার্ফডোমে অর্থাৎ ভূমিদাস শ্রেণীতে। কিন্তু যারা সম্পদের স্রষ্টা এবং যারা হলো

www.pathagar.com

সংখ্যায় সুবিপুল তাদের দমাবে সে সাধ্য কার? এদের রুদ্ররোষেই তো তছনছ হলো বৃটিশ এবং ফরাসি সামন্ত্রতন্ত্র। ১৭৮৯ সালের গণ-বিপ্লবে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হলো ফ্রান্সের লুই রাজবংশ। তার আগে ১৭৭৬ সালে আমেরিকার স্বাধীনতা বিপ্লবের দাবানলে মৃত্যুঘন্টা বাজতে শুরু করলো বৃটিশ উপনিবেশবাদের। পিউরিটান বিপ্লবকালে হাউস অভ্ কমন্স-এর সামনে গিলোটিনে মরতে হলো ইংল্যাণ্ডের স্বৈরতন্ত্রী রাজা প্রথম চার্লসকে। ১৬৮৮ সালের গ্লোরিয়াস রিভ্যুলিশনের ঝড়ের মুখে জনপ্রতিনিধিদের হাতে এলো সেদেশের শাসন ব্যবস্থা।

১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবকালে প্রতিবিপ্লবীদের পাশাপাশি রাশিয়ার দোর্দণ্ডপ্রতাপশীল জারদেরও বিদায় নিতে হলো একইভাবে। ১৯২১ সালে চিনের জরাজীর্ণ পুরনো সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ধসে পড়তে শুরু করলো রুশ বিপ্লব থেকে উত্থিত গণঅভ্যুত্থানের প্রচন্ড অভিঘাতের মধ্য দিয়ে। ১৯৪৯ সালে চূড়ান্ত স্বাধীনতায় এসে সম্পন্ন হলো সানইয়াত সেন, মাও সেতুং, চৌ-এন-লাইয়ের সুদীর্ঘ গণসংগ্রাম। একইভাবে পলাশী যুদ্ধোত্তর যুগের একটানা দুশ' বছরের সংগ্রামশেষে ১৯৪৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে বিদায় নিতে হলো বৃটিশ রাজকে। আহমদ সুকর্ণের নিরাপোস সংগ্রামের বিজয়পর্ব এসে তাঁবু গোটাতে হলো ডাচ্‌দের।

পশ্চিমের নব আধিপত্যবাদ টিকে থাকতে পারলো না কোরিয়ায়। কুড়ি বছর ধরে নিজেদের লাখ লাখ সেনার রক্ত ঝরিয়ে, ভিয়েতনামকে তাঁবে রাখতে পারলো না আমেরিকা। কাগজের মতন উড়ে গেলো তার বিলিয়ন-বিলিয়ন ডলার। নষ্ট হলো পঞ্চাশ হাজার যুদ্ধবিমান। ধ্বংস হলো অগুণতি ট্যাংক, কামান আর কাঁড়ি- কাঁড়ি গোলাবারুদ। মার্কিন সন্তানদের খুনে ভিয়েতনামের রেড-রিভার হলো বাস্তবেই এক খুনের দরিয়া। এই অযৌক্তিক আর নিষ্ফল যুদ্ধের প্রতিবাদে নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন এবং আরো -আরো অনেক শহরে শান্তির পক্ষের বহু মার্কিন নাগরিক আত্মাহুতি দিলেন শরীরে পেট্রোল ঢেলে।

এ যুগে যুদ্ধের বিপক্ষে আর শান্তির সপক্ষে অগ্নিহোত্র এবং আত্মদাহের অমন নজির এক অনন্য ঘটনা। শেষে সারা দুনিয়ার নিন্দাধ্বনির পাশাপাশি স্বদেশের এই গণবিস্ফোরণের মুখে গোঁফ নামিয়ে নীরবে ভিয়েতনাম থেকে সরে আসতে হলো ক্ষয়িষ্ণু জংগিবাদকে।

পথ চলতে-চলতে স্বাগতিক বন্ধুদের সংগে অনেক কথা হলো যুদ্ধ এবং শান্তির সমস্যা নিয়ে। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন তাড়িক। নাম ছিলো তাঁর বোধকরি সেলেনিন। তিনি ছিলেন ইতিহাস এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পণ্ডিত। মানব সমাজের বিবর্তনের কাহিনী তুলে ধরে তিনি বললেনঃ যুদ্ধ বরাবরই ছিলো ক্ষমতালোভীদের সামাজ্য বিস্তারের হাতিয়ার। কিন্তু এরা কখনো টিকে থাকতে পারেনি। হয় গণ-উৎক্ষেপে নয়তো প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের কোপানলে পড়ে এদের বেশিরভাগই উড়ে গেছে ঝরাপাতার মতন। অথচ সাধারণ অতীতে মানুষ ছিলো এবং আজো আছে। ইতিহাসের প্রকৃত নিয়ন্তা তো তারাই।

www.pathagar.com

উপমহাদেশের রাজনৈতিক বিবর্তনের ইতিহাস সম্পর্কে ভালো ধারণা ছিল তাঁর। ১৮৫৭ সালের উপমহাদেশের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের ওপর কার্ল মার্কস বৃটিশ মিউজিয়ামে বসে 'ইভেন্টস বিহাইন্ড ইন্ডিয়ান মিউটিনি' নামে যে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন সম্ভবত সেটি অধ্যয়ন করেন তিনি। তাঁর আলোচনায় উৎসাহবোধ করছিলাম আমি। মাঝে- মাঝে ব্যক্ত করছিলাম আমার নিজের অনুভূতি। পাশাপাশি বসেছিলাম আমরা দুজন। আমার দিকে চোখ রেখে তিনি বললেন ঃ ১৯০৫ সালে যখন প্রথম রুশ বিপ্লব হলো ঠিক সে বছরই তো তোমাদের বাংলাদেশে শুরু হয় বৃটিশ শাসন বিরোধী সশস্ত্র অভ্যুত্থান। তার জের ধরেই তো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পুরো সময়টা তোমরা এগিয়ে গেছো একটানা প্রতিরোধ সংগ্রামের পথ ধরে।

আরো পেছনকার সূত্র ধরে বললেন ঃ পলাশী যুদ্ধের পর থেকে তোমাদের সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ আর রাজনৈতিক অভ্যুত্থানে ছেদ পড়তে দেখা যায়নি। মজনু শাহ্, ভবানী সেন, তিতুমীর, দুদুমিয়া এবং টিপু সুলতানের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের প্রসংগ টানলেন তিনি। সিপাহি-বিপ্লবে বাহ্দুর শাহ, নানা ফার্নোবিস, আহ্মদউল্লাহ, আজিমউল্লাহ খান, মঙ্গলপাণ্ডে প্রমুখের সাহসিক ভূমিকার কথা বললেন। বললেন দুজন বীরাঙ্গনা অযোধ্যার বেগম জিনাতউন্নিসা এবং ঝাঁসির রানী লক্ষ্মী বাঈয়ের কথা। বললেন, এঁদের মিলিত সংগ্রামে কোনো ধর্মভেদ, জাতিভেদ ছিলো না। স্বাধীনতা আর দখলদার বৃটিশ শাসনের উৎখাতই ছিলো সবার লক্ষ্য।

আরো যোগ করলেন ঃ কোনো সংগ্রাম যখন চালিত হয় মুক্তির এক অভিন্ন লক্ষ্যে, সাধারণ মানুষ তখন তার সংগে শরিক হয়। কৃষক এবং শ্রমজীবী শ্রেণী একাত্ম হয় সেই বিপ্লবে। এরা আন্দোলনে ছিলো বলেই একশ বছর নয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে, 'সূর্যাস্তহীন বিশাল বৃটিশ সাম্রাজ্য'কে পাততাড়ি গোটাতে হয়েছিল তোমাদের হিমালয়ান উপমহাদেশ থেকে। তোমাদের বাংলাদেশের ওপর ঔপনিবেশিক শাসন আর হানাদারি আগ্রাসন চালিয়েছিলো বলে ইতিহাসের একই অবধারিত নিয়মে পাকিস্তানকে অনেক মূল্য দিয়ে বিদায় নিতে হয়েছিলো ১৯৭১ সালে। তোমাদের মুক্তি সংগ্রামের পেছনে ঐক্যবদ্ধ ছিলো কৃষক-শ্রমিকসহ সর্বস্তরের সাধারণ জনশ্রেণী। তার জন্যেই সোভিয়েত ইউনিয়ন সমেত সারা দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদ-সম্প্রসারণবাদ নব্য আধিপত্যবাদ বিরোধী জাতিসমূহের অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়েছিলে তোমরা। বিশ্বব্যাপী এই নৈতিক সমর্থনের পাশাপাশি তোমাদের মরণপণ সংগ্রামের ফলশ্রুতি হলো বাংলাদেশের দ্রুতায়িত স্বাধীনতা।

সেলেনিনের এই তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা শুনে ভালো লাগলো। কথায় কথায় তিনি ১৯৫৫ সালের বান্দুং সম্মেলনের প্রসংগ ওঠালেন। তৃতীয় বিশ্ব তথা জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রপুঞ্জের উত্থানের কথা তুললেন। বললেনঃ শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান, সার্বভৌম সমতা, অনাক্রমণ এবং হস্তক্ষেপমুক্ত স্বাধীন-নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি একালের এক পরম রাজনৈতিক বাস্তব। মতাদর্শের পার্থক্য থাকলেও অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং যুদ্ধের অবসান ঘটানোর মানবিক স্বার্থে দেশে দেশে আর্থিক, বৈজ্ঞানিক আর প্রযুক্তিগত

www.pathagar.com

সহযোগিতাও এই আধুনিক যুগের দাবি। এই লক্ষ্য সামনে রেখেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ফ্যাসিবাদ উৎখাতের জন্যে সোভিয়েত দেশ পশ্চিমের পুঁজিবাদী দেশগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছে। সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স আর অন্যসব ফ্যাসিস্টবিরোধী রাষ্ট্রের দিকে।

শেষে তিনি বললেনঃ আজ সাংবাদিকের কলমকেও শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান এবং বিশ্বশান্তির সপক্ষে রাখতে হবে জোরালো ভূমিকা। কারণ পৃথিবীকে যুদ্ধমুক্ত করতে না পারলে কেউ-ই আমরা নিরাপদ থাকবো না। এর জন্যে চাই সদিচ্ছা এবং সমঝোতার সুবাতাস। চাই সম্প্রীতির নির্মল পরিবেশ। এ কাজটা সাংবাদিক সমাজ আর সংবাদপত্র জগতই ভালোভাবে করতে পারে।

অনুপ্রাণিতবোধ করলাম এই পণ্ডিত ব্যক্তিটির আশাবাদে। সবাই মগ্ন ছিলেন আলাপচারিতায়। কারো-কারো গলায় গানের কলি। এক সময় তাকালাম জানালার ওপাশে। রূপার পাতের মতন ঝকঝকে রাস্তা। গতিবেগের ছন্দ রেখে চলাচল করছে অসংখ্য গাড়ি। কিন্তু কোথাও চোখে পড়লো না যানজট। মোড়ে-মোড়ে আছে ভূগর্ভস্থ টানেল। পথে বাঁক নেয়ার সময় গাড়িগুলো নিচে নেমে গিয়ে ধরে গন্তব্যের নির্ধারিত সড়ক। রাস্তার দু-ধারে বার্চ, চেরি আর পপলার গাছের সারি। চোখে পড়লো পুব আর উত্তর-পুব কোণে অরণ্যময় ইসমাইলভো, সোকলনিকি আর ওসতানকিনো পার্ক। নানান জাতের গাছের বিশাল বনানী একেকটি। উত্তরের সমস্ত তল্লাটটাই বোটানিক্যাল গার্ডেনের এক দিগন্তলীন রাজ্য।

সবুজের বাহারি রং উপচে পড়ছে প্রতিটি বৃক্ষকুঞ্জ থেকে। সময়টা ছিলো বসন্তের শেষ এবং গ্রীষ্মের শুরু। ডালে-ডালে পাপড়িমেলা ফুলের সমারোহ। চড়ুই, তিতির, কবুতর আর দাঁড়কাকেদের উল্লাস শোনা যাচ্ছিলো পুষ্পিত অরণ্যের ভেতর থেকে। সবাই যেন এরা নতুন ঋতুকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছিলো ডানা মেলে দিয়ে আর আনন্দে অবগাহন করে।

গাছের ফাঁকে-ফাঁকে দেখা যাচ্ছিলো আকাশের দিকে মাথা তুলে রাখা আধুনিক ইমারতের সারি। রাস্তাগুলো মসৃণ গ্রেনাইটে আর কোথাও শ্বেত পাথরে বাঁধা। সামান্য ধুলোবালির এতটুকু চিহ্ন নেই। পরিচ্ছন্নতার ঝকমকে আয়না যেন প্রতিটি প্রশস্ত সড়ক। দু-ধারের ইমারতগুলো রুশ স্থাপত্যের এক নিটোল ছন্দে গাঁথা। দেখে আপনা থেকেই মুগ্ধতা নামে চোখে। বিশেষ করে পরিচ্ছন্নতার শুভ্রতা যখন দৃষ্টির ওপর আলোর বিচ্ছুরণ ছড়ায়।

গোটা মস্কোই একটি আধুনিক পরিকল্পিত নগরী। এই দেশটির চারভাগের তিনভাগই অরণ্যময় বলে এক সময় শহরটির প্রায় সব বাড়িঘরই ছিলো কাঠের কারুকাজ খচিত। কিন্তু বারকয়েক অগ্নিকাণ্ডে এর সবই ভস্মসাৎ হয়ে যায়। একমাত্র অটুট থাকে পাথরে-গড়া দ্বাদশ শতকের দুর্গনগরী ক্রেমলিনা। অর্থাৎ ক্রেমলিন প্রাসাদ আর তার ভেতরকার আকাশছোঁয়া গির্জাগুলো। শেষবার নেপোলিয়নের অভিযানকালে ১৮১২ সালে ভয়াবহ এক অগ্নিকাণ্ডে এই জায়গাটুকু ছাড়া গোটা

www.pathagar.com

শহরই হয় ভস্মস্তূপ।

তারপর থেকে গোড়াপত্তন আধুনিক ইমারতের শহর মস্কোর। সোভিয়েত আমলে নতুন নতুন স্থাপত্য কীর্তি এবং আধুনিক নির্মাণ সৌন্দর্যের মুকুটমণি হয়ে ওঠে এটি। রাস্তাঘাট হয় চওড়া আর পরিচ্ছন্ন। শহরের চারপাশ এবং রাস্তাগুলোর দু-ধার হলো উদ্যানখচিত। আধুনিক পাতাল রেল চালু হলো ১৯৩৬ সালে। যানবাহনের স্বচ্ছন্দ চলাচলের জন্যে বড় বড় সড়কের মোড়ে তার আগেই হয়েছিলো ভূগর্ভ সড়ক তথা টানেলের নেটওয়ার্ক।

ভূগর্ভের মনোরম রেল স্টেশন আর দ্রুতগামী রেলের জন্যে বিশ্ববিখ্যাত এই শহর। এর স্থাপত্য সৌন্দর্যের কোনো তুলনা নেই। দেখলেই চোখ জুড়ায়।

দেখতে দেখতে গাড়ি এসে থামলো দশতলা উঁচু বিশাল রাশিয়া হোটেলের সামনে। পাবলভ বললেন ঃ চার হাজার কক্ষ আছে এই সরাইখানায়। সারা ইউরোপ কি এশিয়ায় অতবড় হোটেল আর একটিও নেই।

গাড়িখানা হোটেলের সামনের চত্বরে এসে দাঁড়ালো। সবাই আমরা নেমে পড়লাম। এক ফাঁকে বিশাল ভবনটির বাইরেটা জরিপ করে নিলাম আমি। মনে হলো আধ মাইল জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে শ্বেত পাথরের একটি ঝকঝকে মনোরম প্রাসাদ। তার গা থেকে ফুটে বেরুচ্ছিলো শুভ্রতার আলো। চারদিকটাই রকমারি গাছের ঝাড় এবং ফুলের বাগানে ঘেরা। এটি হোটেলের কেবল একটি উইং। নিশ্চয় আরো অনেক ক'টি উইং আছে। যেখানে চার হাজার কক্ষ সেই প্রকান্ড বাড়ির আয়তন প্রথম দর্শনেই আঁচ করতে পারবে কে? চোখভরা বিস্ময় নিয়ে ভেতরকার লাউঞ্জে ঢুকলাম।

নভোস্তির সাংবাদিক বন্ধুরা আগের মতোই আমাদের লটবহর হাতে-হাতে তুলে নিয়ে এলেন। চওড়া বিশাল লবি। এ-মাথা থেকে ও মাথায় চোখ দৌড়ানো যায় না। কুয়াশা-কুয়াশা দেখায়। আমাদের কামরাগুলো আগেই রিজার্ভ করা ছিলো। কাউন্টারে গিয়ে রুম নম্বরের আলাদা-আলাদা চাবি হাতিয়ে আনলেন পাবলভ।

এই প্রথম রাত জাগার ক্লান্তি অনুভব করলাম। শরীরটাকে ছেঁকে ধরলো অবসাদ। চোখে জাঁকিয়ে নামতে চাইছিলো ঘুম। বোধকরি ব্যাপারটা সঠিক আঁচ করতে পেরেছিলেন স্বাগতিক বন্ধুরা। সবাই এক গলায় বলে উঠলেন ঃ এখানে বসে একটু জিরিয়ে নাও সবাই। গরম কফি খেলে জড়তা কেটে যাবে।

একটি বড় গোল টেবিলের চার পাশে পাতানো ছিলো পালকের গদির কসার তুলতুলে কুশন চেয়ার। সবাই পাশাপাশি বসলাম। উস্তিনভ কফির সংগে ডিম-পাউরুটি পরিবেশনের অর্ডার দিলেন। মিনিট কয়েকের মধ্যেই হাজির হলো খাদ্যবস্তুগুলো। পেয়ালা থেকে ধোঁয়া উঠছিলো গরম ব্ল্যাক কফির। এই কালো জাতের কফির জন্যে বিখ্যাত ককেশাস এবং উরাল অঞ্চল।

সত্যি-সত্যি শরীরের আড়ষ্টতা কেটে গেলো কফির পেয়ালায় চুমুক দেবার পর। এর স্বাদ এবং সৌরভই ছিলো আলাদা। কফি পানের পাট চুকে গেলে পর

www.pathagar.com

উস্তিনভ বললেন ঃ আমি জানি অনেক ধকল গেছে তোমাদের ওপর দিয়ে। কোথায় ঢাকা আর কোথায় মস্কো। অমন একটা সুদীর্ঘ পথ রাতভর পাড়ি দিয়ে আসা চাট্টিখানি কথা নয়। এবার সবাই নিজ-নিজ ঘরে গিয়ে পরিচ্ছন্ন হয়ে নাও। তারপর বিছানায় লম্বা দিয়ে একচোট ঘুমিয়ে নাও। এখানে রুম সার্ভিসের ব্যবস্থা খুবই ভালো। ইচ্ছা করলে রুমেই সেরে নিতে পারো দুপুরের লাঞ্চ। আর যা-কিছু দরকার হবে সবই পরিবেশন করবেন রুম হোস্টেজ।

ঘুম পাড়বার কথা শুনে হাসলেন পাবলভ। বেশ জোরেই হাসলেন। ওদিক থেকে প্রশ্ন এলো ঃ হাসছো যে বড়! হাসবার কী হলো এতে?

পাবলভ হেসেই বললেন ঃ এঁরা বাংলাদেশের লোক না ? আমাদের এখানে এখন সকালের খনখনে রোদ। তাও জুনের। ঢাকার ঘড়ির হিসেবে মস্কোতে রাত হয় সূর্য আকাশে ঘন্টা পাঁচেক ঝুলে থাকতে। আমাদের ঘড়ির হিসেবেও ভুল নেই। আমাদের উত্তর মেরুর দেশের দিন তো অনেক বড়। বেলা তিনটে বাজতেই নামে রাত। একথা সবাই আমরা জানি এবং ঘুমুতেও যাই ঘড়ির চব্বিশ ঘন্টার বাঁধা নিয়মে। কিন্তু এঁরা তো ঢাকার সময়ে অভ্যস্ত। সুতরাং অবেলায় কেমন করে এঁদের চোখে ঘুম আসবে ? তবে সময়ের হেরফেরটা দু-চার দিন বাদে ধাতস্থ হয়ে গেলে অন্য কথা।

উস্তিনভ বোকা বনে গেলেন। কাঁচুমাচু মুখে বললেন ঃ তাইতো, সেদিকটা তো আমি ভেবে দেখিনি। জানি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া আর উত্তর-পূর্ব ইউরোপের মাঝখানের সময়ের ফারাক অনেক। কিন্তু ঘড়ি ধরে কখনো মিলিয়ে দেখিনি। তাছাড়া তো আজো আমার ঢাকা যাওয়াই হয়ে উঠলো না।

সংগে সংগে আমি বললামঃ আগে না হলেও এবার যাবে। আমরা যখন মস্কো এসেছি তুমি নিশ্চয় ঢাকা যাবে। তুমি কেন এই বন্ধুদের সবাই যাবে। তোমাদের সবার দাওয়াত রইলো ঢাকায়। তা ছাড়া তো ফিরতি শুভেচ্ছা-সফরে তোমাদের একটি সাংবাদিক প্রতিনিধি দলের যাওয়ার কথা বাংলাদেশে। দুই দেশের সাংস্কৃতিক চুক্তিমতে এই বিনিময় সফরে কোনো ফাঁক থাকতে পারে না। আমি তো মনে করি দেশ ভ্রমণ না করলে একজন সাংবাদিকের অনেক কিছুই অজানা থাকে।

বক্তৃতার বহর আরো একটুখানি বাড়িয়ে বললাম ঃ শুধু কী পুঁথিগড়া বিদ্যায় পেট ভরে কোনো জাত-সাংবাদিকের? 'অজানারে দ্যাখো আঁখি মেলিয়া' আমাদের কবির এই উক্তিটির ইংরেজি তরজমা করে বুঝিয়ে বললাম। বাংলার লোক কবির কথাটিরও পুনরুক্তি করলামঃ 'যত বরণ গাভীরে ভাই একই বরণ দুধ, জগত ভরমিয়া দেখি সব একই মায়ের পুত।' মানবিকতার জয়গানে উচ্চকিত এই পংক্তিমালাটিরও অনুবাদ করলাম। বললামঃ দেশে-দেশে আছে বহু বর্ণের কিন্তু একই মনের কত অচেনা-অজানা মানুষ। এদের কাছাকাছি না গেলে কী নিজেদের চেনা যায়? নাকি মনের ভেতরকার উত্তর খুঁজে পাওয়া যায়? নইলে সাংবাদিকের পেশাটাই তো থাকে অপূর্ণ। এ কারণেই তো তোমাদের দেখতে চাই ঢাকায়। তোমাদের শুভেচ্ছা কী দেবে না আমাদের?

www.pathagar.com

তাঁরা সবাই হাততালি দিয়ে উঠলেন আমার কথায়। সমস্বরে বললেনঃ নিশ্চয় নিশ্চয়। সুযোগ পেলেই ঢাকায় ঢুঁ মারবো। দুই চোখ ভরে দেখবো রক্ত ঝরার বিনিময়ে পাওয়া তোমাদের সুন্দর দেশটাকে। আর দেখবো তোমাদের সাহসী মানুষগুলোকে। জান তো, আমরাও তো রক্ত ঝরিয়েই গড়েছি একশ' জাতের বেশি লোকের বাসস্থান এই পনেরো প্রজাতন্ত্রে মিলিত ইউনিয়নটিকে। আর আমাদের শুভেচ্ছার কথা বলছো? সেটা তো তোমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়েই দেখেছো? এখনো তার একবিন্দু হেরফের হয়নি। আমাদের প্রাণ জুড়ে আছে তোমাদের জন্যে অগাধ শুভেচ্ছার গুচ্ছ গোলাপ। দেখছি তোমাদের বড় কবিরা আসলেই মানবপ্রেমিক। নইলে মানবতার জয়ধ্বনি অমন উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করতে পারতেন না তাঁরা। আশ্চর্য মিল দেখছি, তাঁদের এদেশের কবি পুশকিন, ঔপন্যাসিক তলস্তয়, তুর্গেনিভ আর গর্কির সংগে। দু-চারটি শব্দ বাদে সব কথাই বললেন একা উস্তিনভ। আলাপচারিতা শেষে সবাই ওঁরা উঠে দাঁড়ালেন। উস্তিনভ হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেনঃ আচ্ছা, ঘুম না এলেও বিছানায় শুয়ে থেকে তোমরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম নাও।

শ্বাস বদলে নিয়ে শেষে বললেন, আর তোমাদের সময় নষ্ট করবো না। ও-বেলায় ফের আসবো। নভোস্তি অফিসে একবার দর্শন দিয়ে আসবে তোমরা। সবাই ওখানে তোমাদের অপেক্ষায় থাকবেন। টেলিভিশন সাংবাদিক আর আলোকচিত্রীদের একটি টিম থাকবে। ভ্রমণকালে অষ্টপ্রহর ওঁরা থাকবেন তোমাদের সংগে। তোমরা যা কিছু দু-চোখ মেলে দেখবে- জায়গায়- জায়গায় তার ওপর সাক্ষাৎকার নেবেন টিভি সাংবাদিকরা। ক্যামেরায় ধরে রাখা সেই সাক্ষাৎকার সম্প্রচার করা হবে আমাদের সবকটি টেলিভিশন কেন্দ্র থেকে। ওঁদের সবার সংগে তোমাদের দেখা হবে নভোস্তি সদর-দফতরে।

'হ্যাভ এ গুড রেস্ট' বলেই তিনি দোড়গোড়ার দিকে পা বাড়ালেন। অন্যরাও একে-একে উষ্ণ করমর্দন করে বিদায় নিলেন। একসংগে বললেনঃ গুড বাই অল ফ্রেন্ডস।

আমাদের সংগে কেবল থেকে গেলেন পাবলভ। আগেই লিফ্‌টে উঠে যার-যার রুমে চলে গিয়েছিলো লটবহর। আমরা পাঁচতলায় উঠলাম পাবলভের সংগে। দুই সারিতে ছড়ানো পাশাপাশি রুমে বন্দোবস্ত হলো আমাদের থাকবার। পাবলভ থাকলেন কাছাকাছি এক কক্ষে। তিনি নম্বর দেখে আমার ঘরটা খুঁজে বের করলেন। দরজা খুলে আগেই রুম হোস্টেস আনা-মাস্‌লোভা অপেক্ষা করছিলেন ঘরটার মুখেই। আমাকে দেখেই হাত বাড়িয়ে দিয়ে স্বাগত জানালেন। দুবার মিষ্টি গলায় উচ্চারণ করলেনঃ স্পাসিবা, স্পাসিবা!

স্থূলকায় এক প্রৌঢ়া মহিলা আনা। বয়স বোধকরি ষাটের কাছাকাছি হবে। মাতৃতুল্যা বৃদ্ধা। আঁটোসাঁটো শরীরের গড়ন। মাথার একগাছি চুলেও পাক ধরেনি। হাত-পা ইস্পাতের মতন দেখতে। ওজন কম করে হলেও সাড়ে তিন থেকে চার মণ হবে। এ রকম বয়সে একজন বৃদ্ধার স্বাস্থ্যের অমন প্রাচুর্য দেখেছি কেবল

www.pathagar.com

ককেশাস বুড়োবুড়িদের শরীরে। মনে-মনে ভাবলাম, বোধকরি এই মহিলা ওই শতায়ু দেশেরই কেউ হবেন।

তিনি ঘরটা আমায় খুঁটে খুঁটে দেখালেন। বেশ চওড়া ঘর। দু-দিকে সুবিন্যস্ত বেড পাতা। দুধের মতন সাদা শীটের কভারের ওপর পালক আঁশের তুলতুলে জোড়া বালিশ দুই বেডেই। তাকের ওপর ছোট-বড় সাইজের এক সার টাওয়েলে সাদা আর বেগুনি- গোলাপি লাইলাক ফুলের নকশা।

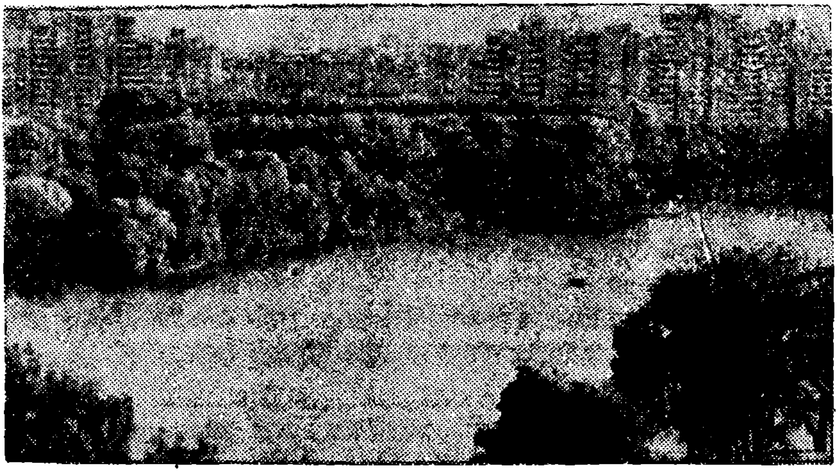

মস্কো নদী

পাশের দুই টেবিলে ফুলদানি ভরা ছিলো তাজা গোলাপের থোকা। বড় পাপড়ি মেলা এই লাল গোলাপের সৌরভে মৌ-মৌ করছিলো সারাটা ঘর। তার ওপর বিছানা-বালিশ-তোয়ালেতে ছিলো সেন্টের মিষ্টি গন্ধ।

বাথরুমটা খুলে দেখালেন আনা-মাস্‌লোভা। ছাদ থেকে মেঝে অব্দি এই স্নানাগারের সবটাই ছিলো শ্বেতপাথরে মোড়া। মেঝে এবং দেয়ালের মোজাইকে খচিত ছিলো লিলি ফুলের ছোট-ছোট কুঁড়ি এবং পাতার অলংকরণ। সুবাসিত সাবান আর হাতে-মাখা সেন্টের গন্ধ ভুর ভুর করছিলো প্রশস্ত স্নান ঘরটায়। বাথটবটা ছিলো ঝকঝকে। শাওয়ারে ছিলো শীতল এবং উষ্ণ পানির প্রস্রবণ। এই পানিতেও ছিলো আতরের সৌরভ। দেখে প্রাণ জুড়ালো। মনে হলো সাত তারা হোটেলের সবকিছু আছে এখানে।

বাথরুমটা দেখিয়ে আনা ইশারায় গা-গোসল দিয়ে পরিষ্কার হয়ে নিতে বললেন আমায়। রুশ ভাষায় বেশ কিছু বাক্য উচ্চারণ করলেন তিনি স্নেহময় গলায়। তিনি হয়তো মনে করছিলেন রুশ ভাষা জানি আমি। কিন্তু আমি কেবল 'ইয়েস-নো'

www.pathagar.com

করলাম, মাঝে মাঝে উচ্চারণ করলামঃ 'থ্যাংক ইউ এবং ভেরি-ভেরি গুড।' তিনি হেসে পাল্টা 'থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ' বলে জবাব দিলেন। ইংরেজি না জানলেও ইংরেজদের ভাষার সাধারণ ভব্যতার এই শব্দগুলো তিনি বুঝতেন। হয়তো আগে কখনো দু-চারজন ইংরেজ বাস করে গিয়েছিলো এই ঘরে।

আমার বয়স তখন চল্লিশের মধ্যপর্বে। আনা মুখ দেখেই বুঝেছিলেন আমি তাঁর ছেলের মতন। তাঁর ইশারা, দু-একটি ভাঙা-ভাঙা ইংরেজি বুলি আর যত্নআত্যিতে তাই ফুটে উঠেছিলো মাতৃস্নেহ। আগেই শুনেছিলাম রুশ প্রবীণারা খুবই স্নেহপ্রবণ এবং সন্তানবৎসল।

আমার বাথরুমে ঢুকবার পর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন আনা। যাওয়ার সময় সময় ইশারায় বলে গেলেন স্নান সেরে এলে পর আমি যেন কলিংবেল বাজাই। কলিংবেলটা তিনি দেখিয়ে দিয়ে গেলেন। দরোজার দিকে ইংগিত করে বোঝালেন বাইরে তিনি আমার অপেক্ষায় থাকবেন। বাথরুমে শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে মিনিট পনেরো ধরে ঈষদুষ্ণ পানির ছোঁয়ায় ক্লান্ত শরীরটাকে জুড়িয়ে নিলাম। রুমে এসে কাপড়-চোপড় ছেড়ে কলিংবেল টিপতেই আনা ছুটে এলেন দরোজা গলিয়ে। আমার পরিচ্ছন্ন চেহারা দেখে আনার দুই চোখে হাসি ঝিকিয়ে উঠলো। বোঝা গেলো তিনি খুশি হয়েছিলেন আমাকে ঝকঝকে-তকতকে দেখে।

ঘরের বড় টেবিলটার ওপর রেকাবিতে রাখা ছিলো কালো টস্‌টসে আঙুরের কয়েকটি থোকা আর গোটা চারেক লেবু। ভেতরে ঢোকার সময় কেতলিভরা চা নিয়ে এসেছিলেন তিনি।

রেকাবির দিকে ইশারা করে উচ্চারণ করলেন আনাঃ ভিনোগ্রাদ। কথাটার মানে আঙুর। এই রুশ শব্দটা আমার জানা ছিলো। তিনি বলতে চাইছিলেন দু-চারটা ভিনোগ্রাদ মুখে দাও। আমার চোখে আগ্রহের ভাব ফুটে উঠতে দেখেই তিনি রেকাবি থেকে এক থোকা আঙুর আমার হাতে তুলে দিলেন। মুখে নিয়ে স্বাদ চাখলাম কালো দ্রাক্ষা ফলের।

মিনিট তিনেক পরেই কাপে চা ঢাললেন তিনি। ধোঁয়া উঠছিলো কাপ থেকে। রেকাবির লেবুর দিকে ইশারা করে, সপ্রশ্ন চোখে উচ্চারণ করলেন। 'লিমন ?' অর্থাৎ চায়ের পেয়ালায় লেবুর রস দেবো?

আমি ইয়েস বলে মাথা নাড়তেই লেবু কেটে কয়েক ফোঁটা রস মেশালেন তিনি চায়ের কাপে। চিনির বয়াম দেখিয়ে ইংগিত করলেন, ইচ্ছে মতন চিনি নিতে পারো তুমি।

চায়ের পাট শেষ হলে পর বিছানা দেখিয়ে বিশ্রাম নিতে বললেন আমায়। ডানহাতের তিনটি আঙুল দেখিয়ে আভাস দিলেন-ঘন্টা তিনেক পর আবার আসবেন তিনি।

আনা চলে গেলে পর বিছানায় উঠে গড়াগড়ি দিতে থাকলাম। বুঁজে রাখলাম চোখ। কিন্তু ঘুম এলো না, একটু তন্দ্রার মতন এলো। ঠিক তিন ঘন্টা বাদে টোকা পড়লো রুমের দরোজায়। খুলতেই দেখি আনা এবং পাবলভ দাঁড়িয়ে। পাবলভ

www.pathagar.com

দ্রুত পোশাক বদলিয়ে নিচের ডাইনিং হলে যেতে বললেন আমায়। আনা দ্রুতহাতে বিছানাপত্র গুছিয়ে নতুন কভার চড়িয়ে বেড সাজালেন।

লিফট বেয়ে নিচে নেমে আমরা একসংগে মধ্যাহ্নভোজ সারলাম। এর মধ্যেই নভোস্তির ওঁরা এসে গিয়েছিলেন। আমরা বাইরে অপেক্ষমাণ 'লাদা সামরা' গাড়িতে উঠলাম গাড়ি তরতরিয়ে চললো গর্কি স্ট্রিটের দিকে। মস্কোর প্রকাণ্ড সড়ক এটি। রাস্তার চৌমাথায় দেখলাম একটি উঁচু স্তম্ভের ওপর দাঁড়ানো বিশ্ববিশ্রুত কথাশিল্পী ম্যাক্সিম গর্কির কালোপাথরে-গড়া গোটা অবয়ব। দূরে জানালা থেকে দেখা যাচ্ছিলো ক্রেমলিনের সোনালি চূড়াগুলো।

আনা মাস্লিনার মুখের হাসি দেখে হোটেল রাশিয়া থেকে বেরিয়েছিলাম। গর্কি স্ট্রিটের মুখে বিশ্বনন্দিত কথাশিল্পী ম্যাক্সিন গর্কির স্ট্যাচু দেখে মন চলে গিয়েছিলো তাঁর রচিত 'মাদার' উপন্যাস আর জীবনকথা 'মাই চাইল্ডহুড'-এর জগতে। এক রচনা প্রতিযোগিতায় 'মা' অর্থাৎ 'মাদার' বইটি পুরস্কার হিসেবে পেয়েছিলাম যখন নেত্রকোণার স্কুলে ক্লাস এইটে পড়ি। তখন থেকে গর্কি দখল করে বসেন আমার অনুভূতিপ্রবণ কিশোর মনটাকে। একবার যাঁরা গর্কির ছোট গল্প, উপন্যাস এবং আলাদা মেজাজের নাটকগুলো পড়েছেন তাদের কারও পক্ষে এই লেখককে ভুলে থাকা সম্ভব নয়।

কর্মব্যস্ত সুদীর্ঘ সড়কের এক প্রান্তে গর্কিকে দেখে এক উচ্ছ্বসিত আবেগে উথলে উঠলো আমার প্রাণ। খুঁটে-খুঁটে দেখলাম তাঁর বয়স্ক মুখের আদল, দাড়িগোঁফ, ঋজুদেহ এবং লম্বাটে হাত-পাগুলো। দুই আয়ত চোখে তাঁর ঝুলছিল জগত আর জীবনকে জানবার অপার এক কৌতূহল। এই সন্ধানী চোখের তুলিতে বাস্তবের রং চড়িয়ে গর্কি এঁকেছিলেন তাঁর প্রথম সাহিত্য-জীবনের লেখা ছোট গল্প 'টুয়েন্টি সিক্স মেন অ্যান্ড এ গার্ল', 'চেলকাশ' এবং 'মালভা'-এর বিচিত্র স্বভাবের চরিত্রগুলো।

তিনি তাঁর গল্পের এই নারী-পুরুষ শিশুদের নাম দিয়েছিলেন 'হিউম্যান সোসাইটি' অর্থাৎ মানব সমাজ। ১৮৯২ সালে চব্বিশ বছর বয়সে লেখালেখিতে হাত দিলেন ভল্গা তীরের নিঝ্নি নভ্গোরদ্ শহরের শ্রমিক পল্লীর এককালের এই ভবঘুরে তরুণ। জন্ম তাঁর ১৮৬৮ সালে এখানকার এক পোড়খাওয়া শ্রমজীবী পরিবারে। টলস্টয় থেকে বছর দশেকের কনিষ্ঠ তিনি। টলস্টয়ের জন্ম ১৮২৮ সালে ইয়াসনায়া পোলিয়ানায়। এটি রাশিয়ার তুলা প্রদেশের একটি ছোট শহর। সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছিলেন টলস্টয়। এক অভিজাত কাউন্ট পরিবারের ছেলে ছিলেন বলে তাঁর শৈশব কেটেছিলো প্রাচুর্যের মধ্যে। কিন্তু গর্কির শৈশব কাটে দুঃখের মুখ দেখে। তবে এক জায়গায় ছিলো এই দুই বিশ্বখ্যাত কথাশিল্পীর মিল। ১৮৫৫ সালে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে সাহিত্যের জগতে পা বাড়িয়েছিলেন টলস্টয়। বেশ কিছু কবিতা এবং উপন্যাস রচনার পর তিনি ছোটবেলার স্মৃতিচারণ করে লিখলেন তাঁর প্রথম গল্প 'মাই চাইল্ডহুড'। কথাশিল্পী হিসাবে এটি প্রথম খ্যাতি দিয়েছিলো টলস্টয়কে।

দু'জনের মধ্যে বড় ধরনের শ্রেণীগত বৈষম্য থাকলেও সাহিত্য জীবনে অগ্রজ কথাশিল্পী টলস্টয়ের বেশ প্রভাব পড়তে দেখা যায় গর্কির ওপর। টলস্টয়ের

www.pathagar.com

জীবনস্মৃতি 'চাইল্ডহুড' বেরুবার পঞ্চাশ বছর পর, ১৯১৩ সালে, প্রকাশিত হলো গর্কির জননন্দিত শৈশবস্মৃতি 'মাই চাইল্ডহুড'। তবে দু'জনের ছোটবেলার কাহিনীতে ছিল প্রচুর তফাৎ। টলস্টয়ের শৈশব-কথায় ছিল তাঁকে নিয়ে বড় জমিদার পরিবারের চাকর-বাকর-খানসামাদের প্রচুর যত্নআত্তির গল্প। পাশাপাশি ছিলো খান্দানি মহিলা এবং অভিজাত আত্মীয়কুলের সতর্কতা। কেমন করে টলস্টয়কে ভবিষ্যতে একজন কেতাদুরস্ত আর জাঁদরেল কাউন্ট হয়ে গড়ে উঠতে হবে পদে-পদে সেরকম আদব-কায়দা শেখাতে ব্যস্ত থাকতেন তাঁরা। একই সঙ্গে শেখাতেন প্রজাপীড়নের সামন্তযুগের প্রথাসিদ্ধ আইনকানুন। কিন্তু স্বভাবগতভাবে হৃদয়প্রবণ টলস্টয় এসব জমিদারি চাল আর পরিবারের নীল রক্তের লোকদের স্নেহের শাসনের পীড়নে হাঁপিয়ে উঠতেন। সাধারণ মানুষের কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকবার যে- রেওয়াজ টলস্টয়দের ইয়াসনায়া পোলিয়ানার কাউন্ট প্রাসাদে ছিলো তা মোটেও বালক টলস্টয়ের ভালো লাগতো না।

আরেকটি জায়গায় গর্কির সঙ্গে মিল ছিলো এই অগ্রজ কথাশিল্পীর। দু'জনই ছিলেন যুদ্ধবিরোধী, মানবপ্রেমিক আর উৎপীড়িত মানুষের অধিকার অর্জনের সমর্থক। টলস্টয় জেন্টেলম্যান-ভলান্টিয়ার হিসাবে ক্রিমিয়ার সেভাস্‌তোপোল যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে যে-পৈশাচিক হত্যাযজ্ঞ তিনি দেখলেন তাতে পাল্টে যায় তাঁর জীবনধারার চালচিত্র। রুশ স্বেচ্ছাসেনা দল থেকে ইস্তফা দিলেন তিনি। সেভাস্‌তোপোল থেকে ফিরে এসে লিখলেন যুদ্ধের হৃদয়বিদারক দৃশ্যের ওপর কয়েকটি গল্প। এসব গল্পে ফুটিয়ে তুললেন মানবতার আত্মহননের করুণ আলেখ্য। এই গল্পগুলো শান্তিবাদীদের গভীরভাবে নাড়া দেয়। দেখতে-দেখতে টলস্টয় হয়ে ওঠেন উঁচু মাপের একজন লেখক। কিছুকাল তিনি সান্ত পিতারবুর্গের শৌখিন লেখকগোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। কিন্তু এঁদের লেখকসুলভ নাক উঁচু ভাব আর মেজাজমর্জি তাঁর ভালো লাগেনি। এরপরেই তিনি বেরুলেন পশ্চিমা দুনিয়া সফরে। ফরাসি বিপ্লবের চেতনা তখন ইউরোপের সমাজ জীবনে এনেছিল অনেক পরিবর্তন। ইতালি- জার্মানি প্রভৃতি দেশের কৃষক-শ্রমিকেরা চাইছিলো সমান অধিকার। টলস্টয়কে এই সফর অভিজ্ঞতা দিলো সামাজিক বৈষম্যের এক নতুন চেতনা। এ সময় রুশ সামন্ত শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী স্বর উচ্চকিত করে লিখলেন তিনি 'দ্য মেমোইর্স অভ্ প্রিন্স মেখলিওডভ'। ১৮৭৬ সালে বিখ্যাত উপন্যাস 'আনা কারেনিনা' প্রকাশিত হবার আগে বেরুলো তাঁর সাড়া জাগানো উপন্যাস 'ওয়ার অ্যান্ড পীস' তথা 'শান্তি এবং যুদ্ধ'। নেপোলিয়নের রাশিয়া আক্রমণ এবং তাঁর ইউরোপীয় যুদ্ধগুলোর ওপর ভিত্তি করে এই উপন্যাস। এটি তাঁকে স্থান করে দেয় বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম উপন্যাসিকদের আসনে।

শেষ জীবনে তিনি যীশুর অহিংস মতবাদে দীক্ষা নিয়ে যাপন করতে শুরু করেন দরিদ্রের জীবন। জমিদারির সমস্ত খাস জমি কৃষকদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন হাসিমুখে। দু-চার একর জমিও পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্যে রাখলেন না।

www.pathagar.com

জুতো সেলাই করে সংসারের খরচ মেটাতেন তিনি। তাঁর এ নিঃসম্বল সন্ন্যাস জীবন তাঁর স্ত্রী কাউন্টেস সোফি দেখতেন চরম ঘৃণার চোখে। বিশেষ করে জমিদারি বিলিয়ে দেয়ার পর স্বামী হিসেবে টলস্টয়কে পুরোপুরি এড়িয়ে চলতেন সোফি। কেবল ছোট মেয়েটি শ্রদ্ধার চোখে দেখতো পিতাকে। ১৯১০ সালের ২০ নভেম্বর এক তুষার ঝড়ের রাতে মস্কোর কাছাকাছি এক গ্রামীণ রেল স্টেশনে স্ত্রী এবং অভিজাত পরিবার পরিত্যক্ত এই বিশ্ববিখ্যাত মানুষটি শীতে কুঁকড়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। 'আনা কারেনিনা' উপন্যাসে ঝগড়ুটে কাউন্টেস স্ত্রীর চরিত্রই নায়িকার ছদ্মাবরণে ফুটিয়ে তুলেছিলেন লিও টলস্টয়। মৃত্যুর পর রানী ভিক্টোরিয়াসহ রাষ্ট্রপ্রধানবর্গ এবং রোঁমা রোঁলাসহ বিশ্ববরেণ্য লেখক মনীষীদের কাছ থেকে অসংখ্য শোকবার্তা এলে পর টলস্টয়ের মৃত মুখ একবার দেখতে চেয়েছিলেন সোফি। কিন্তু ছোট মেয়েটি বাবার কফিনের ধারেকাছেও ঘেঁষতে দিলো না মাকে।

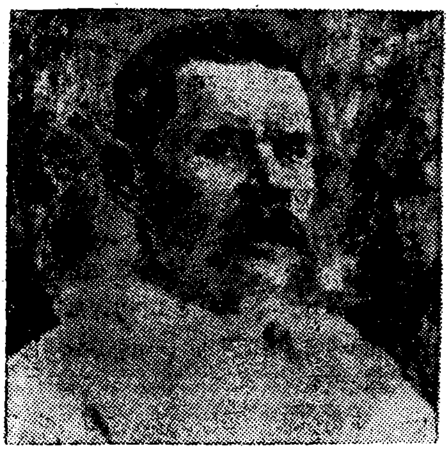

ম্যাক্সিম গর্কি

গর্কি তাঁর 'স্মৃতিচারণ' (রেমিনিসেন্সেস্') গ্রন্থে টলস্টয়, চেখব্ আর আঁদ্রিয়েভকে বড় করে তুলে ধরেছিলেন। এঁদের সঙ্গে ছিলো তাঁর নিবিড় আত্মিক সম্পর্ক। ১৯১৭-র অক্টোবর বিপ্লবকালে টলস্টয় একটু ম্লান হয়ে পড়লেও বিপ্লবোত্তর যুগে আবার রুশ সাহিত্যের মহানায়ক হিসেবে ফিরে এলেন পাদপ্রদীপের সামনে।

রাস্তা দিয়ে চলবার সময় গর্কির জীবন এবং সাহিত্য নিয়ে কথা বলছিলাম পাবলভ এবং নভোস্তির প্রগ্রেসিভ পাবলিকেশন্স-এর দু'জন লেখকের সঙ্গে। এঁদের নাম নোটবুকে রাখতে ভুলে গেছি। তাই মনে করতে পারছি না এখন। কিন্তু সবাই এঁরা রুশ সাহিত্যের অতীত এবং বর্তমান ধারার ভালো খবর রাখতেন। কথায় কথায় আমি বললামঃ ছোটবেলায় আমি পুরস্কার হিসেবে প্রথম যে বইটি পেয়েছিলাম সেটি ছিলো গর্কির 'মাদার' উপন্যাস। সেই থেকে গর্কি আমার প্রিয় লেখক। তাঁকে কখনও ভুলে থাকতে পারিনি। আমার কথা শুনে সবাই এঁরা উৎফুল্ল হলেন। বললামঃ উপন্যাসটি ছিলো আমাদের দেশের একজন বিখ্যাত লেখকের বাংলা অনুবাদ। বইটি হাতে পাওয়ার পর পড়তে শুরু করে দিয়েছিলাম। সারারাত জেগে

www.pathagar.com

খুঁটে-খুঁটে পড়েছিলাম। এতে ছিলো বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের কথা। তারা তৈরি হচ্ছিল বিপ্লবের জন্যে। উপন্যাসের 'মা' চরিত্রটির কথা তুললাম। বললামঃ এই মা ছিলেন একজন খাঁটি সন্তানবৎসল জননী। যেমন আমার রুম হোস্টেস আনা মাস্‌লিনা এঁদের একজন। আনাকে দেখেই আমার মনে পড়লো গর্কির 'মাদার'-এর কথা। রুশ দেশের প্রৌঢ়ারা সত্যি-সত্যি অসাধারণ। তাঁদের বুক জুড়ে আছে ছোটদের জন্যে অপার স্নেহ এবং মমতা।

মাস্‌লিনার কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন তাঁরা। পাবলভ ববলেনঃ এরকম মায়েদের তুমি দেখতে পাবে হোটেল রাশিয়ার সব উইংয়ে। দেখতে পাবে সান্ত পিতারবুর্গে, গর্কি শহরে, তাসকন্দ-সমরকন্দ-আলমা আতায়। দেখতে পাবে স্তালিনগ্রাদ এবং প্রায় সব শহরেই। এঁরা জাদুঘর পাহারা দিচ্ছেন। পাহারা দিচ্ছেন স্কুল-কলেজ, ইউনিভার্সিটির ছাত্রাবাস, বিজ্ঞানাগার আর পার্কের উদ্যানগুলো। এঁদের মতন করিৎকর্মা যেমন নেই, তেমনি এঁরা কোমল এবং কঠোর। যারা ঢেপোমি করে তাদের এঁরা আশ্রয় দেন স্নেহের ছায়াতলে।

প্রৌঢ়াদের হোটেল-রেস্তোরা-জাদুঘর, শিক্ষায়তন এবং পার্ক ইত্যাদিতে নিয়োগের ব্যাপারে আমার একটা ঔৎসুক্য ছিল। জিজ্ঞেস করলামঃ তোমরা বেছে বেছে প্রৌঢ়া এবং বৃদ্ধাদের এসব জায়গায় নিয়োগ করছো কেন? তোমাদের কী শিক্ষিত তরুণী এবং যুবকের অভাব?

আমার কথা শুনে মুচ্‌কে হাসলেন তিনি। বললেনঃ তুমি এর ভেদ জানো না। আমাদের প্রকাশিত পরিসংখ্যান বইতে পড়োন কিছু? বললাম ঃ বইটি আমার হাতে থাকলেও এখনও পাতা ওল্টানোর সুযোগ পাইনি।

তিনি বললেনঃ বেশ, শোনো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্ষতি আমরা এই ত্রিশ বছরেও পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারিনি। যুদ্ধ ঠেকাতে আর নাজিদের ওপর পাল্টা আক্রমণ দিতে গিয়ে আমাদের হারাতে হয়েছিলো প্রায় আড়াই কোটি লোক। এর ভেতর দুই কোটি ছিলো লালফৌজ, স্বেচ্ছাসেবক, গেরিলা আর প্রতিরোধ বাহিনীর পুরুষ সদস্য। বিভিন্ন স্তরের প্রায় ত্রিশ লাখ নারী সেনাকেও দিতে হয়েছিলো প্রাণ।

কথা প্রসঙ্গে তিনি আরও বললেনঃ যুদ্ধের আগে এ দেশের নারী-পুরুষ ছিলো প্রায় সমান-সমান। যুদ্ধের পর কমে গেলো দুই কোটি পুরুষ। এখন অর্থাৎ এই পঁচাত্তর সালে এ দেশের মোট জনসংখ্যা পঁচিশ কোটি। এর ভেতর তেরো কোটি ত্রিশ লাখ মহিলা। আর এগারো কোটি সত্তর লাখ পুরুষ। সংখ্যা-বৈষম্য আস্তে আস্তে কমে এলেও এখন পর্যন্ত মহিলার সংখ্যা এক কোটি আশি লাখ বেশি। আবার এঁদের মধ্যে প্রৌঢ়া এবং বৃদ্ধারা সংখ্যগরিষ্ঠ। এর জন্যেই এঁদের আমরা স্বাস্থ্য, শিক্ষা আর কাজের যোগ্যতা দেখে এঁদের নিয়োগ করি দায়িত্বপূর্ণ কাজে।

আমার প্রশ্নের জবাবে ফের বললেনঃ তোমাদের দেশের মতন এ দেশে আমরা বয়সের মাপে কাউকে অবসর নিতে দেই না। কারণ এটা সমাজতান্ত্রিক দেশ। এখানে চাকরিতে সব বয়সের লোকেরই সমান অধিকার। তাছাড়া আমাদের বৃদ্ধ

www.pathagar.com

নারী এবং পুরুষেরা শরীরে বল থাকতে বেকার-ভাতা খেতে ঘৃণাবোধ করেন। তাঁরা স্বাস্থ্য থাকতে বেকার-ভাতায় বাঁচতে বোধ করেন রীতিমত অপমান। তাছাড়া শোনো, আমাদের প্রবীণারা কাজে-কর্মে খুব পাকা এবং অসাধারণ দায়িত্বশীল।

আমি হেসে বললামঃ অনেক ধন্যবাদ তোমায় বন্ধু। আমার মনের ধাঁধাটা এবার সত্যি-সত্যি ঘুচলো।

কথায়-কথায় উঠলো এবার গর্কির 'মাই বয়হুড' বইটির প্রসংগ। আমি বললাম ঃ অমন বই আর হয় না। আশ্চর্য বিশ্বস্ততার সঙ্গে গর্কি খোলামেলাভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর শৈশব জীবনের ঘটনাবলী। এড়িয়ে যাননি কোন কিছু। গোটা ছোটবেলাটাকেই খুঁটে-খুঁটে তুলে ধরেছেন। নিঝ্নি শহরের মেলা থেকে খেলনা কেনার আনন্দের দিনগুলোসমেত ভল্গা নদীর মাল্লা হওয়ার সময় পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাই উঠে এসেছে তাঁর শৈশবের স্মৃতিকথায়। আমার বিস্ময় লাগে একটা অপরিচ্ছন্ন, নোংরা শ্রমিক বস্তি থেকে বারো বছর বয়সে বেরিয়ে এসে মাত্র ত্রিশ বছরের মাথায় এই লোকটি কেমন করে বিশ্ববরেণ্য সাহিত্যিকের খ্যাতি অর্জন করলেন ?

লেখক বন্ধুটি বললেনঃ গর্কির জন্য গর্ব করে আমাদের পঁচিশ কোটি নরনারী। তিনি আমাদের অহংকার। আমাদের শ্রেষ্ঠতম মনীষী-পুরুষ তিনি। তার জন্যেই তো তাঁর ছোটবেলার শহরের নাম পাল্টে আমরা রেখেছি 'গর্কি সিটি'।

গাড়ির চলা আর কতখানি দূরে গিয়ে শেষ হবে? জানতে চাইলে ইয়াকভ বললেনঃ এখনও গর্কি স্ট্রিটের মাঝপথে আছি আমরা। দেখতেই তো পাচ্ছো সড়কটা অনেক লম্বা। মস্কোর সবচেয়ে ব্যস্ত আর দীর্ঘ রোড এটি। গর্কির মতন অমন একজন বিশ্ববিশ্রুত লেখকের নামফলক যার গায়ে অংকিত, সেকি ছোটখাটো কিছু হতে পারে? কথাটা বলবার সময় ঝকমক করছিলো ইয়াকভের দুই চোখ।

নভোস্তি প্রেস এজেন্সির একজন সিনিয়র সাংবাদিক ইয়াকভ। তাছাড়া একজন খ্যাতনামা আধুনিক লেখকও। তাঁর দেশ কাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিম পারের পুরনো অস্ত্রাখান শহরে। ভল্গা নদীর মোহনার কাছাকাছি।

এই অস্ত্রাখানেরই সাবেকি আমলের শ্যাওলাগড়া একটি বাড়ির গুপচি ঘরে বাস করতেন গর্কির বাবা-মা। বাড়িটি ছিল দোতলা। নিচের কুঠরিতে থাকত দু'জন পার্সি। কাস্পিয়ান সাগরের ওপরের লোক এরা। দু'জনেরই চিবুক জুড়ে ছিল লালচে দাড়ি। মেহ্দি পাতার রস দিয়ে দাড়ির রং অমন ফিকে লাল করা হয়েছিলো। এদের দাড়ির রং কেমন একটা রহস্য জাগাতো শিশু ম্যাক্সিমভিচের মনে।

এই নামটা গর্কি পেয়েছিলেন তাঁর বাবার পৈতৃক পদবি থেকে। তাঁর বাবার পুরো নাম ছিল আলেক্সেই ম্যাকসিমভিচ পেশকভ্। মাঝখানে আরেকটি বিশেষণ ছিল সাভাতিয়েনিস। পেশকভ্ তাঁদের বংশগত উপাধি। পেশায় একজন ছুতোর ছিলেন আলেকসেই পেশকভ্। বড় সহজ-সরল, শান্ত স্বভাবের মানুষ ছিলেন আলেকসেই। নিচুতলার সেই লোক দুটোও ছিলো গোবেচারা ধরনের। তাদের একজনের ছিল ভেড়ার চামড়ার কারবার। সংগের লোকটিও টুকটাক্ ব্যবসা করত।

www.pathagar.com

তারা ছিল জরথস্রুর ধর্মমতের লোক। অস্ত্রাখানে সেকালে পারসিকদের কয়েকটি অগ্নিমন্দির ছিলো। সেখানে জ্বলতো খনিজ তেলের অনির্বাণ শিখা। সেই শিখা সামনে রেখে এরা উপাসনা করত অগ্নিদেবতার।

মনের ক্যান্‌ভাসে এসব স্মৃতিকথা আঁকা ছিলো গর্কির। মা ভারভারা ভাসিলিয়েভনা'র দুঃখময় জীবনের কথাও ভুলতে পারেননি তিনি। অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিলো ভারভারার। কম কথা বলতেন কাশিরিন বংশের এই অল্পবয়সী মহিলা। মেজাজ ছিলো তাঁর বেশ কড়া। কিন্তু কোনরকম অন্যায় বরদাশ্‌ত করতে পারতেন না। খাপছাড়া কিছু করলে বাবা-মা আর ভাইদেরও শাসাতেন। তবে ছেলে ম্যাক্‌সিমকে খানিকটা কড়া শাসনে রাখলেও মাতৃস্নেহের ছায়ায় গড়ে তুলতে চেষ্টার ক্রটি করেননি।

দাম্পত্য জীবনে গর্কির মা-বাবা দু'জনই ছিলেন সুখী। মা ভারভারা ভালবেসে বিয়ে করেছিলো আলেক্‌সেই পেশকভ্‌কে। দু'জনকে কখনও ঝগড়া করতে দ্যাখেনি ম্যাক্‌সিম। অল্পবয়সে বাবা মারা যাওয়ার পরই বিধবা যুবতী ভারভারার জীবনে নেমে আসে দুর্গতি। বাবা যখন মারা গেলেন পঁয়ত্রিশ বছরও পুরো হয়নি তাঁর বয়স। তাছাড়া ভল্গার দক্ষিণের দরিদ্র পেশকভ্‌ বংশের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়েতে সায় ছিলো না গর্কির নানা কাশিরিনের। তাঁরা ছিলেন নদীর উজানের দেশের লোক। ভাটির দেশের লোকেদের তাঁরা দেখতেন ঘেন্নার চোখে। যেমন উজান এবং ভাটির আচার-আচরণ নিয়ে কম ব্যবধান নেই আমাদের দেশেও।

তাছাড়া সাংঘাতিক বদমেজাজি ছিলেন ম্যাক্‌সিমের নানা বুড়ো কাশিরিন। সব কিছুতেই খুঁত-খুঁত করতেন। ছেলেরা বিবাহিত হলেও, তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন ওরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-ফাসাদ করলে। বাড়িতে কোনো জিনিসপত্র ভাঙা-চোরা করলে কিংবা পড়াশোনায় অমনোযোগী হলে নাতিদেরও পেটাতেন। হাত-পা বেঁধে তাদের বেতানো হত। পিটুনি খেয়ে ছোটরা দু-চারদিন বিছানা থেকে উঠতে পারতো না।

একবার গর্কিকেও সাত-আট বছর বয়সে এই বদরোখা নানার হাতে বেদম পিটুনি খেয়ে দিন কয়েক বিছানায় পড়ে থাকতে হয়েছিল। আলেকসেই'র ছেলে বলে ছোট ম্যাক্‌সিমকে দেখতে পারতেন না বুড়ো। তাছাড়া সময়-সময় মেজাজটা ভালো হলেও তিনি ছিলেন ভীষণ সন্দেহপ্রবণ। আবার অতিমাত্রায় ছিলেন বৈষয়িক। এর জন্যে ম্যাক্‌সিম নানাকে কখনও ভালবাসতে পারেননি।

একদিন শুধু নানার ব্যবহারে খুশি হয়েছিলো ম্যাক্‌সিম। সেবার একটা দুষ্টুমির জন্যে কঠিন সাজা দিয়েছিলেন নানা। মা এসে বুড়োর মুখোমুখি হলেন। নানা ইভানোভনা রুখতে চাইলেন স্বামীকে। মা ভারভারা চোখ রাঙিয়ে বাবাকে বললেন ঃ আমার বাপ-মরা ছেলের গায়ে হাত দিলে তোমার বারোটা বাজিয়ে ছাড়বো, হুঁ'। বাবা মেয়েকে ভয় করে চলতেন। তখনকার মত নিরস্ত হলেও সুযোগ বুঝে বুড়ো রাতের বেলা ম্যাক্‌সিমকে কাছে পেয়ে গেলেন। হাত-পা বেঁধে ছোট্ট ছেলেটিকে

www.pathagar.com

বেদম পেটালেন। এই আঘাতে দিন সাতেক শয্যাশায়ী থাকতে হল ম্যাকসিমকে। কম সাহসী আর ডানপিটে ছিলো না বুড়োর বিধবা মেয়ের ঘরের এই নাতি। মার খাওয়ার পর সেও প্রতিজ্ঞা করল সুযোগ পেলেই বুড়োকে এক হাত দেখিয়ে নেবে। কিংবা আরেকটু বয়স বাড়লে চৌদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার করবে কাশিরিনের।

রেড স্কয়ারের ক্রেমলিন দুর্গ

মনে মনে গজরাচ্ছিলো ম্যাক্সিম। বিছানায় শুয়ে থেকে আঁটছিলো পাল্টা শাস্তি দেয়ার পরিকল্পনা। এ সময় হঠাৎ কয়েকটি চিনির ঘোড়ার খাবার খেলনা নিয়ে হাজির বুড়ো। এদিক-ওদিক তাকিয়ে নরম সুরে বললোঃ তোর বুঝি খুব লেগেছে নানুভাই? দ্যাখ, আজকাল আমার মেজাজের ঠিক থাকে নারে ভাইয়া। আমি বুড়ো হয়েছি দেখে সম্পত্তি বেঁচে দেবার জন্য ওঁত পেতে আছে তোর দুই মামা। ওই বদের হাড্ডি মিখাইল আর ইয়াকভ্। রাতদিন মার্মার-কাট্কাট্ করে ওরা। এর মধ্যে কী মেজাজ ঠিক রাখা যায় রে?

বুড়োরর এই আকস্মিক ভদ্রমানুষিতে মন গলে ম্যাক্সিমের। নানাকে শায়েস্তা করবার কথা ভুলে গেলো সে। আসলে নানার কথাই ঠিক। এ বাড়িতে কোন শান্তি নেই। সবসময় ভাইয়ে-ভাইয়ে লেগেই আছে ঝগড়াঝাটি। একান্নবর্তি পরিবার এটি। কাপড় রং করবার ব্যবসা নানার। তিনজন কারিগর বড় বড় গামলায় সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে লাল-নীল-সবুজ রঙের গুঁড়ো মিশিয়ে সাদা কাপড় রঙিন করে। বাড়ির উঠোনে হয় সব কাজ। দড়ি টাঙিয়ে শুকনো হয় ভেজা কাপড়ের থান্। কাদায়-পানিতে থক্ থক্ করে বাড়ির আঙিনা। আর দুই ছেলে ফুলবাবু সেজে ঘুরে বেড়ায় নিঝ্নি শহরে।

www.pathagar.com

কারিগরদের ভেতর সবচেয়ে ম্যাক্সিমের ভালো লাগতো বুড়ো গ্রেগরিকে। লোকটি ফাঁক পেলেই গল্প করতো ম্যাক্সিমের সংগে। বলেঃ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে আছি আমি তোমার নানা কাশিরিনের সংগে। যখন তার অবস্থা খারাপ ছিলো তখনো ছিলাম। আর এখন তার সম্পন্ন অবস্থায়ও আছি। অনেক কিছু দেখলাম আমি এ-সংসারে। এখানে সবাই খারাপ। মিখাইল আর ইয়াকভ তো একেকটা আস্ত শয়তান। এ বাড়িতে একজনই আছেন ভালো মানুষ। তোমার নানী আকুলিনা ইভানোভনা কাশিরিনা। দেবীতুল্য তাঁর চরিত্র। সবার জন্যে ওঁরা মনে দয়া। মাতা ম্যারির মতন মমতাময়ী। যীশুর অমন অনুরাগিনী রুশ সমাজে খুব কমই তুমি দেখতে পাবে।

গ্রেগরির গল্পের সময় হুঁ-হাঁ করে মাথা নাড়ে ম্যাক্সিম। জবাবে বলেঃ সত্যি বলেছো তুমি দাদু। নানীর জন্যেই তো বাবা মরবার পর অস্ত্রাখানের বাড়ি ছেড়ে বিধবা মা আর আমাকে আসতে হলো নানার এই বিষাক্ত সংসারে। নানী প্রাণ দিয়ে মাকে ভালোবাসেন। আর আমাকেও। মায়ের কষ্ট বোঝেন তিনি। আর আমাকেও পেলেপুষে মানুষ করতে চান। কিছুতেই দু'চোখের আড়াল করতে চান না। আর আমার মামী নাতালিয়া? তাঁকেও আমার খুব ভালো লাগে। নিজের সন্তানের মতনই আমাকে ভালোবাসেন। কেমন কোলের কাছে রেখে বর্ণমালা শেখাচ্ছেন আমায়। সুন্দর সুন্দর ছড়া শেখাচ্ছেন। মায়ের সংগে ইয়াকভ মামার এই লক্ষ্মী বউটির খুব ভাব।

বুড়ো গ্রেগরি মাথা নেড়ে সায় দেয়। বলেঃ ঠিক বলেছো ভাই। একটা ভালো মেয়ে নাতালিয়া। তবে একটা কথা তোমায় বলে রাখি-তোমাদের ভাটির দেশের পেশকভ বংশের সংগে উজানের নাকউঁচু কাশিরিনদের কখনো মিল হবে না। আমি জানি, একদিন তোমাকে এ বাড়ি ছাড়তেই হবে।

ম্যাক্সিম বললোঃ আমার দাদা-দাদী কিংবা নিকট আত্মীয় কেউ থাকলে আমার মা অস্ত্রাখানেই মাটি আঁকড়ে থাকতেন। আমিও কখনো এখানে আসতাম না।

একটু শ্বাস নিয়ে ম্যাকসিম বললোঃ মায়ের কাছে শুনেছি নিঝনি শহরের বিদঘুটে এ বাড়িতেই আমার জন্ম। বছর দুয়েক বয়সের সময় আমায় কোলে নিয়ে তিনি বাবার সংগে চলে যান অস্ত্রাখানে। সেখানে আমি বেড়ে উঠতে লাগলাম। আমার সাত বছর পেরুতে-না-পেরুতেই মাত্র দিন কয়েকের অসুখে পড়ে বাবা মারা গেলেন। আমার চোখের সামনেই ঘটনাটা ঘটলো। বাবাকে সাদা কাফনে জড়িয়ে আমাদের ঘুপচি ঘরের মেঝেতে শুইয়ে রাখা হলো। মায়ের পেটে ছিলো তখন বাচ্চা। বাবার লাশ ধরে সে-কী কান্না মায়ের। তিনি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে বিলাপ করতে থাকলেন। আবার উঠে দাঁড়িয়ে চিরুনি দিয়ে বাবার নিশ্চল মাথার চুলগুলি আঁচড়ে দিতে থাকলেন পরম আদরে।

ফের দম নিয়ে ম্যাক্সিম বলতে থাকলোঃ মায়ের অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খবর পেয়েই নানী গিয়েছিলেন আমাদের বাড়ি। আমাকে দেখেই কোলে তুলে নিলেন। চুমুর পর চুমু খেলেন মুখে। কেমন করে জাহাজে চেপে ভল্গার হাজার মাইল পথ ভেসে এসেছিলেন সেই গল্প বললেন নানান রং চড়িয়ে। তিনি আমাকে আদর করে

www.pathagar.com

আলিওশা বলে ডাকতেন। আমার পাশে শুয়ে থেকে রুশ রূপকথার গল্প বলতেন। শোনাতেন দস্যি রাজকুমারী গালিচেভার গল্প। শোনাতেন বীরযোদ্ধা আইভান, জ্ঞানের পরী ভাসিলিসি, সৃষ্টিকর্তার সেবক আলেকসেইয়ের কাহিনী। অনেক ছড়া আর কবিতাও শুয়ে-শুয়ে শোনাতেন তিনি আমায়। নানী শুধু নানাকেই নয়, শয়তানকেও ভয় পান না। শুধু ভয় করেন একটা প্রাণীকে।

গ্রেগরি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলোঃ কী সেই প্রাণী! কোনো নেকড়ে বাঘ নয় তো?

ম্যাকসিম হেসে জবাব দিয়েছিলো ঃ না, ওসব কিছু না। শুধু আরশুলা! দু-জনই তারা হো-হো করে হাসলো।

এরপর হঠাৎ দমে গেলো ম্যাক্‌সিম। দীর্ঘশ্বাস টেনে বললোঃ নানীর সামনেই পড়ে থাকলো আমার বাবার লাশ। বাবাকে খুব স্নেহ করতেন তিনি। মেয়ে-জামাইয়ের মরা মুখ দেখে আর্তচিৎকারে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুললেন নানী। তাঁর চিৎকারের মধ্যেই মা'র গলা শোনা গেলোঃ আলেকসেইকে বাইরে যেতে বলো মা। দরজা বন্ধ করে দাও। আমি তখন ঘরের এক কোণে আতংকিত চোখে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ভয় আমার চোখে পানি ঝরাতে পারেনি। একুট পরেই অন্ধকারে শুনতে পেলাম একটি শিশুর কান্না। নানী চেঁচিয়ে বললেনঃ ছেলে হয়েছে গো!

গ্রেগরি আগ্রহ আর দুঃখ ভরা হৃদয় নিয়ে শুনছিলো আট বছরের ম্যাক্‌সিমের কথা।

'এরপর কী হলো ভাই?' বললো সে।

ম্যাক্‌সিম বললোঃ সেদিন গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছিলো। বৃষ্টির মধ্যেই বাবার কফিন নিয়ে যাওয়া হলো গির্জার পাশের গোরস্তানে। শহর থেকে এলো একজন পুলিশ। তার সাথে ছিলো দুজন কৃষক। তারা গোরস্তানের এক প্রান্তে একটি উঁচু ঢিবিতে কবর খুঁড়লো। পানিতে ভরে গিয়েছিলো গর্তের ভেতরটা। কফিন নিচে নামানো হলে দুটো ব্যাঙ লাফালাফি করছিলো তার ওপর। পুলিশের হুকুমে ওদের সুদ্ধ মাটি চাপা দেয়া হলো বাবাকে। আমি, নানী আর সদ্যপ্রসূতা আমার মা-এই তিনজন ছিলাম আমরা সেখানে। বোধকরি বাবার শোক সামলাতে না-পেরে মা অকাল-প্রসব করেছিলেন।

'তারপর কী হলো' গ্রেগরির প্রশ্ন।

ঃ সেই ব্যাঙ দুটোর জন্যে আমার খুব কষ্ট হয়েছিলো। নানীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ওরা কী আর গর্ত থেকে উঠতে পারবে না? নানী আমার উৎকণ্ঠা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, বিধাতা তোমার মঙ্গল করুন আলিওশা। প্রাণীদের জন্যেও এত দয়া তোমার প্রাণে! ব্যাঙ দুটো উঠতে না পারলেও দয়াময় প্রভু ওদের দেখবেন।

গ্রেগরি বললোঃ তিনি ঠিকই বলেছেন ভাই।

ম্যাক্‌সিম বললোঃ বাবার মৃত্যুর দিন কয়েক বাদে নানী আমাদের নিয়ে ভল্গার জাহাজে চাপলেন। আমরা ছিলাম একটি ক্যাবিনে। মা আমার শিশু ভাইটিকে কোলে নিয়ে লটবহরের ওপর বসে থাকলেন। আমি আর নানী জাহাজের পাটাতনে

www.pathagar.com

গেলাম। নানী আমাকে শোনাতে লাগলেন নানান রকমের গল্প। ভল্গার দুই পার আমার চোখে মুগ্ধতা আনলো। দুই পারেই ছিলো অসংখ্য বনবাদাড়, ক্ষেতখামার, শহর-গঞ্জ আর গ্রাম। সেই প্রথম বিশাল নদীটাকে দেখলাম। পথেই কিন্তু মায়ের কোলে ভাইটি মারা গেলো আমার। এক শহরের ঘাটে জাহাজ থামতেই সেখানে আমার মায়ের চেনা এক নাবিক শিশুটিকে কবর দিয়ে এলো। তুমি তো জানোই তার পর থেকে আমরা এখানে। নানা, দুই মামা, মামী নাতালিয়া আর এ বাড়ির ছেলেমেয়েরা নৌকোয় করে আমাদের নিঝ্নির ঘাটে ওঠালেন। কত জাহাজ, বজরা আর নৌকার ভিড় দেখলাম বন্দরে। এই ভিড়ের জন্যেই জাহাজটা মাঝ গাঙে নোঙর করেছিলো।

ঃ শোনো, হঠাৎ বলে উঠলো ম্যাক্সিম। আমার নানা সেদিন আমাকে বেতানোর পর শয্যাশায়ী দেখে খুব দুঃখ পেয়েছিলেন। নরম গলায় শুনিয়েছিলেন আমাকে তার ছোটবেলার গল্প। বলেছিলেন, ভালুদাই পাহাড়ের অনেক উঁচুতে নাকি ভল্গার জন্ম। সোয়া দু-হাজার মাইল লম্বা নাকি এই নদী। কালিনিন আর মস্কোর তল্লাট হয়ে এঁকে- বেঁকে চলে গেছে অস্ত্রাখানের দিকে। যৌবনকালে এই নদীতে গুনটানা মাল্লার কাজ করতেন নানা। মাসের পর মাস মালবোঝাই নৌকোর গুন টেনে বন্দরে-বন্দরে এসে দু-একদিন জিরোতেন। এভাবে তিন বছর কঠোর শ্রমের পর হলেন নৌকোর মাঝি। এ সময় ভাগ্য বদলাতে লাগলো নানার। নিঝ্নিতে এসে এই বাড়ি কিনলেন। ব্যবসা শুরু করলেন।

গ্রেগরি বললোঃ সেই থেকে আমি আছি তোমার নানার সংগে। আমার কাজে ফাঁকি নেই। তার জন্যেই তিনি এত খাতির করেন আমায়। এই বুড়ো ছিলো ছোট বেলায় গর্কির প্রিয় মানুষ। মা এবং মায়ের কাছে শিশুপাঠ শেখার পর গর্কিকে ভর্তি করে দেয়া হলো নিঝ্নির এক গির্জা স্কুলে। বেশ মেধাবী ছাত্র ছিলেন গর্কি। রচনা করতে পারতেন ছন্দোবদ্ধ কবিতা। শিশুতোষ কবিতার এক স্তবকের সংগে নতুন আরেক স্তবক মুখে-মুখে বানিয়ে আওড়াতেন।

মামারা আলাদা হয়ে গেলে আর অন্য এক লোকের সংগে মায়ের বিয়ে হলে পর বারো বছর বয়সে ছাড়লেন তিনি নানার বাড়ি। শুরু হলো তাঁর ভল্গায় গুনটানা মাল্লার জীবন। ক্ষেত মজুরের জীবন। আশির দশকের দুর্ভিক্ষের সময় ক্ষুধার্ত কৃষকদের সংগে ইউক্রেন, ক্রিমিয়া এবং ককেশাস গেলেন। রুটির দোকানে কাজ করলেন। কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে লেনিনের নেতৃত্বে ছাত্র বিক্ষোভের সময়গুলো খেয়েও অল্পের জন্যে বেঁচে গেলেন। ফুস্ফুসের পাশ দিয়ে বুলেটটি বেরিয়ে গিয়েছিলো চামড়া ভেদ করে।

এই দুর্ঘটনায় বিয়োগান্ত ঘটনা ঘটলে বিশ্ব আর মুখ দেখতো না অমর কথাশিল্পী ম্যাকসিম গর্কির। 'গর্কি' ছদ্মনামে চব্বিশ বছর বয়সে লেখা শুরু করলেন তিনি কাজানের এক সাপ্তাহিক পত্রিকায়। 'গর্কি' কথাটার রুশ মানে 'তিক্তপ্রাণ'। ম্যাক্সিম গর্কি কথাটার মানে তিক্তপ্রাণ অথবা পোড়খাওয়া ম্যাক্সিম। কাজানের এই কাগজেরই

www.pathagar.com

এক মহিলা সাংবাদিকের সংগে বিয়ে হলো তাঁর।

আসলে শৈশব থেকে প্রতিষ্ঠাকাল পর্যন্ত তিক্ততাই ছিলো তাঁর জীবনের নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা। তবে সারাজীবন কৃষক-মজদুর আর সাধারণ মানুষের অগাধ ভালোবাসা পেয়েছিলেন। ১৯২৩ সালে লেনিনের অনুরোধে যক্ষ্মার চিকিৎসার জন্যে জার্মানি এবং ইতালি গেলেন তিনি। লেনিনের সংগে ছিলো তাঁর গভীর অন্তরঙ্গতা। ১৯২৫ সালে বিদেশ থেকে মস্কো ফিরে এলে পর রেডস্কোয়ারে তাঁকে দেয়া হলো এক বিশাল গণসংবর্ধনা।

গাড়িতে বসে গর্কির লেখা 'আমার ছোটবেলার' স্মৃতি আওড়াতে থাকলে এক সময় ইয়াকভ্ বললেনঃ শোনো বন্ধু, মস্কোর ইতিহাসে খুব কম নেতাই গর্কির মতন অমন বিপুল গণসংবর্ধনা পেয়েছিলেন। আমার গর্ব হলো আধুনিক রুশ সাহিত্যের এই মহান নির্মাতার ছোটবেলার কয়েক বছর কেটেছিলো আমার শহর অস্ত্রাখানে। সেখানে ওই গোরস্তানে এখনো তাঁর বাবা আলেকসেই পেশক্ভ শায়িত।

এ সময় আমরা পুশকিন স্ট্রিটের কাছাকাছি এসে গিয়েছিলাম। আমার পাশের খোলা জানালা দিয়ে মস্কো নদী নাকি মস্কো খালের এক ঝাপটা ঠান্ডা বাতাস এসে লাগলো আমার মুখে। মস্কো খালের সংগে আছে ভল্গা নদীর সংযোগ। এটি কাটানো হয়েছিলো বিপ্লবের পর। ১৯৩৬ সালে। বড় বড় জাহাজ চলাচল করে এই খাল দিয়ে।

সাংবাদিক জীবনের কথা লিখছিলাম। লিখছিলাম তাদের কথা যাদের সংগে ওঠা-বসা করেছি। এক টেবিলে বসে কাজ করেছি। আবার তাঁদেরও ভুলতে পারিনি যাঁরা দূরে থেকেও কাছে এসেছেন। ভালোবাসার ছোঁয়া আর স্নিগ্ধতার সৌরভ দিয়েছেন আমার কাতর মনটাকে। কেমন করে তাঁদের বিস্মৃত হতে পারি যাঁরা পথে দেখা হলেই সামনে এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিতেন। কুশল-সংবাদ জিজ্ঞেস করতেন। বলতেনঃ শরীরটাকে ঠিক রাখো। খাটুনি কমিয়ে দাও। একটু বিশ্রাম নাও, সকাল-বিকেল হাঁটাহাঁটি করো। শরীর ঠিক থাকলেই আরো কিছুকাল আশা করতে পারো বেঁচে-বর্তে থাকবার।

বলতেনঃ এ দুর্ভাগা দেশে প্রতিভার দাম নেই হে। কলমপেটার তো কোন কদরই নেই। দাম থাকলে আছে তেলমর্দনের। তেল যদি বেশি মাখতে পারো, হাঁ-হুজুর হাঁ- হুজুর করতে পারো তা হলেই খুশি প্রভুমহাজনেরা। হাসিতে তাঁরা তখন বিগলিত করুণা। আর শনৈ-শনৈ উন্নতি গোপাল ভাঁড় কিংবা মোল্লা দো-পেঁয়াজাদের। কিন্তু তোমরা যারা কাজে বিশ্বাস করো অমন চাটুকার তো হতে পারবে না কখনো। সুতরাং তোমাদের কেবল খেটেই মরতে হবে। বাড়ি হবে না, গাড়ি হবে না। বুড়ো বয়সেও সীমা থাকবে না দুর্ভোগের। সুতরাং স্বাস্থ্যটাকে ঠিক রাখো। ওইটুকুই তো লড়াকু মানুষের একমাত্র মূলধন।

অভিভাবকের মতন এরকম যাঁরা উপদেশ দিতেন তাঁদের প্রায় সবাই এখন ওপারে। দু-চারজন আছেন তাঁদের একজন ছিলেন শওকত ভাই। প্রখ্যাত কথাশিল্পী শওকত ওসমান। তাঁর কথার ধরনই ছিলো এরকম। তিনি চাটুকার, ভাঁড় আর পা-

www.pathagar.com

চাটা লোকদের দেখতে পারতেন না মোটেও। ধর্মের নামে ভণ্ডামি ছিলো তাঁর দু-চোখের কাঁটা। তাঁকে অনেকেই ভুল বুঝে থাকনে। আসলে ভেতরটা ছিলো তাঁর পরিষ্কার। যাঁরা খাঁটি ধার্মিক আর উদারচেতা তাঁদের অনেকেই ছিলো তাঁর বন্ধু। যেমন আলিয়া মাদ্রাসার পরলোকগত প্রফেসর মওলানা মুস্তাফিজুর রহমান, মওলানা জালালুদ্দিন প্রমুখ। মওলানা মুস্তাফিজ ছিলেন দৈনিক আজাদ-এর নিয়মিত লেখক। ধর্মীয় উৎসবাদির ওপর লেখা ছাড়াও ইসলামের দর্শন, বিজ্ঞান, ভূগোল-ইতিহাস, চিকিৎসা শাস্ত্র, মুক্ত চিন্তাধারা ইত্যাদির ওপরও তিনি লিখতেন। মওলানা মুস্তাফিজ ছিলেন একজন ধর্মশাস্ত্র বিশারদ উদারচেতা পণ্ডিত। শওকত ওসমানের সমসাময়িক ছিলেন।

শওকত ভাই আজাদ, মাসিক মোহাম্মদী, মাসিক সওগাত এবং অন্যান্য কাগজে ছোটগল্প লিখতে শুরু করেন চল্লিশ দশকের মাঝামাঝি সময়ের দিকে। তখন এই কাগজগুলো ছিলো কলকাতায়। এক সময় শওকত ওসমান হুগলি মাদ্রাসায় পড়তেন। তাঁর ভাষা বেশ আধুনিক হলেও বোধকরি এ কারণেই তাঁর শব্দাবলীতে আরবি-ফারসির সুনিপুণ প্রয়োগ দেখা যায়। ঢাকার একটি প্রথম শ্রেণীর বাংলা দৈনিকে বেশ কিছুকাল ধরে একটি কলাম লিখতেন তিনি। এটির শিরোনামা ছিলো 'রাহ্‌নামা' অর্থাৎ 'পথ চলবার কাহিনী'। ১৯৬০ সালে মাত্র একচল্লিশ বছর বয়সে আজিমপুর কলোনির সরকারি বাসায় নিঃসঙ্গ অবস্থায় মারা গেলেন শওকত ওসমানের অন্তরঙ্গ বন্ধু মওলানা মুস্তাফিজ। বন্ধুর মৃত্যুতে নিদারুণ মর্মাহত হয়েছিলেন শওকত ভাই।

মওলানা মুস্তাফিজুর রহমানঃ জীবন ও সাহিত্য 'শিরোনামে একটি সংকলন বেরিয়েছে বছর পাঁচেক হলো। এটি সম্পাদনা করেছেন মওলানার ভাগ্নে তরুণ লেখক মকসুদুর রহমান। কবি সুফিয়া কামাল, ডক্টর আবদুল কাদের, সৈয়দ আলী আহ্‌সান, কবি আল মাহমুদ, কবি আবদুর রশীদ খান, কবি আবদুস সাত্তারসহ আমরা অনেকেই এতে স্মৃতিচারণ করেছি পরলোকগত লেখকের। কিন্তু শওকত ওসমান মনে খুব কষ্ট পেয়েছেন কেন তাঁকে বলা হলো না সংকলনে তাঁর স্মৃতিমূলক লেখা দেয়ার জন্যে। বছরখানেক আগে ঢাকার একটি দৈনিকে সংকলনটির ওপর একটি আলোচনা পড়ে তিনি খুঁজে বের করেছেন গ্রন্থ সম্পাদকের ঠিকানা। তাঁকে অভিযুক্ত করেছেন কেন লেখার জন্যে তাঁর কাছে তিনি আসেননি। পরে তাঁর 'রাহ্‌নামা' কলাম বিশদ আলোচনা করেছেন তিনি মুস্তাফিজের লেখালেখি এবং তাঁর উদার চিন্তাধারার ওপর।

শওকত ওসমান কেমন মনের মানুষ ছিলেন এ ঘটনা থেকে তাঁর একটি নিখুঁত পরিচয় পাওয়া যাবে। আসলে পা থেকে মাথা পর্যন্ত তিনি ছিলেন একজন খাঁটি মানবপ্রেমিক কথাশিল্পী। অবসর জীবনে রাজনীতির আবর্তের সংগে জড়িয়ে পড়লেও তার ভেতর হারিয়ে যায়নি সাহিত্যের ভাবুক আর বন্ধুবৎসল মানুষটি।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে আমি থাকতাম পুরানা পল্টনের এক ভাড়াটে বাসায়। শওকত ভাই থাকতেন রাজারবাগ পুলিশ হেড কোয়ার্টারের উত্তর পাশেরকার সড়কের ওপারে তাঁর মোমেনবাগের বাড়িতে। তিনি তখন ঢাকা কলেজে বাংলার

www.pathagar.com

অধ্যাপক। আমি ছিলাম সাবেক দৈনিক পাকিস্তানের তথা পরেকার দৈনিক বাংলায়। ভোরবেলা রোজই হাঁটতে-হাঁটতে তিনি জোনাকি সিনেমা হলের সামনের রাস্তা পর্যন্ত আসতেন। আমিও প্রভাত ফেরিতে বেরুতাম প্রায় একই সময়ে। পথে দেখা হতো আমাদের। তিনি সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে আমার কুশল-সংবাদ জিজ্ঞেস করতেন। নিয়মিত ভোরবেলা হাঁটবার জন্যে তাগিদ দিতেন। বলতেনঃ দু'বেলা হাঁটলে শরীরের ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। শরীর এবং মন দু-ই থাকে ভালো।

মাঝে মাঝে তাঁকে আমার বাসায় নিয়ে আসতাম। টেবিলে চা-নাশ্‌তা সামনে রেখে দেশের হালচাল, রাজনীতি, সাংবাদিকতা-সাহিত্য ইত্যাদি নিয়ে কথা বলতাম। তিনি নিজের মতে অটল থাকতেন। বলতেনঃ আধিপত্যের রাজনীতির অবসান না ঘটলে দেশের মুক্তি আসবে না। কুসংস্কার আর ভণ্ডামি দূর না হলে কোনো দিন মুক্তি আসবে না সাধারণ মানুষের। তারা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকবে। তিনি কাজী নজরুল ইসলামের প্রসংগ টানতেন।

মওলানা আবুল কালাম আজাদ, মওলানা হস্‌রত মোহানি, দেওবন্দ আন্দোলনের নেতা এবং রেশমি রুমাল বিপ্লবের অগ্রনায়ক ওবায়েদউল্লাহ্‌ সিন্ধির কথা বলতেন। তাঁর কথা ছিলো, এঁরা ধর্মশাস্ত্রের পণ্ডিত হয়েও ধর্মীয় রক্ষণশীলতার ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছিলেন। স্বাধীনতার জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন। ওবায়েদউল্লাহ্‌ সিন্ধির সংগে মওলানা বরকতউল্লাহ্‌র উপমাও টানতেন। বলতেনঃ এঁরা দু'জন তো আফগানিস্তান আর ইরান পাড়ি দিয়ে মস্কোতে দেখা করেছিলেন লেনিনের সঙ্গে। শোষণমুক্ত সমাজতন্ত্রের সবক নিয়েছিলেন তাসকন্দে লেনিন প্রতিষ্ঠিত প্রাচ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে। ওবায়েদ্‌উল্লাহ্‌ সিন্ধি একজন মওলানা হয়েও যদি বার্লিনে বসে ১৯২৫ সালে স্বাধীন ভারতের প্রথম সংবিধান রচনা করতে পারেন, কাবুলে বসে অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার গঠন করতে পারেন- তাহলে কেন একালে পিছিয়ে থাকবে আমাদের সমাজ?

নজরুল ইসলামের বিদ্রোহ এবং তাঁর কাব্যাদর্শ সম্পর্কে তাঁর ছিলো পরিচ্ছন্ন ধারণা। তিনি বলতেন, 'নবযুগ' এবং 'ধূমকেতু'-তে কাজী সাহেবই প্রথম স্বাধীন সাংবাদিকতার বলিষ্ঠ দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছিলেন। 'নবযুগে' বৃটিশ সরকারের স্বৈরতান্ত্রিক নীতির বিরুদ্ধে শ্লেষ বর্ষণের জন্যে বাজেয়াপ্ত হয়েছিলো তাঁর কাগজের জামানত। কিন্তু তিনি কী দমে গিয়েছিলেন? পরের বছরই তো বের করলেন অর্ধ সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু'। এবার তাঁর কলম হলো আরো ধারালো, বেশি অনলবর্ষী। বৃটিশ প্রেস অ্যাক্টের কালাকানুন অমান্য করে কাগজের পাতায় প্রথম সরাসরি দাবি তুললেন ভারতের স্বাধীনতার। বললেনঃ নিরাপদ সাংবাদিকতার জন্যে তাঁকে জেলে যেতে হলো। তাঁর কাগজের অফিসে সরকারের তালা ঝুললো। আমরণ অনশন করলেন কারাগারে। মাত্র তেইশ বছরের এক যুবক তখন তিনি। তাঁর ধনুর ভাঙা পণে গোটা জাতি শিউরে উঠলো। অনশন ভাঙার অনুরোধ জানিয়ে হাজার হাজার টেলিগ্রাম গেলো জেলখানায়।

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত নড়ে উঠলেন তারবার্তা পাঠিয়ে নজরুলকে অনুরোধ জানালেনঃ 'স্টপ ইউর হাংগার স্ট্রাইক। আওয়ার লিটারেচার ডিমান্ডস ইউ।' দেখুন তো কত বড় এক স্বীকৃতি। শেষে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলতেনঃ আমরা কী কেউ নজরুল ইসলামের মতন হতে পেরেছি? না হতে পেরেছেন আমাদের কোনো সাংবাদিক, লেখক কিংবা কবি? তিনি 'ধূমকেতু'র প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে পাঠানো রবীন্দ্রনাথের 'ধূমকেতু' নামের শুভেচ্ছা-কবিতাটির আবৃত্তি করলেনঃ 'আয় চলে আয়রে ধূমকেতু, আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু, দুর্দিনের এ দূর্গশিরে উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন! অলক্ষণের তিলকরেখা রাতের ভালে হোক না লেখা, জাগিয়ে দেরে চমক মেরে আছে যারা অর্ধচেতন!'

বাংলা কথা সাহিত্যের দিকপাল শরৎচন্দ্রের শুভেচ্ছা বার্তাটির কথাও স্মরণ করিয়ে দিলেন। বললেনঃ 'ধূমকেতু'র আত্মপ্রকাশ উপলক্ষে কী বলে নজরুল ইসলামকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলেন শরৎবাবু, মনে আছে আপনার? বলেছিলেনঃ আজ একটি মাত্র আশীর্বাদ করি তোমায় যেন শত্রুমিত্র নির্বিশেষে নির্ভয়ে সত্য কথা বলতে পারো।' বিপ্লবী সাংবাদিক নজরুল এই দুই মহামনীষীর আশাভঙ্গ করেননি। জেলখানায় রাজবন্দির জবানবন্দি দিতে গিয়ে ম্যাকসিম গর্কির বিশ্বখ্যাত উপন্যাস 'মাদার'-এর নায়ক কারাবন্দি পাভেলের মতন নজরুল ইসলাম ঘোষণা দিয়েছিলেনঃ 'হে বিচারক, তোমার অনাচারী, সত্যদ্রোহী রাজার অরাজক শাসন মানি না। কী শাস্তি দেবে তুমি আমায়? তোমার মিথ্যা রাজাকে সাজা দেবে শেকল ভাঙার মুক্তিপাগল জনতা।'

পাভেলও একথাই বলেছিলো রাশিয়ার জারের বিচারকমণ্ডলীকে। বলেছেঃ জানি, তোমরা জারের স্বৈরশাসনের যন্ত্র মাত্র। সাধারণের পক্ষে কথা বলেছি বলে তোমরা আমায় সাজা দেবে। আমরা তো আছি ন্যায়ের পক্ষে। ন্যায় কখনো অন্যায়ের কাছে মাথা নোয়ায় না। একদিন রাশিয়ার জাগ্রত গণমানুষ এ অন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে তুলে নেবে ন্যায়ের তেলদন্ড। তখন কোথায় উড়ে যাবে তোমাদের রাজা জারের সিংহাসন? আর কোথায়, কোন্ আবর্জনার স্তূপে নিক্ষিপ্ত হবে বিচারের নামে তোমাদের এই প্রহসন? গণরোষের মুখে তোমরাও ছাই হয়ে যাবে একদিন।

ভোরবেলা হাঁটবার সময়ও এরকম অনেক কথাই শোনাতেন তিনি। বলতেনঃ বাংলা সাংবাদিকতায় বিশ-ত্রিশের দশকেই নতুন যুগের হাওয়া লেগেছে। মুজফ্ফর আহ্মদ সম্পাদিত 'লাঙল' পত্রিকার পুরনো কপিগুলো সংগ্রহ করে পড়ে দেখুন। বিশ দশকের নবীন লেখক গোষ্ঠীর কাগজ 'কল্লোল'- এর সংখ্যাগুলো দেখুন। পড়ে দেখুন ঢাকার মুক্তিবুদ্ধি আন্দোলনের মুখপত্র 'শিখা' পত্রিকার সেকালের সংখ্যাগুলো। যে-কাগজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক আবুল হোসেন। পরে যার সম্পাদক হয়েছিলেন প্রফেসর কাজী মোতাহার হোসেন। আমাদের সাহিত্যেও কী কম আলোড়ন তুলেছে গর্কির উপন্যাস 'মাদার', ডস্টয়ভস্কির দ্য ইনসালটেড এ্যান্ড ইনজিওরড (লাঞ্ছিত-বঞ্চিত), তুর্গেনিভের 'ভার্জিন সয়েল' (অনাবাদি জমি), পুশকিন, লারমনটভ প্রমুখের কবিতা-নাটক, উপন্যাস এবং গল্প ইত্যাদি?

www.pathagar.com

নিঃশব্দে তাঁর কথাগুলো শুনে যেতাম। জানতাম, গর্কির 'মাদার' বাংলায় অনূদিত হয়েছিলো বিশ দশকের শেষে। ত্রিশ দশকেই তুর্গেনিভের ভার্জিন সয়েল অনুবাদ করেছিলেন সাংবাদিক আবুল কালাম শামসুদ্দিন। প্রথম বাংলা সংস্করণটি নাম দিয়েছিলেন 'পোড়ো জমি'। দ্বিতীয় সংস্করণের শিরোনাম দিলেন 'অনাবাদি জমি'। ডস্টয়ভস্কির উপন্যাসের বাংলা সংস্করণের নাম দেয়া হয়েছিলো 'লাঞ্ছিত-বঞ্চিত'।

কখনো কখনো শওকত ভাইয়ের সংগে যেতাম তাঁর মোমেনবাগের বাড়িতে। সেখানেও বৈঠকখানায় ছুটতো তাঁর কথার ফুলঝুরি। আমার ভোরবেলাকার ভ্রমণের আরেকজন সংগী ছিলেন কবি জসীম উদ্‌দীন। তিনি তাঁর কমলাপুরের বাড়ি থেকে এদিকে বেড়াতে আসতেন। পথে দেখা হতো আমার এবং শওকত ভাইয়ের সংগে। তখন জসীম উদ্‌দীনের কাব্যগ্রন্থ 'নকশি কাঁথার মাঠে'র নতুন সংস্করণ ছাপা হচ্ছিলো ইডেন প্রেসে। একবার ইডেন প্রেসে'ফ্রাংলিন বুক প্রোগ্রামস'-এর কয়েকটি অনূদিত গ্রন্থ ছাপানো উপলক্ষে ওখানে গেলে কবিকে দেখলাম তাঁর বইয়ের প্রুফ কাটতে। কয়েকটি ভুল ধরা পড়লো আমার চোখে। তখনি তিনি ছেঁকে ধরলেন আমায় বইটির ফাইনাল প্রুফ দেখে দিতে। আমি ছিলাম তখন দৈনিক ইত্তেফাকে পার্ট টাইম অ্যাসিসট্যান্ট এডিটরের পাশাপাশি এই প্রকাশনা সংস্থাটির সম্পাদক।

ভ্রমণকালে কবি সংগে করে নিয়ে আসতেন 'নকশি কাঁথার মাঠ'-এর প্রুফশীট। ভ্রমণ শেষে শওকত ভাই তাঁর বাসায় চলে গেলে জসীম সাহেব আসতেন আমার বাসায়। একত্রে চা খেতাম দু-জনে। একদিন বাদে তাঁর বইয়ের ভ্রম সংশোধন করে দিতাম। তিনি পরেরদিন ভোরবেলা এসে সংশোধিত কপি নিয়ে যেতেন। আমার বাসায় এরকম আসা-যাওয়া হয়েছে তাঁর এক মাসের বেশি। সেই জননন্দিত কবি সত্তরের সিঁড়ি পার হওয়ার কিছুকাল পরেই পরলোকবাসী হলেন। তাঁর স্মৃতি আজো উজ্জ্বল হয়ে আছে আমার মনে।

শওকত ভাই আমার এগারো বছরের বয়োজ্যেষ্ঠ। তিনি কবি আহসান হাবীব, ফররুখ আহ্‌মদ, তালিম হোসেন, সিকান্দার আবু জাফর, কথাশিল্পী আবু রুশ্‌দ প্রমুখের সমসাময়িক। তাঁর সংগে আমার প্রথম দেখা সম্ভবত ১৯৪৮ সালে 'আজাদ' সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিনের রুমে সাহিত্যিকদের আড্ডায়। তখন আমি আজাদের বার্তা বিভাগে ছিলাম। লিখতাম মাসিক মোহাম্মদীতে। এই আড্ডায় মুজীবুর রহমান খাঁ, কথা শিল্পী আবু জাফর শামসুদ্দিন কখনো কখনো কথাশিল্পী খালেক দাদ চৌধুরী, কবি বেনজীর আহ্‌মদ এবং আরো বেশ কিছু স্বনামখ্যাত কবি-সাহিত্যিক একত্র হতেন। খালেক দাদ চৌধুরীও রুশ সাহিত্যের বেশ কিছু গল্প অনুবাদ করেছিলেন। এঁদের কেউ আর বেঁচে নেই।

পরে মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন সম্পাদিত এবং ঢাকা থেকে নবপর্যায়ে প্রকাশিত 'সওগাত' অফিসে সাহিত্য সংসদের সভায় শওকত ভাইয়ের সংগে যোগাযোগ ঘটে। কবি হাসান হাফিজুর রহমান ছিলেন সাহিত্য সংসদের প্রতিষ্ঠাতা। আহসান হাবীব, কবি হাবীবুর রহমান, শামসুর রাহমান, সাংবাদিক ফয়েজ আহ্‌মদ, আবদুল

www.pathagar.com

গাফফার চৌধুরীসহ আমরা অনেকেই ছিলাম সাহিত্য সংসদের সদস্য। শওকত ভাইও ছিলেন। সেই থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত পঞ্চাশ বছর ধরে তাঁর সংগে ছিলো আমার নিবিড় সংযোগ।

সিংগাপুর হাসপাতালে ব্যয়বহুল চিকিৎসার সময় আমার নিরাময়ে সহায়তার জন্যে অনেক শুভাকাঙ্ক্ষীর সংগে যে বিবৃতি তিনি দিয়েছিলেন সেকথা আমৃত্যু আমার মনে থাকবে। এদের মধ্যে ছিলেন কবি সুফিয়া কামাল, কবি শামসুর রাহমান, নীলিমা ইব্রাহীম, রাহাত খান, সম্পাদক মতিয়ুর রহমান, মতিয়র রহমান চৌধুরী প্রমুখ। এঁদের কথাও ভুলতে পারবো না।

শওকত ওসমান ১৬টি উপন্যাস, অনেক কটি গল্প, নাটক আর অনুবাদগ্রন্থসহ মোট ৯৬টি পুস্তকের প্রথিতযশা লেখক হলেও একজন ভালো কবিও ছিলেন। ১৯৫৫ সালে সওগাত-এর ২৩ বর্ষের ৬ষ্ঠ সংখ্যায় (বৈশাখ, ১৩৪৮) প্রকাশিত তাঁর দীঘি কবিতাটির কয়েকটি পংক্তি এখানে তুলে ধরলামঃ

'ঘুমায়ে গিয়েছে গ্রাম, গিয়েছে পৃথিবী।
ঘুমাই আমিও।...
আমার উপর দীঘি আর তার কালো মায়া
দীর্ঘ পক্ষের উপর গভীর রাত্রির আকাশ;
মৃত্যুঘন আকাশেতে দেখি ছায়া।'

সেই ছায়ার মধ্যেই বিরাশি বছর বয়েসে জরাগ্রস্ত হয়ে হারিয়ে গেলেন সারাজীবন কর্মচঞ্চল শওকত ভাই। নন্দিত কথাশিল্পী শওকত ওসমান। মস্কো ভ্রমণের কথা লিখছিলাম। হঠাৎ শওকত ভাই চলে গেলেন ওপারে। তাঁর স্মৃতিচারণ না-করে অন্য কিছু লেখা সম্ভব ছিলো না। এর মধ্যে আবার এসে গেলো নজরুল জন্মশতবার্ষিকী। গত সোমবার ছিল ১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৫ সাল। ইংরেজি পঞ্জিকার হিসেবে ২৫মে, ১৯৯৮। নিরানব্বই বছর আগে বাংলা দ্বিতীয় মাসের এই তারিখে জন্মেছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। আমাদের মহান জাতীয় কবি। গত ১১ জ্যৈষ্ঠ একশ' বছরের সিঁড়িতে পা রাখলো তাঁর জন্মসাল। বাংলা সাহিত্য, সাংবাদিকতা আর রাজনীতির ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা নজরুলের অভ্যুদয়। সুতরাং এই ঐতিহাসিক ক্ষণটিকে এড়িয়ে অন্য কোন প্রসঙ্গে যাওয়া কঠিন।

আমার ইচ্ছা ছিল রুশ সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি আলেকজান্দার পুশকিনের ওপর কিছু লেখার। কারণ মস্কোতে ঘন্টা কয়েক বিশ্রামের পরই গর্কি স্ট্রিট পেরিয়ে গিয়েছিলাম পুশকিন স্ট্রিটে। সড়কটির পাশেই এক বাড়িতে ১৭৯৯ সালে পুশকিনের জন্ম। আর নজরুলের জন্ম হয়েছিল ১৮৯৯ সালে। কিন্তু তাহলেও প্রচুর মিল দুই কবির কাব্যভাবনায়, প্রগতিবাদী চিন্তায় আর স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহে।

'অ্যান ওড্ টু লিবার্টি' তথা স্বাধীনতার গাঁথা' শিরোনামের একটি বিদ্রোহাত্মক কবিতা লেখার জন্যে জার সরকার পুশকিনকে নির্বাসন দিয়েছিলো ককেশাসের

www.pathagar.com

দুর্গম পার্বত্য এলাকায়। নজরুলকেও ব্রিটিশ সরকারের কারা নির্যাতন ভোগ করতে হয় 'বিদ্রোহীর কৈফিয়ৎ' আর 'আনন্দময়ীর আগমন' শিরোনামের দু'টি জ্বালাময়ী কবিতার জন্যে। পুশকিন 'দ্য প্রিজনার অভ্ দ্য ককেশাস' লিখে তীর বিদ্ধ করেছিলেন জার সরকারের হৃৎপিণ্ডে। তেমনি নজরুল 'বিদ্রোহী', 'ভাঙার গান' আর 'অগ্নিবীণা' এবং 'বিষের বাঁশি' কাব্যগ্রন্থে মুদ্রিত তির্যক পদাবলীর শেল বর্ষণে ক্ষতবিক্ষত করেছিলেন ব্রিটিশ সরকারের ক্ষমতার দুর্গ।

সাহিত্য সাধনার আয়ুর দিক থেকেও এই দুই মহান বিদ্রোহী কবির মধ্যে এক বিস্ময়কর মিল দেখতে পাই। পুশকিন বেঁচেছিলেন মাত্র আটত্রিশ বছর। ১৮৩৭ সালে এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় চিরকালের মতন হারিয়ে গেলেন তিনি। মাত্র একুশ বছর সাহিত্য চর্চার সময় পেয়েছিলেন পুশকিন। আঠারোশ' ষোল সালে তাঁর শুরু আর সাঁইত্রিশে শেষ। ১৯১৮ সালে প্রথমে গল্প এবং পরে কবিতা লেখার মধ্যদিয়ে নজরুলের যাত্রা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আঙিনায়। ১৯২০ থেকে সূর্যের মতন জ্বলতে-জ্বলতে হঠাৎ নজরুল দপ করে নিভে গেলেন একচল্লিশে এসে। সব মিলিয়ে মাত্র তেইশ বছর কবিতায়, গানে-গজলে, গল্প-নাটক-উপন্যাসে, ব্যঙ্গ রচনায় ভরাট করে তুলেছিলেন বাংলা সাহিত্যকে। পাশাপাশি শিশুতোষ রচনায়ও। বিদ্রোহ এবং বিপ্লবের আগুনঝরা কবিতা এবং গানে নজরুল যেমন বাংলা সাহিত্যে নতুন যুগের ধারক-তেমনি তাঁর জুড়ি নেই শিশু সাহিত্যে। তাঁর 'কাঠবিড়ালি' 'লিচুচোর', 'প্রভাতী' আর 'ঝিঙে ফুলের' ছড়া-কবিতাগুলোর মতন শিশুতোষ রচনা আর সৃষ্টি হয়নি। ঠিক একইভাবে পুশকিনও একুশ বছরের ক্ষুদ্র পরিসরে কবিতায়-উপন্যাসে-নাটকে, ছোট গল্প এবং রূপকথায় ভরে তুলেছিলেন রুশ সাহিত্যের ভান্ডারটিকে। তাঁর 'রুসলান ও লুদমিলা', 'ব্রোঞ্জের ঘোড়সওয়ার' আর 'পাথুরে অতিথি' রূপকথায় আছে চিরকেলে শিশুর মনের আনন্দ। পুশকিন এবং নজরুল দুজনই ছিলেন সাধারণ মানুষের কবি। আবার দুজনই ছিলেন স্বাধীনতা এবং গণমুক্তির মুক্ত অবারিত ডানার বিহঙ্গ। আধুনিক রুশ লেখক আর পাঠকদের বার বার যেতে হয় পুশকিনের কাছে। তেমনি নজরুলের দুয়ারে আমাদেরও বার বার নাড়তে হয় কড়া। নজরুলের জন্যে না-হলেও আমাদের এই জাতির জন্যে তাঁর জন্মশতবার্ষিকীর গুরুত্ব অসামান্য। তাঁর ঋণ কোন কিছু দিয়েই শুধতে পারবো না আমরা। একাধারে কবি, সাংবাদিক এবং রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে নজরুল স্বাধীনতার জন্যে আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন সাম্রাজ্যবাদী যুগে। তাঁর যখন অভ্যুদয় রবীন্দ্রনাথ তখন মধ্যগগনের সূর্য। তেইশ বছর বয়সে লেখা নজরুলের সাড়া জাগানো কবিতা 'বিদ্রোহী' পড়ে চমকে উঠেছিলেন বাংলা সাহিত্যের সেকালের নবীন-প্রবীণ কবি, লেখক, সমালোচক আর পত্রপত্রিকার সমালোচককুল। এ যেন আমাদের হাজার বছরের সাহিত্যের জীর্ণ-পুরাতন অচলায়তনে হঠাৎ এক ধূমকেতুর আবির্ভাব। সেই কবিতা পর পর পুনর্মুদ্রিত হলো দেশের সেরা-সেরা সব কাগজে। এ এক অভূতপূর্ব ঘটনা।

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথও কম বিস্মিত হলেন না। কে এই তরুণ-অরুণ বিদ্রোহী? যে হিমালয় শিখরকে নত করতে চায়? তারপর আমার মহাবিশ্বের মহাকাল ভেদ করে অতিক্রম করতে চায় চন্দ্র-সূর্য-গ্রহতারার জগত? এরকম দুর্বিনীত স্পর্ধায় কালবোশেখির ঝড়ের মতন বিজয়ের নিশান উড়িয়ে যে এলো সে আবার কেন উৎপীড়িতের মুক্তি ঘোষণা করে শান্ত-স্থিত হতে চায়? সমস্ত অন্যায়-অনাচার, বাধাবন্ধন ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়ার পর তার কণ্ঠে কী অপার মহিমায়ই না মন্দ্রিত হলোঃ 'যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে-বাতাসে ধ্বনিবে না, অত্যাচারীর খড়্গকৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না, বিদ্রোহী রণক্লান্ত আমি সেই দিন হব শান্ত'। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন তখন বাংলা সাহিত্যের দ্বিতীয় প্রধান কবি। নিখুঁত সুরঝংকারের ছন্দোবদ্ধ কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন তিনি। ছান্দসিক কবি হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল দেশজোড়া। এছাড়া ফার্সি সাহিত্যের বিশ্বখ্যাত কবি সাদী, হাফিজ, উমর খৈয়াম এবং মুগল যুগের কবি নূরজাহান, জাহানারা, জিবুন্নিসা প্রমুখের মর্মস্পর্শী ফার্সি কবিতা পারঙ্গমতার সঙ্গে বাংলায় ভাষান্তর করে যশস্বী হয়েছিলেন তিনি। 'বিদ্রোহী'র আগে 'বিজলী', 'মোসলেম ভারত', 'প্রবাসী', 'কল্লোল', 'সওগাত' এবং ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও ভোলার কবি মোজাম্মেল হক সম্পাদিত 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা', 'মানসী', প্রভৃতি সেকালের খ্যাতনামা সাহিত্যপত্রে প্রকাশিত নজরুলের প্রায় সব কবিতাই পড়েছিলেন এই প্রথিতযশা কবি।

তখনো নজরুলের সঙ্গে পরিচয় ঘটেনি তাঁর। কিন্তু তাহলেও নজরুলের কবিতা পড়ে একইসঙ্গে বিস্মিত এবং অভিভূত হতেন তিনি। এ উক্তিটি সত্যেন্দ্রনাথের নিজের। সেকালের তরুণ কবি এবং কথাশিল্পী পবিত্র গাঙ্গুলীর সঙ্গে চিঠিপত্রের মাধ্যমে নজরুলের যোগাযোগ ছিল। নজরুল তখন ৪৯ নম্বর বাঙালি পল্টনের হাবিলদার ছিলেন। থাকতেন করাচির ব্রিটিশ সেনানিবাসে। রাত জেগে সাহিত্য চর্চা করতেন। লিখতেন ছোট গল্প, জীবন্তিকা, কবিতা, গান-গজল ইত্যাদি। সংস্কৃতের বদলে অপশন্যাল সাবজেক্ট হিসাবে ফার্সি নিয়েছিলেন বর্ধমানের সিয়ারসোল স্কুলে নবম শ্রেণীতে পড়বার সময়। সে সময় পরবর্তীকালের খ্যাতনামা কবি শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ছিলেন নজরুলের সহপাঠী। অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন তাঁরা। দুজনই দশম শ্রেণীর প্রি-টেস্ট দিয়ে সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়ার জন্যে নাম লিখিয়েছিলেন গোপনে। কিন্তু অভিভাবকদের হস্তক্ষেপে সেনাবাহিনীতে যাওয়া আর হয়ে ওঠেনি শৈলজানন্দের।

নজরুলের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটায় মনে আঘাত পেয়েছিলেন তিনি। সিয়ারসোল স্কুলে থাকতেই ব্যঙ্গ কবিতা আর 'নকশা' ধরনের গল্প লিখে শৈলজানন্দকে পড়তে দিতেন নজরুল। শৈলজানন্দ আরও বেশি বেশি লেখার জন্যে উৎসাহিত করতেন বন্ধুকে। বলতেন ঃ তুই লেখা চালিয়ে যা। দেখিস আবার কেটে পড়িসনে তোর মধ্যে লুকিয়ে আছে এক বড় কবি হওয়ার প্রতিভা। লেখায় ইতি না-টানলে একদিন তোর কবিতা আলোড়ন জাগাবে সারাদেশে।

www.pathagar.com

নজরুল প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে শৈশবের স্মৃতি টেনে এই উক্তি করেছিলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। করাচির সৈনিক জীবনে সেনাবাহিনীর ফার্সি-জানা এক মওলবির কাছে হাফিজ এবং উমর খৈয়ামের রুবাই পড়েছিলেন নজরুল। তাঁদের গজলগানও আয়ত্ত করেছিলেন। গান রচনা, গানে সুর দেয়া আর দরাজ গলায় গাওয়ার অভ্যাসও রপ্ত করেছিলেন বাঙালি পল্টনে থাকতে। পবিত্র গাঙ্গুলী তখন কলকাতার একটি উচ্চাঙ্গের সাহিত্য পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক ছিলেন। পত্রিকাটি ডাকে যেতো নজরুলের ঠিকানায়। সেই সুবাদে দুজনের পত্রালাপ। হাফিজের একটি গজলের কাব্যানুবাদ করে ছাপবার জন্যে পবিত্র'র কলকাতার কাগজের ঠিকানায় পাঠালেন নজরুল। কবিতাটি ভাল লেগেছিলো পবিত্র'র। কিন্তু সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী (কথাশিল্পী) রাজি হলেন না অজ্ঞাত কুলশীল এক সৈনিকের কবিতা ছাপতে। পবিত্র গাঙ্গুলী ক্ষুব্ধ হয়ে অন্য একটি নামকরা সাহিত্য পত্রিকায় সেটি ছেপে দিলেন।

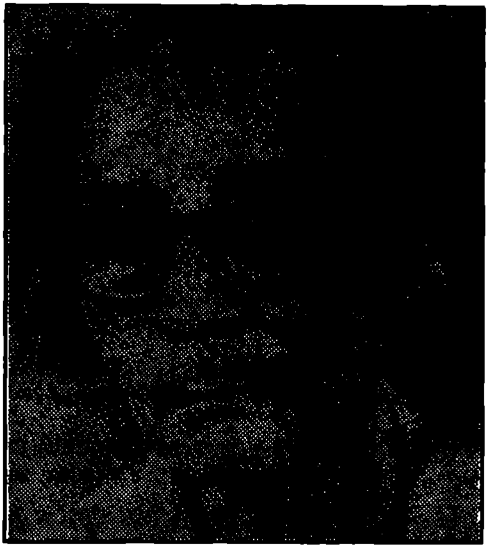

মুজফফর আহমদ

ঘটনাটি ১৯১৮ সালের। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত নজরুল অনূদিত এই কবিতা পড়ে সেবারই প্রথম মুগ্ধ হলেন। এর পর থেকেই নজরুল ইসলামের খোঁজখবর নিতেন পবিত্র'র কাছে। নজরুল আগেই করাচি থেকে তাঁর এই পত্রালাপের বন্ধুকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন ১৯২০ সালের মার্চ মাসে তুলে দেয়া হবে বাঙালি পল্টন। তখন সরাসরি কলকাতা আসবেন তিনি এবং দেখা করবেন পবিত্র' সঙ্গে। সংবাদটি ঠিক সময়ে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে জানিয়েছিলেন পবিত্র। নজরুল কলকাতায় এসেই ওঠেন তাঁর বাল্যবন্ধু শৈলজানন্দের রামাকান্ত বোস স্ট্রিটের বোর্ডিং হাউসে। দেখা করেন পবিত্র গাঙ্গুলীর সঙ্গে। এখানে শৈলজার বোর্ডিংয়ে দিন চারেক থাকতেই পরিচারক লোকটি জানতে পারলো নতুন বোর্ডার একজন মুসলমান। সে নজরুলের এঁটো থালাবাসন ধুতে অস্বীকার করায় শৈলজানন্দ বিপাকে পড়লেন। নজরুলকে তিনি তাঁর বাদুড়তলার মাতামহের বাড়িতে নিয়ে যেতে জোর ধরলেন। কিন্তু নজরুল ৩২ নম্বর কলেজ স্ট্রিটে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসে যেতে চাইলেন।

www.pathagar.com

শৈলজানন্দ তাঁর 'কেউ ভোলে না কেউ ভোলে' স্মৃতিকথায় এসব কথা লিখেছেন। বলেছেনঃ নজরুলের জেদে পড়ে সাহিত্য সমিতির অফিসে নিয়ে এলুম তাঁকে। এই সমিতির সভায় আমি এবং কলকাতার অনেক বিশিষ্ট হিন্দু- মুসলিম লেখক যোগ দিতেন। নামের আগে 'মুসলমান' কথাটি থাকলেও এটি ছিলো একটি অসাম্প্রদায়িক সাহিত্য সমিতি। মুসলমানদের পৃষ্ঠাপোষকতা পাওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল ধর্মীয় বিশেষণটি।

মুজফফর আহ্‌মদের সঙ্গে সাহিত্য সমিতির অফিসেই নজরুলের প্রথম পরিচয়। মুজফফর আহ্‌মদ তখন সমিতির সার্বক্ষণিক কর্মী ছিলেন। আরও কয়েক বছর পরে তিনি ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হলেন। তাঁর নামের আগে যোগ হল 'কমরেড' কথাটি। কাজী নজরুল ইসলাম প্রথম পরিচয়ের দিনকয়েকের মধ্যে মুজফফর আহ্‌মদের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু হলেন। একত্রে কাজ করলেন বিপ্লববাদীদের কাগজ 'লাঙলে', শেরে-বাংলা প্রতিষ্ঠিত সন্ধ্যে দৈনিক 'নবযুগে'। দুজনের যুগ্ম সম্পাদনায় 'নবযুগ' হয়ে উঠেছিলো সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী একটি প্রগতিশীল কাগজ। এতে শ্রমিক কৃষকদের কথা থাকতো। থাকতো ব্রিটিশ সরকারের শোষণ-ত্রাসন এবং রাজনৈতিক আন্দোলন দমনের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষার সম্পাদকীয়। এর বেশিরভাগই লিখতেন নজরুল। বিদ্রোহাত্মক এসব লেখার জন্যে কয়েকবার বাজেয়াপ্ত হয়েছিল 'বনযুগের' জামানত। মুজফফর আহ্‌মদ তাঁর নজরুল বিষয়ক 'স্মৃতিকথায়' লিখেছেনঃ পত্রিকায় কাজের অবসরে কাজী সাহিত্যের আড্ডায় যেতেন। আবার কাজের তাগিদে ধড়ফড়িয়ে আড্ডা থেকে উঠেও আসতেন। আগের কথায় ফিরে আসি। সাংবাদিক ইয়াকভের সঙ্গে কথা বলতে বলতে যাচ্ছিলাম গর্কি স্ট্রিটের শেষ মাথার দিকে। সামনেই কয়েকটি সড়কের মোহনা। হঠাৎ দেখলাম আমাদের গাড়িটি পাতালের দিকে নামছে। আঁতকে উঠলাম। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলেন ইয়াকভ। বললেনঃ ঘাবড়াবার কিছু নেই তোমার। এটা মেট্রো। পাতাল সড়ক। যানজট এড়াবার জন্যে মস্কোর সব বড় রাস্তার মোড়েই এ রকম ভূগর্ভ সড়ক আছে। আমরা এই পাতাল সড়ক ধরে বাম দিক ঘুরে আবার উঠবো ওপরে। সেখানেই তো নভোস্তি নিউজ এজেন্সির অফিস। দু'নম্বর পুশকিন স্ট্রিটে।

বেশ চওড়া পাতাল জংশনটা। দু'ধারে বিজলি বাতির রোশনাই। দিনের মতন আলোর বন্যায় উপচে পড়ছে চারদিকটা। সড়কের দু'পাশে বেশ কিছু দোকানপাট। এ যেন শহরের নিচে আরেকটি শহর। রূপকথার গল্পের পাতাল-নগরীর মতন। মনে পড়লো 'ঠাকুর দাদার ঝুলি'র গল্পগুলোর কথা। সোনার হরিণের পিছু ধাওয়া করে চলেছে শিকার করতে যাওয়া রাজপুত্র। হরিণটা ছুটছে তো ছুটছেই। একসময় ধাঁ করে নিচে নেমে গেলো। রাজকুমার তার পিছু নিতে গিয়ে এক পাতালপুরীতে গিয়ে উঠলো। সেখানে সাজানো সব বাড়িঘর, ফলফুলের বাগান। রাস্তার দু'ধারে দোকানপাট। সামনে সোনায় মোড়া এক বিশাল প্রাসাদ।

মস্কোর পাতালপুরীটা যেন অবিকল সেরকম। তবে আমাদের রূপকথার বর্ণনার

www.pathagar.com

সঙ্গে খানিকটা তফাত আছে। রূপকথায় সেই পাতাল শহরটাকে বলা হয়েছে নিঝুমপুরী। পসরা সাজিয়ে বসে আছে দোকানি। দ্বাররক্ষী পাহারা দিচ্ছে রাজপ্রাসাদ। রাস্তায় পা তুলে দাঁড়িয়ে আছে পথচারীর দল। কিন্তু তাদের কারো মুখে কোনো শব্দ নেই। সবাই তারা একেকটি নিশ্চল পাথর। রাজপ্রাসাদে ঢুকে ভিনদেশী রাজার ছেলে দেখলো সোনার পালংকে নিঃসাড়ে ঘুমুচ্ছে এক রূপসী রাজকন্যা। শিয়রের দু'পাশে তার রূপোর কাঠি আর সোনার কাঠি।

বুদ্ধি করে রাজার ছেলে সোনার কাঠিটা ছোঁয়াতেই ধড়ফড়িয়ে জেগে উঠলো রাজকন্যা। ওই জিয়নকাঠি ছুঁইয়ে অমনি করে পাথর হয়ে থাকা পাতালপুরীর সব লোকজনকে জাগিয়ে তুললো সে। আবার কলমুখর হয়ে উঠলো পাতালের শহর। সোনার হরিণের আদল নেয়া ডাইনিবুড়ির তুকতাকের যাদু বুদ্ধির জোরে ছিন্ন করলো বাংলাদেশের এ সেই বীর কিশোর।

এ রকম রূপকথা আছে রুশ সাহিত্যেও। যেমন পুশকিনের 'পাথরের ঘোড়সওয়ার'। তিনি গল্পটির উপাদান নিয়েছিলেন রুশ দেশের প্রাচীন রূপকথা থেকে। কিন্তু আধুনিক রুশ নগর-নির্মাতারা বাস্তবের মাটিতে তুলে এনেছেন রূপকথার পাতালপুরীকে। বিজ্ঞানের জিয়নকাঠির ছোঁয়া দিয়ে তাকে করে তুলেছেন জীবন্ত এবং প্রাণচঞ্চল। যানজটের উপদ্রব থেকে প্রায় এক কোটি ব্যস্ত নগরবাসীর মূল্যবান সময় বাঁচানোর জন্য পাতালেও গড়ে তুলেছেন নতুন এক শহর। যেখানে আছে সড়ক পথ, রেলপথ, রোড আর রেলের জংশন। পাতালের দুনিয়া জুড়ে আছে আলোয় ঝলমল হাটবাজার, সার সার বিপণি। দিনরাত কর্মমুখর থাকে নিচেকার এই আধুনিক শহর।

ইয়াকভ বললেনঃ আসবার সময় গাড়ির কত আনাগোনাই তো দেখলে রাস্তায়। কিন্তু একবারও কী আমরা যানজটে পড়েছি? একটা মিনিটও তো পথে নষ্ট হলো না আমাদের। বুঝেছো কেন? হেসে বললামঃ তা আর বুঝতে বাকি রইলো কই। এই পাতালপুরীটাই তো দেখছি দিব্যি বাঁচিয়ে দিচ্ছে আমাদের সময়। বাংলাদেশের রূপকথার সেই গোল্ডেন ডিয়ারের মতন যেন টেনে নিয়ে চলছে কোনো রহস্যময় দুনিয়ায়।

ঃ গোল্ডেন ডিয়ার ! ইয়াকভের চোখে বিস্ময়। সত্যি সত্যি অমন কোনো স্বর্ণমৃগ আছে নাকি তোমাদের দেশে?

ঃ না-থাকলে আমাদের দেশটাকে 'গোল্ডেন বেঙ্গল' বলা হলো কেন? ইয়াকভের কথার জবাবে এক নিঃশ্বাসে বললাম।

ঃ হ্যাঁ, 'সোন্হারে বাংলা' কথাটা আমি শুনেছি তোমাদের দেশের অনেকের মুখে।

ঃ সোন্হারে বাংলা নয়, সোনার বাংলা। উচ্চারণটা শুদ্ধ করে দিলাম আমি।

ইয়াকভ তার রুশ জিভ দিয়ে বার কয়েক বিকৃত উচ্চারণ করে শেষে আমার শিক্ষকতায় শুদ্ধ শব্দটা শিখে নিতে পারলো। পরিষ্কার গলায় আবৃত্তি করলো 'সো-না-র বাং-লা'। টানটায় দীর্ঘ স্বরের আধিক্য থাকলেও উচ্চারণ তো ঠিকই হয়েছে।

www.pathagar.com

খুশিতে হাততালি দিয়ে বাহবা জানালাম তাকে। দু'হাত দূরে ছিলো পাবলভ। সে তো এক বছরের বেশি সময় ধরে ঢাকায় থেকেছে। শব্দটা শুনেছে বহুবার। আর নিখুঁতভাবে উচ্চারণও করতে পারতো। সুতরাং সেও হাততালি দিলো ইয়াকভের মুখে শুদ্ধ কথাটার আবৃত্তি শুনে। অন্যরা তখন মগ্ন ছিলো আলাপচারিতায়। তারা হাততালির শব্দে অবাক হয়ে তাকালো আমাদের দিকে। পাবলভ রুশ ভাষায় ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলে সবাই একযোগে হেসে উঠলো হো-হো করে।

ইয়াকভও হেসে ধন্যবাদ দিলো আমায়। বললোঃ থ্যাংক ইউ ফর কারেকটিং মি। এরপর আমি তাকে আমাদের রূপকথার সোনার হরিণ আর সাহসী রাজপুত্রের অভিযানটার কাহিনী শোনালাম অল্প কথায়। বললামঃ গল্পের সেই সোনার হরিণ আজকাল আর কেউ না দেখলেও ওরকম সোনালি রংয়ের হরিণ কিন্তু আছে আমাদের সুন্দরবনে। আমরা এদের বলি মায়া হরিণ। কালো কালো মায়াভরা চোখ ওদের। গায়ের পশম দেখতে সোনার রেনুর মতন ঝক্ঝকে। এ রকম হরিণ কিন্তু খুব একটা দেখা যায় না পৃথিবীর আর কোথাও।

ঃ আশ্চর্য তো! অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললো ইয়াকভ। আর কী যেন বললে? ও হ্যাঁ, 'সুন্‌দার -বান্‌'। আমি তাকে এবারও শুদ্ধ উচ্চারণটা শিখিয়ে দিলাম।

বললামঃ ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট অভ্ বেঙ্গল-এর কথা পড়োনি জিওগ্রাফিতে? ওটাকেই আমাদের দেশের লোকেরা বলে সুন্দরবন। স্থানীয় নাম এটি। সুন্দরী নামের এক রকম গাছ আছে এই অরণ্যে। কাঠের রং-এর লালচে। সারা বন জুড়ে এই গাছেরই আধিপত্য। সুন্দরী গাছ থেকেই বনের নাম হয়েছে সুন্দরবন। এখানে মায়া হরিণ ছাড়াও আছে চিত্রা হরিণ, সম্বর হরিণ এবং আরো আছে কয়েক জাতের মৃগ। রয়াল বেঙ্গল টাইগারের নাম তো নিশ্চয় শুনেছো।

আমার কথার পিঠেই ইয়াকভ বললোঃ বা-রে, রয়াল বেঙ্গলের কথা শুনবো না! ওই দুর্দান্ত বাঘেদের জন্যেই তো সারা দুনিয়ায় বিখ্যাত তোমাদের দেশ। তা কেন হঠাৎ প্রসংগটা তুললে?

ঃ বলছিলাম, রয়াল বেঙ্গলদেরও বাসস্থান আমাদের ওই সুন্দরবন। ওরাই আমাদের বনের রাজা। এক সময় বেশুমার ছিলো এই ব্যাঘ্রকুলের সংখ্যা। কিন্তু আজকাল প্রায় নিঃশেষ হতে বসেছে। চামড়ার লোভে পশু শিকারীরা উজাড় করছে এদের বংশ। ইউরোপে-আমেরিকায় অনেক চড়া দামে বিক্রি হয় রয়াল বেঙ্গল টাইগারের চামড়া। সেখানে ঘটা করে বন্যপ্রাণী রক্ষার নামে সমিতি করা হলেও চোর কী কখনো ধর্মের কথা শোনে? শ্বেতাংগ চোরাকারবারির দল বন্য প্রাণিচামড়ার গোপন ব্যবসা ফেঁদে লোপাট করে চলেছে তৃতীয় বিশ্বের দুর্লভ সব পশুসম্পদ। আমাদের দেশটাও অনেক দিন থেকে তাদের খপ্পরের মধ্যে রয়েছে। যার ফলে রয়াল বেঙ্গল টাইগারের সংখ্যা কমতে কমতে এখন হাজারের কোঠারও অনেক নিচে নেমেছে।

www.pathagar.com

ওপাশ থেকে পাবলভ সায় দিয়ে বললোঃ কথাটা ঠিক। তবে বাঘ হত্যার কাজটা প্রথম শুরু করেছিলো বৃটিশ সিভিলিয়ানরা। তারা বাঘ শিকারকে বাহাদুরির কাজ মনে করতো। সমারসেট মমের গল্পটার কথা মনে নেই তোমাদের? এক বৃটিশ পদস্থ আমলার স্ত্রী মহাসমারোহে গিয়েছিলেন ভারতের কুমায়ুন অরণ্যে বাঘ শিকারে। সংগে ছিলো তার একদল দেশীয় শিকারী। জংগলে ছাগল বেধে রেখে রাইফেল হাতে এক উঁচু মাচানের ওপর বসেছিলেন মহিলা। এদিকে তাঁর দু'পাশে বন্দুক তাক্ করে ওঁৎ পেতে থাকলো শিকারীর দলটি। আস্তে আস্তে ছাগলের দিকে এগিয়ে এলো হাড় জিরজিরে এক বুড়ো বাঘ। মহিলার হাত থেকে রাইফেল পড়ে গেলো জন্তুটির প্রথম দর্শনেই।

ইয়াকভ উৎসুক হয়ে শুনছিলো পাবলভের কথা। কারণ মমের গল্পটি তার পড়া ছিলো না। সে জানতে চাইলোঃ বলো, তারপর কী হলো?

ঃ হবে আর কি ! ইয়াকভের প্রশ্নের জবাবে বললো পাবলভ। শিকারী দলের রাইফেলের গর্জনেই হার্টফেল করে মারা গেলো বুড়ো বাঘটি। তাকে চিৎপটাং হয়ে লম্বা মেরে শুয়ে থাকতে দেখে শিকারীরা নিচে নামলো। দূর থেকে দেখেই আঁচ করলো জন্তুটি অক্কা পেয়েছে। মহিলা তখনো মাচানে বসে কাঁদছিলেন ভয়ে। এদিকে শিকারীরা মৃত বাঘটিকে নেড়েচেড়ে তাকে সংকেত দিলে সদর্পে তিনি নিচে নেমে এলেন। আর মরা বাঘটির মাথায় গুলি চালিয়ে শ্বেতাংগ মহলে প্রচার করলেন হিংস্র জন্তুটি স্বয়ং তিনি শিকার করেছেন। বাঘটির চামড়া খুলে শুকিয়ে টাঙিয়ে রাখলেন নিজের ড্রইং রুমে। ধুমধাম করে উৎসব করলেন তার শিকার অভিযানের। বৃটিশ আমলা এবং তাদের স্ত্রীরা বাহবা দিলেন মহিলাকে। বাঘের চামড়াটি লণ্ডনে নিয়ে গিয়েও লোকের প্রশংসা কুড়ালেন তিনি।

ঃ এ যে দেখছি এক চমৎকার ব্যঙ্গাত্মক গল্প! ইয়াকভের চোখে বিস্ময়।

ঃ সমারসেট মম তো হাস্যরসের গল্পের জন্যেই বিখ্যাত আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যে। বললো পাবলভ্। কিন্তু এর মধ্যে যে সেকালের ভারত-শাসক ইংরেজদের ছলচাতুরি আর মিথ্যে বাহ্‌বা কুড়োনোর ভড়ং আছে সেটি দেখলে না? এ রকম চাতুরি করেই তো শুরুতে বাংলাদেশটা দখল করে নিয়েছিলো তারা। তারপর অবাধে লুটপাট চালিয়ে ফোকলা বানিয়ে ছেড়েছিলো গোটা উপমহাদেশটাকে। তাদের অত্যাচার উৎপীড়ন থেকে কেউ রেহাই পায়নি। না পেয়েছে মানুষ, না বনের প্রাণিকুল। রয়াল বেঙ্গল টাইগার, স্পটেড ডিয়ার, পাইথন ইত্যাদির জন্যে এক সময় সুখ্যাতি ছিলো বাংলাদেশের। বৃটিশরাই প্রথম শিকারের নামে ধ্বংস করতে শুরু করে এসব বন্য জীবজন্তু।

আমি বললামঃ এক বিন্দুও অতিরঞ্জন নেই পাবলভের কথায়। সত্যি ওরাই শুষে শুষে দেশটাকে আমাদের রক্তশূন্য করেছে। সামন্তপ্রথা চাপিয়ে দিয়ে আমাদের কৃষক শ্রেণীকে যেমন ওরা হা-ভাতে করেছে তেমনি দুই হাতে লুটে উরান-বিরান করেছে আমাদের ভূমিজ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ। আমাদের কার্পাস তুলা এবং পাট

www.pathagar.com

দিয়ে লাঙ্কাশায়ার-বার্মিংহামে কাপড় কল আর পাটকল বসিয়েছে তারা। তাদের উনিশ শতকের শিল্প বিপ্লবের পেছনে তো মেদচর্বি যুগিয়েছে আমাদের দেশ থেকে জুটে নেওয়া সব কাঁচামাল। অথচ এক সময় ধনধান্যে ভরা ছিলো বাংলাদেশ। আন্তর্জাতিক বাজারে কী বিপুল চাহিদাই না ছিলো ঢাকার তাঁতীদের বোনা মসলিন-জামদানি এবং আরো রকমারি সূতি বস্ত্রের!

ইয়াকভ এবং পাবলভ দু'জনের দিকেই তাকিয়ে বললামঃ দ্যাখো, নরখাদক বাঘের চেয়েও কেমন হিংস্র আর নিষ্ঠুর ছিলো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ওই লুটেরা বণিকের দল। নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থে ওরা আমাদের মসলিন শিল্পীদের গোপনে ধরে নিয়ে গিয়ে কেটে দিয়েছিলো তাদের হাতের বুড়ো আঙুল। যাতে এরা সূক্ষ্ম বস্ত্র বয়ন করে তাদের উঠতি বস্ত্রশিল্পের প্রতিযোগী হতে না পারে সেই মতলবেই চিরদিনের জন্যে এদের পঙ্গু করে দিয়েছিলো ওই পিশাচেরা। তারপরেও দ্যাখো এ ঠ্যাঙাড়ের দল কম অপচেষ্টা চালায়নি আমাদের ইতিহাসটাকেও মুছে ফেলতে।

দু'জনেই এক সংগে বলে উঠলোঃ একি বলছো? ইতিহাসের ঘরেও চুরি!

ওদের প্রশ্নের জবাবে বললাম ঃ নয়তো কী? আমাদের আঠারো-উনিশ শতকের ইতিহাসটা পড়লেই হদিস পাবে এই চুরির। শোনো, বাংলা-ভারতের দক্ষ কারিগরেরা সোনা আর মণিরত্ন দিয়ে গুপ্ত-পাল, তুর্কি-পাঠান এবং মুগল যুগে কালের নিদর্শন হিসাবে কত উপকরণই না তৈরি করেছিলো। সেসব দুর্লভ প্রত্নসম্ভারেও হাত পড়ে এই লোভী বণিকদের। সেসব লুটে নিয়ে গিয়ে এরা শোভা বাড়িয়েছে বৃটিশ মিউজিয়ামের। ইংল্যাণ্ডের রানীর মুকুটে আজো ঝলমল করতে দেখতে পাবে আগ্রার প্রাসাদ থেকে লুটে নেয়া কোহিনূর মণি। ওদের দেখাদেখি পরের যুগগুলোতে আমাদের প্রত্নসম্পদ চুরির হিড়িক পড়ে গিয়েছিলো। একালেও শেষ হলো না সেই বোম্বেটেপনার। এই কিছুদিন আগেও আন্তর্জাতিক চোরাকারবারিদের ষড়যন্ত্রে বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়ে গেছে অনেক দুর্লভ প্রত্নসম্পদ। যার মধ্যে ছিলো পাল যুগের রত্নখচিত বৌদ্ধ মূর্তি, গুপ্ত যুগের ত্রিমূর্তি আর ময়নামতি-সোমপুর বিহার সংলগ্ন ভূগর্ভ থেকে উদ্ধার করা অনেক প্রত্নসামগ্রী। আমাদের সভ্যতার বিবর্তনের ধারা নিরূপণের জন্যে এগুলোর ঐতিহাসিক মূল্য ছিলো অপরিসীম।

কথা শেষ করে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

পাবলভ সান্ত্বনা দিয়ে বললোঃ এসব ঐতিহাসিক সম্পদ রক্ষার ব্যাপারে তোমাদের আরো সতর্ক থাকা উচিত। সাধারণ মানুষকেও সচেতন করে তুলতে হবে। দু'দিন বাদেই তোমাদের নিয়ে যাবো লেনিনগ্রাদে। সেখানে দেখবে দুই বিখ্যাত জাদুঘর। জারদের উইন্টার এবং সামার প্যালেস আমরা ব্যবহার করছি জাদুঘর হিসাবে। গেলেই দেখবে কত ঐতিহাসিক নিদর্শনের ছড়াছড়ি দুই মিউজিয়ামে। জার এবং জারিনাদের ব্যবহার করা সামান্য একটি চিরুনিকেও আমরা উপেক্ষা করিনি। সযত্নে সবকিছুকে ঠাঁই দিয়েছি প্রত্নসম্ভারের গ্যালারিতে। কারণ অতীতের ছোট একটি সুঁইও তো ইতিহাসের উপকরণ। প্রত্নবস্তুর বিষয়ে এ রকম

www.pathagar.com

যত্নবান হলে এসবের চোরাই হওয়া অবশ্যই বন্ধ করতে পারবে তোমরা।

সংলাপের মাঝখানেই এক সময় হঠাৎ ধাঁ করে পাতাল সড়ক থেকে ওপরকার রাস্তায় উঠে এলো গাড়িটা। সামান্য ঝাঁকুনিও লাগলো না। যেন নরম কার্পেটের বুক ছুঁয়ে ওটা গড়িয়ে এলো ওপরে। পাবলভকে লক্ষ্য করে বললামঃ জীবনে এই প্রথম পাতাল বেয়ে এলাম। সত্যি অবাক লাগলো তোমাদের প্রকৌশলীদের গড়া অপূর্ব সড়ক-নেটাওয়ার্ক দেখে। আমার জন্যে এ এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা। ঢাকায় তো আমাদের পথ-ঘাটের হাল দেখেছো তুমি। একটু ভারি বৃষ্টি হলেই বন্যায় সয়লাব হয় গোটা শহর। বড় রাস্তাগুলোর মোড়ে যানজট তো একটা নৈমিত্তিক ব্যাপার। কবে যে আমরা রেহাই পাবো এই বিড়ম্বনার হাত থেকে? আমাদের দারিদ্র্যকে যেন চোখ তুলে মুহূর্তে বিদ্রূপ করে চলেছে হতশ্রী শহরটা। বিদেশে গেলে বড় লজ্জা হয় ঢাকার দুর্গতির কথা ভাবলে!

আবার কানে এলো পাবলভের সান্ত্বনা। আমার দিকে ঝুঁকে বললো ঃ এই তো মাত্র বছর কয়েক হলো স্বাধীন হয়েছো তোমরা। আগে যারা তোমাদের শহর নির্মাতা ছিলেন তারা আগাম পঞ্চাশ কি একশ' বছরের কথা চিন্তা করে তৈরি করেননি রাস্তাঘাট। ভাবেননি পরেকার যুগগুলোতে শহরের লোকসংখ্যা আর যানবাহন কী হারে বাড়বে। আমাদের কথাই ভাবো। জারদের আমালে মস্কোর অবস্থা খুব একটা ভালো ছিল না। ঘিঞ্জি ছিলো ক্রেমলিনের চারদিকের পুরনো শহর। রাস্তাঘাটও ছিলো সংকীর্ণ আর অপরিচ্ছন্ন। বিপ্লবের দেড় যুগ ঢেলে সাজিয়েছি আমরা মস্কোকে। ১৯৩৬ সালে হয়েছে পাতাল রেল। পাতাল যোগাযোগ ব্যবস্থা হয়েছে তার বছর পাঁচেক আগে। আমাদের পাতাল রেল সড়ক কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে আধুনিক আর মনোরম। আমার বিশ্বাস, দারিদ্র্য ঘোচাতে পারলে তোমরাও পারবে ঢাকা-চট্টগ্রামকে নতুন রূপ দিতে।

প্রবোধ পেলাম পাবলভের কথায়। বললামঃ সেই সুখের দিনের অপেক্ষাতেই তো আছি আমরা।

মাঠের মতন খোলামেলা এবং চওড়া সামনের রাস্তাটা। যানবাহন চলাচলের সুবিধার জন্যে মাঝখানে আছে গোটা আটেক লেন। যেকোন দিকের গাড়ি স্বচ্ছন্দে চলতে পারে লেন বদল করে। দুধারে পথচারীদের জন্যে আছে পাথরের শানবাঁধানো উঁচু ফুটপাথ। বার্চ, পপলার, ঝাউ ইত্যাদি গাছের সবুজাভ ছায়া তো আছেই মাথার ওপর।

মোড়ে দেখলাম আধা-প্রৌঢ় বয়সের একটি লোকের স্ট্যাচু। এবার মুখ খুললেন বয়স্ক সাংবাদিক উস্তিনভ। তিনি ছিলেন কোণের আসনটিতে। সংলাপে মগ্ন ছিলেন আমাদের দলের অন্য সদস্যদের সঙ্গে। স্ট্যাচুটার কাছাকাছি আসতেই বললেনঃ ওটা কবি পুশকিনের স্মারক-স্তম্ভ। ওখানে দাঁড়িয়ে মস্কো শহরটাকে পাহারা দিচ্ছেন তিনি। নতুন প্রজন্মের সোভিয়েত কবি এবং লেখকদের নির্দেশ দিচ্ছেন কোন পথ ধরে এই মহাশূন্যযুগে তাদের চলতে হবে। তোমরা নিশ্চয় পুশকিনের লেখা পড়েছো। আধুনিক রুশ সাহিত্যের ফাউণ্ডার-ফাদার তিনি। সাধারণ মানুষের। মুক্তির বাণী

www.pathagar.com

উচ্চারিত তাঁর কবিতা এবং নাটক-উপন্যাসে।

উস্তিনভের কাছ থেকে জানলাম, পুশ্‌কিনের প্র-পিতামহ হ্যানিবল ছিলেন রুশ সম্রাট পিটার দ্য গ্রেটের (১৬৮২-১৭২৫) একজন নিগ্রো সেনাপতি। ইউরোপ বিজেতা হ্যানিবল বার্কার (খ্রিস্টপূর্ব ২৪৭-১৮২) মতোই উত্তর আফ্রিকার লোক তিনি। ধমনিতে আফ্রিকান এবং রুশ রক্তের সংমিশ্রণ থাকায় বোধকরি অমন বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী হতে পেরেছিলেন আলেকান্দ্রার সার্‌ভিয়েভিচ্‌ পুশ্‌কিন (১৭৯৯-১৮৩৭)। সবচেয়ে বড় কথা হলো, রুশ সাহিত্যে প্রথম ভূমিদাস-কৃষকদের ওপর অকথ্য সামন্ত শোষণের বিরুদ্ধে আর তাদের মুক্তির সংগ্রামের পক্ষে নির্ভয়ে কলম ধরেছিলেন এই চারণ কবি। এর জন্যেই যুগে যুগে মুক্তিকামী মানুষের এক নন্দিত বীর পুরুষ তিনি। নিঃসংশয়ে বলতে পারি, তাঁর লেখার আবেদন কোনোকালেই ফুরিয়ে যাবে না।

পুশ্‌কিনের প্রতি সত্তর দশকের প্রগতিবাদী আধুনিক সোভিয়েত লেখক-সাংবাদিকদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাবোধ আর কবির বংশধারার পরিচয় ছিল আমার কাছে এক নতুন তথ্য। জানতাম উনিশ শতকের অনেক কৃষক বিদ্রোহ, জারতন্ত্র বিরোধী সশস্ত্র রাজনৈতিক উত্থান আর বিশ শতকের প্রথম দিককার তিন তিনটি রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রেরণার উৎস ছিলেন পুশ্‌কিন। কিন্তু এই শতাব্দীর শেষ পাদের সোভিয়েত লেখকদেরও যে তিনি এতখানি নমস্য এটা জানতাম না। নতুন এই খবরে পুষ্ট হলো আমার জ্ঞান ভাণ্ডার।

পিটারের প্রসংগেও কথা উঠলো। যেপথ ধরে যাচ্ছিলাম তার ডান পাশে ছিলো তিনশ' বছর আগে জার আলেক্‌সেই'র আমলের মস্কো শহরের এক পুরনো বস্তি। উত্তরাধিকার নিয়ে সংঘাতের সময় এই বস্তিতে আত্মগোপন করেছিলেন বালক পিটার। একটানা ছিলেন কয়েক বছর। বস্তিটিতে তখন বাস করতো দুর্ধর্ষ শ্রেণীর লোকেরা। এদের ডানপিটে ছেলের দল ছিলো পিটারের খেলার সাথি। আলেক্‌সেই'র দ্বিতীয় স্ত্রী নাতালিয়ার কনিষ্ঠতম পুত্র পিটার। জার আলেক্‌সেই (১৬২০-'৭৬)-র প্রথম স্ত্রী মারিয়ার ছিলো তিন সন্তান। ফিওদোর, সোফিয়া আর স্থূলবুদ্ধি আইভান। ফিওদোর জার হলেন আলেক্‌সেই'র মৃত্যুর পর। তৃতীয় ফিওদোর পদবি নিয়ে মাত্র ছয় বছর রাজত্ব করেন তিনি। ১৬৮২ সালে ফিওদোর মারা গেলে পর উত্তরাধিকার নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হলো নাতালিয়া আর মারিয়ার মধ্যে।

দ্বন্দ্বটা ছিলো অনেকটা বাংলাদেশের রূপকথার সুয়ো রানী আর দুয়ো রানীর হিংসুটেপনার মতন। তাছাড়া মধ্যযুগে কি এশিয়ার আর কি ইউরোপের প্রায় সব দেশেই তো সিংহাসনের দাবি নিয়ে হরহামেশা এ রকম সংঘাত হতো কোনো রাজার একাধিক রাণী থাকলে। রাশিয়াতেও অমনটাই ঘটলো। আলেক্‌সেই'র উজির নাজির-সভাসদদের দুই দল গেলেন দুই জারিনার পক্ষে। গোড়ার দিকে মস্কোবাসীদের সমর্থন পেলেন নাতালিয়া। সিংহাসনে বসানো হলো তাঁর দশ বছরের ছেলে পিটারকে। মারিয়ার পাগলাটে ছেলে আইভানের জার হওয়ার যোগ্যতার দাবি হলো নাকচ।

www.pathagar.com

কিন্তু দ্বন্দ্বটা শেষ হয়েও হলো না। মারিয়ার রাজনৈতিক গ্রুপ সেনাবাহিনীর মস্কো গ্যারিসনকে উত্তেজিত করে বিদ্রোহ ঘটালো। রক্তপাতের সময় বালক পিটারের চোখের সামনেই কেটে টুকরো-টুকরো করা হলো তার প্রধান সমর্থকদের একজনকে। লোকটি পিটারের হাত ধরে নিরাপত্তা ভিক্ষা করলেও বিদ্রোহী সেনারা তাকে রেহাই দিলো না। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের দৃশ্য স্থায়ীভাবে মনে দাগ কেটে থাকলো পিটারের। কথাটা ভাবলে মাঝে মধ্যেই তিনি মূর্ছা যেতেন।

মস্কো গ্যারিসনের বিদ্রোহের পর সিংহাসন নিয়ে একটা রফা হলো। আইভান এবং পিটারকে করা হলো যুগ্ম জার। আইভানের রাজকীয় পদবি হলো পঞ্চম আইভান। আর পিটার হলেন প্রথম পিটার। রিজেন্ট হলেন জার আলেক্সেই'র প্রথম স্ত্রী মারিয়ার মেয়ে সোফিয়া

কিন্তু জার হলেও কিশোর পিটার মস্কোর ক্রেমলিন দুর্গের রাজপ্রাসাদে থাকলেন না। তিনি নগর-উপকণ্ঠের এই বস্তিতে উঠে এলেন। এখানে প্রায়-নির্বাসিত হয়ে

সেন্ট পিটার্সবুর্গে পিটার দ্য গ্রেটে'র ব্রোঞ্জ অশ্বারোহী ভাস্কর্য

থাকলেন। সোফিয়াই হলেন আসলে এ সময় রাশিয়ার প্রকৃত সম্রাজ্ঞী। এদিকে বস্তির ডানপিটে ছেলেদের নিয়ে পিটার গড়ে তুললেন কমাণ্ডো গোছের একটি সশস্ত্র সেনা দল। এদের নিয়ে প্রায়ই তিনি সীমান্তে সামরিক অভিযান চালাতেন। এসব সফল অভিযানে তার নেতৃত্বের গুণাবলীর প্রকাশ ঘটতে দেখা যায়। পুশ্কিনের প্র-পিতামহ কৃষ্ণকায় যোদ্ধা হ্যানিবল, ডাচ নৌ কমান্ডার ফ্রান্জ, সুইস নৌবহরের লেফোর্টসহ অনেকে এলেন এ সময় পিটারের অভিযানে মদদ যোগাতে। এঁরাই তাঁকে উৎসাহিত করলেন রুশ সেনাবাহিনীকে আধুনিক ধাঁচে গড়ে তুলতে। পাশাপাশি

www.pathagar.com

অনুপ্রেরণা যোগালেন একটি শক্তিশালী নৌবাহিনীর গোড়াপত্তন করতে।

পিটার যুবক হলেও দেশ শাসনের ব্যাপারে তখনো মাথা ঘামাতে চাননি। তাঁর মনে কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছিলো কেমন করে রাশিয়াকে একটি আধুনিক রাষ্ট্রের রূপ দেওয়া যায়। আর পশ্চিমের বড় শক্তিগুলোর পাশাপাশি অবস্থানে নিয়ে আসা যায়। তখন শাসন-ত্রাসন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন তাঁর সৎ বোন প্রিন্সেস সোফিয়া। ১৬৮৯ সালে এক গোপনসূত্রে পিটার খবর পেলেন সোফিয়া তাঁর প্রাণনাশের চক্রান্ত আঁটছে। তিনি সজাগ হয়ে উঠলেন। সামরিক ক্রিয়াকসরত ছেড়ে ছুটে এলেন মস্কো। এখানে মস্কো গ্যারিসনে তাঁর অনুগতের সংখ্যা ছিল বিপুল। এদের সাহায্যে ক্ষমতাচ্যুত করা হলো শাসন ক্ষমতার অভিভাবিবকা প্রিন্সেস সোফিয়াকে। এবার নিজের হাতে তুলে নিলেন পিটার। সাত বছর পর, ১৬৯৬ সালে অন্যতম জার পঞ্চম আইভান মারা গেলে পিটার হলেন একমাত্র জার। কিন্তু এরপরও তিনি সরকারের ভার নিলেন না। ব্যাপারটা ছেড়ে দিলেন রাজকীয় মন্ত্রী আর উপদেষ্টাদের হাতে।

কথার মাঝখানে উস্তিনভ বললেনঃ শোনো বন্ধুরা, আজকের সোভিয়েত ইউনিয়ন নির্মাণের ইতিহাস জানতে হলে মধ্যযুগের রাশিয়াকে জানতে হবে। আর জানতে হবে জারদের ইতিহাস। ভালোর দিকটা বিচার করলে প্রথম পিটারকে অবশ্য সামন্তযুগীয় রাশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক বলতে হবে। তবে অসাধারণ কর্মক্ষমতার পাশাপাশি অনেক মন্দ দিকও ছিলো পিটারে চরিত্রে। পাঁচ-পাঁচটি সবল যুবকের চেয়েও তাঁর গায়ের জোর ছিলো বেশি। তেমনি যেকোনো কায়িক শ্রমের কাজও করতে পারতেন অবলীলায়। তাঁর বাবা জার আলেক্সেই'র আমলে রাশিয়া ছিলা সামন্ত শাসিত একটি অবনত, দরিদ্র এশীয় দেশ। পিটারই প্রথম দেশটিকে আধুনিক এশিয়ান-ইউরোপিয়ান রাষ্ট্রের রূপ দিয়ে গেলেন। অবশ্য সীমান্তের চৌহদ্দি বাড়িয়ে। আর পাশাপাশি গড়ে তুললেন আধুনিক রুশ সেনা এবং নৌবাহিনী। তিনি ছিলেন স্বপ্নবিলাসী মানুষ। অনেক পাগলামো, হঠকারিতা আর নিষ্ঠুরতারও প্রকাশ ঘটে তাঁর চরিত্রে।

কথার জের টেনে এই বর্ষীয়ান সাংবাদিক বললেনঃ এ কথা সত্য, ইউরোপের বাল্টিক, কৃষ্ণসাগর, আজোভ সাগর আর মধ্য এশিয়ার কাস্পিয়ান সাগরে সেকালের ভূমিবেষ্টিত রাশিয়ার প্রবেশপথ খুলে দিয়েছিলেন দুঃসাহসী এই লোকটি। উত্তর-মেরু মহাসাগর আর প্রশান্ত মহাসাগরেরও সংলগ্ন করেছিলেন এদেশের স্বাভাবিক ভৌগোলিক অবস্থানকে। উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে নৌ-অভিযাত্রায় পিটারই প্রথম পাঠিয়েছিলেন এডমিরাল বেরিংকে। যার ফলে মেরু মহাসাগরের মাত্র ত্রিশ-বত্রিশ মাইল পথ অতিক্রম করে আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছিলো উত্তর আমেরিকার আলাস্কা উপদ্বীপ। ভাবলে অবাক হতে হয়, পশ্চিমে শিল্পের প্রসার, কারিগরি কৃৎকৌশল আর নৌবিদ্যায় জ্ঞানলাভের জন্যে পিটার গোটা একটি বছর ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন ইউরোপ। হল্যান্ডের একটি জাহাজে ছুতার মিস্ত্রির কাজ করেছিলেন।

উস্তিনভের মুখেই শুনলাম পিটারের পরেকার তুগলকি কাণ্ডকারখানার কথা। ইউরোপ থেকে ফিরে এসে নৃশংসভাবে দমন করলেন তিনি প্রিন্সেস সোফিয়ার

www.pathagar.com

আরেকটি অভ্যুত্থান-ষড়যন্ত্র। রুশদের খাঁটি ইউরোপীয় বানানোর জন্যে নিজের হাতে কামিয়ে দিলেন রাজদরবারের সভাসদদের মুখের দাড়ি। মধ্যযুগে মুখভরা দাড়ি রাখা ছিল রুশদের একটি পুরনো সামাজিক রীতি। ইউরোপীয় স্টাইলের পোশাক পরবার জন্যে জারি করলেন রাজকীয় ফরমান। কিন্তু রুশ কৃষকরা তার সে হুকুম তামিল করলো না।

মুহম্মদ তুগলকের মতোই নিজের খেয়াল খুশি-মাফিক মস্কো থেকে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে গেলেন বাল্টিক সাগর এলাকায়। জায়গাটা তিনি দখল করেছিলেন সুইডেনের কজা থেকে। সেন্ট পিটারের নামে গড়ে তুললেন এখানে নতুন রাজধানী-শহর। নাম দিলেন সেন্ট পিটার্সবুর্গ। শহর নির্মাণকালে পাথরের বোঝা টানতে গিয়ে আর কঠোর দৈহিক শ্রমে জর্জরিত হয়ে মারা গেলো শয়ে-শয়ে শ্রমিক-কারিগার।

এরকম অনেক সুকৃতি এবং দুষ্কৃতি আছে পিটারের। তাঁর আমলের শুরুতে রাশিয়ার শহরগুলো ছিলো কাঠের তৈরি। বার-বার এগুলো অগ্নিকাণ্ডে ছারখার হয় দেখে তিনি নির্দেশ দিলেন সবকটি কাঠের শহরকেই ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে পাথরে গড়তে হবে। সেন্ট পিটার্সবুর্গ শহরটাকে পুরোপুরি তিনি সাজিয়েছিলেন পাথরের দালানকোঠায়। স্থপতিদের সঙ্গে নিজেই দেখাশোনা করতেন শহরের নির্মাণ কাজ। মস্কো শহরকেও একইভাবে পাথর মুড়ে ঢেলে সাজানো হলো। রুশ ভাষা, বর্ণমালা আর পঞ্জিকারও সংস্কার করলেন।

মস্কোর প্যাটরিয়ার্ক-নির্ভর যাজকতন্ত্রের আধিপত্য হটিয়ে তার জায়গায় প্রতিষ্ঠা করলেন তিনি সিনোদ-প্রথা। যার প্রধান করা হলো জারকে। রুশ চার্চের ওপর হস্তক্ষেপ করায় পিটারকে 'অ্যান্টিক্রাইস্ট' তথা ধর্মদ্রোহী বলে ঘোষণা করে গোঁড়া যাজক শ্রেণী। তাঁর ছেলে আলেক্সেই জুনিয়র রক্ষণশীল যাজকদের ষড়যন্ত্রে যোগ দেওয়ায় তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হলো রাজদ্রোহের। কারাগারে ১৭১৮ সালে প্রিন্স আলেক্সেই মারা গেলেন নিষ্ঠুর নির্যাতনের শিকার হয়ে। ১৭২১ সালে পিটার নিজেকে 'তাবৎ রাশিয়ার সম্রাট' বলে ঘোষণা করলেন। সিংহাসনের উত্তরাধিকার প্রথা বিলোপ করে এক ফরমান জারি করলেন- ১৭২২ সালে। যার ফলে তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী রূপসী ক্যাথারিন পেলেন ভারতের মুগল সম্রাট জাহাংগিরের স্ত্রী বেগম নূরজাহানের মতো সম্রাজ্ঞীর মর্যাদা।

ভারতের সেকালের মুদ্রায় যেমন জাহাংগিরের পাশাপাশি নূরজাহানের মস্তক অংকিত থাকতো একইভাবে রুশ মুদ্রায়ও উৎকীর্ণ হলো পিটার আর ক্যাথারিনের ছবি। অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী দু'জন ছিলেন রাশিয়ার যুগ্ম শাসক। পিটার তার উত্তরাধিকার আইনের ফরমানে ঘোষণা করেছিলেন ক্ষমতাসীন জারের ইচ্ছার ওপরই নির্ভর করবে কাকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করা হবে। পিটারের এ আইনটি চালু ছিলো জার প্রথম পল-এর রাজত্বকাল পর্যন্ত। এবার ক্যাথারিন প্রসঙ্গে দু'-একটি কথা বলছি। ক্যাথারিন ছিলেন লিভোনিয়ার এক কৃষক ঘরের মেয়ে। তাঁর পৈতৃক নাম ছিলো মার্থা স্কাভ্‌রনোস্কায়া।১৭০২ সালে লিভোনিয়ার যুদ্ধে রুশ সেনাদের হাতে

www.pathagar.com

বন্দি হয় এই সুন্দরী গ্রাম্য যুবতী। তার ওপর নজর পড়ে পিটারের প্রধানমন্ত্রী আলেকজান্দার মেনশিকভের। তিনি বাঁদি হিসাবে তাঁর হারেমে রাখলেন মার্থাকে। এরপর একদিন হঠাৎ পিটারের সঙ্গে দেখা হলো মার্থার। তার ভুবনমোহিনী রূপে মুগ্ধ হয়ে পড়লেন সম্রাট। মেয়েটিকে স্থান দিলেন নিজের শয্যাপাশে।

মার্থা গোড়াতে ছিল মার্টিন লুথার প্রবর্তিত খ্রিস্ট ধর্মমতে বিশ্বাসী। পিটারের শয্যাশায়িনী হওয়ার পর দীক্ষিত হলো রুশ অর্থোডক্স ধর্মমতে। তার গ্রাম্য মার্থা নামটিও সে সঙ্গে মুছে গেলো। নতুন অভিজাত নাম হলো তার ক্যাথারিন। এই মেয়ের রূপের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে টিকতে পারলেন না পিটারের প্রথম স্ত্রী। এ নিয়ে বাধলো গৃহবিবাদ। জারিনাকে ১৭১১ সালে তালাক দিয়ে ক্যাথারিনকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে করলেন সম্রাট। ১৭২৪ সালে ক্যাথারিনের মাথায় উঠলো সম্রাজ্ঞীর মুকুট। পিটার এবং ক্যাথারিন যুগল এক সঙ্গে শাসন করতে লাগলেন রুশ দেশ।

পিটারের মতন একজন দ্বৈতচরিত্রের খামখেয়ালি রুশ সম্রাটকে অপার ভালোবাসা আর আনুগত্য দিয়ে বশে এনেছিলেন ক্যাথারিন। এ যেন অবিকল নূরজাহানের গল্প। বাঁদি থেকে নূরজাহানও সম্রাজ্ঞী হয়েছিলেন। ভালোবাসা আর আনুগত্যে জয় করেছিলেন স্বেচ্ছাচারী সম্রাট জাহাংগিরের মন। 'জগতের আলো' বলে উপাধি দেয়া হলো তাকে। অনেক সমাজ সংস্কারের কাজ করেন নূরজাহান। চেষ্টা করেন সনাতন হিন্দু সমাজের নিষ্ঠুর সতীদাহ-প্রথা বিলোপ করতে। চিত্রাংকনে এবং কাব্যচর্চায় উদ্বুদ্ধ করেন তিনি মুগল রাজকুমারীদের। তিনি নিজেও ছিলেন একজন সংবেদনশীল কবি। সাম্রাজ্যে শান্তি স্থাপনে তাঁর ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়।

এদিকে নারীদের জন্যে উদ্ভাবন করেন তিনি নকশা-আঁকা সালোয়ার-কামিজ-ওড়নার পোশাক রীতি। সুগন্ধি দ্রব্য বিশেষ করে গোলাপের নির্যাস থেকে আতর তৈরির নিয়মও তাঁর উদ্ভাবনা। ভারতে প্রথম আতরের ব্যাপক প্রচলন এই প্রতিভাময়ী-নারীর এক স্মরণীয় কীর্তি। 'কবর-ই নূরজাহান' কবিতায় বাংলার কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত অমর করে রেখে গেছেন এই বিদূষী সম্রাজ্ঞীকে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক এবং কথাশিল্পী হ্যারল্ড ল্যাম্ব 'নূর মহল' উপন্যাস রচনা করে নন্দিত করেছেন এক কালের হতভাগিনী এই রূপসী ললনাকে।

পিটারের মৃত্যুর পর ক্যাথারিন একচ্ছত্র জারিনা হলেন রুশ দেশের। সিংহাসন নিষ্কন্টক করার ব্যাপারে পিটারের প্রধানমন্ত্রী মেন্‌শিকভ এবং প্রাসাদের গার্ড রেজিমেন্ট সাহায্য করেছিলো ক্যাথারিনকে। রাশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠা আর বিরুদ্ধ মতের গ্রুপগুলোর সঙ্গে সমঝোতা ছিলো ক্যাথারিনের শাসননীতি। ১৭২৭ সালে তাঁর মৃত্যুর পর রুশ সম্রাট হলেন দ্বিতীয় পিটার। ১৭৪১ সালে দ্বিতীয় পিটার মারা গেলে ক্যাথারিনের মেয়ে এলিজাবেথ হলেন রুশ সম্রাজ্ঞী। অর্থাৎ এককালের কৃষক কন্যা মার্থা নিজের গুণাবলীর কল্যাণে আপন উত্তরাধিকারিত্ব অক্ষুন্ন রাখতে পেরেছিলেন রুশ সামন্ততন্ত্রের রাজা বদলের ষড়যন্ত্রের যুগেও।

www.pathagar.com

পুশ্‌কিন প্রসঙ্গে উঠলো পিটার দ্য গ্রেটের কথা। অনেক ব্যর্থতা আছে পিটারের। দুর্নীতিগ্রস্ত কায়েমি শাসন ব্যবস্থার সংস্কারে হাত দিলেও তার চেষ্টা উবে গেলো বাতাসে। নারীকে ক্রীতদাসীর স্তর থেকে তুলে আনবার পদক্ষেপও তাঁর কাজে আসলো না সামন্ত শোষণ চালু থাকায়। তিনি কৃষকদের উন্নয়নের জন্যে তেমন কিছুই করেননি। মানুষের স্বাধীনতা এবং সাম্যে তাঁর বিশ্বাস ছিলো না। রাষ্ট্রকে তিনি একটি যন্ত্র মনে করতেন। মনে করতেন সাধারণ মানুষের ভাগ্য বদলানোর চাইতেও রাষ্ট্রের স্বার্থ অনেক উপরে। একবার সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে দেওয়া এক ভাষণে তিনি বলেন, 'তোমরা জারের জন্যে যুদ্ধ করছো না। যুদ্ধ করছো দেশের জন্যে।' তাঁর এই কথাগুলো দেশপ্রেমের নিখাদ নিদর্শন। এর জন্যে এককালে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হতো তাঁর নাম।

কিন্তু কাজে খামখেয়ালি থাকায় তাঁর বেশিরভাগ সংস্কার পরিকল্পনাই ভেস্তে যায়। সামন্ত প্রথা উৎখাতের জন্যে কোনো পদক্ষেপই নেননি তিনি। এসব সত্ত্বেও আধুনিক রাশিয়ার নির্মাতা হিসাবে ইতিহাসে অনেক উঁচুতে তাঁর আসন। পশ্চিমা দুনিয়ায় তাঁর শাসনকালকে আঠারো শতকের 'পরিমার্জিত স্বৈরতন্ত্র' বলা হয়। মদে বুঁদ হয়ে থাকলেও প্রয়োজনের সময় দ্রুত সুস্থির হয়ে তিনি কাজ করতে পারতেন। আসলে প্রচুর শারীরিক শক্তি আর মনোবল থাকলেও দৈহিক শ্রমের চাপেই মারা গেলেন তিনি।

অনেকে তার বিশাল সংস্কার কর্মকান্ডকে ১৯১৭-র বলশেভিক বিপ্লবের ডাইনামিজমের সঙ্গে তুলনা করেন। এক সময় সোভিয়েত ইউনিয়নে পিটারকে তুলনা করা হতো 'স্তালিনের পূর্বগামী' হিসাবে। এখন অবশ্য তাঁর মন্দ দিকগুলোর সমালোচনা হচ্ছে।

গাড়িটা এসে থামলো নভোস্তি অফিসের সামনে। বিশাল একটি ভবন। নিচের তলার অভ্যর্থনা কক্ষে আমাদের জন্য আগে থেকেই অপেক্ষা করছিলেন সংস্থার সাংবাদিক এবং লেখকরা। অফিসের সামনে চওড়া একটি চত্বর। দেখতে অনেকটা গ্রিন হাউসের মতন। কাচ দিয়ে-ঘেরা জায়গাটার দু'ধারে নানা জাতের ফুল আর সবুজ লতানো গাছের সার-সার টব। বড়-বড় গোলাপের থোকা লাল পাপড়ি মেলে আছে কয়েকটি টবের ঝাড়ে। ছিমছাম বাড়িটিকে বাড়তি সৌন্দর্য যোগাচ্ছিলো সবুজ লতাপাতা আর ফুলের এই বাগানটা।

কাছেই দাঁড়ানো ছিলেন দীর্ঘকায় একটি লোক। লম্বায় বোধকরি ছয় ফুটের বেশি হবেন। মুখে আধাপাকা ফ্রেঞ্চকাট্ দাড়ি। বয়স পঞ্চাশের বেশি। সবার সামনে ছিলেন তিনি। পেছনে দশ-বারো জনের একটি দল। গাড়ি থেকে বেরুতে-বেরুতে পাবলভ বললো ঃ সামনের লোকটি উদালৃতসভ। এপিএন বোর্ডের চেয়ারম্যান। জানোই তো নভোস্তি প্রেস এজেন্সির সংক্ষিপ্ত নাম এপিএন।

'তাকে বললামঃ তোমাকে আর ব্যাখ্যা করে বলতে হবে না। রয়টার, এএফপি, এপি'র পাশাপাশি অবস্থান এখন এপিএন-এর। কত সংবাদ, সংবাদচিত্র আর

www.pathagar.com

নিউজ স্টোরিই তো আমরা ছেপে আসছি তোমাদের এই সংস্থার।

'তার জন্য অনেক ধন্যবাদ' বলতে-বলতে সামনে এগিয়ে গেলো পাবলভ। আমাদের সবার সঙ্গে একে-একে পরিচয় করিয়ে দিলেন উদাল্‌তসভ এবং অন্যদের সঙ্গে। 'স্বাগত' বলে উষ্ণ করমর্দনে সংবর্ধিত করলেন তারা আমাদের প্রতিনিধি দলের সদস্যদের। উদাল্‌তসভ নিজেই আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন অভ্যর্থনা কক্ষের দিকে। এই হল ঘরটিও ছিলো নিচের তলায়। এখানে জড়ো হয়েছিলেন আরো জনা চল্লিশেক সাংবাদিক, লেখক এবং ফটোগ্রাফার। কুশল বিনিময় হলো এঁদের সবার সঙ্গে। সামনের বড় টেবিলটার দু'ধারে বসলাম আমরা। মাঝখানে আসন নিলেন এপিএন চেয়ারম্যান। তাঁর দু-পাশে উস্তিনভ এবং পাবলভ। বাদবাকি আসনগুলোতে ছিলেন সংস্থার অন্যরা।

তাকিয়ে দেখলাম দেয়ালে টাঙানো ভূমণ্ডলের মানচিত্রের পাশাপাশি মহাদেশগুলোর আলাদা-আলাদা ম্যাপ। সামনের দেয়ালটিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রকাণ্ড দু'টি রাজনৈতিক এবং প্রাকৃতিক মানচিত্র। তার একপাশে বাংলাদেশের নতুন একটি ম্যাপ। মনে হলো ম্যাপটা দু'একদিন আগে স্থান পেয়েছে ওখানটায়। এক কোণে ছোট একটি মিউজিয়াম গ্যালারি। ওখানে পৃথিবীর নানান দেশের প্রতীকী সব নিদর্শন। বাংলাদেশের থাকটিতে আছে একটি গ্রামীণ চিত্র। একদল কৃষকের হাতে কাস্তে। তারা মাঠে নেমে ফসল কাটছে। কেউ কেউ আঁটি বাঁধছে। আরেকটি ছবিতে আছে বাড়ির আঙিনায় পাট শুকনোর দৃশ্য।

বুঝতে কষ্ট হলো না এখানকার সাংবাদিকরা একটি দেশকে কতখানি ঘনিষ্ঠভাবে দেখবার চেষ্টা করেন। সংবাদের পেছনে যে মানুষের ইতিহাস, তার চারপাশের প্রকৃতি আর দৈনন্দিন জীবন সংগ্রামের উপাখ্যান আছে যেন তাকে সঠিক নিরিখে বুঝতে চাইছেন এ দেশের নতুন প্রজন্মের নিউজম্যানরা। তার জন্যেই বোধকরি এই নিউজ মিউজিয়ামটিতে সাজানো প্রতিটি দেশের চালচিত্রের স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত এক কিংবা একাধিক নিদর্শন। তাছাড়া, এসব ছবির পাশে ঝোলানো একটি নোটশিটে লেখা আছে সংশ্লিষ্ট দেশের লোকসংখ্যা, ভৌগোলিক রূপরেখা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার, রাজনৈতিক ধারাক্রমের সংক্ষিপ্ত তথ্য ইত্যাদি। এতে দেশটির ওপর কোনো বিশেষ রিপোর্ট করতে গেলে তুলনামূলক বিশ্লেষণের সুযোগ পান একজন নিউজ কিংবা ফিচার রাইটার।

মনে-মনে লজ্জাবোধ করলাম এদের তথ্য পরিবেশনার আধুনিক এবং অতি অগ্রসর ক্রিয়াকৌশলের সঙ্গে আমাদের সাংবাদিকতার সেকেলে রীতির তুলনা করে। কম্পিউটার তো পঞ্চাশের দশকেই বিশ্বগামী করেছে সোভিয়েত প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে। এর ওপর আছে এখানকার প্রতিটি দৈনিক, সাপ্তাহিক এমনকি শিশু-কিশোর পত্রিকার অফিসেও তথ্যসমৃদ্ধ রেফারেন্স লাইব্রেরি আর ফটো-লাইব্রেরি। অর্থাৎ একটি দেরাজের সুইচ টিপলেই তাৎক্ষণিক যোগাযোগ সারা দুনিয়ার তথ্য সম্ভারের সঙ্গে। যা আমরা সত্তরের দশকে স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারিনি।

www.pathagar.com

ভাবলাম, কী দরিদ্রই না হয়ে আছি আমরা জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে। অর্থনীতির জরাজীর্ণ অবস্থার কথা না-হয় বাদই দিলাম। কথাটা উঠলে হাজার জন দেখাবেন হাজার যুক্তি। দোষ চাপাবেন এর-ওর ঘাড়ে। নয়তো অভিযুক্ত করবেন

তলস্তয়

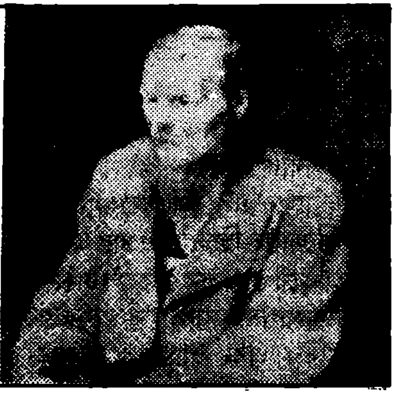

দস্তয়ভস্কি

অতীতের বঞ্চনা-ব্যর্থতাকে। এক চমৎকার কৌশল আয়ত্ত করেছি আমরা ছাতি মেলে ধরে বৃষ্টির ঝাপ্‌টা থেকে মাথাটা বাঁচাবার। এত দেশ ঘুরলাম কিন্তু কোথাও এরকমটা দেখিনি। সোভিয়েত দেশে তো নয়ই। এদের চোখ সামনের দিকে। পেছনকার কথা এরা আর মোটেও ভাবে না। যদিওবা কখনো পেছন ফিরে তাকায় তাহলে শিক্ষা নেয় তার তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে। আমার বিশ্বাস, এই সতর্ক পদচারণার জন্যই এতখানি বড় হতে পেরেছে এরা। মাত্র কয়েক বছরে রুশরা অতিক্রম করে এলো গোটা একটা মধ্যযুগ। পার হলো তার সমস্ত বন্ধ্যাত্ব এবং অন্ধকার। তাদের আধুনিক প্রযুক্তির প্রসার আর সংবাদ মাধ্যমের অবিশ্বাস্য অগ্রগতির আসল রহস্য তো এখানেই। নভোস্তি অফিসে বসে ভাবছিলাম এসব কথা। আর মনে মনে জপ করছিলাম আমাদের জাতীয় সাংবাদিকতার উজ্জ্বল দিনগুলোর স্মৃতি।

যখন কেউ দীনহীন হয়ে পড়ে আপনা থেকেই তখন সুখকর অতীতের ছবি ভাসে তার চোখের সামনে। অতীত এবং বর্তমানকে নিয়ে একটা তুলনামূলক বিচারও তখন নাড়া দেয় তাকে। সেদিন এ রকম এক বিচারের কাঠগড়ায় হঠাৎ এসে দাঁড়াতে হলো আমায়। নিজেই হলাম একই সঙ্গে বাদি এবং বিবাদি। সাংবাদিকতার পেশায় আছি বলেই বোধকরি এমনটা ঘটলো। মনে পড়লো ১৭৮০ সালের ২৯ জানুয়ারি দিনটির কথা। প্রাক-বিপ্লব যুগের রাশিয়ার মতো তখনো আমরা ঘানি টানছি মধ্যযুগের। অথচ সেদিন বাংলাদেশে আচম্বিতে এক যুগান্তর ঘটে গেলো। বেরুলো উপমহাদেশের প্রথম সংবাদপত্র 'বেঙ্গল গেজেট'।

উপমহাদেশ কেন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়ও সে যুগে আর কোনো সংবাদপত্রের অস্তিত্ব ছিলো না। অক্সফোর্ড থেকে প্রথম আধুনিক ধাঁচের কাগজ 'লণ্ডন গেজেট'

www.pathagar.com

বেরুবার শতাব্দীকালের মাথায় বেরিয়েছিলো 'বেঙ্গল গেজেট'। এর পেছনে জেমস হিকি নামের একজন প্রবাসী ব্রিটিশ সাংবাদিকের অবদান থাকলেও বাংলাদেশে সাংবাদিকতার গোড়াপত্তনে ঘটনাটির ঐতিহাসিক মূল্য কিন্তু অসামান্য। পরেকার তিন যুগের ব্যবধানে অর্থাৎ ১৮১৮ সালে পর পর বেরুতে থাকলো বাংলা সাময়িকপত্র 'দিকদর্শন', 'সমাচার দর্পণ', 'বাঙ্গালা গেজেটি' প্রভৃতি। ১৮১৮ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে বেরিয়েছিলো প্রায় দেড় হাজার বাংলা পত্রপত্রিকা।

বাংলাদেশের সেকালের সমাজ সংস্কারক এবং বুদ্ধিজীবীগণ সংবাদপত্রের সামাজিক-সাংস্কৃতিক আর রাজনৈতিক গুরুত্ব কতটা আঁচ করতে পেরেছিলেন কাগজের সংখ্যার এই বিপুল আয়তন থেকেই বিষয়টি বুঝতে পারা যায়। এই সংবাদপত্র-সচেতন প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন রাজা রামমোহন রায় (মাদ্রাসা-পাস মওলবি খেতাবধারী), কবি ঈশ্বর গুপ্ত, 'বিষাদ সিন্ধু' খ্যাত মীর মশাররফ হোসেন, কথাশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র ('বঙ্গ দর্শন' সম্পাদক), রবীন্দ্রনাথ ('সবুজপ' সম্পাদক), শেরে বাংলা ফজলুল হক ('বালক' সম্পাদক), মওলানা আকরম খাঁ, কবি সৈয়দ এমদাদ আলী প্রমুখ। সংবাদপত্রের নতুন যুগের ইতিহাসটা খোলা কেতাবের মতন উঁকি দিচ্ছিলো আমার ওপাশের জানালার বাইরে। খতিয়ে দেখলাম আমাদের দেশে সংবাদপত্রের অভ্যুদয় ঘটে বিলাতের প্রখ্যাত কাগজগুলো বেরুবার বেশকিছু আগে। আন্তর্জাতিক মানের এসব কাগজের মধ্যে ছিলো জন ওয়াল্টার প্রতিষ্ঠিত 'দ্য টাইমস' এবং লণ্ডনের কাগজ ডেইলি এক্সপ্রেস, ডেইলি টেলিগ্রাফ, ডেইলি হেরাল্ড আর ডেইলি মিরর প্রভৃতি।

এছাড়া ছিলো মর্নিং পোস্ট, ডেইলি ওয়ার্কার, দ্য নিউজ ক্রনিকল, দ্য স্টার প্রভৃতি। আঞ্চলিক পত্রিকাগুলোর মধ্যে প্রভাবশালী ছিলো ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান, ইয়র্কশায়ার পোস্ট এবং গ্লাসগো হেরাল্ড। বাংলা সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হয় 'ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান' (১৮২১) বেরুবার তিন বছর আগে। এটিও কালের নিরীক্ষায় মূল্যায়ন করবার মতো একটি ঘটনা। এদিকে ১৮৪০ এর দশকে প্রকাশিত প্রথম বাংলা দৈনিক 'সংবাদ প্রভাকর' ছিলো বিলাতের ডেইলি হেরাল্ড, ডেইলি মিরর এবং লেবার পার্টির মুখপত্র ডেইলি ওয়ার্কার-এর প্রায় সমকালীন কাগজ। হেনরি রেমণ্ড প্রতিষ্ঠিত নিউইয়র্ক টাইমস (১৮৫১) বেরোয় দৈনিক 'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশিত হবার বছর সাতেক পরে।

পশ্চিম ইউরোপের দেখাদেখি আঠারো শতকের দিকে রাশিয়ায় প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছিলেন পিটার দ্য গ্রেট (১৬৭২-১৭২৫)। কিন্তু প্রথম যুগের এসব কাগজের মান ছিলো একেবারেই কাঁচা। উনিশ শতকের মধ্য পর্বে- এদেশে বেশকিছু উন্নতমানের সাহিত্য সাময়িকী এবং দু' একটি দৈনিক কাগজ বেরিয়েছিলো। কিন্তু জারদের কঠোর বিধি- নিষেধের জন্যে দৈনিকগুলোতে সামাজিক এবং রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে তেমন কোনো আলোচনাই হতো না। সাহিত্যের কাগজগুলোতে লিখতেন রুশ গদ্য সাহিত্যের স্রষ্টা লমোনসভ,কারামজিন এবং

www.pathagar.com

অনুবাদক, জুকভস্কি। পরেই শুরু হয় পুশ্‌কিনের যুগ। ১৮৪২ সালে রুশ সাময়িক পত্রে বেরোয় গোগল -এর বিখ্যাত ছোট গল্প 'ওভারকোট'। এখান থেকেই শুরু হয় রুশ সাহিত্যের নতুন লংমার্চ। ১৮৪০-৫০ দশকের বাংলা সাহিত্যের মতোই এ সময় রুশ সাহিত্যে ছিলো দু'টি শ্রেণী।

একটি শ্রেণী ছিলো প্রো-ওয়েস্টার্ন। অন্যটি প্রো-রাশিয়ান। আমাদের যেমন ছিলো পশ্চিমাপন্থী ইয়ং বেঙ্গল গ্রুপ আর ঈশ্বর গুপ্তদের জাতীয়তাবাদী কিছুটা সনাতন পন্থী গ্রুপ। রুশ সাহিত্যে গোগল এই ধারাকে অতিক্রম করে জন্ম দিলেন রাশিয়ার জনজীবন এবং আপন মাটির রসে সিক্ত নতুন এক সাহিত্য। তুর্গেনিভ, দস্তয়ভস্কি, লেভ তলস্তয় এবং চেখভ ছিলেন এই নবযুগের অগ্রসাধক। রুশ দেশে উন্নতমানের সংবাদপত্রের যুগ শুরু হয় ১৯১১ সালের পরে। এ বছর গোপনে মস্কো থেকে জোসেফ স্তালিন বের করেন 'প্রাভদা'। যার মানে ট্রুথ অর্থাৎ 'সত্য'। এটি ছিলো বলশেভিক বিপ্লবীদের মুখপত্র। এর ছয় বছর আগে ১৯০৫ সালে 'যুগান্তর' দলের বিপ্লবীদের গোপন মুখপত্র হিসেবে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮০-১৯৬১)'র সম্পাদনায় কলকাতা থেকে বেরোয়া 'যুগান্তর' পত্রিকা। ভূপেন্দ্রনাথ তাঁর কাগজে ব্রিটিশবিরোধী লেখালেখির জন্যে ১৯০৭ সালে অভিযুক্ত হয়ে এক বছর জেল খাটেন। মুক্তি পেয়ে আমেরিকা পালিয়ে যান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে, ১৯১৬ সালে, ভারতের স্বাধীনতাকামীদের নিয়ে গঠিত বার্লিন কমিটির সম্পাদক হন।

এই বিপ্লবী সাংবাদিকের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা উলইয়ানভ্ লেনিনের অনেক আগে থেকেই পত্রালাপ ছিলো। ১৯২১ সালের ২৬ আগস্টে লেখা এক চিঠিতে লেনিন তাঁকে লিখলেনঃ প্রিয় কমরেড দত্ত, আপনার থিসিসটি আমি পড়েছি। সামাজিক শ্রেণী-স্তরের উপর এখন কোনো আলোচনা করতে চাই না। উপনিবেশবাদ প্রশ্নে যে থিসিসটি আমি লিখেছি সেটি আমাদের অনুসরণ করা উচিত। ভারতে কৃষকদের মিলিত কোনো সংগঠন থাকলে তার ওপর তথ্যাদি সংগ্রহ করুন। একান্ত-ভি, উলইয়ানভ্ (লেনিন)। এই চিঠিখানি ১৯৫২ সালে প্রথম মুদ্রিত হয়ে সাংবাদিক ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ রচিত এবং কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'ডায়ালেক্টস অভ্ ল্যাণ্ড-ইকনমিক্স অভ্ ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে।

আমাদের এ অঞ্চলের একজন প্রথিতযশা সাংবাদিকের সঙ্গে লেনিনের কতখানি ঘনিষ্ঠতা ছিলো হঠাৎ কথাটি মনে পড়ে যাওয়ায় চিঠিখানির ভাষ্য এখানে তুলে ধরলাম। এই যোগাযোগের সুবাদে ভূপেন্দ্রনাথ ১৯২১ সালে লেনিনের সঙ্গে দেখা করেন তাঁর মস্কো সফরকালে। ভূপেন্দ্রনাথের ছিলেন ভারতীয় বিপ্লবীদের একটি প্রতিনিধি দল। পশ্চিম ইউরোপ প্রবাসী এই রাজনৈতিক ডেলিগেশনের নেতা ছিলেন বার্লিনে গঠিত অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকারের নেতা প্রবীণ বিপ্লবী ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। সদস্য ছিলেন আমাদের সহকর্মী সাংবাদিক ফজলে লোহানীর পূর্বপুরুষ গোলাম আম্বিয়া খান লোহানী, বীরেন্দ্র দাশগুপ্ত, সৈয়দ আবদুল ওয়াহিদ, নলিনী গুপ্ত প্রমুখ।

www.pathagar.com

কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে ছিলো এই বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। বীরেন্দ্রনাথ প্রবীণ ব্যক্তি হলেও সাম্যবাদীদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গুছিয়ে বক্তব্য রাখতে না-পারায় তাঁর জায়গায় নেতৃত্ব দিলেন সাংবাদিক, সুলেখক এবং সুবক্তা গোলাম আম্বিয়া লোহানী। এর আগে ১৯২০ সালের ১৭ অক্টোবর তাসকন্দ শহরে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির গোড়াপত্তন হতে দেখা যায়। পার্টির সদস্য হয়েছিলেন বরিশালের বিপ্লবী আন্দোলনের নেতা এম এন রায়, তাঁর মার্কিন স্ত্রী ইভেলিনা রায়, লাহোরের ছাত্র মুহম্মদ আলী, মাদ্রাজের বায়াংকার আচার্য, রুশ মহিলা রোজা ফিটিংগভ, মুহম্মদ শফিক সিদ্দিকী এবং এ, মুখার্জিকে নিয়ে সাতজন। পার্টির সম্পাদক নির্বাচিত হন মুহম্মদ শফিক। এম এন রায় অর্থাৎ পরবর্তীকালের র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট দলের নেতা এবং 'দ্য অ্যাডভান্স গার্ড' দ্য মাসেস্ আর 'দ্য ভ্যানগার্ড' নামের তিন কাগজের সম্পাদক মানবেন্দ্রনাথ রায় ছিলেন তাসকন্দে গঠিত পার্টির মূল উদ্যোক্তা।

সাংবাদিক-রাজনীতিক এবং বিপ্লব সাধক এম এন রায়ের জীবন বৈচিত্র্যময়। মেক্সিকোতে থাকাকালে তিনি কমিউনিজমে দীক্ষিত হন। সেখানে প্রথমে সোশ্যালিস্ট পার্টি এবং পরে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী থাকাকালে পুলিশের নজর এড়ানোর জন্য ছদ্মনাম নিলেন। এই নামই হলো এম এন রায়। তাঁর মূল নাম ছিলো মনিন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

এক অসাধারণ প্রতিভাধর বাঙালি ছিলেন মানবেন্দ্রনাথ। প্রগতিবাদী চিন্তা এবং সুগভীর পান্ডিত্যের জন্য তিনি লেনিনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসবার সুযোগ পান। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় মস্কো কংগ্রেসে 'পরাধীন দেশে কমিউনিস্ট বিপ্লবের কর্মকৌশলের' ওপর লেনিনের প্রস্তাবের পরিপূরক আরেকটি প্রস্তাব রাখেন তিনি। লেনিনের অনুরোধেই প্রস্তাবটি তোলেন রায়। কংগ্রেসে দুই প্রস্তাবই পাস হলো। পরে তিনি কমিন্টার্ন তথা কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের নির্বাহী সদস্য হয়েছিলেন।

কথা বলছিলাম 'প্রাভদা' এবং রাশিয়ায় সংবাদপত্রের বিকাশ প্রসঙ্গে। মস্কো থেকে 'প্রাভদা' সেন্ট পিটার্সবুর্গে গেলে লেনিন কাগজটির পরিচালনার ভার নিলেন। হলেন অন্যতম সম্পাদক। এটি ১৯১৩ সালের ঘটনা। তখন থেকে জননন্দিত হতে শুরু করলো এ কাগজ। সোভিয়েত সংবাদপত্রের ইতিহাসে বৈপ্লবিক মোড় পরিবর্তনের সূচনা হলো পরের চার বছরের মধ্যে। অর্থাৎ উনিশ শ' সতেরোর অক্টোবর বিপ্লবকালে। 'প্রাভদা' হলো তখন থেকে পার্টির সরকারি মুখপত্র। নভোস্তি অফিসে আমাদের সংবর্ধনা ভাষণে সোভিয়েত সংবাদপত্রের এই মাইলফলকটির ওপরই প্রমানত বক্তব্য রাখলেন উদাল্‌তসভ।

লিখছিলাম মস্কো ভ্রমণের কথা। তেইশ বছর আগেকার সেই ছবিগুলো ভোরের তারার মতন মিট্‌মিট করে জ্বলছিলো স্মৃতিতে। হঠাৎ ভল্গা- ডনের সেই দেশ থেকে ফিরে আসতে হলো বুড়িগঙ্গা পারের এই শহরে। এখানে হারিয়ে গেলো আরেকটি প্রিয় মুখ। মাত্র সপ্তাহ তিনেক আগে অবিচ্যুয়ারি লিখেছিলাম শওকত ওসমানের

www.pathagar.com

ওপর। এত শিগ্‌গির আরেকটি লিখতে হবে কল্পনাও করিনি। যেন জানান না-দিয়েই চলে গেলো দাউদ খান মজলিস। যেন এই মাত্র দৈনিক সংবাদ-এর পুরনো অফিসের চৌকাঠে মাড়িয়ে পা দিয়েছিলো সে বংশাল রোর্ডে আর দেখতে দেখতেই উধাও। দাউদ আমার আগে চলে যাবে এটা মাথায় আসেনি একবারও। ১৩ জুন দুপুরে হঠাৎ একটা টেলিফোন পেয়ে ধড়ফড়িয়ে উঠলো বুকটা। এক বয়স্ক সাংবাদিক ফোনের ও-প্রান্ত থেকে বললেনঃ খবরটা কী শুনেছেন ? তাঁর স্বরে কেমন যেন একটা দুঃসংবাদের আভাস।

ঃ কিসের খবর! একরাশ উৎকণ্ঠা নিয়ে জানতে চাইলাম।

ঃ আজ সকাল পৌনে আটটায় মারা গেছেন দাউদ খান মজলিস। সংগে সংগে জবাব দিলেন তিনি। নিজের থেকেই বললেনঃ হার্টফেল করেছেন। আজ বাদ আসর বায়তুল মুকাররম মসজিদে জানাজা।

ঘেমে নেয়ে উঠলো শরীরটা। কেমন সুস্থ, সবল আর প্রাণোচ্ছল ছিলো দাউদ। আমার চেয়ে বছর দুই তিনেকের ছোট। অথচ সে-ই চলে গেলো আগে। আর ভাবতে পারছিলাম না। সারাদিন ভারাক্রান্ত হয়ে থাকলো মনটা। কফিনে- শায়িত দাউদকে শেষবারের মতন দেখে আসবো সে উপায়ও ছিলো না। কারণ শয্যাগত ছিলাম কয়েক দিন ধরে। শুধু বুকের মধ্যে ধরে রেখেছিলাম শোক। আর একান্তে সাঁতার কেটে চলছিলাম ফেলে আসা দিনগুলোর ভাটির নদীতে।

চোখে ভাসলো উনিশ শ' একান্নর একগুচ্ছ গোলাপের মতন মুখ। সেই উজ্জ্বল মুখগুলিরই একটি দাউদ। ওই বছর ৪৮ নম্বর বংশাল রোডের বাড়ি থেকে বেরুলো দৈনিক সংবাদ পত্রিকা। বেরুবার আগে বেশ তোড়জোড় চলছিলো। এক মাস আগেই যোগ দিয়েছিলাম নিউজ ডেস্কে। একদিন দেখি এক কিশোর এসে হাজির বার্তা বিভাগের মাঝারি গোছের হল ঘরটায়। বয়স সতেরো-আঠারোর মাঝামাঝি। ছিমছাম সুন্দর চেহারা। বড় বড় চোখ। লম্বায় ছয় ফুটের কম হবে না। একবার দেখলেই মনে দাগ কাটে। সৈয়দ আবদুল মান্নান বসিয়ে দিলেন ওকে টেবিলে। তখন কাগজের নমুনা-কপি অর্থাৎ ডামি-সংখ্যা বেরুচ্ছিলো। তরুণ সম্পাদক খায়রুল কবীর সংবাদ-পরিবেশনা এবং লেখালেখির মান যাচাই না- করে হুট করে কাগজ বের করতে রাজি ছিলেন না। তখন বার্তা সম্পাদকের পদে কাউকে নিয়োগ দেয়া হয়নি। সৈয়দ মান্নানই বার্তা বিভাগের সব কাজ তদারক করতেন। কলকাতায় থাকতে দৈনিক আজাদে ছিলেন তিনি শিফট ইনচার্জ। তাছাড়া কবি হিসাবেও খ্যাতি ছিলো তাঁর। ইকবালের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'আসরার-ই-খুদি'র বাংলা কাব্যানুবাদ করে এর আগেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন।

খায়রুল কবীরের চেয়েও বছর আট-দশেকের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন মান্নান ভাই। আমার চেয়ে তো ঢের বেশিই ছিলো তাঁর বয়স। বোধকরি সাঁইত্রিশ-আটত্রিশে পা দিয়েছিলেন। খায়রুল কবীর তখন ঊনত্রিশের সিঁড়িতে। এত অল্প বয়সে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ছাড়া আর কেউ দৈনিক কাগজের সম্পাদক হতে পারেননি।

www.pathagar.com

১৯২০ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক 'নবযুগ'-এর যখন সম্পাদক হন, নজরুলের বয়স ছিলো তখন কেবল একুশ। তাঁর তারুণ্যের দীপ্তি এবং কবি-মানসের বিদ্রোহ কি সংবাদ- শিরোনাম কি সম্পাদকীয় কলাম সব কিছুতেই ছাপ ফেলেছিলো। নবযুগ পত্রিকার অসামান্য জনপ্রিয়তার মূলে ছিলো সম্পাদকের আধুনিক দৃষ্টিভংগির পাশাপাশি পাঠকশ্রেণী তথা দেশবাসীর প্রতি তার দায়বদ্ধতা অর্থাৎ কমিটমেন্ট।

নবযুগ পত্রিকার প্রথম প্রকাশের ত্রিশ বছর পরে ঢাকা থেকে বেরুলো দৈনিক সংবাদ। সম্পাদক খায়রুল কবীরও ছিলেন আধুনিক-মনস্ক একজন সাংবাদিক। তিনি চেয়েছিলেন সাধারণ মানুষের সমস্যা এবং দুঃখ- দুর্গতির কথা উঠে আসুক কাগজের প্রতিবেদনে, সম্পাদকীয় নিবন্ধে আর চিঠিপত্র কলামে। চেয়েছিলেন সাহিত্য বিভাগ, মহিলা বিভাগ, শিশু-কিশোরদের বিভাগ, খেলাধুলা, চলচ্চিত্র ইত্যাদি সব বিভাগেই দৃষ্টিনন্দন গেটআপ-মেকআপের পাশাপাশি সুরুচির প্রকাশ ঘটুক।

বামপন্থী কিংবা প্রগতিশীল বলতে আধুনিক অর্থে যা বোঝায় তিনি সেই পংক্তির কেউ না হলেও চিন্তার দিক থেকে প্রগতিবাদী এবং মুক্তবুদ্ধির লোক ছিলেন। লেখক এবং সাংবাদিকদের ব্যক্তিগত মতাদর্শ যাই হোক তারা ভালো লিখতে, অনুবাদ করতে আর পরিচ্ছন্ন মেকআপে কাগজ সাজাতে পারেন কিনা সেটিই ছিলো তাঁর প্রধান বিবেচ্য। এক কথায় বলতে গেলে চিন্তার পরিপক্কতায় নিজের বয়সের চাইতেও বেশি অগ্রগামী ছিলেন কবীর ভাই। নিঃসন্দেহে উদার এবং প্রশস্ত দৃষ্টিভংগির একজন মানবিকতাবাদী সাংবাদিক ছিলেন তিনি।

কাগজের জন্যে লোক বাছাইয়ের ব্যাপারে এই দৃষ্টিভংগিটি ছিলো তার ইয়ার্ডস্টিক অর্থাৎ মাপকাঠি। তাঁর কথা ছিলোঃ যে-আদর্শই তুমি বুকের ভেতর ধরে রাখো সেটা তোমার একান্ত নিজের ব্যাপার। কিন্তু যখন কোনো কাগজে কাজ করতে আসবে সেই কাগজের নীতি তখন তোমার পুরোপুরি মেনে চলতে হবে। সামান্য ইতি-উতিও চলবে না। আর সব থেকে বড় কথা হলো তুমি কেমন লিখতে পারো সেটা। লেখার কোয়ালিটিই হলো একজন লীডার-রাইটার, রিপোর্টার কিংবা কলাম-লেখকের বড় গুণ। যেমন অনুবাদে পারঙ্গমতা হলো একজন সাব-এডিটরের কৃতিত্বের মানদণ্ড। বলতেন, তোমাকে বিচার করবো তোমার কাজ দিয়ে। অন্য কোনো বিবেচনা দিয়ে নয়।

কবীর ভাইয়ের চরিত্রে সেকালের বর্ষীয়ান সাংবাদিক মোহাম্মদ মোদাব্বেরের অনেক মিল দেখতে পাই। মোদাব্বের সাহেব ছিলেন বিশ-ত্রিশ দশকের প্রখ্যাত সাংবাদিক মওলবি মুজিবুর রহমানের ছোট ভাইয়ের ছেলে। মুজিবুর রহমান ছিলেন অসহযোগ-খিলাফত আন্দোলনের সাপ্তাহিক ইংরেজি মুখপত্র 'দ্য মুসলমান'-এর সম্পাদক এবং নিখিল বঙ্গ কংগ্রেসের সভাপতি। মহাত্মা গান্ধীর ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন তিনি। ব্রিটিশ-বিরোধী লেখালেখির জন্যে জেল খেটেছেন বার কয়েক। মোহাম্মদ মোদাব্বেরের সাংবাদিকতার হাতে-খড়ি এই প্রবীণ সাংবাদিক-রাজনীতিকের

www.pathagar.com

কাছে। তখন মোদাব্বেরের বয়স ছিলো পনেরো। চব্বিশ পরগনার বশিরহাট মহকুমা শহর সংলগ্ন রাজেন্দ্রনাথ হাই স্কুলে ক্লাস টেনে পড়তেন।

'ইতিহাস কথা কয়' স্মৃতিগ্রন্থে মোহাম্মদ মোদাব্বের তাঁর শৈশব এবং সাংবাদিক জীবনের প্রসংগ টানতে গিয়ে লিখেছেনঃ আমার লেখাপড়ায় হাতে-খড়ি পণ্ডিত

মোহাম্মদ মোদাব্বের

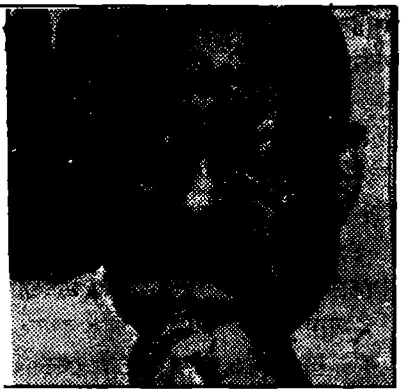

দাউদ খান মজলিস

ক্ষেত্রনাথ দে'র পাঠশালায়। অংক না-পারলে পণ্ডিত মশাই ছাত্রের পিঠ লাল করে দিতেন বেত্রাঘাতে। মারের চোটে অনেকে প্রায় কাপড় ভিজিয়ে ফেলতো। এই স্কুল থেকে প্রাইমারি পাসের পর বাবা-মা'র ইচ্ছায় ভর্তি হতে হয় গ্রামের জুনিয়র মাদ্রাসায়। দুই বছরের মাথায় আধা-মওলবি হলাম। পাড়ায় মিলাদ পড়ি, মানুষ মরলে কুরআন খতম করি, সন্ধ্যা-সকালে মসজিদে আজান দেই। গায়ে মুসল্লির লেবাস, সব সময় টুপি চড়ানো থাকে মাথায়।....একদিন গ্রামের মধ্য ইংরেজি স্কুলের হেডমাস্টার ধরে নিয়ে গিয়ে বিনা বেতনে ভর্তি করিয়ে দিলেন তাঁর স্কুলে। এখান থেকে মাইনর পরীক্ষায় ভালো ফল করায় বিখ্যাত ব্যবসায়ী স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি প্রতিষ্ঠিত হাইস্কুলে বিনাবেতনে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ ঘটলো।

স্মৃতিকথায় আরো লিখলেনঃ এই স্কুলে ১৯২১ সালে ক্লাস নাইনের ফাইনাল পরীক্ষা দেয়ার সময় শুরু হয়ে গেলো অসহযোগ আর খিলাফত আন্দোলন। গান্ধীজি নেতৃত্ব দিচ্ছেন। সঙ্গে আছেন মওলানা মুহাম্মদ আলী, শওকত আলী- দুই ভাই। আর আছেন ডাঃ আনসারি, হযরত মুহানি, মতিলাল নেহরু, বালগঙ্গাধর তিলক এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। এঁদের পাশে ছিলেন মওলানা আকরম খাঁ, বড় চাচা মওলবি মুজিবুর রহমান, যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত প্রমুখ। খবর পেলাম দেশ মুক্তির আন্দোলনের জন্যে এঁদের অনেককেই গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হয়েছে।

পরেকার ভাষ্যটি এ রকমঃ বশির হাটের বিখ্যাত মজুমদার বাড়ির ছেলে দীনেশের সংগে বেশ অন্তরঙ্গতা ছিলো আমার। সে ছিলো আমার এক বছরের সিনিয়র। আমার ক্লাস টেনে ওঠার পর দীনেশ কলকাতায় গিয়ে কলেজে ভর্তি হলো।

www.pathagar.com

বিপ্লববাদের ওপর লেখা বই দীনেশই পড়তে দিতো আমায় গোপনে। এসব বই পড়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ঘৃণা ধরে যায় আমার। কলকাতায় অসহযোগের নেতাদের গ্রেফতারের খবর শুনে মনে তোলপাড় সৃষ্টি হলো। বড় বোনের একটা গরু সাত টাকায় বেচে দিলাম। সেই টাকা ভাঙিয়ে সাত আনার টিকেট কিনে চেপে বসলাম কলকাতার ট্রেনে। গ্রামের এক বন্ধুর কলকাতার মেসে দু'দিন থেকে গেলাম কংগ্রেস অফিসে। এক নেতাকে আন্দোলনে যোগ দেবার ইচ্ছা কথা জানালে তিনি পিকেটিং আর পুলিশের লাঠিপেটা সইতে পারবো কিনা জিজ্ঞেস করলেন। মাথা নেড়ে হ্যাঁ-সূচক সায় দিলে আমাকে থাকতে দেয়া হলো কংগ্রেস অফিসে।

সেই থেকে গোটা এক বছর স্বদেশী আন্দোলনের সংগে জড়িত থাকলেন তিনি। কিন্তু বয়স কম বলে পুলিশ তাদের মতো ছেলেদের জেলে না-পাঠিয়ে কলকাতা থেকে মাইল কয়েক দূরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিতো। কাউকে না-জানিয়ে বাড়ি থেকে তাঁর পালিয়ে কলকাতা আসবার সংবাদ কানে গেলো মুজিবুর রহমানের। তিনি ডেকে এনে তাঁকে 'দ্য মুসলমান' পত্রিকার অফিসে ঠাঁই দিলেন। সাংবাদিকতা শেখার তালিম দিতে থাকলেন নিজের ভাইয়ের ছেলেকে। এভাবে একজন সাংবাদিক হয়ে উঠতে থাকলেন মোহাম্মদ মোদাব্বের। কিন্তু রাজনীতির মোহও ছাড়তে পারলেন না তিনি। তাঁকে আকৃষ্ট করে বিপ্লববাদ। ১৯২১ সালে কংগ্রেসের এলাহাবাদ অধিবেশনে হযরত মুহানির পূর্ণ স্বাধীনতা প্রস্তাবের সমর্থকদের একজন ছিলেন তিনি। শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহে বিশ্বাসী মহাত্মা গান্ধীর বিরোধিতার জন্যে প্রস্তাবটি নাকচ হলেও নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু এবং তাঁর অনুগামী দলের সমর্থন ছিলো এর পক্ষে। ১৯২৮ সালে উদারপন্থী বিপ্লবীদের নিয়ে সুভাষ চন্দ্র হিন্দুস্তান 'রিপাবলিকান আর্মি' গড়ে তুললে মোহাম্মদ মোদাব্বের এই দলে যোগ দিলেন। সন্ত্রাসবাদী সংগঠন 'অনুশীলন পার্টির' উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতা শচীন সান্ন্যাল এর আগে 'হিন্দুস্তান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন' নামে গঠন করেছিলেন একটি নতুন বিপ্লবী রাজনৈতিক দল। তিনি দলটিকে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতামুক্ত বলে ঘোষণা করলেও তাঁর আগেকার উগ্রতাবাদের জন্যে মুসলিম বিপ্লবী তরুণদের পাশাপাশি নতুন বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত হিন্দু যুবকরাও এই দলটিকে প্রত্যাখ্যান করলো।

দলে-দলে শচীন সান্ন্যালের অনুশীলন পার্টির কর্মীরা যোগ দিতে থাকলেন সুভাষ বসুর রিপাবলিকান আর্মিতে। 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স' এর মেজর যতীন দাসও যোগ দিলেন সুভাষ বসুর রিপাবলিকান আর্মিতে। সুভাষ তাঁর রচিত 'দ্য ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল' গ্রন্থে এ সময়কার রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ওপর আলোকপাত করেছেন। পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায় ছিলেন সরাসরি স্বাধীনতার দাবিদার। তাঁর নেতৃত্বেই নরমপন্থী কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বাম গ্রুপের অভ্যুদয় ঘটে। ১৯২৮ সালে লাহোরের এক জনসভায় ব্রিটিশ নির্যাতনের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনার অভিযোগে তাকে বেদম প্রহার করেন পুলিশ সুপার স্কট আর তাঁর সহকারী সন্ডার্স। এই পুলিশি উৎপীড়নে অল্প কয়েক দিনেই মারা গেলেন লাজপৎ রায়।

www.pathagar.com

এই মর্মান্তিক মৃত্যুতে ঘৃণায় এবং ক্ষোভে জ্বলে উঠলো গোটা উপমহাদেশ। বিপ্লবীরা সন্ডার্সকে হত্যা করে লাজপৎ রায়ের খুনের প্রতিশোধ নেয়। ১৯৩০ সালের ৭ অক্টোবর লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় সন্ডার্স সাহেবকে হত্যার অপরাধে মৃত্যুদন্ডে দণ্ডিত করা হলো ভগৎ সিং, শুকদেব এবং রাজগুরুকে। মোহাম্মদ মোদাব্বের তাঁর স্মৃতিকথায় দুঃখ প্রকাশ করে লিখলেনঃ একত্রিশ সালের ২৩ মার্চ এদের ফাঁসি হলেও গান্ধীজি মুখ খুললেন না। তিনি ওইদিন গান্ধী-আরউইন চুক্তির বিষয়বস্তু নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন ভাইসরয় লর্ড আরউইনের সংগে কথাবার্তায়।

মোদাব্বের সাহেব 'দ্য মুসলমান' পত্রিকার সহ-সম্পাদক থাকাকালেই বিপ্লবীদের জন্যে অস্ত্র সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন- উত্তর পশ্চিম সীমান্তের এক পাঠান সর্দারের কাছে। এটি ছিলো ব্রিটিশের অধিকারের বাইরের নিউট্রাল জোন। এখানকার দুর্ধর্ষ ব্রিটিশ বিরোধী নেতা ছিলেন তুরঙ্গজাই গোত্রে'র সর্দার হাজী পীর। মোহাম্মদ মোদাব্বের 'রিপাবলিান আর্মির' প্রতিনিধি হয়ে ১৯৩২ সালে এর সংগে দেখা করতে গেলেন তাঁর পার্বত্য দুর্গে। এর আগে এমএন রায়, সুভাষচন্দ্র বসু এবং মওলানা আজাদ দেখা করেছিলেন এই বিপ্লবী সীমান্ত নেতার সংগে।

মওলানা আজাদ তখন ছিলেন বিপ্লবীদের সংগে। সুভাষ বসু দু'বার হাজী পীরের সংগে দেখা করে ভারতের মুক্তিসংগ্রামের জন্যে চেয়েছিলেন অস্ত্র সাহায্য। এম এন রায় খায়বারের কিছু যুবককে কমিউনিজমে দীক্ষা দিয়ে রাশিয়া চলে গিয়েছিলেন। আর যোগাযোগ করেননি। ১৯২৮ আর '২৯ সালে হাজী পীরের সংগে কথা বলে যান সুভাষ বসু। পাঠান নেতা আলোচনাকালে পাঁচ হাজার রাইফেল আর দু'লাখ বুলেট দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন মোদাব্বের সাহেবকে। বললেনঃ অস্ত্রের দাম আমি নেবো না। তবে বাংগাল মুলুকে এগুলো নিয়ে যাবার দায় আপনাদের। সুভাষ বসু সম্পর্কে বললেনঃ বোস সাহেব একজন ভালো লোক। নেক আদমি। তাঁকে বলবেন- খায়বারে ইসলাম আর স্বাধীনতার নিশান নিচু হতে দেবো না আমরা।

ভাবতে অবাক লাগে হাল্কা- পাতলা ছিপছিপে গড়নের এই সাংবাদিক মানুষটি এককালে ছিলেন এক ডাকসাইটে বিপ্লবী। ১৯৩৬ সালের দিকে তিনি কলকাতায় দৈনিক আজাদের বার্তা সম্পাদকের দায়িত্ব নিলেন। ১৯৪৬ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রতিষ্ঠিত দৈনিক ইত্তেহাদ বেরুবার সময় পর্যন্ত একটানা দশ বছর ছিলেন তিনি আজাদ-এর প্রতাপশালী বার্তাপ্রধান। কলকাতার সংবাদপত্র মহলে বেশ নামডাক ছিলো তাঁর একজন যোগ্য বার্তা সম্পাদক হিসাবে। এদিকে তখন প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক ছিলেন তিনি। পরিচালক ছিলেন আজাদ-এর শিশু বিভাগ 'মুকুল-মহফিলে'র।

খায়রুল কবীর তাঁর হাতেই নিয়েছিলেন সাংবাদিকতার তালিম। আজাদ-এর চীফ রিপোর্টার হয়েছিলেন তাঁর আমলে। মোদাব্বের ভাই ইত্তেহাদে যোগ দেবার পর হয়েছিলেন বার্তা সম্পাদক। বাছাইকরা নবীন-প্রবীণ সাংবাদিক নিয়ে নিউজ ডেস্ক সাজিয়েছিলেন মোহাম্মদ মোদাব্বের। এই বিভাগে লোক নিয়োগের ব্যাপারে

www.pathagar.com

তিনিই ছিলেন সর্বেসর্বা। কড়া মেজাজের লোক হলেও ভেতরটা ছিলো তাঁর নরম। কোনো সাব-এডিটর অনুবাদে ভুল করলে তাকে ডেকে এনে বলতেনঃ 'কাল থেকে আর এসো না।' কিন্তু সেই মৌখিক পদচ্যুত সাংবাদিক দু'একদিন বাদে তার কাছে এসে দাঁড়ালে তাকে চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলতেন। কোনো কথা না-বলে নিউজশীট বাড়িয়ে দিতেন তার দিকে। ঝাঁঝালো গলায় বলতেনঃ বুঝে- শুনে কাজ করো। আর যেন ভুল না-হয়।

খায়রুল কবীর নম্রভাষী হলেও তাঁর মতোই ছিলেন উদারচেতা। কবীর ভাই বাম-ডান নির্বিশেষে কাজ জানা নবীন প্রবীণ সাংবাদিক নিয়ে সাজিয়ে ছিলেন তাঁর কাগজ। এ কারণেই দৈনিক সংবাদে যেমন তিনি সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন সৈয়দ আবদুল মান্নান, হাকিম আবদুল মান্নান, মোহাম্মদ ওয়ালী উল্লাহ্ (লাল কোর্তা) প্রমুখ ধর্মনিষ্ঠ কিন্তু অভিজ্ঞ সাংবাদিকদের তেমনি তাঁদের সংগে সহ-অবস্থান ঘটালেন ফজলে লোহানী, তসাদ্দুক হোসেন, আনিস চৌধুরী, তাসিকুল আলম, আবদুর রাজ্জাক, খোন্দকার আবু তালেবের মতন নবীন প্রগতিপন্থীদের। অপেক্ষাকৃত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক কাজী মুহম্মদ ইদ্রিস, আবু জাফর শামসুদ্দীন, জহুর হোসেন চৌধুরী, সৈয়দ নূরুদ্দিন এবং সিকান্দার আবু জাফর, শুধাংসু চক্রবর্তী প্রমুখ ছিলেন মাঝখানে। দাউদ খান মজলিস, কবি হাবীবুর রহমান, সৈয়দ রেদওয়ানুর রহমান, তোহা খান আর আবদুল খালেক, রফিউদ্দিন খোন্দকার, গফফার চৌধুরীসহ আমাদের বেশ কয়েকজনের ঠাঁই হয়েছিলো এই দলে। এবিএম মূসা ছিলো তখন সংবাদ-এর চট্টগ্রাম প্রতিনিধি। দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট সম্পাদক মাহবুবুল আলম ছিলো কাগজের মুনশিগঞ্জ সংবাদদাতা এবং সেখানকার হরগঙ্গা কলেজের ছাত্র।

দাউদ খান মজলিস প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে অনেকের কথা উঠলো। দাউদ ছিল লাজুক এবং মিতভাষী। কিন্তু বেশ রসবোধ ছিলো ওর। একান্ন'র সেই বিকেলেই আমার সঙ্গে প্রথম পরিচয় এবং আলাপ। গায়ে ছিলো ওর সাদা ধবধবে পায়জামা-পাঞ্জাবি। বেশ ধোপদুরস্ত থাকতো। সাদা পোশাকে চৌকস দেখাতো তাকে।

কখনো-কখনো আসতো শার্ট-প্যান্ট পরে। চোখে পুরু কাচের চশমা পরতে দেখেছি তখন থেকেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তো বলে ইভনিং তথা নাইট শিফটে আসতো। এ সুবিধা তাকে দিয়েছিলেন কবীর ভাই। লাজুক স্বভাবের হলেও কাজেকর্মে ছিলো বেশ চটপটে। পঞ্চাশ সালের দিকে বছর খানিক কাজ করেছিলো দৈনিক 'ইনসাফ'-এ।

'ইনসাফ' তখন বেরুতো বংশাল রোডের বলিয়াদি প্রিন্টিং হাউস থেকে। প্রেসটি ছিলো এই রোডের শেষ মাথায়। ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের পুবে আর্মানিটোলা এবং সাত রওয়াজা সংলগ্ন আবুল হাসানাত রোডের মোড়ের বাঁ-দিক ঘেঁষে। 'ইনসাফ'-এর সম্পাদক ছিলেন মহিউদ্দিন আহ্মদ। ইনি কলকাতার কয়েকটি কাগজের সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কবিতা নাকি লেখতেন সেসব কাগজে। আমার সঙ্গে মহিউদ্দিন সাহেবের পরিচয় ছিলো।

www.pathagar.com

'সংবাদে' যোগ দেয়ার আগে দাউদ কিছুদিন কাজ করেছিলো দৈনিক 'ইনসাফে'। এই কাগজটি বেরিয়েছিলো ১৯৫০ সালে। সম্পাদক ছিলেন মহিউদ্দিন আহ্‌মদ। মহিউদ্দিন ছিলেন কুমিল্লার পয়ালগাছার বিখ্যাত মিয়াবাড়ির লোক। মিয়ারা ছিলেন এককালে এলাকার সম্ভ্রান্ত জমিদার। এ কারণেই পয়ালগাছার ডাকনাম। যেমন ডাকনাম ছিলো বৃহত্তর বরিশালের শায়েস্তাবাদ, উলানিয়া, ফেনির কৈয়ারা, লক্ষ্মীপুরের শমসেরনগর আর লাকসামের নবাববাড়ির। কবি সুফিয়া কামালের কৈশোর কেটেছে শায়েস্তাবাদের নবাববাড়িতে। এটি ছিলো তাঁর নানার বাড়ি। এ বাড়ির অন্দরমহলেই নয়-দশ বছর বয়সে শুরু হয় তাঁর কাব্যচর্চা।

উলানিয়ার চৌধুরী বাড়িতে অনেক বুদ্ধিজীবী এবং সাহিত্যিক-সাংবাদিকের জন্ম। আবদুল গাফফার চৌধুরী, বাহাউদ্দিন চৌধুরী এই পরিবারেরই সন্তান। বিচারপতি আব্দুর রহমান চৌধুরীও এসেছেন এই পরিবার থেকে। কৈয়ারা মিয়াবাড়ির মাতুলালয়ে শৈশব কেটেছে সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং জাতীয় অধ্যাপক প্রফেসর শামসুল হকের। ত্রিপুরার স্বাধীনতা যোদ্ধা শমসের গাজীর স্মৃতিবিজড়িত লক্ষ্মীপুরের শমসেরনগর। এই গ্রামেও বহু বিখ্যাত ব্যক্তির জন্ম। কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামের খ্যাতি সেখানকার কাজী বংশের জন্য। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগের ঔপন্যাসিকা, নবাব ফজিলুতুন্নেসা চৌধুরানীর বাড়ি লাকসাম-দৌলতগঞ্জের চৌধুরী বাড়ি। মহারানী ভিক্টোরিয়া 'নবাব' উপাধি দিয়েছিলেন ফজিলুতুন্নেসাকে।

সৈয়দ, খোন্দাকার, মিয়া এবং চৌধুরীদের নামাঙ্কিত এরকম অনেক গ্রাম আছে বাংলাদেশে। নারীমুক্তি আন্দোলনের মহীয়সী নেত্রী বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের জন্ম রংপুর জেলার বিখ্যাত পায়রাবন্দ গ্রামে। এই গ্রামটি বিখ্যাত ছিলো সেখানকার মিয়া বংশের জন্যে। রোকেয়ার পিতা জহিরুদ্দিন মুহাম্মদ আবু আলী সাবের এই বংশেরই লোক। 'অবরোধবাসিনী', 'সুলতানার স্বপ্ন' (উপন্যাস), 'মতিচুর', 'পদ্মারাগ' (নির্যাতিতা নারী সমাজের ওপর লেখা) প্রভৃতি আলোড়ন তোলা গ্রন্থের লেখিকা রোকেয়া তাঁর পরিবারের অবরোধ ভেঙে উঠে আসেন আলোর জগতে। ১৮৮০ সালে পায়রাবন্দের মিয়া বংশে তাঁর জন্ম। পরলোকগত স্বামী ম্যাজিস্ট্রেট সাখাওয়াত হোসেনের স্মৃতিতে ১৯১১ সালে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা রোকেয়ার এক অনন্য কীর্তি। এটি ছয় বছর পরে হাইস্কুল এবং পরে কলেজে রূপলাভ করে। রোকেয়ার পায়রাবন্দ গ্রামের বাড়িটি ১৯৮৭ সালে দেখবার সুযোগ হয়েছে আমার। তখন বাড়িটির জীর্ণদশা।

পয়ালগাছার মিয়াবাড়ির কথা বলছিলাম। এই বাড়ির মহিউদ্দিন আহ্‌মদ কবি নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর কোন কবিতা অবশ্য আমার চোখে পড়েনি। তিনি কলকাতায় সাংবাদিকতা করতেন। দেশ বিভাগের পর ঢাকায় এসে 'দৈনিক আমার দেশ' নামে একটি কাগজ বের করেন। পুরনো 'সংবাদ' অফিসের কাছেই ছিলো এর অফিস। অর্থকষ্টে কাগজটি বন্ধ হয়ে গেলে বলিয়াদি প্রিন্টিং হাউসের মালিক লতিফ সিদ্দিকী একটি নতুন দৈনিক বের করবার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানালেন।

www.pathagar.com

এই কাগজটিরই নাম হলো দৈনিক 'ইনসাফ'। ১৯৫০ সালে 'ইনসাফ'-এর আত্মপ্রকাশ। মহিউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে আগে থেকেই আমার ঘনিষ্ঠতা ছিলো। আলাপ-ব্যাপারে অত্যন্ত মার্জিত ছিলেন তিনি।

'ইনসাফ'-এর সম্পাদক হলেন মহিউদ্দিন আহমদ। সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দিলেন কাজী মোহাম্মদ ইদ্রিস, খোন্দকার আব্দুল হামিদ, সন্দ্বীপের 'অলিগান্ধী' নামে পরিচিত প্রবীণ সাংবাদিক মোহাম্মদ উল্লাহ্ এবং হাসান হাফিজুর রহমান। অবিভক্ত বাংলার মুসলিম লীগের প্রাদেশিক সেক্রেটারি, বিখ্যাত বাগ্মী ও পণ্ডিত আবুল হাশিম ১৯৪৪ সালের দিকে 'মিল্লাত' নামে একটি বাংলা সাপ্তাহিক বের করেছিলেন। হাশিম সাহেব ছিলেন কাগজটির সম্পাদক। কাজী ইদ্রিস ছিলেন ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক। বদরুদ্দিন উমরের পিতা রাজনীতিক-চিন্তাবিদ আবুল হাশিম। খোন্দকার হামিদ সহকারী সম্পাদক হিসাবে কাজ করতেন ১৯৪৬ সালে কলকাতায়, শহীদ সোহরাওয়ার্দি প্রতিষ্ঠিত ও আবুল মনসুর আহ্মদ সম্পাদিত দৈনিক 'ইত্তেহাদে'। হাসান ছিলো সেসময় খ্যাতনামা তরুণ কবি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।

'ইনসাফ'-এর বার্তা সম্পাদক হিসাবে যোগ দিলেন আজাদ-এর সে সময়কার শিফট-ইনচার্জ কে জি মুস্তাফা। মুস্তাফা নূরুল ইসলাম হলেন 'ইনসাফ'-এর স্টাফ রিপোর্টার। আজাদ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বনিবনা না-হওয়ায় এরা বিদ্রোহ করেছিলেন এবং চলে এসেছিনে এই নতুন কাগজে। প্রতিভাশালী সাংবাদিক খোন্দকার তালেবও এই দলে ছিলেন। অগোচরে কাজ করেতন 'ইনসাফে'। শিক্ষানবিস সাব-এডিটর হিসাবে কাজ করতো দাউদ, এবিএম মূসা এবং নূরুল ইসলাম পাটোয়ারি প্রমুখ। মফস্বল বিভাগ দেখতেন সন্দ্বীপের মওয়াহিদুল মওলা চৌধুরী। মওলা সাহেব বিভিন্ন কাগজে মফস্বল সম্পাদক হিসাবে কাজ করেছেন। এছাড়াও ছিলেন আরো কিছু প্রতিভাশালী সাংবাদিক। এদের মধ্যে ছিলেন বাহাউদ্দিন চৌধুরী এবং আহমদ জামিল প্রমুখ। কাজী ইদ্রিস, খোন্দকার হামিদ, হাসান হাফিজুর রহমান, এবিএম মূসা, নূরুল ইসলাম পাটোয়ারি এবং কে জি মুস্তাফা এরা সাতজন পরে জাতীয় দৈনিকের সম্পাদকের পদে অলংকৃত করেন।

একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। ১৯৪৭ সালে 'দৈনিক জিন্দেগি' নামে ঢাকা থেকে বেরিয়েছিলো প্রথম বাংলা ডেইলি। সম্পাদক ছিলেন কথাশিল্পী-সাংবাদিক কাজী আফসার উদ্দিন আহ্মদ। এসএস বজলুল হক ছিলেন প্রকাশক। কাগজটির আয়ু ছিলো মাত্র এক মাস। এই কাগজের ৪৮ নম্বর বংশাল রোড অফিস থেকেই একান্ন সালে বেরোয় দৈনিক 'সংবাদ'। 'ইনসাফ'-এর সাংবাদিকদের অনেকেই যোগ দিলেন এই নতুন কাগজে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা মাসিক পঞ্চাশ-একশ' কি বড়জোর সোয়াশ' টাকা বেতনে সাব-এডিটর, রিপোর্টার এবং সম্পাদকীয় লেখকের কাজ করতো। ঢাকার বিখ্যাত জমিদার বংশ বলিয়াদির সিদ্দিকী পরিবারের লতিফ সিদ্দিকী ছিলেন কাগজটির প্রতিষ্ঠাতা-প্রকাশক। তিনি নিজে প্রশাসনিক কাজকর্ম দেখবার সুযোগ পেতেন না।

www.pathagar.com

তাঁর পক্ষে ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বে ছিলেন সাংবাদিক-কর্মচারীদের কাছে মাসী-মা নামে খ্যাত এক আধাবয়সী স্থূলকায়া মহিলা।

সেকালে অমন পুরুষালি ব্যক্তিত্বের স্মার্ট মহিলা আমার চোখে কমই পড়েছে। ম্যানেজমেন্টের লোকেরা উঠতো-বসতো তাঁর কথায়। তিনি নাকি ঢাকার সেকালের মিটফোর্ড মেডিক্যাল স্কুল থেকে এলএমএফ পাস করেছিলেন। সিদ্দিকী সাহেবের ছোটবেলার সহপাঠী ছিলেন। তবে পত্রিকার অফিস এবং প্রেসেই সীমাবদ্ধ ছিলো মহিলার দাপট। সিদ্দিকী পরিবারের অন্দরমহলে প্রবেশাধিকার ছিলো না তাঁর।

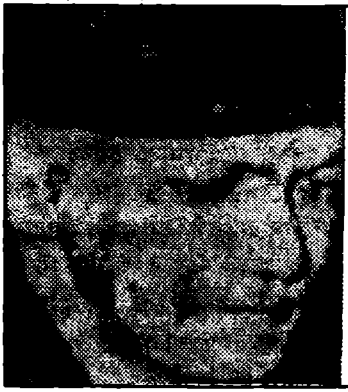

আবুল হাশিম

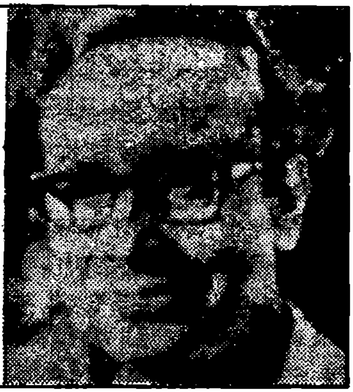

হাসান হাফিজুর রহমান

সেখানে ছিলো অবরোধ প্রথা। মহিলারা পর্দা করে চলতেন। সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা সহপাঠী ছেলেদের থেকেও নিরাপদ দূরত্বে থাকতো। ঘোড়ার গাড়িতেই তারা বেশি চলাচল করতো। এই অশ্বশকটই ছিলো সেকালের ঢাকার প্রধান যানবাহন।

কয়েকটি জমিদার পরিবার, ধনী ব্যবসায়ী, মন্ত্রিবর্গ, সচিব এবং ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার আর জেলা প্রশাসকসহ পদস্থ ব্যক্তিরা ব্যবহার করতেন মোটরগাড়ি। হাইকোর্টের জজেরাও এই সুযোগটি পেতেন। টেনেটুনে তখনকার সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাজধানীতে শ' আড়াইয়েক ওল্ড মডেলের গাড়ি ছিলো। ১৯৪৭ সালের জুলাইতে আমি যখন ঢাকায় আসি তখন ছিলো বৃটিশ যুগ। কোর্ট বিল্ডিংয়ে উড়তো ইউনিয়ন জ্যাক।

ঢাকার নবাব খাজা হাবিব উল্লাহ, লায়ন সিনেমার মালিক আব্দুল কাদের সর্দার, বলিয়াদি-বলদা-রূপবাবুর পরিবার আর সাধনা ঔষধালয়ের বিখ্যাত কবিরাজ অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষের মোটরগাড়িসহ ঢাকার রাস্তায় চলাচল করতো এ ধরনের পঁচিশ থেকে ত্রিশটি যন্ত্রচালিত যান। এর মধ্যে একটি ছিলো বিভাগীয় কমিশনারের। অন্যটি ছিলো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি'র।

ঢাকায় তখনো টাউন সার্ভিস কিংবা স্কুটার চালু হয়নি। রিকশা কেবল চালু হতে শুরু করেছিলো। সাতচল্লিশের জুলাইতে ঢাকার পৌরসভার সূত্র থেকে জানা যায়- ঢাকায় রিকশার সংখ্যা মাত্র চল্লিশটি। আর ঘোড়ার গাড়ি আড়াইশ'। কচ্ছপের

www.pathagar.com

খোলের মতন দেখতে চার-পাঁচটি যাত্রীবাহী বাস চলাচল করতো ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের মধ্যে। ঢাকা-মিরপুরের কাঁচা সড়কে চলাচল করতো মাত্র একটি বাস।

একবার এক সাহিত্য সভা উপলক্ষে আমি গিয়েছিলাম মিরপুরের জমিদার বাবুদের বাড়ি। এই লক্করমার্কা বাসে করে যেতে হয়েছিলো। গরমের দিন ছিলো। কাঁচা রাস্তার ধুলায় বোঁজা-বিড়ালের মতো সাদা হয়ে গিয়েছিলো চোখ-মুখ-মাথা মায় তাবৎ শরীর। দীঘিতে নেমে পরিচ্ছন্ন হওয়ার চেষ্টা করলেও ময়লা ছাড়াতে পারিনি। সেই বিদঘুটে দৃশ্যটা আজো মনে পড়ে আমার।

বর্ষাকালের অবস্থাটা তো ছিলো আরো করুণ। কাদায়-আবর্জনায় লেপ্টে থাকতো বাসগুলো। যেন উঠে এসেছে নর্দমা থেকে। কাদা আর পানির কল্যাণে একসা হয়ে যেতো যাত্রীদের পরিষ্কার জামাকাপড়। ঢাকা তখনো মুগল আমলের প্রথম দিককার ঐতিহ্য বয়ে চলছিলো। সেকালে কাঁচা রাস্তাই ছিলো মুগলদের এই প্রাচ্য-রাজধানীর চলাচলের স্নায়ুতন্ত্রী। বিদেশি পর্যটকদের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, বর্ষাকালে রাস্তা এবং রাস্তার দুপাশের ডোবাগুলো পশুর মৃতদেহ, আবর্জনা আর কাদাপানিতে থক্-থক্ করতো। এখানে সেখানে সুবাদার, নায়েব-সুবাদার, দেওয়ান, ফৌজদার আর পদস্থ শাহি কর্মচারিদের বেশকিছু জৌলুসদার ইমারত থাকলেও সূত্রাপুর, নবাবপুর, বাংলাবাজার, রায় সাহেব বাজার, লালবাগ, নবাবগঞ্জ প্রভৃতি এলাকার নব্বই শতাংশ বাড়িই ছিলো কাঠের। ছুতারদের কারখানা আর কাঠের আড়ত থেকে ছুতারপুর তথা তার বিবর্তিত রূপ 'সূত্রাপুর' কথাটির উৎপত্তি। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের মস্কোর মতো এই নগর ইসলাম খাঁ, মীরজুমলা, মুর্শিদকুলি আর শায়েস্তা খাঁর আমলে কয়েকবার ছারখার হয়েছিলো আগুনে পুড়ে। বেশিরভাগ বাড়িঘর কাঠের তৈরি হওয়ায় গরমকালে সহজেই ঘটতো অগ্নিকান্ড।

আওরংগজেবের পুত্র শাহজাদা মির্জা আজম নাকি ঢাকায় প্রথম একটি ইটের তৈরি পাকা সড়ক করেছিলেন। বাংলাদেশের কোনো শহরেই এর আগে কোনো পাকা সড়ক হয়নি। বৃটিশ এবং ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর এক বিবরণে বলা হয়, পাকা সড়কটি দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয় ঢাকার লোকজন। তারা হাজারে হাজারে ভিড় করে এটি দেখতে। শাহজাদা আজম ছিলেন তখন বাংলার সুবাদার। তিনি এক বছর ঢাকায় ছিলেন। রাজশাহী-মালদা'র সুস্বাদু আম খেয়ে প্রশস্তিসূচক চিঠি লিখেছিলেন তাঁর বাবা বাদশাহ আলমগীরের কাছে।

আওরংজেবের পত্রাবলী ('খত-ই-আলমগিরি')-তে স্থান পেয়েছে আজমের লেখা এই ঐতিহাসিক চিঠিখানি। আজমের পর ঢাকায় সুবাদার হয়ে আসেন নবাব শায়েস্তা খান। তিনি দুই দফায় মোট ছাব্বিশ বছর শাসন করেন এই অঞ্চল। তাঁর দীর্ঘ শাসন-আমলেই ঢাকার বাড়িঘর আর রাস্তাঘাটের সংস্কার শুরু হয়। ঘোড়া, গাধা আর খচ্চরের গাড়ির প্রচলন সেসময়কার ঘটনা।

অভিজাত মহিলারা সেকালে অবরোধবাসিনী হয়ে থাকতেন। শায়েস্তা খাঁর যুগের তিনশ' বছর পর ঢাকায় এসে দেখলাম ঘোড়ার গাড়িতে করে কোথাও যেতে হলে

www.pathagar.com

ডাবল প্রোটেকশনের ব্যবস্থা আছে মহিলাদের জন্যে। দরজা-জানালা বন্ধ করবার পর আবার পুরো শকটটি ঢেকে দেয়া হতো কালো কিংবা রঙিন চাদরে। এয়ারটাইট হয়ে ভেতরে থাকায় হাঁসফাঁস করতেন মহিলারা ভেতরকার গুমট-গরমে।

পঞ্চাশের পর থেকে আস্তে-আস্তে পাল্টাতে থাকে এই সাবেকি রেওয়াজ। আটচল্লিশে সদরঘাট- নবাবপুর-ইসলামপুর আর লালবাগ আজিমপুর-পলাশী এলাকায় প্রথম চালু হলো যাত্রীবাহী টাউন- সার্ভিস। দিনে দিনে বাড়তে লাগলো রিকশা আর মোটরগাড়ির সংখ্যা। আর কমতে থাকলো শায়েস্তাখানি আমলের পংখিরাজ শকট। অর্থাৎ ঘোড়ায়-টানা গাড়ির সংখ্যা। তার সংগে তাল মিলিয়ে স্ফীত হতে থাকলো জনসংখ্যার খতিয়ান। সাতচল্লিশের এক লাখ কুড়ি হাজারের কোটা থেকে বাড়তে বাড়তে জনসংখ্যা এই আটানব্বই সালে এসে দাঁড়ালো প্রায় এক কোটিতে। বিশ্বের সব চেয়ে জনাকীর্ণ বারোটি মেগাসিটির একটি এখন ঢাকা।

এই শহরেই দাউদ এবং সংবাদপত্রের সেকালের তরুণ আমরা সবাই বেড়ে উঠি। পায়দল হেঁটে গভীর রাতে নিউজের কাজ সেরে ফিরি বাড়ি। বংশালের পুব মাথায় ছিলো 'সংবাদ' অফিস। সেখান থেকে রাত তিনটায় বাড়ি ফেরার পথে শিকার হই খেঁকি কুকুরের ভয়ংকর গলাবাজি আর সংঘবদ্ধ আক্রমণের। বাধ্য হই সবাই মিলে ইট ছুড়ে কিংবা লাঠি বাগিয়ে সারমেয়কুলের হামলা রুখতে।

সারা মাস চলি উঞ্ছবৃত্তি করে। পত্রিকা মালিকেরা এক সংগে দিতে পারতেন না মাসের পুরো বেতন। অনেক সময় ঈদের সময়ও নিতে হতো দশ-বিশ টাকা করে দেয়া ভাঙা-ভাঙা বেতন। চিকিৎসা ভাতা, বাড়িভাড়া, বোনাস ইত্যাদি তো ছিলো সোনার হরিণ। এ রকম কষ্টের মধ্যেও কিন্তু একটা স্বস্তি ছিলো আমাদের মনে। সেটা ছিলো সাংবাদিকতার কাজের আনন্দ। মনে হতো সারা দেশের মানুষকে সমাজ আর দুনিয়ার সুখ- দুঃখের খবর পৌঁছে দিয়ে এক বিরাট দায়িত্ব পালন করছি আমরা কিছুসংখ্যক নাইট-বার্ড।

পাঁচ-দশ টাকা করে বেতন পেলেও এই একান্ত অনুভূতিটি ঘুঁচিয়ে দিতো অহোরাত্র শ্রমের ক্লান্তি। অবশ্য বাহান্ন'র পর থেকে আমরা সংবাদপত্রকে বাঁচানোর পাশাপাশি নিজেদের বাঁচবার সংগ্রামের দিকে ঝুঁকতে থাকি। এভাবেই আস্তে-আস্তে গড়ে ওঠে সংবাদপত্রে গঠনমূলক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন। দাউদ এই আন্দোলনে ছিলো। ভালো অফার পেয়ে ছাপ্পান্ন সালের দিকে সে ইউসিসে যোগ দেয়। প্রায় তেরো-চৌদ্দ বছর সেখানে থাকে। স্বাধীনতার পরে-পরে হয় পিআইডি'র মহাপরিচালক এবং কিছুকাল পরে এফডিসি'র নির্বাহী পরিচালক। উচ্চারণ নিখুঁত এবং দরাজগলা ছিলো বলে রেডিও'র নিউজ-রীডার হিসাবে পঞ্চাশ দশক থেকেই তার খ্যাতি।

এদিকে 'ফার ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউ'সহ কয়েকটি আন্তর্জাতিক কাগজের প্রতিনিধি হিসাবে তার নাম ছড়ায় বহির্বিশ্বে। ৭৮-৮১ সালে রাষ্ট্রপতি জিয়ার তথ্য উপদেষ্টা হিসাবে সাংবাদিকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার। আশির দশক থেকে উনিশশ' সাতানব্বই পর্যন্ত ভয়েস অভ্ আমেরিকার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ডেস্কের

www.pathagar.com

ব্যুরোপ্রধান হিসাবে অসাধারণ তার কৃতিত্ব। আমেরিকার একটি নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়েও কিছুদিন করেছিলো শিক্ষকতা।

১৯৯২ সালে শেষবার দাউদের সংগে আমার দেখা ওয়াশিংটনে। ভয়েস অভ্ আমেরিকায় তাৎক্ষণিকভাবে আধঘন্টার একটি বাংলা প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করেছিলো আমার জন্যে। ম্যাগডোনাল্ড হোটেলে অন্তরঙ্গ পরিবেশে আপ্যায়িত করেছিলো আমায় লাঞ্চে। তার তাগিদেই ১৯৭৯ সালে 'দৈনিক দেশ' পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়েছিলাম। দীর্ঘ সাতচল্লিশ বছর অটুট ছিলো আমাদের বন্ধুত্ব। তাকে আমরা ইংরেজি অনুকরণে দাউদের বিকল্প হিসাবে ঠাট্টা করে বলতাম ডেভিড। সে আমার নামের পদবি শুরুতে এনে মশকরা করতো।

গত বছর কখন সে অবসর নিয়ে ঢাকা ফিরে এসেছে জানতাম না। জানতাম না তার অসুস্থতার খবর। শুধু শেষ মুহূর্তে পেলাম শোক সংবাদটি। এভাবেই চলে গেলেন সৈয়দ মান্নান, সৈয়দ নূরুদ্দিন, জহুর ভাই, আনিস চৌধুরী, ফজলে লোহানী। শেষে গত বছর চলে গেলেন কবীর ভাইও।

চলে গেলেন আবু তালেব, রেজ্জাক চৌধুরী, তোহা খানসহ বন্ধুদের আরো অনেকে। আমরা যে-ক'জন বেঁচে আছি হঠাৎ বোধকরি ঝরে যাবো অমন করেই। বয়স্ক না-হতেই যারা চলে গেলো তাদের স্মৃতি বেশি ভারাক্রান্ত করে রাখে মনটাকে। ভোরের শিউলির মতো শুভ্র, উজ্জ্বল সেই মুখগুলো। আহমেদুর রহমান, মোজাম্মেল হক, ফরিদ উদ্দিন। দেখা হতো পত্রিকার অফিসে, প্রেসক্লাবে, রাস্তায় চলবার সময়। দেখা হলেই হাত তুলে আন্তরিক অভিবাদন। ঠোঁটে ফুটে উঠতো পুষ্পগন্ধমাখা এক টুকরো মিষ্টি হাসি। এ রকম নির্মল, সুরভিত হাসি ভোলা যায় কী কখনো? অথচ অকালে হারিয়ে গেলো এরা।

প্রেসক্লাবের পরিবেশটা ছিলো তখন ভিন্ন মেজাজের। তরুণদের সঙ্গে প্রবীণরাও এসে জমজমাট করতেন আসর। আসতেন সম্পাদক মুজিবুর রহমান খাঁ, মানিক মিয়া, জহুর হোসেন চৌধুরী। প্রায়শই হাজির হতেন খায়রুল কবীর, সৈয়দ নূরুদ্দিন, আবদুল গণি হাজারি। অবজার্ভার সম্পাদক আবদুস সালাম খেয়াল হলেই ছুটে আসতেন। সাংবাদিক হলেও মননের দিক থেকে ছিলেন তিনি একজন দার্শনিক। আত্মভোলা ছিলেন অনেকটা দর্শনশাস্ত্রী জিসি দেবের মতন। ক্লাবে এলেই চায়ের আড্ডায় বসতেন, তাস খেলতে বসতেন তরুণদের সঙ্গে। ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স হলেও চমৎকার দখল ছিলো তাঁর বাংলার ওপর।

এ রকম ভালো মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি। আমার সঙ্গে বয়সের তফাৎ তাঁর আঠারো বছরের। কথাবার্তায় কিন্তু কখনো এ-ব্যবধানটা তাঁকে মনে রাখতে দেখিনি। অন্তরঙ্গ জনের মতোই আমায় 'নূরী ভাই' বলে সংবোধন করতেন। আমি তাঁকে বলতাম 'সালাম ভাই'। 'সাংবাদিকতার ক্রমবিবর্তন'-এর ওপর আমরা দু'জন একটি টেলিভিশন প্রোগ্রাম করেছিলাম ১৯৭৬ সালে। স্মৃতিটি প্রায়ই মনে উঠে আসে আমার। সালাম সাহেব তখন বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক।

www.pathagar.com

তাঁর হাতেই গোড়াপত্তন এ সংস্থার।

সেই টেলিভিশন প্রোগ্রাম উপলক্ষে সালাম ভাই এসেছিলেন আমার বড় মগবাজারের বাসায়। এখন থেকে বাইশ বছর আগের ঘটনা সেটি। তারিখ মনে নেই। চোখে কম দেখতেন তিনি সে সময়। বাসার লম্বা বারান্দায় ছিলো হলুদ রংয়ে-ঢাকা তারের পার্টিশন। মুক্তিযুদ্ধের সময় হানাদাররা যাতে বাইরে থেকে বাড়ির ভেতরকার হালচাল বুঝতে না-পারে তার জন্যে নিজেরাই ব্যবস্থাটা করেছিলাম। রামপুরার টেলিভিশন ভবনের দিকে যাত্রার সময় দরজার হদিস করতে না-পেরে হঠাৎ তারের পার্টিশনটিতে ধাক্কা খেলেন সালাম ভাই। পড়ে যাবার আগেই তাঁকে ধরে উঠিয়ে দিলাম।

তাঁর গাড়িতে করেই গেলাম টিভি অফিস। সন্ধ্যার দিকে দু'জন ঢুকলাম স্টুডিওতে। উপস্থাপনার ভার দিলেন তিনি আমাকে। বিনয়ের সঙ্গে বললেনঃ জানেনই তো বুড়ো হয়ে গেছি। সবকিছু আর মনে রাখতে পারি না। আমাকে দু'একটি প্রশ্ন করে ছেড়ে দেবেন। মূল কথা বলতে হবে আপনাকেই। অনুষ্ঠান শেষে টিভি প্রযোজক বললেনঃ খুব সুন্দর প্রোগ্রাম হয়েছে এটি। বয়স হলেও এডিটর সাহেবের গলা এখনো বেশ পরিষ্কার।

আমায় রাতের দিকে মগবাজারের ঠিকানায় পৌঁছে দিয়ে নিজের ঘরে ফিরে গেলেন সালাম ভাই। এরপর বার কয়েক তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে-৩ নম্বর সার্কিট হাউস রোডে। পিআইবি অফিসের নিচের তলায়। মাঝেমধ্যেই যেতাম দেখা করতে।

মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ *আবুল কালাম শামসুদ্দিন* *আবদুস সালাম*

তিনি খুশি হতেন আমাকে পেলে। পিআইবি'র কাজ কেবল হাঁটি-হাঁটি করে শুরু হয়েছে। সংবাদপত্র অফিসের মতন সাংবাদিক- দর্শনার্থীর ভিড় ছিলো না সেখানে। এখনকার সিনিয়র ডিরেক্টর গোলাম কিবরিয়া ছিলেন সম্ভবত তাঁর একমাত্র সহকারী। আর ছিলো দু-তিনজন পিয়ন এবং সাধারণ বিভাগের কিছু লোক।

www.pathagar.com

বোধকরি সাতাত্তরের জানুয়ারিতে সকালের দিকে গেলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। তীব্র শীত। বারান্দায় ফক্ ফক্ করছিলো রোদ। আমাকে দেখে মুখখানা উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো তাঁর। চেয়ার থেকে উঠে বললেনঃ চলুন, বারান্দায়। রোদে শরীর তাতানো যাবে। আরাম করে চা-ও খাওয়া যাবে। বারান্দায় পাতানো সোফায় বসে অনেক গল্প হলো। সাংবাদিকতা, সাহিত্য, বই পড়া, রাজনীতি ইত্যাদি নিয়ে অনেক কথা। কেমন করে পিআইবি সাজাবেন সে নিয়ে পরামর্শ চাইলেন। তাঁকে প্রথমে একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরি গড়ে তুলবার কথা বললাম। বললামঃ সাংবাদিকতার ইতিহাস, আধুনিক রেফারেন্স পুস্তক আর অন্যান্য জ্ঞানগর্ভ বইয়ের অভাবে আমাদের সাংবাদিকরা বাধ্য হচ্ছে শামুকের খোলে বাস করতে।

চায়ের সঙ্গে এলো সিঙ্গারা, সন্দেশ। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে-দিতে কথার জের টেনে বললামঃ বই সংগ্রহের কাজটা আগে করুন। কোন্ কোন্ সংস্থা থেকে বই পাওয়া যাবে তারও হদিস দিলাম। দিন কয়েক বাদে গিয়ে তাজ্জব হলাম। দেখি প্রচুর দামি-দামি বই শোভা পাচ্ছে তাঁর কামরা আর পাশের কামরায়।

তখন তাঁর বয়স সাতষট্টির কোঠায়।। ওই বয়সেও কাজে বেশ তৎপর ছিলেন। দার্শনিক স্বভাবের আপনভোলা সরল মানুষ হলেও স্মৃতি ছিলো প্রখর। তাঁর সাজানো রাশি-রাশি মূল্যবান বইয়ের লাইব্রেরি আর একটি শিশু-প্রতিষ্ঠানকে বড় আকারে গড়ে তুলবার রূপরেখা সাক্ষ্য দিচ্ছিলো ধারণাটির। আজকের বিস্তীর্ণ অবয়বের প্রেস ইনস্টিটিউট ছিলো তাঁরই মানস সন্তান। এ কথা সত্য, একটি অব্যক্ত বেদনা তাঁর ভেতরটাকে খেয়ে চলছিলো কুরে-কুরে। যে-অবমাননার মুখে সম্পাদকের পদে তাঁকে ইস্তফা দিতে হলো সেটি নিশ্চয় ছিলো তাঁর জন্যে এক প্রচণ্ড আঘাত। এই নিদারুণ যন্ত্রণা কর্মশক্তি থাকা সত্ত্বেও শীতল হাত বাড়িয়েছিলো তাঁর আয়ুর ওপর।

প্রেস ইনস্টিটিউটের দায়িত্ব নেবার মাত্র মাস কয়েকের ব্যবধানে, ১৯৭৭-এর ১৩ ফেব্রুয়ারি, মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন প্রজ্ঞাপারঙ্গম সম্পাদক আবদুস সালাম। এখন আমার যা আয়ু তার তিন সিঁড়ি নিচে ছিলো তখন তাঁর বয়স। দুঃখবোধ মানুষকে দ্রুত কেমন করে যবনিকাপাতের দিকে টেনে নেয় এই মহীরুহের আচম্বিৎ ঝড়াঘাতে পতন তার এক মর্মান্তিক দৃষ্টান্ত।

অনেকটা এ রকম দুঃখবোধ নিয়েই অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিন, মুজিবুর রহমান খাঁ এবং জহুর হোসেন চৌধুরী। শামসুদ্দিন সাহেবের সঙ্গে আত্মমর্যাদাবোধ, দৃষ্টিভংগি আর চালচলনে অনেক মিল ছিলো সালাম ভাইয়ের। দু'জনই তাঁরা ছিলেন রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রবল সমর্থক, মুক্তবুদ্ধির প্রবক্তা এবং গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা আর সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষের লোক। ১৯৫২ সালে বাংলা ভাষার মিছিলে লীগ সরকারের নির্বচার গুলিবর্ষণ এবং ছাত্র হত্যার তীব্র নিন্দা করে দৈনিক অবজার্ভার পত্রিকায় সম্পাদকীয় লিখলেন সালাম ভাই। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের বিপক্ষের ইংরেজি দৈনিক 'মর্নিং নিউজ'-এর বাংলাবাজার অফিস ২২ ফেব্রুয়ারি পুড়িয়ে দেয় বিক্ষুব্ধ ছাত্রজনতা। এ ঘটনার আগে একটি

www.pathagar.com

তির্ষক সম্পাদকীয় লেখার অজুহাতে তেরো ফেব্রুয়ারি অবজার্ভার বন্ধ করে দেয় নূরুল আমিন সরকার। জেলে পোরা হলো সম্পাদক আবদুস সালামকে!

ভাষা আন্দোলনকালে জেলে না-গেলেও ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য পদে ইস্তফা দিয়ে মুসলিম লীগের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেছিলেন শামসুদ্দিন সাহেব। সরকারের বর্বরতার কঠোর নিন্দা করে সম্পাদকীয় লিখেছিলেন তাঁর কাগজ দৈনিক আজাদ-এ। মেডিক্যাল কলেজ ছাত্রাবাসের সামনে ২২ ফেব্রুয়ারি পুরনো ইট দিয়ে ভিত গেঁথেছিলেন তিনি প্রথম শহীদ মিনারের।

উনিশশ' পঞ্চাশ থেকে বায়াত্তর পর্যন্ত একটানা বাইশ বছর অবজার্ভার -এর সম্পাদক ছিলেন আবদুস সালাম। আর উনিশশ' চল্লিশ থেকে বাষট্টি পর্যন্ত বাইশ বছর আজাদ-এর সম্পাদকের পদ অলংকৃত করেন আবুল কালাম শামসুদ্দিন। এছাড়া ১৯৬৩ তে 'দৈনিক জেহাদে' দেড় বছর এবং ১৯৬৪-এর নবেম্বর থেকে ১৯৭১ -এর ডিসেম্বর পর্যন্ত দৈনিক পাকিস্তানে সাত বছর সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন তিনি। সব মিলিয়ে মোট প্রায় একত্রিশ বছর দৈনিক কাগজের সম্পাদক ছিলেন শামসুদ্দিন সাহেব।

তাঁর সাংবাদিকতার আয়ুষ্কাল সুদীর্ঘ। তাঁর জন্ম ১৮৯৭ সালে। সাংবাদিকতা শুরু করেন ১৯১৮ সালে। তেপ্পান্ন বছর কাটালেন এপেশায়। আবদুস সালামের জন্ম ১৯১০ সালে। শামসুদ্দিন সাহেবের তেরো বছরের বয়োকনিষ্ঠ সালাম ভাই। ১৯৩১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান পাওয়ার পর উনিশ বছর তিনি নিয়োজিত থাকেন সরকারের বিভিন্ন উচ্চপদে। কর্মজীবন শুরু করেন ফেনি কলেজে ইংরেজি সাহিত্যে অধ্যাপনার মধ্য দিয়ে। পরে সরকারি চাকরিতে যোগ দিয়ে কলকাতায় রেশনিং বিভাগের ডিরেক্টর হলেন। দেশ বিভাগের পরে হলেন পাকিস্তান সরকারের অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস সার্ভিসের ডেপুটি অডিটর জেনারেল। বাঙালি অফিসারদের ওপর সরকারি বৈষম্যের প্রতিবাদে ১৯৪৯ সালে ইস্তফা দিলেন এই উচ্চপদে।

এরপরেই সাংবাদিকতার বিসর্পিল সড়কে তাঁর যাত্রা। উনপঞ্চাশেই বিখ্যাত আইনজীবী এবং রাজনীতিক হামিদুল হক চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত দৈনিক পাকিস্তান অবজার্ভার কাগজে যোগ দিলেন সিনিয়র লীডার-রাইটার হিসাবে। পঞ্চাশের জুনে হলেন সম্পাদক। তাঁর মনীষা এবং ব্যক্তিত্বের স্ফূরণ ঘটলো এই সৃজনশীল পেশায় এসে। চুয়ান্ন সালে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী হিসেবে প্রাদেশিক আইন পরিষদে নির্বাচিত হলেন ফেনির একটি আসন থেকে। '৬৩-৬৪ সালে আইয়ুবের সংবাদপত্র দলন আইন বিরোধী আন্দোলনে নিলেন নেতৃস্থানীয় ভূমিকা।

এই কালাকানুনের বিরুদ্ধে সম্মিলিত মোর্চা গড়ে তুলেছিলেন বাংলাদেশের সম্পাদক, পেশাদার সাংবাদিক এবং বুদ্ধিজীবীরা। দৈনিক আজাদ, দৈনিক সেবক, দৈনিক জামানা, সাপ্তাহিক এবং মাসিক মোহাম্মদীর প্রতিষ্ঠাতা- সম্পাদক, বিখ্যাত 'বারোয়ারি' উপন্যাসের অন্যতম লেখক মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ'র বয়স

www.pathagar.com

তখন ৯৭ বছর। ওই বয়সেও জরাগ্রস্ত শরীর নিয়ে তিনি এসে দাঁড়ালেন জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনের রাস্তা থেকে শুরু হওয়া সংবাদপত্র দলন আইন-বিরোধী বিশাল বিক্ষোভ মিছিলের পুরোভাগে।

সাংবাদিকদের সঙ্গে এককালের স্বদেশী অসহযোগ আন্দোলন এবং কংগ্রেস ও লীগের উপমহাদেশ খ্যাত এই বয়োবৃদ্ধ রাজনীতিকের একাত্মতা প্রকাশের ঘটনাটি নাকি আইয়ুব খানকে বিচলিত করে তুলেছিলো। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের জাঁদরেল তথ্য সচিব কুদরতউল্লাহ শেহাব এবং উচ্চপদস্থ আরো কয়েকজন কর্মকর্তাকে ঢাকার বিক্ষোভ মিছিলের পর পরেই ডেকে পাঠিয়েছিলেন এবং ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলেনঃ আইনটির প্রতিক্রিয়া যে এতখানি তীব্র হবে সে আভাস কেন তোমরা আগে আমায় দাওনি? এর মধ্যে খুব খারাপ কিছু না- থাকলে মওলানা আকরম খাঁ'র মতন একজন সর্বজনমান্য বয়োজ্যেষ্ঠ বাঙালি নেতা রাস্তায় নামতেন না।

আইয়ুব বোধকরি অশনি সংকেত দেখতে পেয়েছিলেন ঢাকার সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবীদের সেই প্রচণ্ড উৎক্ষেপে। সেদিন এই শহরের প্রবীণ-নবীন কোনো সাংবাদিকই ঘরে বসে ছিলেন না। মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন আবুল কালাম শামসুদ্দিন, মুজিবুর রহমান খাঁ, তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, কাজী মোহাম্মদ ইদ্রিস, মোহাম্মদ মোদাব্বের, জহুর হোসেন চৌধুরী প্রমুখ সম্পাদক। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন সিরাজুদ্দীন হোসেন, শহীদুল্লাহ কায়সার, এবিএম মূসা, খোন্দাকার আবু তালেব, মোজাম্মেল হক, আহ্‌মেদুর রহমান, ফরিদ উদ্দিন প্রমুখ সাংবাদিক ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ। এছাড়া ছিলেন আরো অসংখ্য সাংবাদিক, সংবাদপত্র কর্মী আর বাইরের বিপুল সংখ্যক বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিক, শিক্ষক-ছাত্র। সেদিন আমাদের পায়ে ছিলো ঝড়ের গতি, কণ্ঠে বজ্রনির্ঘোষ। আইয়ুবের বিদায়-ঘন্টা বাজতে শুরু করেছিলো সেদিন থেকেই। কোনো কোনো ঐতিহাসিক মুহূর্তে সাংবাদিকেরাও যে নিয়ন্ত্রণ করে রাজনীতিকে-কলমযোদ্ধাদের ওই আগুনঝরা, অনিরুদ্ধ মিছিলটি ছিলো তার এক জ্বলজ্যান্ত, তাৎপর্যবহ নজির।

ওইদিন বাংলাদেশে এবং পাকিস্তানের পশ্চিম অংশে আইয়ুবের সংবাদপত্র দলনের প্রতিবাদে একটি কাগজও বেরোয়নি। এর ওপর প্রতিটি সাংবাদিক বাহুতে ধারণ করেছিলো কালো-ব্যাজ। আমাদের বন্ধু কে জি মুস্তাফা ছিলেন তখন পাকিস্তান ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সেক্রেটারি-জেনারেল। ওই বিক্ষোভ উপলক্ষে তিনি তখন ছিলেন অস্থায়ী ফেডারেল রাজধানী রাওয়ালপিন্ডি। বিক্ষোভের দিন কেন্দ্রীয় তথ্য সচিব কুদরতউল্লাহ শাহাব তাঁর সঙ্গে ব্রেকফাস্টের জন্যে দাওয়াত করেছিলেন কেজিকে এবং বলেছিলেন ওইদিন তাঁর টেবিলে থাকবে দৈনিক পত্রিকা। কেজি বলেছিলেনঃ আমি আপনার দাওয়াত কবুল করলাম। তবে আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি, আপনার ব্রেকফাস্ট টেবিলে কোনো কাগজ দেখতে পাবেন না। পরের দিন পিন্ডি শহর থেকে কোনো কাগজ বের না-হওয়ায় শাহাব সাহেবের সাধের দাওয়াতটি ভণ্ডুল হয়ে গেলো।

www.pathagar.com

মানুষের জীবনের পরম কাঙ্ক্ষিত হলো স্বাভাবিক মৃত্যুর ছাড়পত্র। বয়স্ক হলে মৃত্যু নীরবে এসে শিয়রের পাশে দাঁড়াবে এ তো চিরকেলে নিয়ম। মাথার চুল ধব্‌ধবে হতে শুরু করলে, শরীর বিলীন হতে থাকলে ধরে নেই ফুরিয়ে এসেছে সময়। কানে বাজে তখন অবেলার শেষ সংগীতের করুণ মূর্ছনা। ধ্বনিত হতে থাকে 'লাস্ট-পোস্টের' বাঁশির সুর। এর পরও বরাত জোরে টিকে গেলে ভাবি, পাওয়া গেলো কিছু বাড়িতি সময়। এটি নিঃসন্দেহে গ্রেস-পিরিয়ড। যে-ক'জন আমরা এখনো শ্বাস ফেলছি বাইরের আলোবাতাসে, হাতে- গোনার মতো হলেও আমাদের বসবাস এই সময়টায়।

অবশ্য আমাদের মধ্যে ব্যতিক্রমও ছিলেন দু-চারজন। তাঁরা আয়ুর বৃক্ষ থেকে সময় কেড়ে নিয়ে চোখ ঠেরেছিলেন মৃত্যুকে। এঁদের একজন ছিলেন মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন। মাসিক এবং সাপ্তাহিক 'সওগাত' পত্রিকার সম্পাদক। আয়ুষ্মান হয়েছিলেন একশ' ছয় বছর। ছিলেন উনিশ এবং বিশ শতকের এক সাক্ষাৎ কিংবদন্তী। তাঁর সংগে কাজ করেছি ছয় বছর। চুয়ান্ন থেকে ষাট সাল অব্দি। চুয়ান্নতে তাঁর বয়স ছিলো ছেষট্টি। তখনো তাঁকে মনে হতো এক স্বাস্থ্যোজ্জ্বল যুবা। কোনো ক্লান্তি কিংবা অবসাদে আক্রান্ত হননি। একদিনও দেখিনি তাঁর পাটুয়াটুলির অফিসে গরহাজির থাকতে। তাঁর অটুট স্বাস্থ্যের রহস্য জানতে চাইলে একদিন বললেনঃ 'নিয়ম মেনে চলো বাবা। ভোরবেলা ওঠো ঘুম থেকে। এক ঘন্টা খোলাবাতাসে হাঁটাহাঁটি করো। তারপর যাও বাথরুমে। খাঁটি সর্ষের তেল হাতের তালুতে ফেটে নিয়ে মাখো মাথায় এবং সারা শরীরে। ঝরনার নিচে অন্তত দশ মিনিট দাঁড়িয়ে শীতল হয়ে নাও। দূর হয়ে যাবে সমস্ত ক্লান্তি। সর্ষের তেলের ফেনা মাথায় মাখলে সহজে পাক ধরবে না চুলে। এরপর রুটির সংগে সহজপাচ্য নিরামিষ, ডাল আর ডিমের সাদা অংশ তুলে নিয়ে সকাল আটটার মধ্যেই সেরে ফেলো ব্রেকফাস্ট। রুটিন ধরে এ নিয়ম মানলে হজম ভালো হবে। চাঙ্গা থাকবে শরীর এবং মন। দুপুর এবং রাতের খাবারও খেতে হবে সময়-মাফিক। জানো, হাজারো কাজ নিয়ে থাকলেও নিয়ম মেনে চললে শরীর কখনো বিকল হতে পারে না।'

বললেনঃ আমার বাবা-দাদাও এ নিয়ম মেনেছিলেন সারা জীবন। তার জন্যে দীর্ঘজীবী হয়েছিলেন তাঁরা। আমি তাঁদের নিয়মই মেনে চলছি। দিনভর আর তার ন'টা অব্দি কাজে ডুবে থাকলেও তাই ক্লান্তি বোধ করি না আমি। দুপুরে খাওয়ার পর কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিয়ে চাঙ্গা করে নিই শরীরটাকে।

সময় মাফিক চলবার জন্যেই কোনো কঠিন ব্যাধি শেষ বয়সেও কাবু করতে পারেনি বটবৃক্ষতুল্য আয়ুর এই অক্লান্ত পরিশ্রমী সাংবাদিককে। এ রকম সুদীর্ঘ আয়ু পেয়েছিলেন আরো তিনজন। সাংবাদিক মওলানা আকরম খাঁ, জননায়ক এ কে ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান আসানী। এঁদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসবার সুযোগ হয়েছিলো আমার। সবাই এঁরা প্রায় শতায়ু হয়েছিলেন। এঁদের জীবনেও ছিলো নিয়মের বাঁধন। স্বাভাবিক মৃত্যু ছেদরেখা টানে তাঁদের জীবনের। এই

www.pathagar.com

বয়োবৃদ্ধ নেতাদের শবাধার অনুগমন করতে গিয়ে শোকাচ্ছন্ন হয়েছি একথা ঠিক। আবার একথাও মনে হয়েছে দুই শতাব্দীর সাংবাদিকতা, সাহিত্য এবং বর্ণাঢ্য আর উত্থান-পতনময় রাজনীতির যে-ঐতিহাসিক যোগসূত্র আমাদের -তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি আমরা। হয়ে পড়েছি নিঃস্ব, দরিদ্র এবং অভিভাবকহীন। কিন্তু তারপরেও মনে হয়েছে মৃত্যুগুলো ছিলো অতি স্বাভাবিক।

কিন্তু জীবিত থাকাকালে বার-বার তাদের কাছে প্রশ্ন রাখতে ইচ্ছা করছিলো- কলমপেষা সাংবাদিকদের রুটিন রাখবার ফুরসত কী আছে? নাকি আছে তাদের জন্যে সুখাদ্য?

আয়ুর চৌহদ্দি অতিক্রম করে ওই স্বাস্থ্যবান বর্ষীয়ানরা চলে গেলেন জীবন্ত ইতিহাস হয়ে। বেদনাহত হলেও তাই মথিত, বিচলিত এবং আরক্ত হয়নি হৃদয়। কিন্তু অস্বাভাবিক মৃত্যু কোনোরকম জানান না-দিয়েই বুকের কাছের যে-তরতাজা প্রাণগুলোকে ছিনিয়ে নিয়েছিলা কেমন করে ভুলবো তাদের শোক? আরো আয়ুষ্মান হওয়াই তো ছিলো তাঁদের জন্যে স্বাভাবিক। অসাধারণ প্রতিশ্রুতি ছিলো, ছিলো অপার এক প্রতিভার ঔজ্জ্বল্য সেই উদীয়মান সাংবাদিকদের মধ্যে-যা ঝলসে উঠতে-উঠতে এক সংগে হঠাৎ নিভে গেলো। যেন দমকা হাওয়ার প্রচন্ড ঝাপ্টায় নির্বাপিত হলো একই আনন্দে-রাখা কয়েকটি প্রদীপ।

তেত্রিশ বছর পর অতীতের দিকে চোখ রাখতে গিয়ে আজ আবার মনে পড়লো সেই বিভীষিকাময় শোকের দিনটির কথা। এরকম পাথরের মতন গুরুভার আর বজ্রাঘাততুল্য শোক গত পঞ্চাশ বছরে দু-বার এসেছিলো আমাদের এই পেশাগত জীবনে। প্রথম ভয়ংকর ঘটনাটি ঘটেছিলো ১৯৬৫ সালের ২০মে। আরেকটি একাত্তরের ১৪ ডিসেম্বর।

প্রথমবার দু-দিন আগে তেজগাঁও বিমানবন্দর থেকে আকাশে উড়লেন ঢাকার পাঁচ দৈনিক কাগজের চার সাংবাদিক আর একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালক। মোজাম্মেল হক, আহমেদুর রহমান, ফরিদউদ্দিন এবং আবদুল হান্নান। আর বাচ্চু মিয়া। বাচ্চু ছিলেন দৈনিক 'পয়গাম' পত্রিকার প্রকাশক এবং মুদ্রাকর। সবার মুখেই ছিলো হাসির উদ্ভাসন। প্লেনে ওঠার আগে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে সবাই তাঁরা ঘন-ঘন হাত নেড়ে বিদায় জানিয়েছিলেন সহকর্মী আর প্রিয়জনদের।

পিআইএ বিমানটি ছাড়বার আগে তাঁদের সবার হাতে কেউ তুলে দিয়েছিলো লাল গোলাপ, কেউ রজনীগন্ধার গুচ্ছ। আপন শিশু সন্তানদের বুকে তুলে নিয়ে তাদের মুখে স্নেহচুম্বন বুলিয়েছিলেন সাংবাদিক ডেলিগেশনের সদস্যরা। স্ত্রীদের কাছে ডেকে নিয়ে বলেছিলেনঃ এই তো মাত্র দিন সাতেক। তারপরেই তো ফিরছি। বাচ্চাদের দেখো।

ঢাকার আকাশে বার কয়েক চক্কর দিয়ে পশ্চিমমুখো হয়ে মেলা করলো বোয়িংটি। পেছনে লতিয়ে উঠতে থাকলো জেটের হাল্কা ধূসর ধোঁয়ার কুণ্ডলী। বিমানবন্দরের ছাদে উঠে তখনো সেদিকে চোখ রেখে হাত দোলাচ্ছিলেন বিদায়-দিতে-আসা

www.pathagar.com

অন্তরঙ্গজনেরা। দু-একজন দোলাচ্ছিলেন রুমাল। কিন্তু এঁরা কী ভুলেও ভাবতে পেরেছিলেন যাঁরা চলে গেলেন আর কখনো ফিরে আসবেন না তাঁরা? স্বপ্নেও কী তাঁরা কল্পনা করেছিলেন, ওই বিদায়ী প্রিয়জনদের লাশ পর্যন্ত দেখবার ভাগ্য হবে না তাঁদের? অন্তত যে মৃতদেহগুলোকে আঁকড়ে ধরে রোধ করা যেতো খানিকটা হাহাকার,

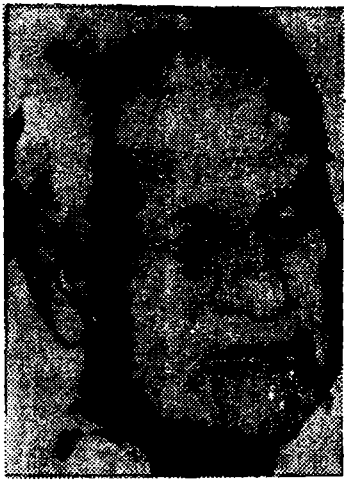

মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন

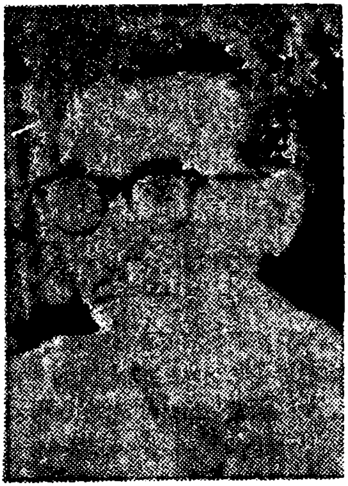

আহমেদুর রহমান

কিছুটা বোবা কান্না।

পিআইএ বিমানের করাচি-কায়রো'র প্রথম উদ্বোধনী ফ্লাইট ছিলো সেটি। যাত্রী ছিলেন মোট ২৩৪ জন। সংবাদপত্রের লোকদের মধ্যে ছিলেন ঢাকার পাঁচজন। আর করাচি-লাহোর-পিন্ডি'র উনিশজন। সব মিলিয়ে মোট ২৪ জন। এদের মধ্যে প্রেস ট্রাস্ট অভ্ পাকিস্তান-এর চেয়ারম্যান হায়াউদ্দিনও ছিলেন। ইনি ছিলেন আইয়ুব খানের সেনাবাহিনীর একজন জেনারেল।

২০ মে কায়রো বিমানবন্দরে অবতরণকালে ইঞ্জিন বিকল হয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনা-কবলিত হলো উদ্বোধনী ফ্লাইটের বিমানটি। আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে-দেখতে গ্রাস করলো আকাশযানের ভেতর এবং বাইরের সমস্ত অবয়বটিকে। বাঁচাও! বাঁচাও! এই একটি মাত্র পরিত্রাহী আর্তনাদই দু-শ' চৌত্রিশটি কণ্ঠে হাহাকার তুলে দীর্ণ-বিদীর্ণ করে তুললো নীলনদের বাতাস। কিন্তু কে বাঁচাবে জ্বলন্ত নরকাগ্নি-বেষ্টিত সেই বিপন্ন, ভাগ্যাহত যাত্রীদের? মুহূর্ত কয়েকের মধ্যে আগুনে ঝলসে পোড়া-কাঠ হলো এতগুলো প্রাণ। ছিন্নভিন্ন হলো তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। কয়েক বর্গমাইল জুড়ে বিমানটির ধ্বংসাবশেষের সংগে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিলো আমাদের প্রিয় কলমসৈনিক বন্ধুদের ছিন্নবিচ্ছিন্ন বিকৃত দেহগুলো।

www.pathagar.com

কী নির্মম, নিষ্ঠুর পরিহাস ভাগ্যের! যারা প্রায়শ বিমান দুর্ঘটনা, ঝড়-জলোচ্ছ্বাস-বন্যা, ভূমিকম্পে হতাহত মানুষের খবর ছাপে প্রাণঢালা সমবেদনায়-শেষ পর্যন্ত তাদেরও শিকার হতে হলো অমন এক ভয়ংকর বিপর্যয়ের। মৃত্যু তো বেঘোরেও আসে। কিন্তু চোখের সামনে যখন তাকে বিকট, বীভৎস রূপ নিয়ে দেখা যায় বাহু বিস্তার করতে, বিপন্ন মানুষের সেই মুহূর্তের অসহায়ত্বকে কে পারবে ভাষায় প্রকাশ করতে?

আছে পরিপূর্ণ সজাগ চৈতন্য অথচ মৃত্যুকে দেখছি চোখের সামনে মুখ ব্যাদান করতে। ধেয়ে আসছে সে সগর্জনে, বিষকুম্ভ ফণা তুলে। হিম হয়ে যায় ওই মুহূর্তে বুকের সমস্ত রক্ত, চোখে জাগে নিদারুণ এক আতংক। ছটফট করতে থাকে শিহরিত ক্ষুদ্র প্রাণটি। সেই সময়কার একটি গল-অনুগলের যন্ত্রণার সংগে কী তুলনা হয় শতসহস্র বছরের যাতনার? আমার বিশ্বাস, এ যন্ত্রণাকে হৃদয়ের সমস্ত মর্মানুভূতি দিয়েও তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন বিয়োগান্ত মহাকাব্য-রচয়িতা হোমার, ভার্জিল কিংবা শীলার। অথবা জন মিল্টন এবং গ্যেটে। প্রাণ রক্তাক্ত হয় যখন-ভাবি আমাদের অতিপ্রিয় কয়েকজনসহ ত্রিশজন সাংবাদিক আরো দু-শ'র বেশি যাত্রীর সংগে অর্গলবদ্ধ একটি কুঠরিতে বন্দি হয়ে অমন এক অব্যক্ত, অকথিত যন্ত্রণা সমর্পিত হয়েছেন মৃত্যুনামক এক নৃশংস নরবলির হোমানলে।

কিন্তু আশ্চর্য, অমন ধ্বংস তাণ্ডবের গ্রাস থেকেও অবলীলায় বেঁচে গিয়েছিলেন দু'জন যাত্রী। বেঁচেছিলেন প্রায় অক্ষত দেহে। সেদিন আমার লেখা শোকগাঁথায় অর্থাৎ 'মর্মন্তুদ' শিরোনামের সম্পাদকীয় নিবন্ধে শেক্সপীয়রের সেই বিখ্যাত উক্তিটি তুলে ধরিনি। তুলে ধরলে অসংগতই শুধু হতো না-নিজের মনে যাতনাও বোধ করতাম।

আজ তেত্রিশ বছর দুঃখ যখন খানিকটা থিতিয়ে এসেছে বোধকরি তখন কথাটা বলা যায়। উক্তিটি এ রকম ঃ 'স্বর্গ এবং মর্ত্যে এমন সব বিস্ময়কর জিনিসও আছে, যা হোরাশিও কল্পকাহিনীর চেয়েও অনেক বিস্ময়কর।' বলাবাহুল্য, কবি তাঁর বিখ্যাত নাটকটির অন্যতম চরিত্র হোরাশিওকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন কথাটি।

এই ভয়ংকর দুর্ঘটনাটিতেও ঘটেছে অমন এক অবিশ্বাস্য ঘটনা। যেখানে হতভাগ্য পিআইএ বিমানটি বিস্ফোরিত হয়ে উড়ে গিয়ে দূরে-দূরে ছিটকে পড়েছিলো ছত্রখান হয়ে সেখানে কেমন করে অনেকটা অক্ষত দেহে বাঁচতে পারেন দু-জন যাত্রী! বিশেষ করে যে- ভয়াবহ দুর্ঘটনায় ক্রু সমেত ২৩৪ জন যাত্রীর মধ্যে দু-শ' বত্রিশজনই নিহত। সত্যি এটি 'স্ট্রেনজার দ্যান ফিক্‌শন।' ভাগ্যকে চোখ ঠেরে আশ্চর্যজনকভাবে এই বেঁচে থাকা। একে কী কাকতালীয় বলা যায়? নাকি অলৌকিক কিছু? এ ধরনের বিস্ময়কর, রহস্যময় ঘটনার বোধকরি কোনো ব্যাখ্যা নেই।

ভয়ানক এই ঘটনার সংগে আছে আরো একটি ব্যাখ্যার অতীত ঘটনা। এটি আমার সহকর্মী ভাগ্য বিপর্যস্ত মোজাম্মেল হক আর আমার মতন আশ্চর্যজনকভাবে অনেকটা আয়ুষ্মান-হওয়া অভাজনকে নিয়ে। আসলে পিআইএ-র উদ্বোধনী ফ্লাইটে কায়রো যাওয়ার কথা ছিলো আমার। আমি ছিলাম তখন সাবেক প্রেস ট্রাস্ট পত্রিকা

www.pathagar.com

'দৈনিক পাকিস্তান'-এর অ্যাসিসট্যান্ট-এডিটর। আমার সহকর্মী ছিলেন কবি শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান এবং আহ্‌মেদ হুমায়ুন। কাগজের বার্তা সম্পাদক ছিলেন বরিশালের মোজাম্মেল হক।

ঢাকায় দাওয়াত এসেছিলো দৈনিক ইত্তেফাক, ইংরেজি দৈনিক মর্নিং নিউজ, দৈনিক পাকিস্তান আর দৈনিক পয়গাম-এর সম্পাদকদের নামে। কথা ছিলো তাঁরা পিআইএ-র করাচি-কায়রো উদ্বোধনী ফ্লাইটে মিসর সফরের জন্যে তাঁদের প্রতিনিধি হিসেবে পত্রিকাগুলোর অ্যাসিসট্যান্ট-এডিটরদের মধ্য থেকে পাঁচজনকে পাঠাবেন। আবুল কালাম শামসুদ্দিন ছিলেন তখন দৈনিক পাকিস্তান কাগজের সম্পাদক। তিনি এই বিমান-ভ্রমণে সম্পাদকীয় বিভাগ থেকে মনোনীত করলেন আমাকে। বললেনঃ যান, একবার ঘুরে আসুন। ফেরাওনদের মমি দেখবার সুযোগ পাবেন কায়রো জাদুঘরে। তাছাড়া দেখতে পাবেন আদিম মানব সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র নীলনদের তীর ভূমি এবং বদ্বীপ। তাছাড়া ওরা বিশ্ববিখ্যাত আসোয়ান ড্যামও দেখাতে পারে।

আমি জানতাম কায়রো মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে মিসরের প্রাচীন রাজবংশের রাজা প্রথম র‍্যামেসিস, রানী নেফারতিতি, রানী আখ-আল আমেনসহ অনেক প্রাচীন মিসরীয় রাজা-রানীর মমি। এছাড়া নীলনদ আর তার মোহনায় ভূমধ্যসাগরীয় বদ্বীপটি একবার জাহাজ কিংবা স্পীড বোটে দেখাটাও একটা দুর্লভ সুযোগ। এর ওপর আছে কয়েক হাজার ফুট উঁচুতে আসোয়ান পাহাড়। ইথিওপিয়ার উৎস থেকে এই পাহাড়টির মাথায় এসে ব্লু-নাইল আর হোয়াইট নাইল অভিন্ন হয়ে গড়িয়ে পড়ছে অনেক নিচে। জলপ্রপাত হয়ে। এরই কাছে বিশাল আসোয়ান বাঁধ, পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং আসোয়ান শহর। আসোয়ানের পাথরও দেখতে অপূর্ব সুন্দর। চোখের পানির মতন স্বচ্ছ ধারায় বিম্বিত।

মিসর দেখবার সাধ আমার অনেক দিনের। কায়রো সফরের কথা শুনে তাই খুশিই হয়েছিলাম। যাত্রার জন্যে মনে-মনে তৈরিও হচ্ছিলাম। তবে কেন জানি গোছগাছ করতে দেরি হচ্ছিলো। আবার অন্তর থেকে তেমন সাড়াও পাচ্ছিলাম না।

এর মধ্যে হঠাৎ একদিন বার্তা সম্পাদক মোজাম্মেল হক আমাদের সম্পাদকীয় রুমে এলেন। তখন টিপু সুলতান রোডের একটি পুরনো জমিদার বাড়িতে ছিলো দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকার অফিস। আমরা তিনজন অ্যাসিসট্যান্ট-এডিটর বসতাম বাড়িটির দোতলায় উত্তরতম প্রান্তের একটি বড় কামরায়। মোজাম্মেল হক এসে সোজাসুজি বসলেন আমার টেবিলের সামনেকার চেয়ারে। এই কাগজেই প্রথম তাঁর সংগে গড়ে ওঠে আমার নিবিড় সম্পর্ক। আমার প্রায় সমবয়সী। শান্তশিষ্ট, মার্জিত রুচির ত্রিশোর্ধ্ব এক উজ্জ্বল তরুণ মোজাম্মেল হক। মধ্যবয়সীও বলা চলে। শুরুতে বরিশালে সাপ্তাহিক 'খাদেম' নাকি অন্য কোনো কাগজে সাংবাদিকতার হাতে-খড়ি। ঢাকায় আর কোন্ কোন্ কাগজে কাজ করেছেন জানি না। তবে ষাটের দশকের গোড়াতে দৈনিক আজাদ-এর বার্তা সম্পাদক হয়েছিলেন। সেখানে নেতা ছিলেন সাংবাদিক ইউনিটের। ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের ছিলেন প্রভাবশালী লীডার।

www.pathagar.com

উনিশশ' তেষট্টি সালে আজাদ-এর নতুন মালিকেরা পত্রপাঠ বিদায় করে দিলেন কাগজের প্রবীণতম সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিনকে। এই অদূরদর্শী মালিকেরা আজাদ-এর প্রতিষ্ঠাতা, প্রথিতযশা সাংবাদিক- সাহিত্যিক-রাজনীতিক মওলানা আকরম খাঁর নবীন বংশধর। সম্পাদক সাহেবের সংগে তাঁর ভক্ত অনেক অভিজ্ঞ সাংবাদিককেও বিদায় নিতে হলো। সাংবাদিক ইউনিয়ন নেতা মোজাম্মেল হক আইনের সাহায্যে আদায় করে নিয়েছিলেন এঁদের সবার পাওনা কড়াগণ্ডা। এই সাহসী ভূমিকার জন্যে শামসুদ্দিন সাহেবের বিশেষ প্রিয়ভাজন হয়েছিলেন মোজাম্মেল হক। মিতভাষী হলেও ব্যক্তিত্ব এবং নেতৃত্বের গুণাবলী ছিলো মোজাম্মেলের মধ্যে। এটা আমি ভালো করেই লক্ষ্য করেছি। সুদীর্ঘকালই তো বার্তা বিভাগে কাজ করেছি। দৈনিক কাগজে বার্তা সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছি দুই-দুইবার। এসব কথা জানা ছিলো বলে মোজাম্মেল আমার কাছে মাঝে-মাঝেই আসতেন কাগজের সংবাদ পরিবেশনার বিষয়ে পরামর্শ নিতে। কাগজকে ভালো করবার তাঁর এই খাঁটি সাংবাদিক সুলভ নিষ্ঠায় মুগ্ধ হয়েছিলাম আমি।

কিন্তু সেদিন কাগজের ব্যাপারে কিছু না বলে জানতে চাইলেন আমার কুশল-সংবাদ। মিনিটখানিক ইতিউতি করলেন। কেমন একটা সংকোচের ছায়া দুলছিলো মুখে। হঠাৎ আমার চোখের দিকে তাকিয়ে একটু সলজ্জ হাসি হাসলেন। শেষে বললেনঃ আচ্ছা, আপনি তো আরো বিদেশ সফরে গেছেন। যদি কিছু মনে না করেন তাহলে একটা অনুরোধ করবো।

বললামঃ বা-রে, অনুরোধের কী হলো। আমার সহকর্মী আপনি। সোজাসুজি বলে ফেলুন। নিশ্চয়ই সাহায্য করবার দরকার হলে করবো।

-সত্যি করবেন?

- বললামই তো ভাই।

- আমি একবারও কিন্তু বিদেশ যাইনি। আপনি যদি কায়রো ফ্লাইটে যাওয়ার সুযোগটা আমায় দিতেন? এডিটর সাহেবকে বললে তিনি ফেলতে পারবেন না আপনার কথা।

এমনভাবে মোজাম্মেল কথাগুলো বলছিলেন যাতে আমি রাজি না হয়ে পারলাম না। সংগে সংগে হো-হো করে হেসে বললামঃ এটা কী একটা বড় কিছু হলো? আমি তো নয় বছর আগে এশিয়ান রাইটার্স কনফারেন্সে গেছি। সামনে আছে ইথিওপিয়া যাওয়ার আমন্ত্রণ। বেশ তো পিআইএ-র উদ্বোধনী ফ্লাইটে আপনিই যাবেন। সম্পাদক সাহেবকে আমি বলছি। আপনি আজ থেকে গোছগাছ করতে থাকুন।

খুশিতে চক্‌চক্‌ করে উঠলো মোজাম্মেল হকের চোখ দুটি। আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন উষ্ণ হাতটি।

আমি বললামঃ কিন্তু একটা অনুরোধ আমার। ফেরার পথে কায়রো থেকে স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে আমার জন্যে আনবেন আসোয়ানের কিছু নীলপাথর। আর মমির

www.pathagar.com

কিছু নমুনা। স্মারক হিসেবে তুলে রাখবো আমার কাচের শো-কেসের ছোট্ট জাদুঘরে।

মোজাম্মেল বললেনঃ অবশ্যই আনবো। ....

বিদায় নেবার দিন বললেনঃ দোয়া করবেন যেন ভালোয়-ভালোয় ফিরে আসি। আপনার কথা কিন্তু ভুলবো না।

কায়রো বিমান দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়ার পর রীতিমতন বোবা হয়ে গেলাম শোকে। মনে হলো, মরণ যেন আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন মোজাম্মেল হক। নিজের আয়ুকে সংক্ষিপ্ত করে যেন অগোচরে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন আমার সময়টাকে। নেপথ্য কে বুঝি বলে বসলোঃ দেখলে তো, কার মরণ কে মরে! এ-ও কী 'স্ট্রেনজার দ্যান ফিক্শন' নয়?

সাংবাদিকের কাছে খবরের যান্ত্রিক দূত হলো টেলিপ্রিন্টার। সুসংবাদ, দুঃসংবাদ সবই বয়ে আনে এই দূত। আনে পৃথিবীর চার প্রান্ত থেকে রাশি রাশি খবর। নিউজ ডেস্কের ইনচার্জরা মাঝে-মধ্যেই নিয়ত কর্মরত প্রিন্টারটির কাছে দাঁড়ান। আর সতর্ক চোখ বুলিয়ে দেখেন কোনো বড় সংবাদ প্রিন্ট হচ্ছে কিনা সুদীর্ঘ নিউজ-রিলের সাদা কাগজের বুকে।

সেদিন নিউজ-রিলের সশব্দে মুদ্রণরত একটি সংবাদের ওপর চোখ রাখতে গিয়ে বুক শুকিয়ে গেলো তাঁদের। অন্ধকার নেমে এলো চোখের পাতায়। যেন দাঁড় কাকের কালো ডানায় ভৌতিক শব্দে মুদ্রিত হচ্ছিলো খবরটি। ভয়ংকর শোকচিহ্নের মতন তার হরফগুলি। এক নজর দেখেই আর্তচিৎকার। সর্বনাশ হয়ে গেছে! কেউ বেঁচে নেই ওঁরা। কায়রোতে এয়ার ক্র্যাশ হয়েছে!

মুহূর্তে নিউজ-টেবিল আর সম্পাদকীয় বিভাগের সবাই রুদ্ধশ্বাসে ছুটে এলেন টেলিপ্রিন্টারের কাছে। টেনে নিয়ে নিউজ-রিলের কাটা অংশটি দেখলেন সবাই। কথা সরলো না কারো মুখে। সবক'টি মুখেই নামলো বিষণ্নতা। দুই চোখ বেয়ে টপ্-টপ্ করে ঝরতে লাগলো অশ্রুর ধারা। কিছুক্ষণ আগে যে কক্ষটি ছিলো কোলাহলমুখর দেখতে দেখতে সেটি রূপ নিলো শোকসভায়।

আমি টিপু সুলতান রোডের পত্রিকা অফিসের সেদিনকার করুণ দৃশ্যটির কথা বলছি। সেখানকার এক সাবেকি আমলের বাড়ি থেকে বেরুতো তখনকার 'দৈনিক পাকিস্তান' কাগজ। এখান থেকে ১৯৬৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে কাগজটির প্রথম আত্মপ্রকাশ। আর শোকাবহ ঘটনাটি ঘটলো ১৯৬৫ সালের ২০ মে। কয়েকজন সাংবাদিক বিলাপজুড়ে কাঁদতে লাগলেন। এর মধ্যে শোনা গেলো একরাশ জড়ানো কণ্ঠস্বর ঃ মোজাম্মেল ভাই ! মোজাম্মেল ভাই! তাঁকে আর দেখতে পাবো না আমরা। আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন তিনি কেমন করে?

সংবাদকক্ষে কান্নার রোল শুনে ছুটে এলাম আমরা। আমি, শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, আহমেদ হুমায়ুন। এসেই দেখি বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতন পাশাপাশি দু'টি চেয়ারে স্থানুবত বসে আছেন বৃদ্ধ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিন এবং ব্যবস্থাপনা সম্পাদক কবি আহসান আহমদ আশক। এক পাশে ছিলেন

www.pathagar.com

সাহিত্য বিভাগের সম্পাদক কবি আহসান হাবীব। সবাই এঁরা নির্বাক। রক্তশূন্য মুখ। বোবা দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছেন। শামসুদ্দিন সাহেবের চোখে উদগত অশ্রু। ক্রন্দনরত সাংবাদিকদের সান্ত্বনা দেবার ভাষা প্রবীণদেরও ছিলো না। কারণ তাঁদেরও বুক ঠেলে উথলে উঠছিলো একটি নীরব কান্না।

আমাদের মধ্যে সব থেকে স্পর্শকাতর ছিলেন কবি হাসান হাফিজুর রহমান। যে-কোনো অন্তরঙ্গজনের মৃত্যু দিশেহারা করে তুলতো তাঁকে। একটা কলাও বলতে পারলেন না সেদিন হাসান। স্বর তাঁর বাষ্পরুদ্ধ। চোখে পানির ঢল। আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে হু-হু করে কাঁদলেন কিছুক্ষণ। অন্যদের মুখে-পিঠে নিঃশব্দে হাত বুলিয়ে চোখের পানিতে উজাড় করে ঢেলে দিলেন আপন জর্জরিত হৃদয়ের শোক।

হাত ধরে আমাকে বাইরে টেনে নিয়ে এসে বললেনঃ মোজাম্মেল হকের সংগে আহ্‌মেদুর রহমানকেও আমরা হারালামরে নূরী। ঝরে গেলো আরো তিনটি প্রিয়মুখ। ফরিদ, হান্নান, আখতারুজ্জামান বাচ্চু। এই তো দু'দিন আগে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বিদায় দিয়ে গেলেন মোজাম্মেল হক। বলে গেলেনঃ ফিরে এসেই দেখা করবো। বলুন, কায়রো থেকে কী আনবো আপনার জন্যে? কথাটি স্মরণ করে আবার ভিজে গেলো হাসানের চোখ। ফিস্‌ফিসানো গলায় ধ্বনিত হলো কয়েকটি শব্দঃ সত্যিরে, একজন খাঁটি ভদ্রলোক আর বন্ধুবৎসল সাংবাদিককে হারালাম আমরা। ওঁর মতন লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না আর।

সম্পাদকীয় বিভাগে পাশাপাশি বসতাম আমরা। আমি এবং হাসান। সেখানে এসে আহ্‌মেদুর রহমানের প্রসঙ্গ উঠলো। আমাদের দু'জনেরই অতি কাছের মানুষ ছিলেন জনপ্রিয় কলামিস্ট আহ্‌মেদুর রহমান। তিনি ইত্তেফাকে 'ভীমরুল' নামে লিখতেন। কায়রোর উদ্দেশ্যে যাত্রার দু'একদিন আগে হাসানের কাছ থেকেও শুভ কামনা চেয়ে বিদায় নিয়েছিলেন আহ্‌মেদ। যেমন আমার কাছ থেকেও একই অনুভূতি ব্যক্ত করে বিদায় নিয়েছিলেন। বিদায়ের সেই ছবিটি তখনো দাগ কেটেছিলো আমাদের দু'জনের মনে। কেমন করে সেকথা ভুলতে পারেন হাসান? এবং ভুলতে পারি আমি? এই প্রতিশ্রুতিশীল সাংবাদিক -সাহিত্যিকের মৃত্যুর নাড়িছেঁড়া শোকে একইভাবে আমরা হলাম নীলকণ্ঠ।

আহ্‌মেদুর রহমান আগাগোড়াই ছিলেন এক প্রতিবাদী সাংবাদিক। সমাজের শোষণ-পীড়ন আর সমকালের গণবিরোধী রাজনীতির বিরুদ্ধে এক শক্তিমান নবীন কলমযোদ্ধা। সাংবাদিকতায় তাঁর এই নিরাপোস ভূমিকার জন্যে আমার প্রথম দৃষ্টি কাড়লেন তিনি। হাসান হাফিজুর রহমানও ছিলেন সাহিত্যে- সাংবাদিকতায় আর আধুনিক কবিতার বলয়ে এক উচ্চনাদী প্রতিবাদী কণ্ঠ। অনুভূতির এই একাত্মতার জন্যেই আহ্‌মেদুর রহমান ছিলেন হাসানের প্রিয়ভাজন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের ব্যালট-বিপ্লবের যুগে সাংবাদিকতায় আসেন আহ্‌মেদুর রহমান। কোর্ট হাউস স্ট্রিট থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক মিল্লাত' পত্রিকায় প্রথমে সাব-এডিটর হিসাবে যোগ দিলেন বার্তা বিভাগে। অনুবাদের পাশাপাশি মৌলিক রচনায়, বিশেষ করে ব্যঙ্গাত্মক লেখায়

www.pathagar.com

ছিলো তার ভালো হাত। কাগজটির সম্পাদক ছিলেন তখন খ্যাতনামা কলাম-লেখক খোন্দকার আবদুল হামিদ। খোন্দকার হামিদ বিভাগ-পূর্বকালে কলকাতার

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি

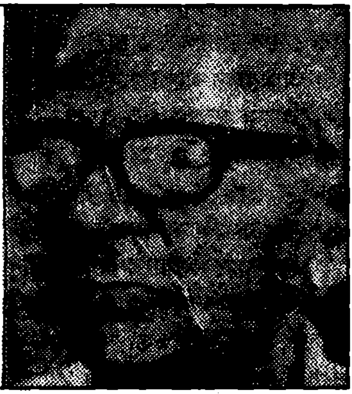

আবুল মনসুর আহমদ

প্রথম শ্রেণীর দৈনিক কাগজ 'ইত্তেহাদ'-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর ছিলেন। ১৯৪৬ সালে এই কাগজটির আত্মপ্রকাশ। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, প্রখ্যাত আইনবেত্তা-রাজনীতিবিদ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি। সম্পাদক ছিলেন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান রম্য সাহিত্যিক, যশস্বী সাংবাদিক এবং রাজনীতিক আবুল মনসুর আহমদ।

উনিশ শ'২০-২১ সালের অসহযোগ-খিলাফত এবং স্বদেশী আন্দোলনকালে বিখ্যাত আলী ভ্রাতৃদ্বয়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, শেরে বাংলা ফজলুল হক এবং কলকাতার ডক শ্রমিক নেতা, দেশবন্ধুর স্বরাজ্য দলের সমর্থক হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দির সংগে একযোগে কাজ করেন তখনকার উদীয়মান লেখক-সাংবাদিক আবুল মনসুর আহমদ। তাঁর সাংবাদিকতার গুরু ছিলেন সেকালের প্রাদেশিক কংগ্রেস সভাপতি, 'দ্য মুসলমান' পত্রিকার প্রখ্যাত সাংবাদিক মওলবি মজিবুর রহমান এবং 'দৈনিক সুলতান' সম্পাদক কংগ্রেস নেতা মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী। খোন্দাকার আবদুল হামিদ ছিলেন সাংবাদিকতায় আবুল মনসুর আহমদের ভাবশিষ্য। তাঁর নিকট-আত্মীয়ও ছিলেন তিনি। এই মনীষী-সাংবাদিকের কাছে সাংবাদিকতার প্রথম পাঠ নিলেন হামিদ সাহেব ফলে তাঁর লেখায়ও মনসুর সাহেবের শ্লেষাত্মক লেখার তীক্ষ্মতার ছাপ ফুটে ওঠে।

পরবর্তীকালে হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দির একনিষ্ঠ সহচর হিসাবে প্রাক-বিভাগ যুগ এবং বিভাগোত্তর কালের রাজনীতিতে বিশিষ্ট ভূমিকা রাখেন আবুল মনসুর আহমদ। ১৯৪৯ সালে সোহ্‌রাওয়ার্দির নেতৃত্বে পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হলে সংগঠনটির পুরোভাগে ছিলেন তিনি। পরে আওয়ামী লীগ পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ (পার্লামেন্ট)-এর ভেতরে এবং বাইরে প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকায়

www.pathagar.com

এলে মনসুর সাহেব ছিলেন তারও অগ্রসারিতে। ১৯৫৬ সালে সাহ্‌রাওয়ার্দি সাহেব বিরোধী দলের নেতা হিসাবে পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করলে আবুল মনসুর আহ্‌মদ শিল্পমন্ত্রী হন এবং কিছুকাল উপ-প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ষাটের দশকের মধ্যপর্বে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বিখ্যাত ৬ দফার ভিত্তিতে বাংলাদেশে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন যখন বিপ্লবের রূপ নিলো মনসুর সাহেব নিজেকে যুক্ত করেন এই গণদাবির সংগে। আবুল মনসুর আহ্‌মদের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার সব থেকে স্মরণীয় দিক হলো ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের প্রাক্কালে 'গ্রেটার বেঙ্গল মুভমেন্ট' তথা বৃহত্তর বাংলা আন্দোলনের প্রতি নিরঙ্কুশ সমর্থন। হিন্দু মহাসভা-প্রধান শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, ভি আর সাভারকার, কেন্দ্রের কংগ্রেস নেতা সর্দার প্যাটেল, আচার্য কৃপালনি, আসামের কংগ্রেস নেতা ও প্রদেশ মুখ্যমন্ত্রী বরদোলই, বর্ধমানের মহারাজা এবং আরো কিছু গোঁড়া সাম্প্রদায়িক নেতা ছিলেন বাংলা ভাগ করবার প্রধান হোতা।

অন্যদিকে বাংলাকে একটি অখণ্ড স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে নতুন রূপ দেয়ার পক্ষে স্তম্ভের মতো দাঁড়িয়েছিলেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দি, মওলানা ভাসানী, প্রাদেশিক লীগের জেনারেল সেক্রেটারি আবুল হাশিম, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সভাপতি সৌরীন্দ্র মোহন ঘোষ, কংগ্রেস নেতা শরৎচন্দ্র বসু (নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর বড় ভাই), বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন সভায় কংগ্রেসের সংসদীয় দলের নেতা কিরণশংকর রায়, সোহরাওয়ার্দি মন্ত্রিসভার ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী ঢাকার জনাব ফজলুর রহমান প্রমুখ।

হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দি মুসলিম লীগের পক্ষে একটি সাব-কমিটি গঠন করে দফায়-দফায় বৈঠক করেন প্রাদেশিক কংগ্রেসের শীর্ষ প্রতিনিধিদের সংগে। বৈঠকে বসলেন গান্ধী, জিন্নাহ্‌ এবং ভারতের সে সময়কার গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সংগে। কিন্তু শেষ অব্দি উগ্রবাদীদের প্রচণ্ড চাপে দ্বিখণ্ডিত হলো বাংলা। অথচ ১৯০৫ সালে বাঙালির প্রাণপ্রিয় স্বদেশ এই বাংলাকে খণ্ডিত করার বিরুদ্ধে প্রথম সূচিত হয়েছিলো আলোড়ন-তোলা স্বদেশী আন্দোলন। শুরু হয়েছিলো বৃটিশ রাজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদী বিপ্লব।

ইংরেজ শাসকদের প্রতি তখন ঘৃণার যে দাবানল জ্বলে উঠেছিলো, ইতিহাসে তার তুলনা বিরল। বঙ্গভঙ্গ রদের সেই প্রচণ্ড উৎক্ষেপে ১৯১১ সালেই ছেঁড়া ন্যাকড়ার মতন ডাস্টবিনে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলো জাঁদরেল বড়লাট লর্ড কার্জনের বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ পরিকল্পনা। ওই বছরই বাংলা আবার একীভূত হলো। ১৯৪৬ সালের জুন মাসে সেই অখন্ড বাংলাকেই উগ্রবাদীরা তাদের তীক্ষ্ম ছুরিকাঘাতে কেটে দুই টুকরো করলো। রক্তের নদী বইলো তার বুকে।

এ ইতিহাস আমরা দেখেছি অসহায় দৃষ্টি মেলে। কারণ আমাদের সাংবাদিক জীবনের সূচনালগ্নেই তো ঘটলো এই মহাট্র্যাজেডি। রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চের পর্দার ভেতরে এবং বাইরে ঘন ঘন দৃশ্য বদলানোর আশা-নিরাশায় দোদুল্যমান নাটকেরও

www.pathagar.com

কখনো প্রত্যাশাবাদী, কখনা হাত-নিস্‌পিস্‌-করা ক্ষুব্ধ দর্শক ছিলাম আমরা। বছর কয়েক আগে 'দেশ কেন ভাগ হলো' গ্রন্থে বীরেন্দ্র শাসমল বাংলা এবং ভারত ব্যবচ্ছেদের জন্যে কংগ্রেসের শীর্ষনেতা গান্ধীনেহরু-প্যাটেল আর উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদী শ্যামাপ্রসাদ, সাভারকার, বরদোলই প্রমুখকে দায়ী করেন। ১৯৩৯ থেকে '৪৬ সাল পর্যন্ত একটানা প্রায় সাত বছর স্থায়ী অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেসের সভাপতি মওলানা আবুল কালাম আজাদও তাঁর ইন্ডিয়া উইন্‌স্‌ ফ্রিডম' গ্রন্থের শেষ ৩০ পৃষ্ঠায় এই বেদনাদায়ক মহাব্যবচ্ছেদের জন্যে তাঁর প্রস্তাবিত পরবর্তী কংগ্রেস সভাপতি এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু জওহরলাল নেহরুকে মূলত দায়ী করেন। কারণ, ছেচল্লিশ সালে বোম্বাই সফরকালে বৃটিশ ক্যাবিনেট মিশনের স্বশাসিত 'এ-বি-সি গ্রুপ' ভিত্তিক একীভূত ফেডারেল সরকার পরিকল্পনা নেহরুই ভাবাবেগতাড়িত হয়ে নাকচ করে দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষে কংগ্রেস সভাপতি হওয়ার পরে-পরেই দলের শীর্ষস্থানীয়দের কারো সংগে যোগজিজ্ঞাসা না করে এই সুদূরপ্রসারী পরিণামসূচক কাজটা তিনি করে বসলেন।

এটি আলাদা এক ইতিহাস। আমাদের প্রথম যৌবনের উন্মেষকালে অভিনীত এর পরেকার মর্মান্তিক দৃশ্যগুলো। এ নিয়ে আলোচনা করবো পরে। এখন ফিরে যাই আবুল মনসুর আহ্‌মদ প্রসঙ্গে। আবুল মনসুর আহ্‌মদ বাংলা ভাষা আন্দোলনের মনস্তাত্ত্বিক পটভূমির প্রথম উদ্‌গাতাদের অন্যতম। ঢাকায় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন দমনের জন্যে 'দৈনিক ইত্তেহাদ'-এ (তখন এ কাগজ বেরুতো কলকাতা থেকে) নূরুল আমীন সরকারের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক সম্পাদকীয় লেখার অভিযোগে কাগজটির বাংলাদেশে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হলো। এর আগে ১৯৪৩ থেকে বাহান্ন পর্যন্ত বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে প্রচুর নিবন্ধ তিনি লিখেছিলেন। তাঁর এ অবদান বাংলা ভাষা আন্দোলনের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়।

তরুণ কলামিস্ট আহমেদুর রহমানকে দৈনিক মিল্লাতে খোন্দকার আব্দুল হামিদ অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর করে নেন। এই কাগজে আহমেদ 'সাপে-নেউলে' শিরোনামে রাজনীতি বিষয়ক একটি ব্যঙ্গাত্মক কলাম লিখতেন। তখন কাগজের প্রতিষ্ঠাতা মোহন মিয়া মুসলিম লীগ ছেড়ে শেরে বাংলার কৃষক-শ্রমিক পার্টিতে আসেন। পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি হলেন। হলেন যুক্তফ্রন্টের অন্যতম শীর্ষ নেতা। কাগজের সম্পাদকীয় লেখকরা তখন কলম খুলে লিখতে পারতেন লীগ সরকারের অপরাজনীতির বিরুদ্ধে।

আগেই বলেছি, আহ্‌মেদ ছিলেন প্রতিবাদী সাংবাদিক। এই কলামটি অচিরেই জনপ্রিয় করে তোলে তাকে। উনিশ শ আটচল্লিশে ম্যাট্রিক পাসের পর প্রায়-কিশোর এই ছেলেকে একান্নতে নামতে হয় জীবনযুদ্ধে। ঢাকা বেতারে কেরানি হিসাবে তার শুরু জীবিকা উপার্জনের। এখানেই সে খোন্দকার আব্দুল হামিদের নজরে পড়ে। কিন্তু এখানে ৫২-৫৩ সালে বেতার ভবনে তীব্রতর হয়ে ওঠে তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীদের বেতন-ভাতা দাবির আন্দোলন। এর নেতৃত্বে থাকায় চাকরি

www.pathagar.com

খোয়াতে হলো আহ্‌মেদকে।

এর পরেই মিল্লাতে সাংবাদিকতার জীবন শুরু তার। সেই চুয়ান্ন সালেই 'পূর্ববঙ্গ লেখক সংঘ' নামে তরুণ কবি-সাহিত্যিকের একটি সংগঠন গড়বার সময় আমার সংগে ঘনিষ্ঠ পরিচয়। এ সংগঠনের সংগে জড়িত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, বাংলা বিভাগের ছাত্র-কবি মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, কবি আবদুস সাত্তার, কাজী নজমুল হকের সম্পাদনায় পরিচালিত সাপ্তাহিক সাহিত্যপত্র 'কাফেলা' পত্রিকা এবং 'দৈনিক ইত্তেফাক'-এর সংগে জড়িত কবি আল-মাহমুদ, নজমুলের স্ত্রী কবি লতিফা হক, ছোট গল্পকার লুৎফর রহমান, কবি আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী এবং আরো অনেকে। আমি ছিলাম সংগঠনের সভাপতি, ওয়াসেকপুরী সম্পাদক, আহ্‌মেদুর রহমান ছিলেন প্রচার সম্পাদক। এর আগে আমরা ছিলাম 'সওগাত' কেন্দ্রিক 'সাহিত্য সংসদ'-এর সদস্য।

সঙ্গীত সম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খান এবং আন্দামানের প্রবাদখ্যাত বন্দি বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তের সরাইলের ব্রাহ্মণচিরণ গ্রামের জন্মস্থান সংলগ্ন বড়াইল গ্রামে জন্মগ্রহণকারী আহ্‌মেদুর রহমানের সাংবাদিক চৈতন্যে ছিলো তার পরিবেশের প্রভাব। ছাপ্পান্ন সালে অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর হিসাবে দৈনিক ইত্তেফাকে যোগ দেবার পর 'ভীমরুল' ছদ্মনামে বেরুতে থাকে তাঁর নিয়মিত কলাম 'মিঠে-কড়া'। এই কলামে রাজনৈতিক শ্লেষাত্মক লেখার জন্যে পাঠকনন্দিত হলেন তিনি।

ছোটগল্প লেখায় চমৎকার হাত ছিলো তাঁর। 'যুদ্ধ না শান্তি' তাঁর নামকরা ছোটগল্প। 'লাল শাড়ি' এবং 'তরঙ্গ নীল রাত্রি' জনপ্রিয় অনুবাদ গ্রন্থ। একটি মৌলিক উপন্যাস রচনায় হাত দিয়েও শেষ করে যেতে পারেননি।

আহ্‌মেদসহ কায়রো বিমান দুর্ঘটনায় নিহত বন্ধুদের ওপর অশ্রুপাত করে সম্পাদকীয় লেখা যে কী কঠিন কাজ, একজন সহযোগী সাংবাদিকের জন্যে তা ছিলো সত্যি দুঃসহ।

নিহত বন্ধুদের ঘরে গিয়ে তাদের স্বজনদের বোবামূর্তি আর শিশুদের ক্রন্দনরোলের যে-দৃশ্য দেখেছি, মনে পড়লে তা আজো মথিত করে স্মৃতিকে। কায়রোর ধ্বংসস্তূপে তাদের দগ্ধ-বিকৃত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন দেহগুলো সনাক্ত করতে পেরেছিলেন অনুসন্ধানী দল। ক্রুসেড যুদ্ধজয়ী গাজী সালাহউদ্দিনের মাজারের কাছে সমাহিত করা হলো চব্বিশ সাংবাদিকের মৃতদেহ। সেখানে এঁদের নাম উৎকীর্ণ করে নির্মিত হলো একটি স্মৃতিস্তম্ভ। নিহতদের পরিবারপিছু সত্তর হাজার টাকা করে দেয়া হলো অনুদান। এই বিশাল মৃত্যুগুলোর অপূরণীয় ক্ষতির তুলনায় কত তুচ্ছ এ দান।

আমাদের জীবনকালে আরেকটি মহট্র্যাজেডির সূত্রপাত হয়েছিলো এই শহরে। তার ভয়ংকর, বীভৎস ছায়াপাত ঘটতে দেখলাম বাংলাদেশ নামক বিশাল এই জনপদে। আগুনের লেলিহান শিখায় ট্রয় নগরীর ভস্মসাৎ হওয়ার মুখে অসহায় নরনারী-শিশুর পরিত্রাহী চিৎকারের চেয়েও হৃদয়-বিদারক ছিলো সেদিনকার সেই

www.pathagar.com

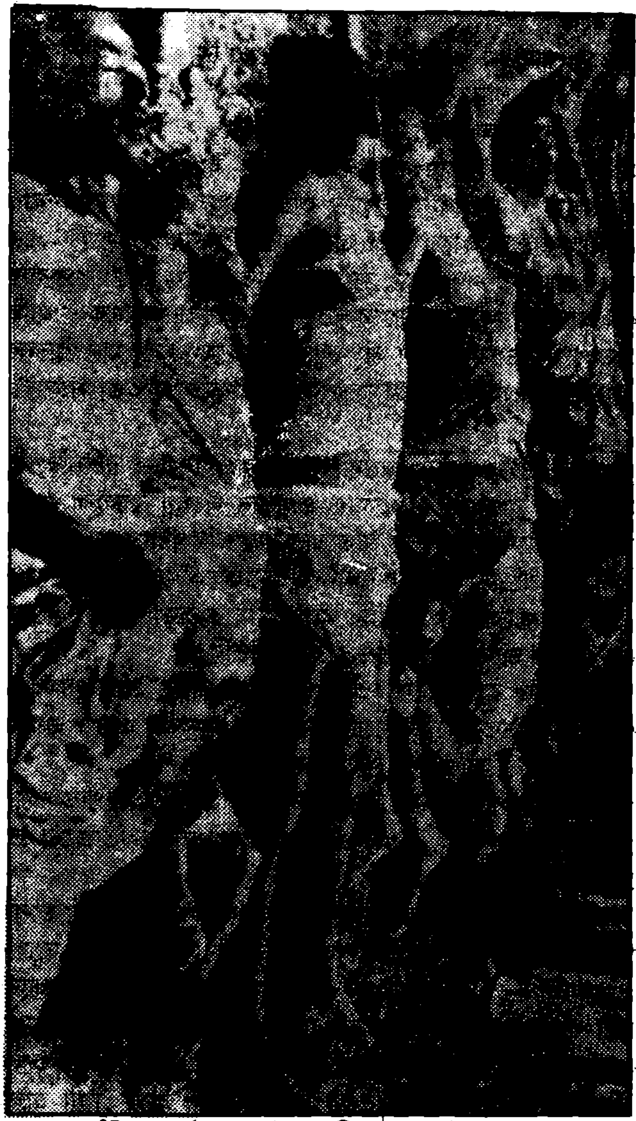

পঁচিশে মার্চ রাতে এই নারকীয় তাণ্ডব ঘটানো হয় সান্ধ্য আইনের ছত্রছায়ায়

দৃশ্য। রাতের অন্ধকারে গ্রীক হানাদারদের অতর্কিত আক্রমণের শিকার হয়েছিলো তারা। ঘুমের মধ্যেই পুড়ে ছাই হলো অগণন মানুষ।

নিরাপদ ঘরগুলোতে যখন বেষ্টন করলো আগুনের লোল জিহবা তার গ্রাস থেকে বাঁচবার জন্যে কোলের শিশুকে বুকে নিয়ে ছোটাছুটি করছিলো বিপন্ন মায়েরা। রোরুদ্যমানা নারীর হাহাকার কেবল করুণ প্রতিধ্বনি তুললো বাতাসে। তারপর অসহনীয় এক নিস্তব্ধতা। তার আগেই মৃত্যু বিস্তার করেছিলো তার দানবীয় থাবা। পর মুহূর্তেই লেপ্টে থাকতে দেখা গেলো পোড়াকাঠা হয়ে যাওয়া মা এবং শিশুদের চোখে মূর্তিমান এক আতংক। তারা যেন বলছিলোঃ পৃথিবীর ভালোবাসায় আরো কিছুকাল বাঁচতে চেয়েছিলাম আমরা। কিন্তু কেউ এলো না আমাদের বাঁচাতে।

www.pathagar.com

কিন্তু সে রাতে ট্রয় শহরে স্বাধীনতার পতাকা হাতে নিয়ে নির্ভয়ে দাঁড়িয়েছিলো এক নারী। রাজকুমারী ক্যাসান্দ্রা। তাঁকে দেখা গেলো নগরীর দুর্গ শীর্ষে অবস্থান নিতে। তিনিই তো অনেক আগে বলেছিলেনঃ বিপদ আসন্ন সুতরাং সর্বক্ষণ সতর্ক থাকো ট্রয়বাসীরা। আরো বলেছিলেনঃ ইটারনাল ভিজিলেন্স ইজ দ্য পাইস অভ্ ফ্রিডম। তাঁর কথায় তখন কেউ কান দেয়নি। মনে করেছিলো তারা- কোনো শত্রুর সাধ্য নেই তাদের সুরক্ষিত নগরে আঘাত হানবার। এই গর্ববোধের জন্যেই সার্বক্ষণিক সতর্কতা ছিলো না তাদের। সুতরাং শত্রু এলো। রক্ষীদের প্রতারিত করে খুলবার সুযোগ পেলো নগরদ্বার।

এরপরেই সেই বিয়োগান্ত নাটক। কিন্তু দুর্ভাগ্যের চরম মুহূর্তেও ক্যাসান্দ্রার নিষ্কম্প হাতে ধরা ছিলো স্বাধীনতার পতাকা। চিৎকার দিয়ে তিনি বলছিলেনঃ যুদ্ধ দাও। যুদ্ধ দাও! প্রতিরোধ করো। নিশ্চিহ্ন করো শত্রুকে। লুণ্ঠিত হতে দিয়ো না ট্রয়ের স্বাধীনতা।

তাঁর ডাকেই তো আগুন ডিঙ্গিয়ে প্রতি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন বীরেরা। দেশপ্রেমিকেরা। হাতাহাতি যুদ্ধ হলো নগর চত্বরে। রাস্তায়। নগরের বাইরে। কিন্তু তখন তো ছিলো অন্তিম মুহূর্ত। ফুরিয়ে গিয়েছিলো বিজয়ের সব সুযোগ। তবু তাঁরা ছিলেন প্রচন্ড যোদ্ধা। দুঃসাহসী, দুর্ধর্ষ সেনার মতন লড়তে-লড়তে আলিংগন করলেন মৃত্যুকে। দার্দানেলিসের বেলাভূমিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকলো তাঁদের লাশ। কিন্তু মুখমণ্ডলে উৎকীর্ণ ছিলোঃ আমরা পরাজিত হইনি এবং মরিওনি। কারণ আমরা ছিলাম স্বাধীনতার যোদ্ধা। আরো লেখা ছিলো সেসব মুখের পোস্টারেঃ হানাদারের কাছে কখনো পরাজয় মানে না স্বাধীনতার সেনারা। মৃত্যুর কাছেও না।

একাত্তরের পঁচিশ মার্চ রাতে ট্রয়ের সেই ভয়ংকর, দুঃসহ এবং করুণ নাটকই অভিনীত হয়েছিলো এই মহানগর ঢাকায়। কিন্তু সেই বীভৎস ধ্বংসযজ্ঞের নারকীয়তার মধ্যে ভয়ার্ত সন্তানদের বুকে নিয়ে আসন্ন মরণ-দূতের জন্যে আতংকের প্রহর গোনা ছাড়া কোনো উপায়ই কারো ছিলো না। কিন্তু তার মধ্যেও কে যেন ক্যাসান্দ্রার মুখ দিয়ে ভরাভয় মন্ত্র উচ্চারণ করছিলো আমার কানে। বলছিলোঃ মরবার আগে মরে যেয়োনা। যুদ্ধ দাও! নিপাত করো শত্রুকে।

ঢাকায় সে রাতে কামান-মর্টার-মেশিনগানের গর্জনের মধ্যে কালো কুৎসিত ছায়া ভাসতে দেখলাম হালাকু খানের। দানবীয় চিৎকার শুনতে পেলাম তার হিংস্র, বর্বর সেনাদলের। মনে হলো ত্রয়োদশ শতকের মনোরম নগরী বাগদাদ ছারখার হচ্ছে জ্বলে-পুড়ে। হাহাকার ভেসে আসছে ভয়াকুল নরনারী এবং শিশুর। একটানা সাতদিন নির্বিচার হত্যালীলা চললো। নিহত হলো দশ লাখ নিরীহ নিরস্ত্র নগরবাসী। তাদের কাটামুণ্ডু নিয়ে একটার পর একটা মিনার গড়লো যখন রক্ত স্রোতে তাই গ্রিসের পানি উপচে উঠলো রক্তের বন্যায়, সেকি উল্লাস তখন বর্বর হালাকুর! মহাবিজয়ের আনন্দে গোঁফে তা দিচ্ছিলো এক সাক্ষাৎ দানব আর তার নরপিশাচের দল।

সেই রাতেও হালাকুর প্রেতাত্মা ইয়াহিয়া খান নামক এ আরেক বর্বরকে দেখা গেলো প্রেতের হাসি হাসতে। তার লেলিয়ে দেওয়া পিশাচের দল জ্বালিয়ে পুড়িয়ে

www.pathagar.com

ছারখার করলো এ শহরটাকে। হাজার হাজার নরনারী-শিশুকে হত্যা করলো তারা মেশিনগান-মর্টারের বৃষ্টির গোলাগুলিতে। ট্যাংক-বহরের চাকার তলায় পিষ্ট করলো অসংখ্য বাড়িঘর, বাঙালি সেনা এবং পুলিশের ছাউনি। বিপন্ন মানুষের আর্তচিৎকার শুনে সেকি উল্লাস তাদের! অসহায় নারী-শিশুকে আগুনে ঝলসাতে দেখে গৃধিনীর ভয়ংকর হাসি ছিলো কাপালিকদের মুখে।

পঁচিশের আর ছাব্বিশের সে-কালোরাতে এই নারকীয় তাণ্ডব ঘটেছে সান্ধ্য আইনের ছত্রছায়ায়। আমাদের আতংকিত দৃষ্টির সামনে। সেই বিভীষিকাময় দৃশ্যের জান্তব, প্রস্তরমূর্তি ছিলাম আমরা। যারা কোনোমতে জীবিত ছিলাম এই অবরুদ্ধ শহরে। এক ভীতিকর অবস্থা ছিলো সে-রাতে ঢাকার পত্রিকা অফিসগুলোতে। এ-প্রজন্মের সাংবাদিকরা অনুভব করতে পারবেন না তার গভীরতা। তার জন্যেই স্মৃতি জাগরুক থাকতে কিছু কথা লিখে যাচ্ছি।

রাত তখন বারোটা বাজতে মিনিট বিশেক বাকি। তার আগে বেলা একটার পরে-পরে ভেঙ্গে গেলো ইয়াহিয়া-ভুট্টোর সঙ্গে বঙ্গবন্ধু এবং আওয়ামী লীগ নেতাদের গোলটেবিল বৈঠক। বিক্ষুব্ধ বাঙালির হৃদয়ে অংকিত হয়ে গেছে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি। তার মানচিত্র।

ঢাকা তখন গুজবের নগরী। একই সংগে প্রতিরোধের নগরীও। মুখে-মুখে সংবাদ রটতে লাগলো-রাতেই পাক হানাদারেরা ট্যাংক-কামান-মেশিনগান নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে ঢাকার বুকে। মেতে উঠবে অঘোষিত যুদ্ধে। বাঙালি জাতির ওপর চালাবে একযোগ আক্রমণ। রাত নামবার পরে-পরেই খবর এলো এর আগেই ইয়াহিয়া, ভুট্টো আর তাদের দোসরের দল ঢাকা ছেড়ে চলে যায় প্লেনে চেপে। যাওয়ার আগে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলো বাংলাদেশে পাইকারি ধ্বংসতাণ্ডব এবং হত্যাযজ্ঞ চালাতে। খবরগুলো ছিলো তখনো অনেকটা উটকো।

আতংকের গুজবের মুখে ভেবেছিলাম কাগজের লেখালেখি সেরে নয়টার আগেই ঘরে ফিরবো। কিন্তু গণবিক্ষোভের ওপর একটা কিছু লেখার জন্যে নিসপিস করছিলো হাত। ওটা লিখতে বেশ দেরি হয়ে গেলো। লেখার বক্তব্য ছিলো-দুর্ধর্ষ ব্ল্যাক অ্যাণ্ড ট্যান বাহিনী লেলিয়ে দিয়েও উত্তর আয়ারল্যাণ্ডকে শেষ পর্যন্ত তাঁবে রাখতে পারেনি ব্রিটিশ সরকার। দমাতে পারেনি সিনফিন তথা স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা ডি ভ্যালেরাকে। এখানেও পারবে না। কারণ ঢাকার উত্তপ্ত মাটিতে রচিত হতে শুরু করেছে স্বাধীনতার ইতিহাস।

লেখা প্রেসে দিয়ে বাসায় ফিরলাম রাত বারোটার মিনিট তিনেক আগে। বড় মগবাজারে যাওয়ার পথে মোড়ে-মোড়ে দেখলাম কংক্রিটের বড়-বড় পাইপের এবং ইটের স্তূপের ব্যারিকেড। শোবার ঘরে ঢুকে কাপড় ছাড়বার আগেই রাজারবাগের দিক থেকে ভয়ংকর গর্জন তুলে মর্টার এবং মেশিনগানের বৃষ্টি শুরু হলো। শুনতে পেলাম ট্যাংক চলাচলের ভৌতিক শব্দ। সে সংগে আতংকিত মানুষের আর্তস্বর। ঝাঁক-ঝাঁক বুলেট এক মাইল দূর থেকে বাতাসের ওপর দিয়ে গড়িয়ে খৈ ফোটার

www.pathagar.com

মতন এসে পড়তে লাগলো দোতলা বাড়ির ছাদে। ভয়ে শিঁটিয়ে উঠলাম স্বামী-স্ত্রী দু'জন। মুরগির বাচ্চার মতন কাঁপছিলো ছেলেমেয়েরা। খাটের তলায় বিছানা পেতে তাদের বুকের পাশে নিয়ে শুয়ে পড়লাম। থেমে-থেমে কিছুক্ষণ পর পর গোলাগুলির বৃষ্টি হয়। থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে ছেলেমেয়েরা। ওরা তখন কত ছোট। অভয় দিতে লাগলাম, ভয় পেয়ো না। গুলি লাগবে না খাটের তলায়।

যেখানে একটি শহর জ্বলছে, মর্টারের গোলার গর্জনে প্রতিমুহূর্তে কাঁপছে বাড়িটা, জানালা গলিয়ে আসছে সার্চলাইটের তির্যক আলো-সেখানে কি কোনো অভয়ের কথা বুঝ মানাতে পারে শিশুদের? গোলাগুলির বৃষ্টি শুরু হলেই তিরতিরিয়ে কাঁপতে থাকে তারা। ছোট ছেলেটার বয়স ছিলো পাঁচ। কেবলই সে বলে চলছিলোঃ ভয় লাগছে! ভয় লাগছে! দুই হাতে মায়ের বুক সাপ্টে ধরে ভয়ে ঠির-ঠির করছিলো সে। সাত বছরের মেয়েটা বলছিলোঃ আমরা বুঝি সবাই মরে যাবো বাবা। শিঁটিয়ে গিয়েছিলো তার সমস্ত শরীর। অন্ধকারের মধ্যেই আঁচ করতে পারছিলাম, শহরের সমস্ত ভয়ার্ত শিশুর আতংক লেপ্টে আছে ওর চোখে।

একটা জ্বলন্ত নরকপুরীতে দুই চোখ এক করতে পারে কেউ? আমরাও কী পেরেছি? মুহূর্তে-মুহূর্তে মনে হচ্ছিলো এই বুঝি কামানের শেলাঘাতে ছাদটা চুরমার হয়ে ভেঙে পড়বে বুকের ওপর! অমন দুর্বিষহ শংকা-আতংকের মধ্যেই কাটলো একটা নির্ঘুম, দীর্ঘ ভৌতিক রাত।

ভোর হলো। কিন্তু কানে এলো না পাখির কোনো ডাক। ওরাও নিশ্চয় ভয়ে পালিয়েছে নরপিশাচ-তাড়িত এই শহর থেকে। নিত্যকার মতোই ভোরের আকাশে জাগলো সূর্য। কিন্তু নিঃসাড় হয়ে পড়ে থাকলো চারপাশের স্থাবর এবং জংগম। যেন কবরের নৈঃশব্দ শীতল বাহু মেলে ছেঁকে ধরে রেখেছে শহরটাকে। মাঝে মাঝে কেবল কানে ভেসে আসে মিলিটারির জীপের গর্জন। ট্যাংক আর সাঁজোয়া গাড়ি-বহরের ভারী ধাতব শব্দ।

জানালার পর্দাঘেরা কাচের ভেতর দিয়ে চুপিসারে দেখলে দেখা যায়-তখনো কুন্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে পোড়া বাড়িগুলোর ভেতর থেকে। রাজারবাগ পুলিশ ব্যারাকের জ্বলন্ত ইট-কাঠ থেকে।

অবরুদ্ধ নগরীর বাড়িঘরগুলোতে ছিলো ভয়ার্ত নরনারীর শব্দহীন চকিত পদচারণা। আর কিছু অনুচ্চ ফিসফিসানো কথা। রাস্তায় ঝুলে আছে সান্ধ্য আইনের হুকুমনামা। পথে বেরুলেই গুলি। গলি-কানাগলিতেও টহল চলছে রক্তপিপাসু বর্গি-হানাদারের। শুধু সক্রিয় ছিলো দখলদার কবলিত ঢাকা বেতার। তার সুইচ টিপলেই কানে ভেসে আসে হায়েনার চিৎকার। শোনা যায় মার্শাল ল'র সাজার কথা। শোনা যায় কারফিউ'র আতংককর ঘোষণা। বায়াত্তর ঘন্টার কারফিউ। কাউকে বাইরে বেরুতে দেখা গেলেই তৎক্ষণাৎ গুলি।

আর কোনো খবর নেই কোথাও। কেমন করে জানবো যারা রাতের শিফটে কাজ করছিলো সংবাদপত্র অফিসগুলোতে সেই সাংবাদিক সহকর্মীদের কথা? হাজার

www.pathagar.com

দুর্যোগের মুখেও একজন সাংবাদিক ব্যাকুল হয়ে থাকে খবর জানবার জন্যে। সেদিনও ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলাম ওই বন্ধুদের খবর জানতে। ওঁরা কী কাগজ বের করতে পেরেছিলেন? নাকি গোলাগুলোর বৃষ্টির মধ্যে পড়ে কোনো অঘটনের শিকার হয়েছেন? শংকার পর শংকা দুলছিলো মনে।

তিনদিনের মাথায় দু'ঘন্টার জন্যে শিথিল হলো কারফিউ। উর্ধ্বশ্বাসে বেরুলাম ঘর ছেড়ে। তিনশ' গজ দূরে পা রাখতেই দেখলাম মগবাজার মসজিদে এক গুলিবিদ্ধ মুসল্লির রক্তাক্ত লাশ। অজুর জায়গায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছে মৃতদেহটি। রক্তের ধারায় লাল হয়ে আছে সামনের সড়ক। আপনা থেকেই ঘৃণায় রি-রি করে উঠলো সমস্ত শরীর। মসজিদের একজন ধর্মভীরু মুসল্লিও যে-জল্লাদদের থাবা থেকে বাঁচে না তারা কোন নরকের কীট? পাকিস্তান নামক দেশটির যে-নেতাদের আজ্ঞাবহ এরা নিশ্চয় সেই নেতারাও নরপিশাচ। এক‌েকটি নরাধম হালাকু, চেঙ্গিজ খান।

রাজারবাগ পুলিশ কোয়ার্টারের মোড়ে এসে দেখলাম, ভস্মসাৎ হয়ে আছে টিনের ছাউনির সবকটি পুলিশ ব্যারাক। রাস্তায় চাপ-চাপ রক্তের ধারা। শুনলাম সারা রাত যুদ্ধ করেছে ওরা দখলদার ফৌজের সংগে। মনে ধ্বনিত হলো ট্রয়ের বীরাঙ্গনা ক্যাসেন্দ্রার কণ্ঠস্বরঃ যুদ্ধ দাও, যুদ্ধ দাও, তোমরা গ্রীক দস্যুদের! পরের মাসগুলিতে সারা বাংলাদেশেই শোনা গেলো এরকম অসংখ্য দেশপ্রেমিকা ক্যাসান্দ্রার বজ্রকণ্ঠধ্বনি। আপন সন্তানদের তাঁরা একই আবাহন জানিয়ে রণাঙ্গনে পাঠিয়েছেন দেশমুক্তির জন্যে। স্বাধীনতার জন্যে।

দৈনিক বাংলার মোড়ে এসে দেখলাম ব্যারিকেড ঘেরা রাস্তায় খুনের নদী। শহীদ হয়েছে এখানে অনেক প্রতিরোধ-যোদ্ধা! শুনলাম, রাতে কর্মরত সাংবাদিকরা ক্ষান্তিহীন গোলাগুলোর মুখে টেবিল জড়ো করে তার নিচে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কাগজ বের করেননি। ৭২ ঘন্টা দানাপানি না-খেয়ে বন্দি হয়ে থেকেছিলেন পত্রিকার অফিসে।

আরো ভয়ংকর দৃশ্য দেখলাম বংশাল রোডে এসে। দৈনিক সংবাদ অফিস ঘাতকদের আগুনে বোমায় পুড়ে ছারখার। ঝাঁঝরা হয়ে আছে সব দেয়াল গোলাগুলির আঘাতে। সাংবাদিক শহীদ সাবের পুড়ে মারা গেছেন আগুনের লেলিহান শিখায় বেষ্টিত হয়ে। নামের শুরুতে তাঁর 'শহীদ' কথাটি। মরলেনও তিনি শহীদ হয়ে। শাহ্‌বাগের 'দ্য পিপল' পত্রিকার অফিসটি জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিলো ওই রাতেই। ছাপাখানার দু'জন কর্মী মরলেন জীবন্ত দগ্ধ হয়ে।

হাটখোলা রোডের ইত্তেফাক অফিসও পুড়িয়ে দেয়া হলো। রাতে অফিসে আটকা পড়েছিলেন নির্বাহী সম্পাদক সিরাজুদ্দীন হোসেন, ভারপ্রাপ্ত বার্তা সম্পাদক আসফ উদ্দৌলা রেজা এবং আরো অনেকে। এঁরা দক্ষিণের জানালা টপকে গোপীবাগের রেল লাইন পেরিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন পুবের এক গ্রামে। কারফিউ শিথিল হলে পর ফিরতে পেরেছিলেন বাড়ি।

কিন্তু তারপরেও কী সিরাজুদ্দীন হোসেন এবং আরো বহু সাংবাদিক বাঁচতে পেরেছিলেন হায়নাদের হিংস্র থাবা থেকে? স্বাধীনতার মাত্র পাঁচ-ছয়দিন আগে

www.pathagar.com

রাতের অন্ধকারে ধরে নিয়ে গিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিলো দেশপ্রেমিক এই সাংবাদিকদের। তাদের সঙ্গে খুন করা হয়েছিলো দেশের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীদের। প্রায় সবাইকে চোখ বেঁধে তুলে নেওয়া হয়েছিলো ঘর থেকে।

স্বাধীনতার ইতিহাসের এ এক করুণতম কাহিনী। বিজয়ের পদধ্বনি যখন শোনা যাচ্ছিল দ্বার প্রান্তে ঠিক সেই মুহূর্তে শেষবারের মত হিংস্র ছোবল মারল নাগিনীর দল। সারা দেশের মুক্ত আকাশে স্বাধীনতার পতাকা উড়তে আর মাত্র ছিল দিন পাঁচেক বাকি। ষোল ডিসেম্বর চোখের একেবারে নাগালে। তার আগে আগস্ট-সেপ্টেম্বর থেকে দখলদারদের রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত হচ্ছিল প্রায় প্রতিদিনই একেকটি জেলা। মুক্ত হচ্ছিল তিন দিকের সীমান্ত সংলগ্ন বিস্তীর্ণ অঞ্চল। সেসব জায়গায় চালু হয়ে গিয়েছিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসন। থানা সদর এবং জেলার কোর্ট-কাছারির মাথায় শোভা পাচ্ছিল উদয় সূর্য-খচিত ঝাণ্ডা। এই অবরুদ্ধ শহরে ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ শুরু হওয়ার শেষ কয়েকটি দিন ব্যাগ্রাকূল হয়ে অপেক্ষা করছিলাম আসন্ন বিজয়ের ঐতিহাসিক লগ্নটির জন্য। ঢাকা আর কেবল দুঁএকটি শহর তখনও হানাদারকবলিত।

স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে ঘন্টায় ঘন্টায় ভেসে আসছিল চূড়ান্ত বিজয়ের সন্ধিক্ষণটির বার্তা। জায়গায়-জায়গায় হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের খবর দিচ্ছিলেন চরমপত্র-র লেখক এবং ঘোষক সাংবাদিক এম আর আখতার মুকুল। ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে, রেডিও সেটের বেতার তরঙ্গ ধ্বনি নিচু গ্রামে নামিয়ে এসে উৎকর্ণ হয়ে শুনতাম সেসব উদ্দীপ্ত সংবাদ। আশায়-আশায় গুনতে থাকতাম সময়। সমস্ত অনুভূতি দুলতে থাকত এক অনির্বার উত্তেজনার আবেগে। কেবল একটি ব্যাকুলতাই অনুরণন তুলত সমস্ত প্রাণমন জুড়েঃ আহা, কখন মুক্ত-নাগরিক হয়ে নামতে পারব রাস্তায়! শ্বাস ফেলতে পারব স্বাধীনতার আলো এবং বাতাসে।

ঢাকায় আটকে পড়ে থাকা মানুষগুলোর সেই নয় মাসের দুঃসহ জীবন, প্রতি মুহূর্তের মরণভীতি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আর শেষ কয়েকটি দিনের আশা-নিরাশার দোলাচলের অনুভূতি বর্ণনার অতীত। রোমারোঁলা, মোপাসাঁ, হেমিংওয়ে কিংবা শরৎচন্দ্রের মতন সংবেদনশীল কথাশিল্পীরাও বোধকরি একটি ভয়ংকর কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে বন্দি সেদিনকার এই সব মানবাত্মার যন্ত্রণাকে ভাষায় রূপ দিতে পারতেন না। পারতেন না ছবিতে মূর্ত করে ফুটিয়ে তুলতে মাইকেল অ্যানজেলো, দ্যা-ভিনচি কিংবা জয়নুল আবেদীনের মতন স্পর্শকাতর অমর শিল্পীরাও। ড্যামোক্লিসের তলোয়ার সর্বক্ষণ ঝুলছিল যে-মানুষগুলোর মস্তকের ওপর মুখোমুখি না দেখলে তাদের মরণাতংকের দৃশ্য ভাষায় অথবা তুলিতে বাঙময় করে তুলে ধরা সম্ভব নয়। আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসের এ এক অব্যক্ত করুণ কাহিনী। যা লিপিবদ্ধ ছিল জল্লাদের খাঁড়ার কোপের মুখে অহোরাত্র যাপন করা কয়েক লাখ নর-নারীর আরক্ত প্রাণে।

কী তুচ্ছই না ছিল সেই দিনগুলোতে এই শহরের নিরীহ, নিস্প্রাণ মানুষের জীবন! এই মুহূর্তে মনে পড়ছে সংবাদপত্রের প্রকাশক মুদ্রাকর এবং ছাপাখানা

www.pathagar.com

মালিক আমার এক আত্মীয়ের কথা। মুখভরতি তার দাড়ি। মাথায় কিস্তি টুপি। গ্র্যাজুয়েট ছিলেন। আজান পড়লেই মসজিদের দিকে ছুটতেন। নাম নূরুর রহমান জামালী। জামালপুর জেলার লোক ছিলেন। নামের শেষে তাই ধারণ করেছিলেন 'জামালী' পদবি। মনোপ্রাণে ছিলেন তিনি স্বাধীনতার পক্ষের লোক। গোপনে সাহায্য করতেন মুক্তিযুদ্ধে যাওয়া আশপাশের ছেলেদের।

২৫ মার্চ রাতে ঢাকা আক্রান্ত হওয়ার দু'দিন পর এই পরিবারটির নারী-পুরুষ-শিশু সবাই প্রাণভয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন বুড়িগঙ্গার দক্ষিণে কামরাঙ্গীরচরে। তাদের দুধওয়ালার বাড়িতে। অনেক দিন ছিলেন সেখানে। তারপরও এখানে ওখানে লুকিয়ে-ছাপিয়ে ছিলেন। শেষে নিদারুণ অর্থকষ্টে পড়ায় ঝুঁকি নিয়ে বন্ধ করা প্রেসটি চালু করলেন আবার। পাঠ্য পুস্তকই বেশিরভাগ ছাপা হত প্রেসে। আর ছাপা হত ছোটখাটো দু-একটি মাসিক কাগজ আর সাহিত্য পুস্তক।

আগে থেকেই ফেউ লেগে গিয়েছিল ওঁর পেছনে। মাঝে মধ্যে অচেনা কিছু লোক এসে উঁকি ঝুঁকি দিয়ে দেখত প্রেসে কী ছাপা হচ্ছে। বই ছাপবার নাম করে এরা আসত। প্রেস কী ছাপা হচ্ছে। প্রেস থেকে বেরুনো ছাপা ফর্মাগুলোর ওপর চোখ বুলাত। বলতঃ দেখি, আপনার প্রেসের ছাপা কেমন? আমাদের পুস্তকের ছাপা কেমন হবে একটু পরখ করে দেখতে চাই। কখনও-কখনও আসত আধা-বাংলা জানা দু-চারজন অবাঙালি।

শহীদুল্লাহ্ কায়সার   নিজামুদ্দিন আহমদ   আ ন ম গোলাম মোস্তফা

মুক্তিযোদ্ধাদের ওরা বলত 'মুক্তি।' বুঝল 'মুক্তিদের' হাতে আর ওদের মুক্তি নেই। সুতরাং পাততাড়ি গোটানোর আগে যত পার লুটেপুটে নাও। পোড়ামাটির পথ ধরে ছারখার করা বাংলাদেশটাকে। জানত সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবীরা দেশের

www.pathagar.com

মাথা। ওদেরও মেরেকেটে সাফ করে দাও। তা হলে রাজনীতিকদের বুদ্ধি দেবার মতন মানুষ আর কেউ থাকবে না। ওরা একটা ধ্বংসস্তূপ পাবে, বিকলাঙ্গ দেশ পাবে কিন্তু মেধা পাবে না। এই ঘৃণ্য অপকৌশল থেকেই মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় পর্বে আমাদের শেষ সর্বনাশ করে গেল ওরা। ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পনার ছক এঁকে বেছে-বেছে হত্যা করল দেশের সেরা সাংবাদিক, মনীষী এবং বুদ্ধিজীবীদের। নৃশংসতম এ হত্যাকান্ডের শোক, বেদনা আর এর ফলে সৃষ্ট শূন্যতা কখনও কী নিবারিত হবে? সেই হতভাগ্য প্রকাশক-মুদ্রাকর নূরুর রহমান জামালীকেও স্ত্রী-কন্যা-পুত্রের বিলাপের করুণ দৃশ্যের সামনে প্রেস থেকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল হায়েনারা। দুই চোখ কালো কাপড়ে বেঁধে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ওঁকে। ঘটনাটি ঘটানোর আগে এক হাস্যকর এবং নিষ্ঠুর নাটকের মহড়া দিয়েছিল পাষন্ডরা। সন্ধ্যার দিকে জিপ এবং ট্রাক ভরতি একদল ঘাতক-মিলিশিয়া এসে ঘেরাও করল বাড়িটি। রাইফেল উঁচিয়ে কিছু হার্মাদ গেল বাড়ির উপর তলায়। মহিলারা তখন পড়ছিলেন মাগরেবের নামাজ। কেউ কেউ তসবিহ হাতে নিয়ে পড়ছিলেন দোয়া-দুরূদ।

এর মধ্যেও পশুর দল ওঁদের বুকের ওপর রাইফেলের বেয়নেট বাগিয়ে ধরল। হুংকার ছেড়ে গর্জালঃ 'হেঁয়া কুই 'মুক্তি' হ্যায়। উসকো দে দো।' মহিলাদের কয়েকজন ছুটে গিয়ে কুরআন নিয়ে এসে বুকে চেপে ধরলেন। আর্তনাদ করে বললেনঃ বাবারা, এই পাক-কালামের কসম আমরা সবাই মুসলমান। এখানে কোন মুক্তিসেনা নেই। আমরা মহিলারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ি, কুরআন পড়ি। আমাদের ইজ্জত নষ্ট করো না তোমরা। মহাপাপ হবে তোমাদের! এরপরও দমলো না শয়তানেরা। রাইফেলের বাঁট দিয়ে আঘাত করল বিলাপরত মহিলাদের। অস্ত্র পাবার নামে নগদ টাকার সন্ধানে তছনছ করল শোবার ঘরগুলো।

আরেকটি দল প্রেসে ঢুকে বইয়ের ছাপানো ফর্মাগুলোও তছনছ করলো। সাদা কাপড়ের একটি লোক পঁই পঁই করে ওল্টেপাল্টে দেখতে লাগল ছাপানো পাঠ্যপুস্তকের একটি স্তূপ। ধর্ম ও সমাজবিষয়ক একটি পাঠ্য বইতে ছিল ব্রাহ্ম ধর্মের ওপরে লেখা একটি নিবন্ধ। এতে সম্ভবত ছিল ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায় এবং কেশব চন্দ্রের ছবি। আধাবাংলা জানা লোকটি নিবন্ধের পাতাগুলো খুলে চোখ কুঁচকালো। মিলিশিয়া অফিসার পাঠ্যবইয়ের খোলা প্রথম পৃষ্ঠাটি টেনে নিয়ে বললঃ ইয়ে কোন-সা কিতাব? আওর ইয়ে ফটোগ্রাফ কোন লোগো কা? কিসকে বারে মে লিখখা হ্যায় ইয়ে কিতাব? অর্থাৎ সে বললঃ এ পুস্তক কোন ধরনের? আর ছবিগুলো কোন কোন লোকের এবং ফটোগুলো কাদের? দালালটি বললঃ হিন্দু ব্রাহ্মণদের নিয়ে লেখা এটি। আর ছবি দুটি তাদের নেতাদের। লোকটির কথা মুখে থাকতেই অফিসারটি নূরুর রহমানের বুকে রাইফেল ঠেকিয়ে বললঃ 'সমঝ গ্যেয়া, তোম হিন্দু হ্যায়। না-হোতো উন কাফেরোকো বড়া-সা দালাল হো। এক খতরনাক আদমি হ্যায় তোম।' সে বলতে চাইল- তুমি একজন হিন্দু। নয়ত ওই কাফেরদের বড় এক দালাল। সাংঘাতিক খারাপ লোক তুমি।

www.pathagar.com

নূরুর রহমান উর্দু ভাল বলতে পারতেন না। কিছু বাংলা কিছু উর্দু শব্দ মিলিয়ে তিনি মূর্তিমান দানবদের হুংকারের মুখেও সাহস সঞ্চার করে বললেনঃ এটা সরকার অনুমোদিত পাঠ্য কিতাব। ব্রাহ্ম সমাজের বয়ান লেখা আছে এতে -হিন্দু ব্রামণদের কথা নয়। ব্রাহ্মরা হিন্দু ধর্ম মানেন না। তাদের সমাজ এবং ধর্ম আলাদা। তারা একেশ্বরবাদী। ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে মুসলমানদের কাছাকাছি। পশুটি খেঁকিয়ে বললঃ গলাবাজি মত করো। ব্রাহমিন তো আসলি হিন্দু হ্যায়। ওয়ে সব মুলুককা বড়া দুশমন। হামলোক তোমকো ঠিক সে পাসানা। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ তো আসল হিন্দু। মুলুকের (অর্থাৎ পাকিস্তানের) বড় শত্রু। আর আমরা তোমাকে ঠিকমত চিনতে পেরেছি। বজ্জাতের হাড্ডি মূর্খটি ব্রাহ্ম কি বস্তু তা জানতোই না। জামালী বার বার পার্থক্যটা বোঝানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। অথচ এদেরই একটা দল নাকি এক বাড়িতে ঢুকে রবীন্দ্রনাথের মুখভরতি লম্বা সাদা দাড়ি, মাথায় টুপি, পরনে লংকোট এবংপায়জামাওয়ালা ফটো দেখে তাকে এক বড় বুজর্গ মনে করে ফটোটিকে সালাম করেছিল। আর বাড়ির লোকজনকে সাচ্চা মুসলমান হিসেবে ছেড়ে দিয়েছিল।

সেদিন এ বাড়ির মহিলাদের কাকুতি-মিনতি এবং কান্নার রোলের মধ্য দিয়ে ওরা টেনে-হিঁচড়ে একটি জিপে তুলল নূরুর রহমান জামালীকে।

ওই দিন নূরুর রহমানকে ধরে নেয়ার আগে মিলিশিয়া গ্রুপটির অর্থলোভী অফিসারটি নাকি তার আত্মীয়দের বলে যায় কুর্মিটোলার মিলিশিয়া ক্যাম্পে জলদি দেখা করতে। ডান হাতের পাঁচ আঙুল তুলে ইশারা করে মুক্তিপণ টাকা যোগাড় করতে। পাঁচ আঙুলের সংকেতের অর্থ ছিল পাঁচ লাখ টাকা। ভয়ে ওরা কেউ কুর্মিটোলা যেতে সাহস পাননি। ঢাকার কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি অফিসে গিয়ে আহাজারি করেও কোন ফায়দা হয়নি। কুর্মিটোলার ঘাতক ক্যাম্প থেকে ১৬ ডিসেম্বরে উদ্ধার পাওয়া বন্দিদের কাছ থেকে জানা গেছে, অশেষ যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করা হয়েছিল জামালীকে। গুম করা হয়েছিল ওঁর লাশ।

গোড়ার দিকে হতভাগ্য মানুষটির স্ত্রী-পুত্র-কন্যারা আশায়-আশায় ছিলেন হয়ত তিনি ফিরে আসবেন ১৬ তারিখে। কিংবা দু-একদিন বাদে। কিন্তু আর ফিরে আসা হল না ওঁর।

এই মর্মান্তিক ঘটনা জন্ম দিল আরও করুণ এক ঘটনার। বাবার অসহনীয় শোকে কাতর জামালীর বড় ছেলে কিছু দিন পর ধুঁকতে ধুঁকতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। ওর মা আর ছোট ভাইবোনেরা শোকে বোবা হয়ে থাকল দীর্ঘকাল। প্রায়ই প্রলাপ বকত ওরা। একটি ছেলে বেশ বড় হবার পরও বলতঃ স্বাধীনতার এল কিন্তু বাবা তো এলেন না। এই ছেলেরা সংগ্রামের সময় এক্সারসাইজ খাতায় আঁকত বাংলাদেশের পতাকা। আতংকিত মায়ের তাড়া খেয়ে পাতাগুলো লুকিয়ে রাখত।

এরকম করুণ ঘটনা ঘটেছে আমাদের সাংবাদিক পরিবারগুলোতেও। ডিসেম্বরের গোড়াতেই নরপিশাচদের টার্গেট হলেন দেশের সেরা সাংবাদিক এবং বুদ্ধিজীবীরা। আমার মনে পড়ছে প্রিয় বন্ধু সিরাজুদ্দীন হোসেনের কথা। ডিসেম্বরের সাত কি আট

www.pathagar.com

তারিখে দেখা করতে গেলাম সিরাজের চামেলিবাগের বাসায়। তার সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা। বারান্দায় পাতা টেবিলের সামনে পাশাপাশি বসলাম দু'জন। সিরাজ অনুচ্চ স্বরে বললেনঃ 'ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ভয়ংকর একটা খবর পেয়েছি নূরী। ওখানকার কয়েকজন বিশিষ্ট আইনজীবীকে ধরে নিয়ে গিয়ে গুলি করে হত্যা করেছে পাক-সেনারা। লক্ষণ খুব খারাপের। ঢাকার সাংবাদিক এবং বুদ্ধিজীবীদের ওপরও বিপদ আসতে পারে। সাবধানে থাকিস। পারলে বাসা বদল করে অন্য কোন জায়গায় সরে যা। আমার মন বলছে, যে কোন সময় মহাবিপদ ঘটতে পারে আমাদের।'

শেষে কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললঃ দেখিস, তোর মিতেন (সিরাজের স্ত্রী নূরজাহান বেগম) আর আমার ছেলেরা যেন ব্রাহ্মণবাড়িযার ঘটনাটা জানতে না পারে। ওরা টের পেলে ভয় পাবে। অস্থির হয়ে উঠবে। এমনিতেই বড় ছেলে শামীমের জন্য পাগলের মতন হয়ে আছে ওরা। শামীম মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে আছে। ওর জন্য আমারও বড় ভয়।

সেদিন যে আমাকে বিপদের ভয় দেখিয়ে সাবধান করলো শেষে কিনা হন্যে হয়ে তাকেই তাড়া করলো বিপদ। ১০ ডিসেম্বর রাতেই আর্তনাদরত স্ত্রী-পুত্রের সামনে তাকে ধরে নিয়ে গেল ঘাতকের দল। স্বামীগতপ্রাণা অসহায় স্ত্রী আশা করছিলেন হয়ত পরদিন কিংবা তার পরদিন ঘরে ফিরবেন ওঁর স্বামী। হতভাগ্য ছেলেরাও নিদারুরণ উৎকণ্ঠার মধ্যে তাদের স্নেহময় পিতার ফেরার অপেক্ষায় ছিল। ভাবছিল স্বাধীনতা এলে দেখতে পাবে বাবার মুখ। আবার ইত্তেফাক-এর নিউজ টেবিলে এসে বসবেন ওদের বাবা। অপরাধ জগতের চাঞ্চল্যকর কাহিনী, প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপন্ন মানুষের আহাজারির সরেজমিন রিপোর্ট ছেপে তোলপাড় তুলবেন সংবাদপত্র জগতে। অনুসন্ধান রিপোর্ট প্রকাশ করে দুষ্কৃতি চক্রের গোপন আড্ডা থেকে উদ্ধার করতে সহায়তা যোগাবেন বন্দি হয়ে থাকা শিশু এবং যুবতীদের। কিন্তু কাগজের অফিসে এবং আপন সংসারের স্নেহচ্ছায়ায় ফেরা হলো না আর বিনিদ্র দিবা-রজনী যাপনরত দেশের এই অগ্রণী সাংবাদিকের।

যেমন ফেরা হলো না শহীদুল্লাহ্ কায়সারের, খোন্দকার আবু তালেবের এবং নিজামুদ্দিন আহমদের। ঘাতকদের নিষ্ঠুর বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে একইভাবে হারিয়ে গেলেন সাংবাদিক এসএ মান্নান (লাডু), আ.ন.ম. গোলাম মোস্তফা, সৈয়দ নাজমুল হক, আবুল বাশার, শিবশংকর চক্রবর্তী। বর্বর নৃশংসতার শিকার হয়ে চলে গেলেন শহীদ সাবের, চিশতি হেলাল, মুহম্মদ আখতার এবং সেলিনা পারভীন। এদের আত্মজনের চোখের পানি গত সাতাশ বছরেও কী শুকিয়েছে? নাকি থেমেছে তাদের আর্তহাহাকার। অমন করে এদেশের নানান স্তরের কত অসংখ্য নিষ্পাপ মানুষই না হারিয়ে গেলেন। তাদের শোকগাঁথা রচনা করবে কে?

মানুষের জীবনে অনেক দুঃখ, অনেক বেদনার মধ্যেও এমন কিছু স্মৃতি থাকে যাকে আমরা বলি সুখকর। সেই সুখের দিন অথবা মুহূর্তগুলোর মুখ কখনো কখনো

www.pathagar.com

দেখতে পাই বলেই আত্মবিশ্বাস জাগে মনে। উদ্বুদ্ধ এবং অনুপ্রাণিত হয়ে সাহস করি ভবিষ্যতের পানে দৃষ্টিপাত করতে। আসলে সুখ কিংবা আনন্দ যে-অর্থেই শব্দটিকে ব্যবহার করি না কেন তার কোনো চিহ্নমাত্রও না থাকলে বেঁচে থাকাটাই হতো নিরর্থক।

আগের লেখায় এই অবরুদ্ধ নগরীর সে সময়কার যন্ত্রণা এবং পরিত্রাহী হাহাকারের কথা বলেছিলাম। বলেছিলাম অন্য অনেক বেদনার্ত দৃশ্যপটের মধ্যে রাজারবাগ পুলিশ হেড কোয়ার্টারের টিনের শেডগুলো পাক-হানাদার বাহিনীর মর্টার-মেশিনগান আর কামানোর গোলাগুলিতে ছারখার হয়ে যাওয়ার কথা। যুদ্ধক্ষেত্রের একটা ধ্বংস্তূপের মতন দেখাচ্ছিল পঁচিশে মার্চ রাতে আক্রান্ত এই ব্যারাকগুলোকে।

পাকিস্তানী বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ

হ্যাঁ, এখানে একটা যুদ্ধ হয়েছিল। মুখোমুখি যুদ্ধ এবং বলতে গেলে প্রচণ্ড যুদ্ধ। প্রতিপক্ষ ছিল হানাদার ফৌজ। আর তাদের অবরোধ করে দাঁড়িয়ে লড়াই দিয়েছিল এসব ব্যারাকে অবস্থানরত সেদিনকার দেশপ্রেমিক বাঙালি পুলিশ বাহিনী। তাদের হাতে ট্যাংক, মর্টার আর মেশিনগানের মতন ভারি কোনো অস্ত্র ছিল না। ছিল শুধু থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল। মেশিনগানের বুলেট-বৃষ্টির মধ্যে আমাদের শিহরিত কানে ভেসে আসত রাইফেলের গুরুগম্ভীর আওয়াজ। বাতাস ফুঁড়ে এক সংগে গর্জে উঠত রাইফেলের ঝাঁক-ঝাঁক গুলি। হানাদারদের মর্টার-মেশিনগানের আক্রমণ শুরু হলেই চারদিক থেকে শুরু হত এই পাল্টা রাইফেল- আক্রমণ।

www.pathagar.com

আমার এক আত্মীয় অনেকক্ষণ দক্ষিণ দিকে কান পেতে রেখেছিলেন। হঠাৎ আমার পিঠে খোঁচা দিয়ে বললেনঃ শুনতে পাচ্ছ কিছু? রাইফেলের শব্দ আসছে না রাজারবাগ পুলিশ ব্যারাক থেকে? নিশ্চয় আমাদের বাঙালি পুলিশরা ওদের সংগে যুদ্ধে নেমেছে। পাল্টা আক্রমণ চালাচ্ছে। এত দুর্যোগের মধ্যেও হাততালি দিয়ে উঠলেন তিনি। ঘরের সব বাতি নিভিয়ে খাটের তলায় জড়োসড়ো হয়ে ছিলাম আমরা। অন্ধকারেও আঁচ করতে পারছিলাম তাঁর মুখে উপচে পড়ছে হাসি। স্বস্তিতে এবং আনন্দে বুকখানা যেন তাঁর ফুলে উঠেছিল। তাঁর কণ্ঠস্বরে ছিল একটা আশ্চর্য উল্লাসের রেশ।

একটা ঘোরের ভেতর ছিলাম আমি। ধুঁকছিলাম সংশয়ে। এ কেমন করে সম্ভব? শুনতে পাচ্ছিলাম ট্যাংক চলার ভারি-বিকট আওয়াজ। তার উপর কামান-মেশিনগানের ভয়ংকর, হিংস্র আক্রমণ। মাত্র কয়েকশ' রাইফেল নিয়ে বাঙালি পুলিশের দল কোন সাহসে, কেমন করে মোকাবিলা করবে অমন সব ভারি যুদ্ধাস্ত্র-সজ্জিত একটা রণোন্মাদ বাহিনীর? বিশ্বাস হতে চাইছিল না আমার। দুদিন পর দু-ঘন্টার জন্যে কারফিউ শিথিল হলে গেলাম রাজারবাগ। বিস্মিত চোখে তাকিয়ে দেখলাম দক্ষিণ রাজারবাগ এবং শান্তিনগর রাস্তার পুর্ব মোড়ের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে পড়ে আছে মুখোমুখি যুদ্ধের রক্তাক্ত চিহ্ন। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে রাইফেলের গুলির অসংখ্য খোল। দক্ষিণ শান্তিনগরের লোকজনের সংগে দেখা হলো। ওরা বললেনঃ ব্যারাকের বাঙালি পুলিশরা রাত চারটা পর্যন্ত ঠেকিয়ে রেখেছিল হানাদার সেনাদের। শান্তিনগর-রাজারবাগ রাস্তার পুব পশ্চিমের দুই মোড়, সিদ্ধেশ্বরী-রাজারবাগের মোড় আর মতিঝিল রাজারবাগের মাথায় ছিল স্টিলের রড-পাইপ-ইটের রাশি রাশি স্তূপ এবং গাছের গুড়ির ব্যারিকেড। একেকটি সাত-আট ফুট উঁচু। এ ছাড়া রাজারবাগ পুলিশ হেড কোয়ার্টারের চারদিকের রাস্তা জুড়ে ছিল আরও অসংখ্য ব্যারিকেড। এসব ব্যারিকেড দিয়ে পুলিশ সদর দফতরটিকে দুর্ভেদ্য দুর্গের মতন সুরক্ষিত করে রেখেছিল চারপাশের পাড়ার লোকজন আর যুবকেরা।

রাত নয়টা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে কাজটা করে তারা। বিডিআর, রাজারবাগ পুলিশ ক্যাম্প এবং খিলগাঁও আনসার হেডকোয়ার্টারের ওপর পাকসেনা রাতে আক্রমণ চালাবে এরকম একটা গুজব সন্ধ্যার দিকেই ছড়িয়ে পড়ে শহরে। তারপর থেকেই এসব ছাউনিকে রক্ষার কাজে লেগে যায় আশপাশের লোকেরা। যাদের মধ্যে ছিলেন সকল পেশার মানুষ। যুবক-যুবতী, স্কুল কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী। ছিলেন ঠেলাগাড়ি, বাস-বেবিট্যাক্সি, রিকশা শ্রমিক এবং কুলি-কামিন, দিনমজুরের দল। ঠেলাগাড়িওয়ালারা তাদের রোজগারের সম্বল ঠেলাগাড়িগুলো স্তূপাকার করে রচনা করেছিলেন ব্যারিকেড।

ট্যাংক দিয়ে এসব ব্যারিকেড ভাংতে অনেক সময় লেগেছিল হানাদারদের। শান্তিনগরের কিছু প্রবীণ জানালেন, পাড়ার ছেলেরা পুলিশদের পশ্চাৎ রক্ষীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়ে তারা ওদের হাতে তুলে দিচ্ছিল

www.pathagar.com

অস্ত্রাগারের সামনে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা হাতিয়ার। আর ক্ষেপণাস্ত্রের মতন ইটের বৃষ্টি বর্ষণ করছিল ব্যারিকেডের মুখে আটকেপড়া সাঁজোয়া গাড়ির বহরের ওপর। হানাদারেরা আঁচ করতে পারেনি কোথা থেকে কেমন করে অমন অজস্র ধারায় বাতাস ভেদ করে আসছে ইট-পাথরের গোল্লা। তারা ভেবে নিয়েছিল আক্রান্ত পুলিশদেরই একটা দল হয়ত ইটের গোলা নিক্ষেপ করে তাদের মাথা ফাটাচ্ছে। দিশহারা করে তুলতে চাইছে তাদের।

পরের দৃশ্যটি ছিল আরও উদ্দীপক। এ দেশের সাধারণ মানুষ আর বাঙালি পুলিশের ভালোবাসার এবং একাত্মতার এক উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি। হানাদারদের সংঘবদ্ধ আক্রমণে প্রতিরোধ ভেঙে পড়লে পুলিশরা ক্রলিং করে পিছু হটতে শুরু করল শান্তিনগরের ভেতরকার গলির দিকে। স্থানীয় লোকেরা একান্ত আত্মজনের মতন নিজেদের ঘরে আশ্রয় দিলেন তাদের। আশ্রয় দিলেন প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে। কারণ তাদের ঘরবাড়িতে যে-কোনো মুহূর্তে নৈশ-অভিযান চালাতে পারত দুর্ধর্ষ হানাদার সেনারা। মহল্লার লোকেরা ইউনিফর্ম পুড়িয়ে লুঙ্গি-শার্ট-পাঞ্জাবি-পায়জামা পরিয়ে পরিবারের সদস্য করিয়ে নিলেন তাদের। সাধ্যমতন ফার্স্ট এইড দিলেন আহত পুলিশদের। খাদ্য পরিবেশন করলেন পরম সমাদরে।

শান্তিনগরের দক্ষিণ প্রান্তের দুই গলিতে থাকতেন বিখ্যাত লোকসাহিত্য গবেষক, বর্ষীয়ান সাহিত্যিক প্রফেসর মনসুর উদ্দিন এবং শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন। মনসুর উদ্দিন সাহেবের সংগে দীর্ঘকাল থেকে ছিল আমার ঘনিষ্ঠতা। সময় পেলে দেখা করতে যেতাম তাঁর বাড়িতে। তাঁর বড় ছেলের গ্রন্থবিপণী এবং প্রকাশনা সংস্থা 'হাসি প্রকাশনালয়' ছিল একসময় সিদ্ধেশ্বরী সংলগ্ন আমার বাসার মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে। এখানে প্রায়ই মনসুর উদ্দিন আসতেন লাঠিতে ভর দিয়ে। আমার বাসায়ও আসতেন কুশল-সংবাদ নিতে। ফাঁক, পেলে দেখা করতেন পত্রিকার অফিসে। তাঁর মুখে শুনেছি পঁচিশ মার্চ রাতে বাঙালি সিভিলিয়ন আর বাঙালি পুলিশের অভিন্ন অনুভূতির উপাখ্যান। পরমাত্মীয়ের মতন নিজেদের ঘরে আশ্রয় দেয়া এই শ্রান্ত-বিধ্বস্ত-আহত পুলিশদের বুড়িগঙ্গার ওপারে জিনজিরার দিকে পালিয়ে যেতে তারা সাহায্য করেছিল। সবিস্তারে এসব কাহিনী বর্ণনা করেছেন তিনি।

খিলগাঁও হেডকোয়ার্টারের আক্রান্ত আনসার বাহিনীর সদস্য এবং সাবেক ইস্টবেঙ্গল রাইফেলস-এর বিপন্ন সদস্যদেরও একইভাবে আশ্রয় দিয়েছিল সে-রাতে মহল্লাবাসীরা। ইউনিফর্ম বদল করে নিয়ে সাদা পোশাকে সাজিয়ে সাহায্য করেছিল জনগণের সংগে তাদের মিশে যেতে। সাহায্য করেছিল তাদের আত্মগোপনের কাজে। আজিমপুর গোরস্তানের ভেতর দিয়ে জনগণই নিরাপদে সরে পড়তে মদদ যোগায় ইস্টবেঙ্গল রাইফেলসের অফিসার এবং সেপাইদের। অনেক জুনিয়র-সিনিয়র পুলিশ অফিসারও প্রাণরক্ষা করেছিলেন জনগণের ছত্রছায়ায়।

প্রফেসর মনসুর উদ্দিন সাহেবের ভাষায়ঃ হানাদারদের মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধ বাঙালি নরনারী-যুবা এবং বাঙালি সেনা-পুলিশ-আনসার-বিডিআর-এর একাত্মতার

www.pathagar.com

মধ্য দিয়ে পঁচিশ মার্চ রাতেই জন্ম হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশ আর স্বাধীন বাঙালি জাতির। মুক্তিযুদ্ধের গোটা নয় মাসেই নিবিড়তর ছিল একাত্মতার এই অচ্ছেদ্য বন্ধন।

মুক্তিযোদ্ধাদের সংগে লিয়াজোঁ রাখতেন সন্দেহে রাজশাহীর পুলিশ কর্মকর্তা মামুন মাহমুদের মতন অনেক সিনিয়র পুলিশ কর্মকর্তাকে প্রাণ দিতে হয়েছিল পাকসেনাদের হাতে। মাহমুদ ছিলেন বাংলাদেশের এক প্রভাবশালী পরিবারের সন্তান। তাঁর মা ছিলেন নারী জাগরণের প্রখ্যাত নেত্রী এবং প্রথিতযশা সাহিত্যিক বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ। পিতা ছিলেন অবিভক্ত বাংলার স্বনামখ্যাত চিকিৎসক এবং বিভাগোত্তর পূর্ব বাংলার সার্জেন-জেনারেল। মামা ছিলেন এককালের বিখ্যাত সাংবাদিক-সাহিত্যিক, রাজনীতিক আজাদ পত্রিকার রম্য-কলাম 'হিং ও হালিম'-এর মশহুর লেখক এবং সাবেক পূর্ববঙ্গ সরকারের মশা উৎসাদনখ্যাত স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাবীবুল্লাহ বাহার চৌধুরী। তাঁর মাতৃকুলের ঘনিষ্ঠ মাতুল ছিলেন দৈনিক সংবাদ সম্পাদক এবং 'দরবার-ই-জহুর' কলামের তীক্ষ্ণধার লেখক জহুর হোসেন চৌধুরী। এ রকম প্রভাবশালী পরিবারের অনেক ঊর্ধ্বতন বাঙালি পুলিশ অফিসার, বেসামরিক এবং সামরিক কর্মকর্তাকে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকবার অভিযোগে বেঘোরে প্রাণ দিতে হয় হানাদার সেনাদের হাতে।

মুক্তিযুদ্ধ আত্মত্যাগের এমন কত অনন্য সুখকর স্মৃতিই না রেখে গেছে আমাদের মনে। এমনকি স্বাধীনতার আগেও নারী পাচার, পতিতালয়ে অল্প বয়স্কা মেয়েদের বিক্রি, ছেলেধরার আড্ডা উদঘাটন, ভদ্রঘরের মহিলাদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে এনে প্রমোদবালা হিসাবে ব্যবহার ইত্যাদি দুষ্কর্মের অনুসন্ধানে তখনকার পুলিশের সাগ্রহ সাহায্য পেয়েছেন আমাদের রিপোর্টারগণ। সাহায্য পেয়েছেন কাগজের বার্তা সম্পাদক এবং সম্পাদকগণ। পঞ্চাশ দশকের গোড়ার দিকে এই পুলিশ বাহিনীরই আইজি ছিলেন প্রখ্যাত চিন্তাবিদ এবং লেখক আবুল হাসনাত সাহেব। ওই দশকেই আরেকজন জনপ্রিয় আইজি ছিলেন কাজী আনোয়ারুল হকের মতন চিন্তাবিদ। নাম করবার মতন এরকম আরও অনেকেই ছিলেন এ-বিভাগে। পুলিশের ভাবমূর্তি রক্ষা করবার জন্যে চেষ্টার অন্ত ছিল না এঁদের। আবার মাঝারি পর্যায়ে অনেকে কিংবদন্তী হয়ে আছেন প্রবীণদের কাছে। বৃটিশ যুগের বিপ্লবীদের মুখে শুনেছি সন্ত্রাসবাদী ডাকাতি, বোমা হামলা, 'যুগান্তর', 'অনুশীলন' প্রভৃতি গোপন সন্ত্রাসবাদী দলের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে অনেক ছাত্র-তরুণ এবং রাজনৈতিক কর্মীকে আটক করত সেকালের গোয়েন্দা পুলিশ। কিন্তু তাঁদের কাছ থেকে কথা বের করবার জন্যে অমানুষিক উৎপীড়ন করা হতো না। আইন মোতাবেক কিছুদিন রিমান্ডে রেখে তাদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করা হতো। ডিটিন্যু অর্থাৎ রাজবন্দি হিসাবে তাঁদের পাঠানো হতো জেলে। কারাগারে 'ভদ্রলোক কয়েদি' হিসাবে তাঁরা পেতেন যোগ্য মর্যাদা।

স্বাধীনতার মাত্র এক-দুই দশকের মাথায় সেই বাঙালি পুলিশের চরিত্র এবং আচরণ হঠাৎ কেন পাল্টে গেলো ? ভাবতে অবাক লাগে, স্বাধীনতা যুদ্ধকালে এ

www.pathagar.com

দেশের সাধারণ মানুষ যাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, আজ কেন পুলিশের হেফাজতে তাদের মেয়েদের ধর্ষিতা হয়ে প্রাণ খোয়াতে হয়? কেন ধর্ষিতা এবং অকথ্য নির্যাতনের শিকার হয়ে থানা পুলিশের হাতে অকালে ঝরে পড়তে হয় ইয়াসমিন, সীমার মতন অসহায় বাঙালি মেয়েদের? কেন ঠুনকো ৫৪ ধারায় আটক বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র রুবেলকে ডিবি পুলিশের কক্ষে অকথ্য নির্যাতনে খুন হতে হয়?

আবার সাংবাদিকরা পুলিশের আচরণ এবং কোডের খেলাফ এসব নৃশংস ক্রিয়াকলাপের কথা লিখলে তাঁদের বিরুদ্ধে ছদ্মবেশধারীর নামে বহুরঙা দামি পোস্টার ঝোলানো হয় মহানগরীর প্রাচীর গাত্রে? কেন সচিবালয়ের গেটে বৈধ প্রবেশপত্রধারী কোনা জাতীয় দৈনিকের স্টাফ রিপোর্টারকে নাকাল হতে হয় সাংবাদিক নামে ভীতিগ্রস্ত এবং তাদের প্রতি প্রচণ্ডভাবে ক্ষুব্ধ একজন কনস্টেবলের হাতে?

বৃটেন, যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম ইউরোপের গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে, এশিয়ার জাপান, সিঙ্গাপুর এমনকি মালয়েশিয়ায়ও এমন খারাপ দৃষ্টান্ত কেউ খুঁজে পাবেন না। বৃটেনের পুলিশদের তো বলা হয় জেন্টেলম্যান পুলিশ। তাঁদের প্রধান অর্থাৎ চীফ কনস্টেবল একজন সাদা পোশাকের সিভিলিয়ন। সুইজারল্যাণ্ডে পুলিশের শেরিফ এবং অন্যসব পদস্থ কর্মকর্তাকে স্ব-স্ব পদে নিয়োগের জন্যে নির্বাচিত হতে হয় জনগণের ভোটে।

জেন্টেলম্যান পুলিশের স্তরে উঠতে অনেক সময় লাগবে এ দেশের পুলিশদের, একথা সত্য। কিন্তু নৈতিক প্রশিক্ষণ এবং পুলিশ কোডের বিধি পালনের প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের কী মোটামুটি মার্জিত এবং সুশীল করা যায় না? তাদের কী পেশাগত ট্রেণিংয়ের সময় অনুপ্রাণিত করা যায় না জনগণই তাদের বেতন যোগায়? এবং জনগণই গণতান্ত্রিক সমাজে সমস্ত ক্ষমতার উৎস? বলা কী যায় না সরকার আসবে এবং চলে যাবে কিন্তু জনগণ থাকবে, রাষ্ট্র থাকবে। পুলিশও চাকরিতে আসবে আবার অবসর নিয়ে চলে যাবে। কিন্তু 'উইল অভ্ দ্য পিপল'-সব সময় থাকবে সুপ্রিম। সুতরাং তাদের কাছে এবং রাষ্ট্রের কাছে অবশ্যই তাদের জবাবদিহি করতে হবে। আজ না হোক কাল করতে হবে। এটাই গণতান্ত্রিক সমাজের অনিবার্য নিয়ম।

পঁচিশ মার্চের সেই সুখকর স্মৃতি কেমন করে, কীভাবে আগলে রাখতে পারবো? এ জিজ্ঞাসার উত্তর পাবো কার কাছে?

আগের প্রসঙ্গে ফিরে যাচ্ছি। ২৩ বছর আগেকার সোভিয়েত দেশ ভ্রমণের কথা বলছিলাম। স্মৃতি থেকে এঁকেছিলাম অভিজ্ঞতার কিছু রেখাচিত্র। মাসটি ছিল জুলাই। বার এবং তারিখের কথা মনে করতে পারছি না। তবে সময়টা ছিল জুলাইয়ের মাঝামাঝি। হোটেল রাশিয়া থেকে সরাসরি আমাদের নিয়ে যাওয়া হল পুশকিন স্ট্রিটে। নভোস্তি প্রেস এজেন্সির অফিসে। প্রতিনিধি দলে ছিলাম আমরা পাঁচজন। দৈনিক সংবাদের তোহা খান, বাংলার বাণীর মীর নুরুল ইসলাম, শফিকুল আজিজ মুকুল, বিএসএস-এর রিপোর্টার হাবীবুল্লাহ খান আর আমি। দলনেতার দায়িত্ব নিতে হয়েছিল আমাকে। বিষয়টি বঙ্গবন্ধুই ঠিক করে দিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

নভোস্তির পরিচালনা বোর্ড-চেয়ারম্যান আইভানোভিচ্ উদালসভ্ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ রাখেন। এতে তিনি সোভিয়েত সংবাদপত্র এবং প্রকাশনা শিল্পের আধুনিকায়নের একটি চিত্র তুলে ধরেন। টেলিভিশন টিমসহ এপিএন-এর যে কজন প্রতিনিধি আমাদের সফরসঙ্গী হবেন তাদের সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। এ সময় তোহা খানের দীর্ঘাকৃতির চেহারাটা সবার নজর কাড়ে। লম্বায় সাড়ে ছয় ফুটের বেশি ছিল তোহা। করমর্দনের জন্যে উঠে দাঁড়ালে সবার ঘাড়ের উপর দেখা যাচ্ছিল ওর মাথা। কেমন একটা বিস্ময় মিশ্রিত কৌতূহল ফুটে উঠেছিল এপিএন সাংবাদিকদের চোখে-মুখে। পরে রাস্তায় নেমে তোহার পিঠ চাপড়ে বলেছিলেন- ব্রাভো, আওয়ার ডিয়ার ফ্রেণ্ড। চোখ ধন্য হলো তোমায় দেখে। শোনো, আমাদের উপকথায় আছে এক দীর্ঘাকৃতি কশাক কৃষকের গল্প। মাথা নুইয়ে যাকে ডিঙাতে হতো ঘরের দরজার চৌকাঠ। গাছের তলায় দাঁড়িয়ে উঁচু ডালের ফল অনায়াসে পাড়তে পারতো সে। শুধু লম্বা হাত-দুটি বাড়িয়ে দিলেই হলো।

বেশ অন্তরঙ্গতা জমে উঠেছিল ওঁদের তোহার সঙ্গে। বিশেষ করে রুশ মহিলারা বেশি কৌতূহলী হতেন আমাদের এই বন্ধুটিকে দেখে। সফরকালে অনেক মজার-মজার উদ্দীপক আর পরিহাস-তরল গল্পের অবতারণা হয়েছিল তোহা খানকে ঘিরে। বাংলাদেশের মানুষ এতটা দীর্ঘদেহী হতে পারে এটা তারা আগে কখনও কল্পনা করেননি। বলতেনঃ নিশ্চয় তোমরা পাঠান মুলুক থেকে বাংলাদেশে গিয়েছো মিঃ তোহা।

ঐতিহাসিক দিক থেকে কথাটা তো ঠিকই। আমাদের দেশের লোদি, লোহানি, খান পন্নি, খান মজলিস, খান মির্জা আর খাঁ কিংবা খান পদবির লোকেরা মোগলদের তাড়া খেয়েই তো বাংলাদেশের ভাটি অঞ্চলে এসে ঘর বেঁধেছিলেন। এই পানির দেশে অবস্থান নিয়ে মোগলদের অগ্রাভিযান রোধের প্রাণপণ চেষ্টাও করেছিলেন তারা। যেমন করেছিলেন স্বাধীন বারো ভূঁইয়া- প্রধান ঈসা খাঁ, মুসা খাঁ, দাউদ খাঁ প্রমুখ। এগারো সিন্ধুরের যুদ্ধে ঈসা খাঁ'র হাতে লজ্জাজনক পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল সম্রাট আকবরের সেনাপতি রাজা মানসিংহকে। এই খাঁয়েরা এদেশের মাটি, আলো-বাতাস, ঝড়-জলোচ্ছ্বাস আর বন্যার পরিবেশে থেকে খাঁটি বাঙালি হয়েছিলেন। ঈসা খাঁ'র একটনের বেশি ওজনের বিখ্যাত কামান 'কালে-বাদল'-এর গায়ে প্রথম আমরা উৎকীর্ণ দেখতে পাই ষোড়শ শতকের বাংলা গদ্যের নমুনা। স্পষ্ট বাংলা হরফে ঈসা খাঁ ও কামানের নির্মাতা ঢাকার লৌহকারের নাম এবং বাংলা সনের তারিখ খোদাই করা হয়েছিল এতে। এছাড়া মধ্যযুগ থেকে এই আধুনিক যুগ পর্যন্ত এদেশের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের পটপরিবর্তনে, শিল্প-সাহিত্য এবং সংস্কৃতিতে কম অবদান রাখেননি এই মিশ্রিত রক্তধারার প্রতিভাধর বাঙালিরা।

যা হোক, বন্ধু-সাংবাদিক তোহার কথায় আসি। সরল স্বভাবের মিতভাষী তোহা স্বাগতিক সোভিয়েত সাংবাদিকদের কৌতুক উপভোগ করতো সানন্দে। তার ঠোঁটে ফুটে উঠতো এক টুকরো সরস মিষ্টি হাসি। সেই তোহা রোগক্লিষ্ট অবস্থায় কর্মচ্যুত হয়ে যে-দুর্দশাগ্রস্ত জীবন যাপন করেছিল সেকথা ভাবলে অনুভূতি শীতল না-হয়ে

www.pathagar.com

পারে না। ভাবি শেষ বয়সে ভগ্নদূত হয়ে বেঁচে থাকাটাই বুঝি একজন নিষ্ঠাবান, পরিশ্রমী সাংবাদিকের বিধিলিপি। রোগশয্যায় ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থেকে হতাশাগ্রস্ত তোহাকে একদিন আলিঙ্গন করতে হলো অনিবার্য মরণকে।

কথাটা ভাবলে নিজের মধ্যেই ক্ষুদ্র হয়ে যাই। শেষ দিকে আমার সম্পাদিত একটি দৈনিকে ওর প্রকাশিত কিছু লেখা ছেপে যৎসামান্য কিছু অর্থের উপায় করে দিয়েছিলাম। কিন্তু সে-তো ছিল ওর অভাবের সংসারে সমুদ্রে গোষ্পদতুল্য। যে তোহাকে ঢাকায় পত্রিকার অফিসে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরকালে অমন প্রাণবন্ত দেখেছিলাম তাকে একদিন লাঠি ভর দিয়ে আমার কামরায় ঢুকতে দেখে চোখের পানি রোধ করতে পারিনি। দেখেই শিউরে উঠলাম। একি হাল হয়েছে তোহা খানের! বিষণ্ন-মলিন চেহারা। লাঠিতে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁটে। সংবাদপত্রের কর্তাব্যক্তিরা ওর দীর্ঘকালের অবদানের কথা মনে রেখে ইচ্ছা করলে সহায়তার হাত নিয়ে পাশে এসে দাঁড়াতে পারতেন ওর। কিন্তু এ হতভাগা দেশে অমন আশা করাটাই যে-বৃথা! এর পরও কিছু ভরসার কথা বলেছিলাম ওকে। গল্প আর ইতিহাসের কাহিনী লেখার হাত ছিল ওর ভারি মিষ্টি। অনুবাদ ছিল স্বচ্ছন্দ। 'সুন্দরবনের ইতিহাস' লিখে বেশ প্রখ্যাতিও পেয়েছিল। প্রবোধ দিলামঃ ঘরে বসে ছেলেমেয়েদের কাউকে ডিকটেশন দিয়ে রোজ কিছু-কিছু লিখতে থাকো। প্রকাশককে দিয়ে ছাপবার ব্যবস্থা করবো। কাগজেও ছাপবো। তা হলে রোজগারের একটা উপায় হয়ে যাবে। কিন্তু ওর হাত দুটি আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল বাতে। বসে গিয়েছিল গলার স্বর। সংকুচিত হয়ে পড়েছিল স্মৃতিশক্তি। কিছু বলার কিংবা লেখার কোনরকম সাধ্যই ছিল না। এ অবস্থায় হঠাৎ একদিন জীবনের সব দেনা-পাওনা হিসাবের খাতায় তুলে রেখে বিদায় নিতে হলো কলমযোদ্ধা তোহা খানকে। অক্ষম প্রাণটি আমার দীর্ঘ বিদীর্ণ হয় যখন বন্ধু বিয়োগের করুণ দৃশ্যটি চোখের সামনে ভাসে।

গোর্কি

আজ মনে পড়ে মস্কোর এপিএন অফিসের সেদিনকার উষ্ণঘন সংবর্ধনার দৃশ্যটির কথা। অনুষ্ঠান পর্ব শেষে উপহার হিসেবে রুপোর পাঁচটি 'সামোভার' আমাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন চেয়ারম্যান মিঃ উদালসভ্। রুপোর কারুকাজখচিত সামোভারটি পেয়ে খুশিতে কেমন ঝিকিয়ে উঠলো তোহা খানের দুই চোখ যেন একটা স্বর্গ হাতে পেয়ে গেছে। আসলেই জিনিসটি ছিল মনোলোভা।

www.pathagar.com

সামোভার! কথাটি একজন রুশভাষীর মুখে প্রথম শুনলেও অবচেতনে কিসের যেন একটা ক্ষীণ রেশ স্মৃতিকে আমার ছুঁয়ে যেতে থাকলো। অপূর্ব অলংকরণ-খচিত বস্তুটি হঠাৎ যেন একটা জান্তব রূপ নিল। মনে গুনগুন করে উঠলো রবীন্দ্রনাথের সেই দুটি চরণঃ

'চিত্রহারিণী জাপানি বালিকা
উহারু তাহার নাম।...'

এ কোন উহারু? স্মৃতি হাতড়াতে থাকলাম। আচমকা আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়ালো নাতাশা নামের একটি তরুণী। শ্রীমন্ত চেহারা। নিটোল দুই ঠোঁটে ঝুলে আছে এক টুকরো ঝকঝকে হাসি। ঠিক আমাদের হাতে-রাখা উপহারটির গায়ে ঝলকে-ওঠা রূপোলি রশ্মির মতন। দুই গালে গোলাপ পাপড়ির রং। বেণিতে বাঁধা দীঘল চুলের রাশি। মুখখানা গোলগাল। যেন কবির সেই নন্দিতা মেয়ে উহারু। মস্কোর শীতের রাতের হুল-ফোটানো বাতাস আর তুষার ডিঙিয়ে এসে কড়া নাড়লো পাভেল ভ্লাসভের শ্রমিক বস্তির স্যাঁতস্যাঁতে ঘরের দরজায়। দরজা খুলে দিলেন পাভেলের মা পেলাগেয়া নিলভ্না।

দরজার ভেতরে পা রাখতেই ঘরখানা ঝলমল করে উঠলো, নাতাশার চন্দ্রপানা মুখের এক ঝলক বিচ্ছুরিত জোছনায়। শীতে কাঁপছিল সে ঠকঠকিয়ে। ভেতরে ঢুকেই বললঃ এক কাপ গরম চা পেলে ভালো হতো। মেয়েটিকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন পাভেলের মা নিলভ্না। যেমন চন্দ্রমল্লিকার মতন দেখতে জাপানের কালো চোখের মেয়ে উহারুকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

মা ছুটে গেলেন রান্নাঘরের দিকে। বলতে-বলতে গেলেনঃ দু-মিনিট অপেক্ষা কর লক্ষ্মীটি। আমি এক্ষুণি 'সামোভার' চড়াচ্ছি চুলায়। পরম যত্নে নিলভ্না সামোভার ভরে চা বানিয়ে এনে রাখলেন নাতাশা, পাভেল, খখল-নাখোদ্‌কা আর দাড়িওয়ালা নিকলাই ইভানভিচের সামনে। সামোভার থেকে হাতে-হাতে ধোঁয়া-ওঠা চা কাপে ঢেলে নিয়ে তৃপ্তির শ্বাস ফেলে চুমুক দিতে থাকলো ওরা। সেই সামোভার! 'গোর্কির 'মাদার' উপন্যাসের এক অতুলনীয় দৃশ্য এটি। সেই কবে পড়েছি বিখ্যাত এই উপন্যাসটি। এখন থেকে ৫৪ বছরের মাথায়। আর উপহারটি পাওয়ার ঠিক ৩৩ বছরের সন্ধিলগ্নে প্রথম বারের মতন সেটি হাতে আসে আমার। তখন স্কুলে পড়তাম। এরপর আরও দু-চারবার পায়চারি করেছি গোর্কির সংগ্রামী এই চরিত্রগুলো বিচিত্র ভূবনে। সেই নরনারী তারা যাদের চোখে ছিল ক্ষোভের আগুন। বুকে ছিল শোষণত্রাসন হননের এক ইস্পাতকঠিন প্রত্যয়।

যখন এতকাল পর দৃশ্যটি নতুন করে চোখের সামনে ভাসছিল সেই মুহূর্তে শুনতে পেলাম উদালসভ্রের গলা। তিনি বললেনঃ অভ্যাগত বন্ধুরা, এটি সোভিয়েত সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে আমাদের সামান্য উপহার। কিন্তু আপনাদের দেবার মতন এর চেয়ে মূল্যবান আর কিছু খুঁজে পাইনি আমরা। জানি, সাংবাদিকদের কাছে সব থেকে প্রিয় হলো চা এবং কফি। সামোভার দিয়ে দুটোই আপনারা করতে

www.pathagar.com

পারেন। তখন সামোভারের গরম চা অথবা কফিতে চুমুক দেবেন আমাদের কথা তখন নিশ্চয় মনে পড়বে। সেই সেঙ্গে আজকের এই দিনটির কথাও। ভেবে-চিন্তেই তাই আমরা এটি আপনাদের দেব বলে সিদ্ধান্ত নিই।

একটু থেমে ফের বললেনঃ সামোভার আমাদের দেশের বহু পুরাতন ঐতিহ্যের অন্তর্গত। জানেনই তো চা এবং কফির দেশ এটি। সান্ত পিতেরবুর্গ আর মস্কোর সাবেক কালের রাজরাজড়া, জমিদার থেকে শুরু করে দরিদ্র কৃষক এবং মজুরদেরও চা-কফি না হলে চলতো না। সেই তখন থেকে সামোভারের প্রচলন। এক বেলা আহার না জুটলেও শীতের দাপট থেকে বাঁচার জন্যে চুলায় সামোভার চড়িয়ে সকালে এবং রাতে চা কিংবা কফির উষ্ণ স্বাদ চেখে শরীরটাকে গরম রাখতো এদেশের গরিবেরা। সেই ঐতিহ্য আজও ধরে রেখেছে সোভিয়েত সমাজের লোকেরা। লেখক-সাংবাদিকেরা তো এ না হলে কাজই করতে পারে না।

শেষে গলা বাড়িয়ে বললেনঃ আপনারাও তো চায়ের দেশের লোক। আপনাদের চায়ের পাতা পৃথিবীর দেশে-দেশে যায়। নিশ্চয় তা তৈরির ভালো বন্দোবস্ত আছে আপনাদের। কিন্তু এ সামোভারগুলো রূপোর অলংকরণে শোভিত করে দিলাম আমরা স্মারকচিহ্ন হিসেবে। ইচ্ছে করলে অন্য কোন ও পাত্রে চা জ্বাল দিয়ে সামোভারে ভরিয়ে নিয়ে পরিবেশন করতে পারেন অতিথিদের। তা হলে এর গায়ের উজ্জ্বল রূপোলি রংটা চটকে যাবে না। কিন্তু আমার মতে স্যুভেনির হিসেবে জিনিসটা সযত্নে তুলে রাখাই ভালো।

খুশি হয়ে আমরা সবাই তাকে ধন্যবাদ দিলাম। আমি বললামঃ মিঃ উদালসভ্, সত্যি আপনার উপহার বাছাইয়ের তারিফ না করে পারি না। আপনি একটি মূল্যবান, স্মরণযোগ্য জিনিস আমাদের দিলেন। একে কী হেলাফেলা করা যয়? নিশ্চয় একে আমরা পরম যত্নে শো-কেসে তুলে রাখবো। তবে শো-কেসের শোভাবর্ধনের জন্যে নয়- এ দেশের চিরায়ত ঐতিহ্যের অন্তর্গত একটি নিদর্শনকে ধরে রাখবার জন্যে। এর দিকে চোখ রাখলেই মনে পড়বে আপনাদের কথা। আপনাদের অন্তরঙ্গতার কথা। আর তার সঙ্গে আমাদের সফরের স্মৃতিটাও জেগে থাকবে অনুভূতিতে।

আমার কথা শুনে সবাই হাততালি দিয়ে উঠলেন। উদালসভ্ বললেনঃ ভারি খুশি হলাম আপনার কথা শুনে। আমাদের মনে রাখবেন এটাই তো আমাদের একান্ত প্রত্যাশা। আমরা বিশ্বাস করি, দুনিয়ার দেশে-দেশে সাংবাদিকরা মানুষের বন্ধু হিসেবে কাজ করেন। তারা শুধু বিবেকের কণ্ঠস্বরই নন- আন্তর্জাতিক মৈত্রী, শুভবোধ এবং শান্তিরও দূত। এর জন্যেই তো আমরা আয়োজন করেছি পৃথিবীর সব দেশের সঙ্গে সাংবাদিক শুভেচ্ছা প্রতিনিধি দল বিনিময়ের। তারা এসে আমাদের সমাজের চালচিত্রটি দেখুন। আমাদের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি আর সাংবাদিকতার চেহারা কতটা বদল হয়েছে তা দেখে যান। আমরাও সফরে গিয়ে দেখতে চাই তাদের সমাজ জীবনের ধারাটা কেমন। কেমন তাদের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং সাংবাদিকতার হালচাল। পরস্পরের এই জানাশোনার মধ্য দিয়েই তো অবসান

www.pathagar.com

ঘটবে ভুল বোঝাবুঝির। বন্ধুত্ব বিনিময়ের এই পথ ধরেই প্রতিষ্ঠা ঘটবে আন্তর্জাতিক মৈত্রী এবং বিশ্ব শান্তির। কথাগুলো শুনে ভালো লাগল।

এরপর উদালসভ্ এপিএন-এর অগ্রযাত্রার ওপর কিঞ্চিৎ আলোকপাত করলেন। প্রতিষ্ঠানটির জন্ম ১৯৬১ সালে। একটি নিউজ এবং পাবলিকেশন সংস্থা এটি। সোভিয়েত সাংবাদিক ইউনিয়ন, লেখক সংঘ, বহির্বিশ্বের সঙ্গে মৈত্রী আর সাংস্কৃতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত সোভিয়েত সংস্থাগুলোর সম্মিলিত ইউনিয়ন এবং গোটা দেশের বুদ্ধিজীবী সমাজের মিলিত সংঘের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত এই প্রেস এজেন্সি। ১৯৭৫-এ আমাদের সফরকাল পর্যন্ত মাত্র ১১ বছরের ব্যবধানে বিশ্বের ১১০টি দেশের সংবাদ সংস্থা, বেতারটিভি নেটওয়ার্ক এবং প্রকাশনা সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে এপিএন-এর।

বহির্বিশ্বের ৫৩টি সাময়িকপত্র, ১১টি সংবাদপত্র আর ১৫৩টি সংবাদ বুলেটিনকে তথ্য প্রকাশনা- উপকরণ আর আলোকচিত্র দিয়ে সহায়তা যুগিয়েছে সংস্থাটি। বিদেশের এসব পত্রপত্রিকার প্রচার সংখ্যা ছিল ২৩ লাখ। এপিএন প্রকাশিত 'স্পুটনিক' ম্যাগাজিনটির ছিল রুশ, ফরাসি, ইংরেজি, জার্মান এবং চেক সংস্করণ। ফি-বছর পৃথিবীর ৫৬টি ভাষায় প্রকাশিত এপিএন পুস্তক-পুস্তিকার প্রচার সংখ্যা ছিল ১৯৭৪ সাল অব্দি দুই কোটি। সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলো ছাড়াও ৮২টি দেশে আছে এপিএন ব্যুরো অফিস, শাখা-অফিস। সংস্থার সাংবাদিক প্রতিনিধিরা এর বাইরেও অনেক দেশে নিয়োজিত ছিলেন। সংস্থার বাইরের বহুল প্রচারিত দৈনিক কাগজ 'প্রাভদা'র প্রচার সংখ্যা ছিল তখন এক কোটি দশ লাখ। আর 'ইজভেস্তিখা'র প্রচার সংখ্যা ছাড়িয়ে যায় এক কোটির চৌহদ্দি। 'প্রাভদা'র প্রধান সম্পাদক এম জিম্‌ইয়ানিন ছিলেন সে সময় সোভিয়েত সাংবাদিক ইউনিয়নের পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান। 'প্রাভদা' প্রকাশনা সংস্থা থেকে বেরুত বেশ কয়েকটি উচ্চমানের ম্যাগাজিন। এগুলোর মধ্যে নামকরা ছিল 'জুর্নালিস্‌ত' (জার্নালিস্ট), 'সোভেতস্কোই ফতো' (সোভিয়েত আলোকচিত্র), 'দেমোক্রাতিচেস্কি জুর্নালিস্‌ত' (দ্য ডেমোক্র্যাটিক জার্নালিস্ট) এবং 'যা-রুবেজহোম' (বহির্বিশ্ব)। এসব কাগজের প্রচার সংখ্যাও ছিল বিপুল।

সোভিয়েত সাংবাদিক ইউনিয়ন ছিল আন্তর্জাতিক সাংবাদিক সংস্থার সদস্য।

সোভিয়েত প্রকাশনা শিল্পে খ্যাতি তখন দুনিয়াজোড়া। ইংরেজি, ফরাসি এবং আরবি, ফার্সি, স্পেনিশ, বাংলা, হিন্দি, উর্দু, পশ্‌তু, চেক-জার্মান, ইতালিয়ানসহ অসংখ্য ভাষায় প্রতি বছর মস্কো থেকে বেরুত বিশ কোটির মতন সাহিত্যপুস্তক। তরুণ ও কিশোরদের জন্যে ২২টি ভাষায় বেরুত বহুল প্রচারিত 'কমসোমলস্কায়া' ম্যাগাজিনসহ ৬৬টি পত্রিকা। এগুলোর প্রচার সংখ্যা ছিল সাত কোটি। শিশুতোষ পত্রপত্রিকার সংখ্যা ছিল ৬৮টি। সব থেকে জনপ্রিয় শিশু-কাগজ ছিল 'পিওনের্সস্কায়া প্রাভদা'। এটির প্রচার সংখ্যা ছিল এক কোটি। এছাড়া শিশু সাহিত্য প্রকাশনা সংস্থাগুলো থেকে বেরুনো অন্যান্য শিশুতোষ কাগজের প্রচার সংখ্যা ছিল আরও কয়েক কোটি।

www.pathagar.com

এর থেকেই আঁচ করা যায় সে সময় সোভিয়েত প্রকাশনা শিল্পে কত বড় একটা যুগান্তর ঘটেছিল।

অবাক বিস্ময়ে এসব তথ্য শুনবার পর মেলা দিলাম হোটেল রাশিয়ার সরাইখানার দিকে। কিন্তু পথে আবার ছায়া ফেলল গোর্কির 'মাদার' উপন্যাসের জগৎ। কল্পনার চোখে দেখলাম উহাকুর কালো চুল এবং কালো চোখের মতন মেয়ে নাতাশা আর তার বান্ধবী সাশাকে। পাভেলের মা আর তার বন্ধু খখল-এর ডাকা 'নেনকো' (মা) নিলভ্না চা চড়িয়েছেন সামোভারে। গাড়ি হোটেলের পথে ছাড়বার সময় আমার কোলে ছিল তখন উদালসভের দেয়া আরেকটি আনকোরা ঝকমকে সামোভার। মনে রাখবার মতন একটি স্মৃতিচিহ্ন যা আজও গোর্কির 'মাদার'কে মনে করিয়ে দেয়। সেটি এত বছর পরেও সযত্নে আছে আমার ঘরে। ওপারকার তলায় এসে দেখলাম বারান্দায় পায়চারি করছেন আনা মাসালিনা। আমার প্রতীক্ষায় ছিলেন তিনি। সিঁড়ির গোড়ায় আমাকে দেখতে পেয়েই ছুটে গিয়ে রুমটা খুলে দিলেন। কাছাকাছি আসতেই দু-হাত তুলে বললেনঃ তাসিবা! স্বাগত! তাসিবা! চোখে -মুখে তাঁর উপচে উঠলো এক ঝলক স্নিগ্ধ হাসি।

দেখলাম বিছানাটা পরিপাটি করে রেখেছেন তিনি। খুশি হয়ে বললামঃ থ্যাংক ইউ মাদাম, থ্যাংক ইউ ! বিগলিত হয়ে রুশ ভাষায় কেমন যেন একটা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন তিনি। তাঁর চোখে তখনও ফুটে আছে হাসির ঝিলিক। ইশারায় বললেন যেন একটু গড়িয়ে নিই আমি। আমার গায়ের কোটে হাত রেখে কাপড়চোপড় বদলাতে বললেন। বালিশের দিকে আঙুল তুলে বলতে চাইলেন যেন একটু ঘুমিয়ে নিই।

টি-টেবিলে রাখা ছিল তোয়ালে দিয়ে জড়ানো একটি সামোভার। ঠিক আমার হাতেরটির মতন। প্যাকেটে ছিল বলে জিনিসটি কী বুঝতে পারেননি মাসালিনা। খুলে বের করতেই ঝকমকিয়ে উঠলো তাঁর চোখ। আমার হাত থেকে নিয়ে পরখ করে দেখতে লাগলেন। উল্টে-পাল্টে দেখলেন জিনিসটির রূপোলি কারুকাজ। সারা চোখে-মুখে তাঁর মুগ্ধতা। ফিস্ফিসিয়ে বললেনঃ গুড! ভেরি গুড্!

টি-টেবিলের সামোভারটি তুলে এনে মিলিয়ে দেখতে লাগলেন। ওটি ছিল ধুসর রঙের। পিতলের ওপর সাদাটে প্রলেপ। কিন্তু আমারটি ছিল খাঁটি চাঁদির। গা থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছিল রুপোলি আলো। মাসালিনা বুঝতে পারছিলেন কেউ উপহার হিসেবে জিনিসটি দিয়েছে আমায়। তাই অমন খুশি খুশি দেখাচ্ছিল তাঁকে। ফের একরাশ রুশ শব্দ উচ্চারিত হলো তাঁর ঠোঁট থেকেঃ সামোভার। রুসি, রুসি! নিসে গিক্‌ত। তাঁর সব কথা বুঝবার সাধ্য ছিল না আমার। শুধু এইটুকু বুঝলাম, এটা রুশ দেশের সবচেয়ে দামি একটি সামোভার। খুব সুন্দর আর চমৎকার একটি উপহার হয়তো উদাল্সভের মতন ধরে বলতে চাইছিলেন- সযত্নে জিনিসটা রেখে দিয়ো তুমি।

এবার পরিষ্কার বুঝতে পারলাম আমাদের দেশের চাদানির রুশ প্রতিশব্দ হলো সামোভার। তবে এদেশের বেশিরভাগ চাদানিরই আছে নিজস্ব একটি আভিজাত্য। সেটি এগুলোর গায়ের চিরায়ত রুশ কারুকর্মের অলংকরণ। চীনাদের মতন রুশরাও

www.pathagar.com

তাদের চাদানি, ফুলদানি, বাসন-পেয়ালাকে নিরাভরণ রাখে না। এসবের গায়ে তাদের শিল্পমনের কিছু-না-কিছু ছাপ ফুটিয়ে রাখে। পাবলভের মুখে শুনেছি সাবেক কালের কৃষক এবং শ্রমিকদের চাদানি ছিল পেতলের। কিন্তু হলে কী হবে? সেগুলোর গায়েও ছিল ফুল-পাখি, লতাপাতার নক্‌শা। রাজরাজড়া, প্রিন্স-ডিউক আর জমিদার বাড়ির হালচাল তো ছিল সেকালে একেবারে কেতাদুরস্ত। ওঁরা শয়নে-স্বপনে, চলনে-বলনে, পোশাকে-আশাকে অনুসরণ করতেন ফরাসি রাজতন্ত্রের ঐতিহ্য।

এই রুশ অভিজাতদের খাওয়ার টেবিলের বাসনকোসন, চাদানি, সোমরসের পেয়ালা ইত্যাদি সবই ছিল সোনার। যারা ছিল ছোট জমিদার তাদের বাড়ির বাবুর্চিখানার তৈজসপত্রের সবটুকু খাঁটি সোনার না-হলেও অন্তত সোনার প্রলেপমন্ডিত থাকতো। নিদেনপক্ষে রুপোতে মোড়া থাকতো বাসন-পেয়ালা, চামচ, চা-কফির কাপ, পিরিচ, ফুলদানি এবং আর-আর ব্যবহার্য জিনিস। প্যারিস থেকে রুশ অভিজাতরা আমদানি করতেন তাঁদের বাড়ির চিত্রখচিত টেবিল-চেয়ার, ঘরের দরজা-জানালার পর্দা, গায়ের রাজকীয় পোশাক এবং হলঘর কিংবা শয়নকক্ষের শোভাবর্ধক ফরাসি অথবা ইতালিয়ান চিত্রসম্ভার। বাইরে তাঁরা রুশ ভাষা ব্যবহার করলেও বাড়িতে কথাবার্তা বলতেন ফরাসিতে। ফরাসি গবর্নেসরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের শেখাতেন ফরাসি ভাষা। শেখাতেন ফ্রান্সের লুই রাজবংশের দরবারি আদবকায়দা আর তাদের সামন্তদের নবাবি চালচলন। কিন্তু অভিজাততন্ত্রের এই পরগাছা সংস্কৃতি কখনও প্রভাব ফেলতে পারেনি রুশ বুদ্ধিজীবীদের ওপর। কৃষক আর শ্রমিকরা তো তাদের লোকজ সংস্কৃতি নিয়েই পড়ে থেকেছে মাটি কামড়ে। প্রাচীন রুশ লোককাহিনী, গাঁথাকাব্য, রূপকথা আর স্তেপ অঞ্চল তথা তৃণভূমির চারণ সংগীতে তারা খুঁজে পেয়েছে প্রাণের খোরাক। খুঁজে পেয়েছে আসূর্যাস্ত খাটুনির পর ঘাস আর মাটির গন্ধমাখা চিত্তবিনোদনের খানিকটা সুরভিত ছোঁয়া। আর তাদের জীবনধারণ? সে তো ছিল এক টুকরো রুটির জন্যে প্রতিদিনকার ঘাম-ঝরানোর এক দুঃখময় উপাখ্যান। দুঃখ বেদনা, হতাশা, গ্লানি আর আত্মহননের এক করুণ ট্রাজেডি।

অথচ তিন হাজার বছর কিংবা তারও অনেক আগে তাদের পূর্ব-পুরুষরা ভল্গা, ডন এবং নীপার নদীর তটভূমিতে, উরাল-ককেশাস পর্বতমালার উপত্যকায়, উত্তরের তৃণভূমি আর মধ্য রাশিয়া এবং দক্ষিণের অরণ্যভূমিতে প্রথম গোড়াপত্তন করে কৃষিকেন্দ্রিক গ্রামীণ সমাজের। অবিকল আমাদের দেশের প্রাচীন সমাজের মতোই। তখন জারতন্ত্র কিংবা সামন্ততন্ত্রের কোনো নামগন্ধ ছিল না। গ্রামই ছিল স্ব-স্বাধীন একটি ক্ষুদে রাষ্ট্র। আমাদের পঞ্চায়েতের মতন প্রবীণরা গ্রামের বিচার-আচার করতেন, অভাবের সময় দরিদ্র কৃষকদের সাহায্য করতেন যৌথ শস্যভাণ্ডার থেকে। আমাদের দেশে যার নাম ছিল সেকালে 'ধর্মগোলা'।

রাশিয়ায় গ্রাম-প্রবীণদের বলা হতো স্তারেত (Starets)। নিপীড়নমূলক ভূমিদাস-প্রথা ভল্গা-ডন নদীর দেশে আমদানি হয়েছিল ফ্রান্স, ইতালি, ইংল্যাণ্ড আর পশ্চিম ইউরোপের আর সব দেশ থেকে। এটি ছিল ষোড়শ শতকের ঘটনা। জার

www.pathagar.com

চতুর্থ আইভান (১৫৩০-৮৪) কৃষিভূমি জবরদখল করবার কৌশল হিসেবে চালু করেন এই বর্বর-প্রথা। ভূমিকেন্দ্রিক অভিজাততন্ত্রের তথা জমিদারি প্রথারও প্রবর্তক এই স্বেচ্ছাচারী জার। জমিদারি প্রথাকে রুশ ভাষায় বলা হতো 'গ্রমিয়েসৃতচিষ্ক'। জারের শাসন ব্যবস্থা আর সেনাবাহিনীতে দায়িত্ব পালনের ওপর নির্ভর করতো একজন সামন্তের ভূমিমালিকানা। মস্কোর গ্র্যাণ্ড ডিউক এই আইভানকে বলা হতো 'আইভান দ্য টেরিবল'। অর্থাৎ নিষ্ঠুর আইভান।

১৫৮১ সালে জার বিধিবদ্ধ করলেন একটি কুখ্যাত আইন। জমিদারের খাস তালুক থেকে বাইরে কোথাও কৃষকদের জীবিকার সন্ধানে যাওয়া নিষিদ্ধ করা হলো এই আইনে। এটি ছিল আধুনিক নিবর্তনমূলক আটকাদেশের সামন্তযুগীয় রূপ। এতে করে জমিদারের তালুক-মুলুকে বন্দি হয়ে থাকতে হতো চাষীদের। অবশ্য তখন পর্যন্ত জমিদারের খাস ভূমিদাস হওয়ার অভিশাপ তাদের কুড়াতে হয়নি। খানিকটা নাগরিক অধিকার তখনও তাদের ছিল।

জার প্রথম পিটারের আমলে কৃষকদের এই, সর্বশেষ অধিকারটুকুও কেড়ে নেয়া হলো। জমির ওপর তাদের আর কোনো হক থাকলো না। তারা হলো জমিদারের খাস গোলাম অর্থাৎ ক্রীতদাস। এক সময় ক্রীতদাস এবং সার্ফ অর্থাৎ ভূমিদাশের মাঝখানে যে সামান্য ফারাক ছিল তাও আর রইলো না। মস্কোর গোড়াপত্তন এবং এই শহরের ওপর পোল এবং মোঙ্গলীয়দের আক্রমণের কাহিনী সবিস্তারে লেখা ছিল এতে। কেমন করে চেঙ্গিজ খানের পৌত্র বাতু খানের সোনালি তাঁবুর (Golden Hords) -এর বিজেতাদের উৎখাত করেছিল রুশ কৃষক বাহিনী তারও রোমাঞ্চকর বৃত্তান্ত ছিল এই বইতে। কৃষক বাহিনীর নেতা ছিলেন ভ্লাদিমির নামের এক বীর কৃষক। মস্কোর উত্তর-পূর্ব কোণের প্রাচীন ভ্লাদিমির শহরের গোড়াপত্তন করেছিলেন তিনি ১১১৩ খ্রিস্টাব্দে। মস্কো শহরের প্রতিষ্ঠাকাল ছিল ১১৪৭ সাল। কিয়েভ ছিল সেসময় মধ্য রাশিয়ার রাজধানী। কিয়েভ রাজ্য ভেঙ্গে যাওয়ার পর এই বংশের গ্র্যাণ্ড ডিউক ভ্লাদিমির-সুজদাল (১১৫০-১২৩৮) এ শহরকে রাজধানী করলেন নবপ্রতিষ্ঠিত মস্কো রাজ্যের। যাকে বলা হতো 'মস্কোভি ডাচি'।

বইটি টেবিল থেকে তুলে নিয়ে শুয়ে পড়লাম আমি বিছানায়। চোখে কিছুতেই ঘুম আসছিল না। কারণ তখনও সূর্য ঝুলছিল পশ্চিম দিগন্তের বেশ উপরে। আমাদের ঘড়ির হিসাবে তখন হবে বেলা তিনটা। এদের হিসাবে রাত নয়টা। সুতরাং অনভ্যস্ত চোখে ঘুম নামবে কেমন করে? রুশ হোস্টেস আনা মাসালিনা নিচে গিয়েছিলেন মিনিট পনেরো আগে। ফিরে এসে দরজায় টোকা দিলেন। আমি শুয়ে থেকেই বললামঃ ইট ইজ ওপেন। কাম্ ইন, কাম্ ইন। আনা কথাগুলোর মানে জানতেন। ভেতরে এসে মায়ের মতন স্নেহময় চোখে তাকালেন। আমি বই পড়ছি দেখে বললেনঃ গুড্ গুড্।

শেষে টি-টেবিলের সামোভারটার দিকে ইশারা করে বললেনঃ চা দেবো? কী ভেবে আবার বললেনঃ হট, হট। অর্থাৎ আরও গরম করবো? ইশারা করে সায়

www.pathagar.com

করবার আভাস দিতেই বৈদ্যুতিক চুলায় বসালেন তিনি সামোভারটি। মিনিট পাঁচেক বাদেই কাপ-ভর্তি হট-টি এনে রাখলেন তিনি আমার বেডের সাইড-টেবিলে। ভাসা ভাসা ইংরেজিতে বললেনঃ ড্রিংক, রিদ। অর্থাৎ চা খাও এবং পড়তে থাকো।

পড়াশোনার প্রতি সাংঘাতিক ঝোঁক রুশ মহিলাদের। অক্টোবর বিপ্লবের পর লেনিনের নেতৃত্বে গোটা সোভিয়েত দেশে শুরু হয়েছিল সাক্ষরতা অভিযান। গ্রামে-গ্রামে, শহরে-শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অসংখ্য স্কুল, পাঠাগার, গবেষণাগার, নাট্যালয়। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের পর বিশ্ববিদ্যালয়। স্থাপিত হয়েছিল অংগ-প্রজাতন্ত্রের শহরগুলোতে বিজ্ঞানাগার, জাদুঘর, থিয়েটার, চিড়িয়াখানা। ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির, উচ্চতর বিদ্যায়তন এবং অনুবাদকেন্দ্র। তাসকন্দের প্রাচ্য বিশ্ববিদ্যালয় উদ্বোধন করেন লেনিন স্বয়ং। বিপ্লবের আগে সোভিয়েত দেশে শিক্ষার হার ছিল মাত্র বারো শতাংশ। লেনিন বেঁচে থাকতেই (১৯২৪) এই হার বেড়ে হয়েছিল ষাট শতাংশ। আর উনিশশ' পঁচাত্তরে এই শিক্ষার হার এসে দাঁড়ায় আটানব্বই শতাংশে। আমূল রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সংস্কারের পাশাপাশি শিক্ষার সর্বাত্মক বিস্তার ছিল লেনিনের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব।

রুশ মহিলাদের অ-আ-ক-খ থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উঁচু ক্লাসে বিজ্ঞান আর ভাষা-সাহিত্যের গবেষণা করতে দেখা যায় উনিশশ' আঠারো বিপ্লবের পর। গোর্কির 'মাদার' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র পাভেলের মা নিলভনাকেও বই হাতে নিতে দেখি ১৯০৫ সালের বলশেভিক-বিপ্লবের আগে। এক সময় তাঁর ছেলে পাভেল ছিল কারখানা-মিস্ত্রি-পিতা মিখাইলের মতন গোঁয়ারগোবিন্দ। অহোরাত্র খেটে-খেটে বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে মিখাইল। শুঁড়িখানায় যেতো, বস্তিতে ফিরতো মদ গিলে। ছুতোনাতায় স্ত্রীকে মুখখিস্তি করতো, লাথিগুঁতো মারতো। স্ত্রী নিলভনা কৃষক ঘরের মেয়ে। এক সময় আয়ত্ত করেছিলেন প্রাথমিক বিদ্যা। গল্পের বই, রূপকথার বই পড়তে পারতেন। কিন্তু শ্রমিক-স্বামীর দুর্বিষহ সংসারের ঘানি টানতে গিয়ে ওই সামান্য শিক্ষাটুকু ভুলে গেলেন নিলভনা।

বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত', 'রাজলক্ষ্মী', 'চরিত্রহীন', 'দেবদাস', 'রমা', 'গৃহদাহ' প্রভৃতি অমর উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলোর মতোই গোর্কির 'মা' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র নিলভনি ছিলেন ধর্মভীরু। ঘরের কোণে রাখতেন খ্রিস্টধর্মের মহাপুরুষদের 'আইকন' অর্থাৎ ক্ষুদে মূর্তি। পাভেলের বিপদের কথা ভেবে আইকনগুলোর সামনে গিয়ে ছেলের মঙ্গল কামনা করতেন। যীশু এবং মাতা মেরীর নাম জপ করতেন পাভেল যখন জেলে যেতো। কিংবা সমাজতন্ত্রীদের লেখা বই কিংবা গোপন পত্রিকা নিয়ে বেরুতো শ্রমিকদের কাছে বিলি করতে।

পাভেলও ছিল একজন দক্ষ কারিগর। গোড়ার দিকে বাপের মতন ছিল রুক্ষ মেজাজি। মদ গিলে বাড়ি ফিরলে আঁতকে উঠতেন মা। যেমন আঁতকে উঠতেন শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের মায়েরা। সেই যুবক পাভেল দু-চার মাস বাদে হঠাৎ বদলে গেলো। যারা ঘুণে-ধরা সমাজটাকে বদলে দিতে চান, কৃষক- শ্রমিকের দুর্গতি

www.pathagar.com

মোচন করতে চান সেই সমাজবাদী বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের সংস্পর্শে এলো পাভেল। হঠাৎ তাকে মদ ছেড়ে দিতে দেখে অবাক হলেন মা। মদের বদলে সে ধরতো চায়ের বায়না। দলের কমরেডদের বাড়ি নিয়ে এসে বলতোঃ সামোভার চুলায় চাপাও মা। আমরা চা খাবো।

ছেলের সুমতি ফিরেছে দেখে সেকি আনন্দ মায়ের! সঙ্গে সঙ্গে ছুটতেন রান্নাঘরে। বেশি অবাক হতেন ছেলে আর তার বন্ধুদের হাতে নতুন-নতুন বই দেখে। কিসের বই এসব? মনে মনে আওড়াতেন তিনি। ঘরে ঢুকেই ওরা টেবিলের পাশে বসে বই নিয়ে ডুবে থাকতো। মাঝে-মধ্যে মেতে উঠতো আলোচনায়। কখনও তর্কে। মা ওদের কথার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারেন না। ওরা সব ভালো ছেলে। সবাই ওরা লেখাপড়া-জানা। পাভেলও কিছুদিনের মধ্যে রীতিমতন একজন পণ্ডিত হয়ে ওঠে। ব্যক্তিত্ব হয়েওঠে ওর তির্যক। কম কথা বলে, সব সময় গম্ভীর থাকে। দলের নেতা সে। বন্ধুরা সবাই ওকে শ্রদ্ধা করে। দেখে প্রাণ ভরে যায় মায়ের।

কিন্তু ওরা যখন বইগুলো রান্নাঘরে চুলার গর্তে লুকিয়ে রাখে, টেবিলে ওসব বইয়ের বদলে বাইবেল সাজিয়ে রাখে-মা তখন ভয়ে কুঁকড়ে যান। সাহস পান না ওদের জিজ্ঞেস করতে কিছু। কিন্তু নিজের মনে প্রশ্ন রাখেনঃ কীসব লেখা থাকে এসব বইতে? কেন ওরা গোপনে এসব নিয়ে আসে রাতের বেলা? নবেম্বরের ভয়ংকর শীতে যখন তুষার ঝড় হিস্-হিস্ শব্দে গর্জন তুলতে থাকে, রাস্তায় হাঁটু-সমান হয় তুষার স্তূপ-তার ভেতর দিয়ে কোন সাহসে এরা আসে এই শ্রমিক বস্তিতে! এসে আস্তে-আস্তে দরজা ধাক্কায় পাভেলদের বাইরের ঘরে।

ভিজে কাকের মতন বরফের পানি চুইয়ে পড়ে নাতাশা, সাশা আর সোফিয়ার মাথার ঝাঁকড়া চুলের রাশি থেকে। নাতাশা শহরের এক বস্ত্রকল স্কুলের শিক্ষিকা। বাবা শিল্পপতি। সমাজবদলের সংগ্রামে নেমেছে বলে বাবা ত্যাজ্য সন্তান করেছে মেয়েটিকে। সাশাও এক ধনপতির মেয়ে। উচ্চশিক্ষিতা। সেও বাড়ি ছেড়েছে দেশ মুক্তির কাজে নেমে। জীবন ধারণ করে ছোট একটি চাকরি করে। সোফিয়া এক জাত-বিপ্লবী মেয়ে। বার কয়েক দর্শন করেছে শ্রীঘর। গায়ে ফুঁ দিয়ে সে জেলে যায়। আবার ফিরে আসে। মন খারাপ হলে পিয়ানো বাজায়, গলা চড়িয়ে গান গায়। সমাজতন্ত্রের পণ্ডিত সে। কখনও চাকরানী সেজে, কখনও সন্ন্যাসিনীর সাদা পোশাকে আপাদমস্তক ঢেকে আর গলায় ক্রুশ ঝুলিয়ে পিছু-লাগা টিকটিকিদের চোখে ধুলো দেয়। দূর-দূর গ্রামে যায় চাষীদের সমাজ সচেতন করে তুলতে। এক শহর থেকে আরেক শহরে যায় শ্রমিকদের মধ্যে বিপ্লবের কেতাব আর পত্রপত্রিকা বিলি করতে।

মা হতবাক হয়ে পড়েন এসব বড়ঘরের শিক্ষিতা মেয়ে কিসের নেশায় শীতের রাতের রাস্তায় জমে-থাকা তুষার মাড়িয়ে হাঁটে, বৃষ্টিতে ভিজে একাকার হয়। তাদের মাথার টুপি, গায়ের কোট-স্যুয়েটার, পায়ের উঁচু-মোটা জুতা একসা হয় ভিজে। আবার একাই এরা বৈঠক শেষ করে কয়েক মাইল হেঁটে যায় মস্কো। নগর উপকণ্ঠ থেকে মস্কো সে তো ছয়-সাত মাইল দূরের শহর।

www.pathagar.com

একদিন মা সাহস করে নাতাশাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমরা কিসের বই পড়ছো এসব মা?

নাতাশা সরাসরি জবাব দেয়ঃ সমাজ বদলানোর বই এসব। এতে আছে সত্য কথা। যে-ব্যবস্থা মানুষের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিয়েছে তার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই। যে-ব্যবস্থা শ্রমিকের রক্ত এবং ঘাম দিয়ে ইমারত গড়ে আর শ্রমিককে যক্ষ্মায় ভুগিয়ে অকালে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেয় তার উচ্ছেদের জন্যে আমাদের সংগ্রাম। যে-অভিজাততন্ত্র কৃষক শ্রেণীকে ভূমিদাস বানিয়ে গরু-বলদের মতন পশুর স্তরে নামিয়ে এনেছে তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়ে শোষণমুক্ত সুখী-সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠাই আমাদের লক্ষ্য। আমরা যারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেমেছি আমরা সবাই এক সমতলের লোক। আমাদের মধ্যে ভদ্রলোক-ছোটলোক, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, শ্রমিক-চাষাভুষা বলে কোনো ভেদরেখা নেই। আমরা সবাই বন্ধু, কমরেড। এবং আমরা সবাই সোশ্যালিস্ট, সমাজবাদী। আমরা পুরনো জীর্ণ সমাজটাকে ভাঙবোই। তার সব নিগড়, শোষণযন্ত্র গুঁড়িয়ে দেবোই।

কথাগুলো যখন বলছিল নাতাশা দুই চোখেই তখন তার আগুনের ফুলকি। যেন তার কণ্ঠে আগাম ধ্বনিত হচ্ছিল ত্রিশ বছর পরে লেখা বাংলার চিরবিপ্লবী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহের গানঃ

কারার ওই লৌহ কবাট
ভেঙে ফেল কররে লোপাট...
লাথি মার ভাংরে তালা
যতসব বন্দিশালা...।

ধর্মবিশ্বাসী, নিপীড়িতা এক নারী ভয়ে শিউরে ওঠেন এক যুবতী লড়াকু মেয়ের গলার শাণিত উচ্চারণে। তিনি ভয়ার্ত কণ্ঠে বলেনঃ যদি তোমাদের ওপর অত্যাচার করে পুলিশ? যদি তোমাদের জেলে নিয়ে যায়? সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে পাঠায়? ফাঁসিতে ঝোলায়?

মায়ের চোখে পানি দেখে তাঁকে অভয় দেয় নাতাশা। চোখের পানি মুছে দিয়ে সান্ত্বনা দেয় মাকে। বলেঃ যুগ-যুগ ধরে পীড়ন চালিয়ে, ভয় দেখিয়ে অমন করে আমাদের সবার চোখেই তো পানি ঝরিয়েছে ওই তাসের-পুতুল প্রভুর দল। এবার আর কোনো অশ্রুপাত নয়। এবার পাল্টা রক্ত ঝরানোর দিন। এবার ওদের শয়তানি-হাত গুঁড়িয়ে ফেলবার দিন। দেশ জেগে উঠেছে এবার। জেগেছে মানুষ। ঘুম ভাঙতে শুরু করেছে হাতুড়ি-পেটা শ্রমিকদেরও। আড়মোড় ভেঙ্গে দাঁড়াতে শুরু করেছে গতরখাটা কৃষক আর ভূমিদাসের দল। আমরা নারীরা কেন আর ঘরে বসে থাকবো? বসে-বসে ফেলবো চোখের পানি? আপনি কেন বসে থাকবেন মা? দেখুন না আমরা মেয়েরা বেরিয়ে পড়েছি। আপনাদেরই তো সন্তান আমরা।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ফের বলতে থাকেঃ আমাদের সংগে রাস্তায় নামুন। মিছিলে যোগ দিন। দেখবেন কেটে গেছে ভয়। আপনারই তো ছেলে পাভেল

www.pathagar.com

মিখাইলভিচ। দেখুন না কেমন এক সাহসী নেতা হয়েছেন। গোপনে পোস্টার লিখছেন, পুস্তিকা বিলি করছেন। কৃষকদের জন্যে পত্রিকা ছাপাচ্ছেন। সত্যি এক যোগ্যি ছেলে আপনার। ওঁর বুদ্ধিজীবী, শ্রমজীবী বন্ধুরা দলে-দলে জেলে যাচ্ছেন। কাউকে-না-কাউকে তো সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যে, দেশ মুক্তির জন্যে জেলে যেতেই হবে। সাইবেরিয়ায় সারা জীবন নির্বাসন ভুগতে হবে। ফাঁসিতেও ঝুলতে হতে পারে। সবার ভালো করতে হলে একদলকে তো আত্মবলিদান করতেই হবে। শহীদ হয়ে প্রেরণা যোগাবেন এঁরা নিগৃহীত আর সত্যনিষ্ঠ মানুষের প্রাণে। আর তখন দাসত্বের বন্ধনমুক্ত হবে গোটা দেশ। বলুন না, সেই মুক্তি কত আনন্দের?

মা অনুপ্রাণিত হলেন। ছেলের গোপন বইগুলো পড়বার জন্যে নতুন করে শিশুশিক্ষায় হাতে-খড়ি নিলেন। পাভেলের বন্ধু খখল আঁদ্রিউশা তাঁকে শেখাতে শুরু করেন। তিনি লজ্জাবোধ করেন। আঁদ্রিউশা বলেঃ পড়াশোনায় লজ্জিত হওয়ার মতন কিছু নেই। বুড়ো বয়সেও লেখাপড়া শিখে অনেক জ্ঞানী হতে পারেন। মা এবার নিবিষ্টচিত্ত হলেন পুস্তক পাঠে। এক বছরের মধ্যেই পত্রিকা পড়বার বিদ্যা অর্জন করলেন। সমাজ পাল্টানোর বইগুলো পড়বার মতো জ্ঞান আয়ত্ত করলেন।

পাভেল মে দিবসের আন্দোলনে জেলে গেলে কিছুটা ভেঙ্গে পড়েছিলেন তিনি। কিন্তু দেশের মুক্তির কথা ভেবে মন শক্ত করলেন। কারখানা শ্রমিকদের খাদ্য-পশারিণী মারিয়ার সংগে একই পেশা নিয়ে জীবিকা অর্জনে নামলেন। আর সেই সুযোগে ছেলের দায়িত্ব পালন করতে লাগলেন। অর্থাৎ খাদ্যের মোড়কে গোপন বই আর নিষিদ্ধ পত্রিকা ছদ্মবেশে পাচার করতে লাগলেন কারখানার সচেতন শ্রমিকদের মধ্যে। পুরোপুরি বদলে গিয়ে এক নতুন মানুষ হলেন নিলভনা। হলেন এক শিক্ষিতা, সাহসিকা এবং সমাজ বিবর্তনের নেত্রী।

কিন্তু ধর্মভীরুতার সংগে মমতাময়ী মাতৃত্বের প্রাণটি ছিল তার মধ্যে জাগ্রত। একদিন তুষার বৃষ্টির মধ্যে ছাতা মাথায় বার্চ আর আস্পেন গাছের অরণ্য গলিয়ে রাতের অন্ধকারে নাতাশা যখন মস্কোর পথে রওয়ানা দিল ওর কষ্টে গুমরে উঠলো মায়ের বুকখানা। বললেনঃ আহা, কেমন করে এতটা পথ পার হবে মেয়েটা? পাভেলকে ডেকে বললেনঃ যা-নারে পাশা, ওকে এগিয়ে দিয়ে আয়। নাতাশা নিষেধ করলেও মানলেন না। খখল আঁদ্রিউশাকে সংগে পাঠালেন।

মা আদর করে পাভেলকে ডাকতেন পাশা। তেমন গোর্কিকে ওঁর দাদী ডাকতেন আলিউশা। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত হওয়ায় রুশ ভাষায় স্লাভনিক ভাষার পাশাপাশি আত্মলীন হয়েছে অনেক উজবেক, কাজাখ, তুর্কি, ইরানি, তাতারি, মঙ্গোলিয়ান, আরবি এবং সংস্কৃত শব্দাবলী।

'মস্কোর ইতিহাস' বইটি হাতড়াতে-হাতড়াতে এসব কথা ভাবছিলাম আমি। ভাবছিলাম আনা মাসালিনা যদি আমায় পাভেলের মা নিলভনার মতন 'সানু' কিংবা 'নূরী' নামে সম্বোধন করতেন। কারণ, তাঁর চোখে-মুখে আমি দেখছিলাম নিলভনার ছবি।

www.pathagar.com

হঠাৎ তাঁর দিকে তাকিয়ে হাতের ইশারায় বললামঃ 'নামে নূরী'। অর্থাৎ আমার নাম 'নূরী' 'নাম' শব্দটি ফার্সি এবং উজবেক ভাষার।

মাসালিনা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে সংগে সংগে উচ্চারণ করলেন ঃ নূরী! নূরী ! গুড্, গুড্।

রাশিয়ার প্রাচীন ইতিহাসের ধূসর সড়কে এসে পড়লাম। ভল্গার তীর ধরে হাজারটা বাঁক নিয়ে এই সড়ক চলে গেছে এশিয়া এবং ইউরোপের কত শত জনপদে। এক সময় এই নদী-উপত্যকায় বাস করতো প্রত্নপ্রস্তর যুগের মানুষ। তাদের গুহাগৃহ ছিল উরাল আর ককেশাসের সানুদেশে। দশ লাখ কিংবা তারও আগেকার এই পার্বত্য-অধিবাসের উপাখ্যান। প্রত্নবেত্তারা সেই আদিম জনগোষ্ঠীর পাথুরে হাল-হাতিয়ার এবং ঘর-গেরস্থালির নিদর্শন খুঁজে পেয়েছেন মধ্য, দক্ষিণ ও উত্তর-রাশিয়ার গুহাচত্বরে।

মস্কো এবং তার চারপাশের পৌরাণিক যুগের অধ্যায়গুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে চলছিলাম। আর রোমাঞ্চিত হচ্ছিলাম বার-বার। কী বিচিত্র, বর্ণাঢ্য আর ঘাতপ্রতিঘাতময় আদি মানবের ক্রমবিকাশের কাহিনী।

মনে পড়লো ভারতীয় ঐতিহাসিক উপন্যাসের লেখক রাহুল সাংকৃত্যায়নের 'ভল্গা থেকে গঙ্গা' (হিন্দিঃ 'ভল্গা সে গঙ্গা') উপন্যাসটির কথা। তিনি পুরনো পাথর-যুগের এই আদিম রুশদের চিহ্নিত করেছেন কাস্পিয়ান সাগর তল্লাটের আর্য তথা বৈদিক জাতির পূর্বপুরুষ হিসাবে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের সেই দূরতম পর্বে গুহার ছাদের তলায় ছিল তাদের সংসার। পরিবার ছিল তাঁদের মাতৃতান্ত্রিক। অর্থাৎ মা-ই ছিলেন পরিবার এবং গোষ্ঠী-প্রধান।

মায়ের নির্দেশেই চলতো পরিবারের যুবক-যুবতী আর প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধ পুরুষ সদস্যরা। তাদের ছিল যূথবদ্ধ জীবন। সবাই মিলে তারা অরণ্যে আহরণ করতো ফলফলারি। তীক্ষ্ণধার পাথরের ফলা নিক্ষেপ করে শিকার করতো বন্যপ্রাণী। প্রথমে খেতো তারা কাঁচা মাংস। এক সময় আগুন আবিষ্কৃত হলো তাদের হাতে।

অরণ্যে দাবানল জ্বলতে দেখে আগুন আবিষ্কারের ধারণা পেলো তারা। এক গাছের শুকনো ডালের সংগে ঝড়ের আঘাতে পাশের গাছের শুকনো ডালের একটানা ঘর্ষণে জ্বলে ওঠে আগুনের লকলকে শিখা। সেই আগুনে মাসের পর মাস ধরে পুড়তে থাকে একটার পর একটা অরণ্য। পুড়ে ছাই হয় সবুজ পত্রপল্লব-পুষ্পভরা তরুশ্রেণী। গুহাচারীরা বুঝলো একটি শুকনো ডালের সঙ্গে আরেকটি শুকনো ডাল ক্রমাগত ঘষতে থাকলে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে দাহ্য-পদার্থটি। পরখ করে দেখলো তারা দুই শুকনো ডালের এই ঘর্ষণের প্রতিক্রিয়া। এভাবে তারা আগুন আবিষ্কারের প্রথম বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবক হলো। আবার দুই নুড়ি-পাথর ঘষেও পেলো একই ফল। ইতিহাসের গতিধারা এই মহাউদ্ভাবনার কল্যাণে পাল্টে দিল তারা।

আগুনের আবিষ্কার তাদের জীবনধারাটাকেও পাল্টে দিল। এই প্রথম গুহাবাসীরা হলো বিজ্ঞান-মনস্ক মানুষ। আগুনে ঝলসানো মাংসের ব্যবহার শুরু হলো গুহায়।

www.pathagar.com

শুকনো লতাপাতা পুড়িয়ে তুষার ঝড়ের ভয়ংকর শীত থেকে বাঁচবার উপায় বের হলো। স্তূপাকার শুকনো পাতায় আগুন জ্বালিয়ে হিংস্র বন্যপ্রাণীর উপদ্রব থেকে আত্মরক্ষার কৌশলও তাদের আয়ত্তে এলো। এখন থেকে তারা আর বন্য পশুর আক্রমণের ভয়ে গুহাদ্বার বন্ধ করে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে থাকলো না। পশুকুলের ওপর প্রতিষ্ঠিত হলো আদি মানবের আধিপত্য।

ক্রমে দোআঁশ মাটির তাল পাকিয়ে উদ্ভাবিত হলো মৃৎপাত্র নির্মাণ- কৌশল। সেই পাত্রে তুষারগলা বরফ পানি, ভল্গা-ডন-অং আর উরাল নদীর স্বচ্ছ পানি গুহাঘরে ধরে রাখবার ব্যবস্থা হলো। চুলা বানিয়ে সবজি-শস্যদানা আর মাছ-মাংস সেদ্ধ করে খাওয়ার নতুন অভ্যাস হলো তাদের ধাতস্থ। সভ্যতার হাওয়া লাগলো আদিম স্লাভনিক-রুশদের জীবন ধারায়।

বন্যপশুর আক্রমণরোধ আর খাদ্য আহরণের উপায় হিসেবে আবিষ্কৃত হলো পাথরের তীর-ধনুক, গাছ কাটার কুড়াল, নদী সমতলে চাষবাসের জন্যে পাথর-ফলার লাঙল। শিকারের জীবন ছেড়ে এক সময় নেমে এলো আদিম রুশরা ভল্গাতটে। গাছের ডালপালা দিয়ে তৈরি করতে লাগলো পর্ণ কুটির। মাটির দেয়াল ঘেরা ঘর। গড়ে উঠতে থাকলো নদীর তীরে আদিম গ্রাম, বসত এবং নিয়ন্ত্রিত গ্রামীণ সমাজ। অভ্যুদয় ঘটলো এদেশে প্রাচীন কৃষি যুগ এবং কৃষি সভ্যতার। এক সুদূরপ্রসারী বিপ্লব ঘটে গেলো আদিম মানুষের পারিবারিক এবং সমাজজীবনে। গুহায় বসবাসকালে তৈরি করতে শিখলো তারা এক ধরনের হাড়ের সুচ। সেই সুচে গাছের আঁশ দিয়ে সেলাই করলো তারা পশুচামড়ার পোশাক অথবা গাছের বাকলের পরিধেয়।

কৃষি জীবনে এসে স্লাভ-রুশরা চাষ করতে শিখলো গম-ভুট্টা-ধান আর যবের পাশাপাশি কার্পাস তুলা। চরকা এবং তাঁত আবিষ্কার করে তারা এ সময় কার্পাস তুলার সুতো দিয়ে বয়ন করতে শিখলো সুতি কাপড়। এরপর পশমি কম্বল। উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়, বিকিকিনি আর ভল্গা-ডনে নৌকা বোঝাই করে দূরে-দূরে পণ্য নিয়ে যাওয়ার বাণিজ্যিক উপায়ও জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকলো। ভল্গা-ডনের তীরে এভাবেই গড়ে উঠলো অস্ট্রিক যুগের বাংলাদেশের মতন হাট, অনেক বাজার এবং গঞ্জ।

গঙ্গার তীরে গড়ে উঠেছিল বাংলার প্রাচীন গঙ্গারিদাই সভ্যতা, হুগলির মোহনায় গড়ে ওঠে তাম্রলিপ্তি এবং সপ্তগ্রাম সভ্যতা। মেঘনা তটে গড়ে উঠলো সুবর্ণগ্রাম (সোনারগাঁ) নগর, ব্রহ্মপুত্র তীরে প্রাচীন বটেশ্বর-উয়ারি। আধুনিক কুমিল্লা সংলগ্ন মোহিতগিরিতে নির্মিত হয় ময়নামতি, কর্ণফুলী তটে চট্টলা বন্দর। এভাবেই গড়ে উঠেছিল ছোটখাটো হাট এবং গঞ্জ থেকে বড় বড় শহর।

এ দেশের প্রাচীন এবং আজকের বিশাল শহরগুলোও ছিল এ সময় সামান্য এককেটি গঞ্জ। ভল্গা নদীর শাখা হলো পুরনো মস্কোভি নদী। এটি ছিল হাজার বছর আগে একটি গ্রাম। সেকালে গ্রামটির নামও ছিল মস্কোভি। প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপিয়ান ভাষাগোষ্ঠীর স্লাভ জাতির মধ্য-রাশিয়ার একটি গোত্র বাস করতো এই মস্কোভি গ্রামে। গ্রামের নামেই ভল্গা থেকে আসা পাশের নদীটির নামও হয়েছে মস্কোভি।

www.pathagar.com

রাশিয়ার আদি যুগের রাজধানী কিয়েভ শহরের ডিউক বংশের ভাদিমির এই গ্রামের চারপাশের এলাকা নিয়ে ত্রয়োদশ শতকে গড়ে তোলেন একটি রাজ্য। নতুন এ রাজ্যকে বলা হতো মস্কোভি ডাচি অর্থাৎ ডিউকডোম।

ইতিহাসের দুর্লভ এই বইটি পড়তে-পড়তে কেবলই অবাক হচ্ছিলাম। একটি নদী কেমন করে একটি জাতি, তার ভাষা-সংস্কৃতি এবং তার গ্রামীণ সভ্যতার পাশাপাশি বৃহৎ নগর সভ্যতাকেও আপন দোলনায় দোলাতে-দোলাতে পরিপুষ্ট করে তোলে তার গভীরে চোখ রাখতে গিয়ে সত্যি-সত্যি বিস্ময় ধরে রাখতে পারলাম না।

কিয়েভ শহরও তো পূর্ব ইউরোপের বিখ্যাত নদী নীপারের তীরে। কিন্তু কিয়েভের নাম তো নদীর নামে হয়নি। সেন্ট পিটাসবুর্গ (রুশ নামঃ সান্ত পিতের বুর্গ) শহরের মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে নেভা নদী। কিন্তু রাশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম এই শহরের সঙ্গে নদীর নামগন্ধও নেই।

যেমন নীল নদের সঙ্গে নামের যোগসূত্র নেই মিসরের প্রাচীনতম শহর মেমপিক নগরীর। যোগসূত্র নেই পরেকার শহর আলেকজান্দ্রিয়া কিংবা কায়রোর। ইরাকের আদি নগর সুমার, ব্যাবিলন এবং সপ্তম শতকের বিখ্যাত শহর বাগদাদ নামের দিক থেকে বন্ধ্যা। দজলা-ফোরাত তথা তাইগ্রিস-ইউফ্রেতিসের মতন দুই বিখ্যাত ঐতিহাসিক নদী ছুঁতেও পারেনি নতুন শহরের নাম। উপমহাদেশের প্রাচীনতম নগর সভ্যতার লীলাভূমি মহেনজোদারো শহরও অবলীলায় উপেক্ষা করে গেছে সিন্ধু নদকে। যেমন রোম চোখ তুলে তাকায়ওনি টাইবার নদীর কাকচক্ষু সলিল রাশির দিকে। বিশাল ইয়াংসি নদীকেও নিজের নামের সংগে জড়ায়নি চীনের প্রাচীন রাজধানী-নগরী নানজিং। টেম্‌স আর সীন নদীকে একইভাবে পাত্তা দেয়নি ইউরোপের দুই সুন্দরী নগর-সম্রাজ্ঞী লণ্ডন এবং প্যারিস। এদিকে গঙ্গাস্নান করলেও গঙ্গাকে যেমন এড়িয়ে গেছে ভারতের সব থেকে জনাকীর্ণ শহর কলকাতা তেমনি আমাদের রাজধানী একালের মেগাসিটি ঢাকার ভূমিকাও একই। বুড়িগঙ্গা নদী কেবল ফোকলা বুড়ি হয়ে থাকলো প্রাচ্যের এককালের এই রূপময় নগরীর কাছে। পর্বতকন্যার কানের ফুল ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে কর্ণফুলী নদী এক রোমাঞ্চকর উপাখ্যানের জন্ম দিলেও প্রাচীন চট্টলা শহর এবং আধুনিক চাটগাঁও বন্দর কোথাও ধরে রাখেনি তার স্মৃতি।

সারা পৃথিবীতে একমাত্র মস্কোভি তথা আধুনিক মস্কোভা নদীই, যতদূর জানি, এর একমাত্র ব্যতিক্রম। এই নদীর নামে হয়েছে এ দেশের কৃষি যুগের প্রথম গ্রাম। তারপর কৃষকদের ছোট একটি হাট। অষ্টম শতকে একটি গঞ্জ। যেখানে বসতো স্নাভনিক-রুশ চাষীদের পণ্যের মেলা। এমনকি দ্বাদশ শতকেও এটি ছিল দেয়াল ঘেরা একটি গঞ্জ। সাবেক রাজধানী কিয়েভ থেকে সুজদাল ভ্লাদিমির বিতাড়িত হলেন বারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে। সুজদালরা ছিলেন কিয়েভের সাবেক গ্র্যান্ড ডিউক।

১২৪০ খ্রিস্টাব্দে চেঙ্গিজ খানের পৌত্র বাতু খানের বাহিনী দখল করে নিয়েছিল কিয়েভ। তখন থেকে চৌদ্দশ' শতক পর্যন্ত মোঙ্গলদের দখলে ছিল কিয়েভ শহর এবং রুশ রাজ্যগুলো। এর আগে পূর্ব ইউরোপের স্ক্যানডেনেভিয়ান ভারানজিয়ান

www.pathagar.com

শাসকরা ছিলেন রাশিয়ার অধিপতি। এই বংশের ডিউক রুবিক-এর পুত্র এবং উত্তরাধিকারী ওলেগ (৮৭৯-৯১২) রাশিয়া দখল করেন। তিনি বারানজিয়ান সেনাদল নিয়ে দখল করেন পুরনো কিয়েভ।

এর আগে খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের প্রাচীন শহর নভ্গোরদ (রুশ নামঃ নভ্গুরাত) ছিল মধ্য-পশ্চিম এবং উত্তর রাশিয়ার রাজধানী। ডিউক ওলেগ সেখান থেকে রাজধানী সরিয়ে আনলেন কিয়েভে। ৮৮২ সালে কিয়েভ দখল করে তিনি নতুন করে গড়লেন শহর। খাজার আধিপত্য থেকে তিনি মুক্ত করলেন ইস্টার্ন রাশিয়ানদের তথা পূর্বাঞ্চলীয় রুশদের। পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্ট্যান্টিনোপল অভিযানে যান দুঃসাহসী ওলেগ। রোমানদের কাছ থেকে আদায় করলেন বাণিজ্যিক সুবিধা এবং ট্যাক্স।

রুশ রূপকথায় আছে বীর ওলেগ-এর অনেক গল্প। তাঁকে আদি যুগের রুশ কবিরা নন্দিত করেছেন বীরযোদ্ধা হিসাবে। কারণ বর্বর যাযাবরদের আধিপত্য থেকে তিনিই প্রথম মুক্ত করেছিলেন ভল্গা এলাকার কসাক কৃষক, ডন অঞ্চলের 'দনেত-চাষী' আর গ্রামবাসীদের। তার পুত্র ইগর ছিলেন মধ্য-রাশিয়ার গ্র্যাণ্ড ডিউক। ওলেগ-এর পূর্বপুরুষরা নাকি ছিলেন নরওয়ের লোক। ডিউক ইগরের সময় থেকে রুশ রাষ্ট্র একটা আদল নিতে শুরু করলো। মস্কোভি গঞ্জের গোড়াপত্তন হয় ১১৪৭ সালের দিকে। এখান থেকে মস্কোভি নদীর তীর ধরে ভল্গার ভাটি এবং উজান হয়ে পূর্ব-উত্তর ইউরোপের বাল্টিক সাগর এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে কাস্পিয়ান কৃষ্ণসাগরের দিকে চলে গেছে প্রাচীন যুগের বাণিজ্যপথ। যেমন চীনের ইয়াংসি নদীর তীর ছুঁয়ে মধ্য এশিয়ার সমরকন্দ-তাব্রিজ হয়ে পূর্ব ভূমধ্যসাগর এলাকায় চলে গিয়েছে এশিয়ার প্রাচীনতম বাণিজ্যপথ 'সিল্ক রোড' তথা রেশম-সড়ক।

ভল্গা-ডনের বাণিজ্যপথের মাঝখানে অবস্থানের কারণেই মস্কোভি গঞ্জটি দ্রুত একটি ব্যস্ত বাণিজ্যকেন্দ্র হয়ে উঠতে থাকে। এর আগে আধুনিক মস্কোর মাইল কয়েক পূর্ব-উত্তর কোণের প্রাচীন ভাদিমির শহর ছিল মস্কোভি ডাচির রাজধানী। কিয়েভের ডিউক দ্বিতীয় ভাদিমির বাযেশ' শতকের গোড়ার দিকে' 'ক্রেমলিনা' অর্থাৎ দুর্গবেষ্টিত করে নির্মাণ করেন এই শহর। দীর্ঘদিন পর্যন্ত এটি ছিল মধ্য-রাশিয়ার রাজধানী।

দানিয়েলের নাম জানে আধুনিক মস্কোভা নদীর চারপাশের সমতল ভূমির কৃষকরা। শহুরে শিক্ষিতরা তো জানেই। এই দানিয়েলই ইউরোপের বল্কান এবং স্ক্যানডেনেভিয়া অঞ্চলগামী বাণিজ্য পথের ওপর দাঁড়ানো মস্কোভি গ্রাম আর তার মুখের গঞ্জটিকে গড়ে তোলেন শহর হিসেবে। সেকালে প্রায়শই বাণিজ্যপথে আর কৃষক পল্লীগুলোতে হানা দিত লুটেরা যাযাবরের দল। যেমন আঠারো শতকের গোড়াতে বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গ্রামগঞ্জে হানা দিত মারাঠা বর্গি দস্যুরা। বর্গির হাঙ্গামা নিয়ে মুখে মুখে শ্লোক গাঁথতে পারা সেকালের বাংলার গ্রামপ্রবীণারা রচনা করেছিলেন ছেলে-ভোলানো প্রচুর ছড়া। তার মধ্যে সব থেকে স্মরণীয় হলোঃ

www.pathagar.com

'ছেলে ঘুমালো, পাড়া জুড়ালো বর্গি এলো দেশে' ছড়াটি।

এখানেও পোল, খাজার, তাতার আর মোঙ্গলদের লুটপাটের ঘটনা নিয়ে রচিত হয়েছে অসংখ্য উপকথা এবং ছড়া। রুশ লোকসাহিত্যে আছে এ রকম ভুরি-ভুরি ছেলে-ভোলানো শ্লোক আর দস্যিদের গল্প। গোর্কির নানী কাশিরিনা আকুলিনা। প্রায়ই নাতিকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে শোনাতেন এসব রাহাজান-দস্যুর উপদ্রবের কাহিনী। শোনাতেন লোকজ রুশ ভাষায় রচিত নানান রকমের ছড়া। উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ রুশ ছোটগল্পকার এবং প্রখ্যাত কথাশিল্পী হলেন আন্তন চেখভ (১৮৬০-১৯০৪)-এর গল্পগুলোতেও আর এরকম অনেক ছড়ার উদ্ধৃতি।

ডাকাত রাজকুমারী গালিচেঁভা, দস্যুরানী উস্তা আর ডাকাতের মা মারিয়ার শোকগাঁথা তো দশ বছর বয়সেই অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে গোর্কি শুনেছিলেন নানী কাশিরিনার মুখে। গোর্কির লেখা আমার ছেলেবেলার স্মৃতিকথায় আছে তাতারদের নিয়ে লেখা একটি ছড়া। ছড়াটির দুই স্তবক এ রকমঃ

'ঠক্ ঠক্ ঠোকা দেয় কারা ঘরে

প্রাণ থাকে না বুড়ি বুড়ি, কিষান-বউয়ের ধড়ে৷'

দস্যুদের উপদ্রব থেকে উঠতি গঞ্জ মস্কোভির প্রতিরক্ষার জন্যে চারদিকে পাথরের উঁচু দেয়াল তুললেন দানিয়েল। দেখতে-দেখতে চারদিকের আরও কিছুগ্রাম নিয়ে গড়ে উঠলো ছিমছাম গোলাকার একটি মনোরম শহর। দূর দূর থেকে এসে ভিড় জমালো এখানে সওদাগর, নাবিক আর মাঝারি গেরস্তরা। সেটি ছিল ১২৭১ সালের স্মরণীয় ঘটনা।

সেকালে মস্কোভা নদীর দু'ধারে ছিলো কচুরিপানা-ভরতি বিল-ঝিল আর নলখাগড়া-বার্চ গাছের জঙ্গল। মাঝখানে জনবিরল ছাড়া- ছাড়া কিছু অজ পাড়াগাঁ। যেমন ছিল সতেরো শ' শতকে গঙ্গার ধারের তল্লাটটি। তিনটি জঙ্গুলে গাঁ ছিল নদীর পুব ধারে। কলিকাতা (পুরনো নাম নাকি কালিহাতা), সুতানুটি, গোবিন্দপুর গ্রামে। এই তিন গাঁ কিনে নিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইংরেজ কুঠিয়াল জব চার্নক আওরঙ্গজেবের আমলে বাংলা মুলুকে প্রথম পত্তন করলেন ব্রিটিশ জমিদারি। তাদের এ তালুকে গড়ে উঠলো ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গকে ঘিরে ইংরেজদের ইস্ট ইন্ডিয়ান উপনিবেশ।

ইংরেজ বণিক, জলদস্যু, গোরা সেপাই, গির্জার শ্বেতাঙ্গ পাদরি ছাড়াও এখানে এসে ভিড় জমালো কোম্পানির এ দেশীয় এজেন্ট, মুৎসুদ্দি, দোভাষী, স্থানীয় বণিক-ব্যবসাদার আর জমিদার শ্রেণী। উপনিবেশটিতে ক্রমে গড়ে উঠলো শ্বেতাঙ্গ-শাসিত এক বিশালাকৃতির আধুনিক শহর। আধুনিক নাম মহানগরী কলকাতা। গেঁয়ো শহর মস্কোভিও জঙ্গল আর জলাশয় ঘিরে অনেকটা এভাবেই এক বড় নগর হয়ে উঠলো। শহরের চৌহদ্দিতে যোগ হতে থাকলো একটার পর একটা গাঁ। পাশের শহর ভাদিমির নিষ্প্রভ হয়ে পড়লো মস্কোর উত্থানে। এক সময় মস্কোর ওপরও আক্রমণ চললো বাতু খানের মোঙ্গল অশ্বারোহী লুটেরাদের। কৃষক ফৌজ নিয়ে নগর রক্ষার সেই যুদ্ধে নিহত হলেন ডিউক ভাদিমির। রুশদের কাছে শহীদের সম্মান পেলেন

www.pathagar.com

এই সাহসী যোদ্ধা। তাঁর গৌরবগাঁথা রচনা করেছেন মধ্যযুগের রুশ লোক কবিরা। শিশুতোষ গল্পেও আছে বীর ভাদিমিরের কথা।

ডিউক প্রথম আইভানের পিতৃদত্ত নাম ছিল আইভান বালিতা। তাঁর সময়ে (১৩২৮-৬১) মস্কো হলো তাঁর গ্র্যান্ডডাচির রাজধানী। দিমিডনস্কির আমলে (১৩৫৯-৮৯) মস্কো শহর এবং রাজ্যের আয়তন বাড়লো আরও অনেকখানি। তৃতীয় আইভান (১২৬২-১৫০৫) কৃষক ফৌজ আর ভল্গা উপত্যকার কসাক অশ্বারোহী সেনাদল নিয়ে মস্কো থেকে উৎখাত করলেন মোঙ্গলদের। বীর আইভানের কত গল্পই না আছে রুশ উপাখ্যানগুলোতে। তেবার, নভগোরাত, রোস্তভ আর ভাইয়াত কা রাজ্য তথা ডাচি দখল করে নিয়ে বিশাল রাশিয়ান স্টেটের গোড়াপত্তন করলেন আইভান। মস্কোর ডিউক তৃতীয় ভাগিনির আমলে বিশাল রুশ রাষ্ট্রের একীভূত করবার কাজ শেষ হলো। মস্কো ডাচি রূপ নিল গ্রেট রাশিয়ান স্টেটে। ১২৬২ থেকে ১৭১৩ সালে অব্দি একটানা সাড়ে চারশ' বছর মস্কো ছিল রাশিয়ার রাজধানী। এই নিরবচ্ছিন্নতার ছন্দপতন ঘটালেন প্রথম পিটার অর্থাৎ পিটার দ্য গ্রেট। মস্কোতে শৈশব এবং যৌবন কাটালেও ১৭১৩ সাল মস্কো থেকে রাজধানী সরিয়ে নিলেন তিনি ফিনল্যাণ্ড সাগর উপকূলের পেত্রোগ্রাদ শহরে। পরে যার নাম হলো সেন্ট পিটার্সবুর্গ।

পিটার রাশিয়াকে রূপ দিয়েছিলেন তখনকার দিনের ইউরোপের সমান্তরাল এক আধুনিক রাষ্ট্রে। অনেক গুণ থাকলেও দিল্লীর সুলতান মুহম্মদ তুগলকের মতন স্বপ্নবিলাসী, খেয়ালি এবংস্বেচ্ছাচারী পিটার। তাঁর আমলেই সামন্তপ্রথা পেষণ যন্ত্র হয়ে উঠলো। জমিদারদের তাঁবে রাখতে গিয়ে কৃষকদের গলায় কঠিন ফাঁসের মতন ঝুলিয়ে দিলেন তিনি ভূমি দাসপ্রথা।

১৯১৮ সালের সফল-বলশেভিক বিপ্লবের পর লেনিনের নেতৃত্বে গড়ে-ওঠা সোভিয়েত সরকার মস্কোকে গোটা ইউনিয়ন-রাষ্ট্রের রাজধানী করলেন। সোভিয়েত যুগে গৌরবের শিখরে উঠলো মস্কো। এ সময় সূচিত হলো অনেক সংস্কার কাজ, নির্মাণ কাজ, সেচ আর নদী শাসন কর্মকাণ্ড। ২,২৯০ মাইল দীর্ঘ ভল্গা নদীর শাখাগুলোকে যুক্ত করা হলো খাল কেটে। মস্কোর উত্তর-পশ্চিমে আইভানকোভ্ এলাকায় বাঁধ দিয়ে গড়ে তোলা হলো ১২৫ বর্গ মাইল জুড়ে সুবিশাল ভল্গা জলাধার। যার অন্য নাম মস্কো সাগর (Moscow Sea)। ভল্গার শাখা মস্কোভা নদী খনন এবং খাল কেটে ভল্গার এই জলাধারের সংগে যুক্ত করা হলো মস্কো শহরকে। যার ফলে এই নগরীর পাশে বিশাল নদীমুখে গড়ে উঠলো সুনাব্য মস্কো বন্দর। মস্কোর গোড়াপত্তন আর তার প্রসার এবং আধুনিকায়ন নিয়েও আছে অনেক অনবদ্য কবিতা এবং ছড়া। তার একটি বাংলা নমুনা হলো এ রকমঃ

মস্কোভি গ্রাম রুসিদের ভূমি
গড়ে উঠলো আকাশ চুমি।
মস্কোভি গঞ্জ দাবা আর শতরঞ্জ
মস্কো শহর মস্ত এক বন্দর

www.pathagar.com

মস্কো সাগর পানির এক বাওর।
মস্কোভা নদী, ভল্গা নদী
বইছে যুগ-যুগ, নিরবধি॥

ইতিহাসের গহনে ডুবে ছিলাম। হাঁটছিলাম তার অলিগলিতে। দেখছিলাম কে যেন পথে-পথে খুলে রেখেছে দাবার ছক। সেখানে গুঞ্জন তুলছে সেপাই-শান্ত্রী, ঘোড়া-হাতি। নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে আছে প্রজা, রাজা-উজির। সবাই যেন তারা আঁটছে বাজিমাত করবার কৌশল। কলের পুতুল সব। অথচ তুখোড় হাতে ঘুঁটি চেলে নাচিয়ে চলছে তাদের।

কী বিচিত্র ইতিহাসের খেলা! গুহাচারী আদিম মানবকুল নদীর তীরে নেমে এসে হলো ক্ষেত্রজীবী কৃষক। তাদের মধ্যকার বলবন্তরা হলো যোদ্ধা। খেতাব পেলো নাইট অর্থাৎ বীর বাহাদুরের। সেই নাইটরা হলো আবার ডিউক, নবাব। তারপর রাজা-মহারাজা, সুলতান, বাদশাহ এবং জার। তারা গ্রামকে বানালো দুর্গ। তারপর গড়লো শহর, নগর, রাজধানী। কিন্তু সাধারণ মানুষ যে তিমিরে ছিল থেকে গেলো সেই তিমিরেই। খাদ্য-উৎপাদক আদিম কৃষক যুগের পর যুগ কেবল চাষাভুষাই বনে গেলো।

কিন্তু লড়াই এক মুহূর্তও থেমে থাকলো না তাদের। ভূমিদাসের দুর্ভাগ্য কবুল করতে হলেও লাঙ্গলের তীক্ষ্ণ ফলা দিয়ে পায়ের শেকল ভাঙ্গার জন্যে তাদের চোখে জ্বললো আগুনের শিখা। তীরধনুক নিয়ে উৎপীড়ক সামন্ত প্রভুদের বিরুদ্ধে নামলো তারা যুদ্ধে। ইংল্যাণ্ডে মধ্যযুগেই সামন্ত লর্ডরা গ্রাম ছেড়ে পালালো। ম্যাগনাকার্টা তথা মাটির অধিকার আর স্বাধীনতার মহাসনদ ঘোষণা করতে বাধ্য করলো তারা রাজাকে। ফ্রান্সে দুর্ভিক্ষপীড়িত কৃষকদের 'রুটির বদলে কেক খাওয়ার' কথা বলে পরিহাস করেছিল যে-স্বেচ্ছাচারিণী সম্রাজ্ঞী তাকে চুল ধরে প্রাসাদ থেকে টেনে হিঁচড়ে বের করে এনেছিল ক্ষুধার্ত- বিক্ষুব্ধ এবং বিদ্রোহী প্রজারা।

দেখতে-দেখতে গোটা দেশজুড়ে শুরু হলো এক মহাগণবিপ্লব। চূর্ণ বিচূর্ণ হলো জল্লাদের আখড়া ব্যাস্টিল দুর্গ। শূলে চড়তে হলো ফরাসি সম্রাট শেষ লুই এবং তার সেই ভোগবিলাসিনী রানীকে। তাবৎ পশ্চিম ইউরোপ থেকে উচ্ছেদ হলো ভূমিদাস প্রথা। গীত হলো সাম্যের গান।

বাকি থাকলো তখন কেবল জারশাসিত রাশিয়া। সেখানেও ভূমিদাস প্রথা চালু হওয়ার পর থেকে হলো একটার পর একটা কৃষক বিদ্রোহ। দাবার চালের ঘোড়ার মতন ডন-আমুর, উরাল-উসুরি, কুবান-তেরেক নদীপারের আর সাইবেরিয়ার সাহসী কসাক্-কৃষকদের অশ্বারোহী সেনা হিসাবে ব্যবহার করেছিল স্বেচ্ছাচারী জারেরা। তারাও এক সময় বিদ্রোহ করলো।

সতেরোশ' শতকে সংবাদপত্র এবং প্রকাশনা শিল্প চালু হলে পর সাংবাদিক, কবি, ঔপন্যাসিক আর বুদ্ধিজীবীরা গড়ে তুললেন জারশাসন বিরোধী অনেক বৈপ্লবিক সংগঠন। ভূমিদাস প্রথার বিরুদ্ধে কলম শাণিয়ে লিখতে শুরু করলেন তারা। সামন্ত

www.pathagar.com

প্রথা বিরোধী কবিতা, ছড়া, গল্প, উপন্যাস-নাটক এবং প্রবন্ধ ছাপবার অভিযোগে বাজেয়াপ্ত হলো পত্রিকার পর পত্রিকা। নিষিদ্ধ হলো বইপুস্তক। সাংবাদিক -লেখক-কবিদের জেলে পোরা হলো। নির্বাসন দেয়া হতে লাগলো সাইবেরিয়ায়। জার-বিরোধী অভ্যুত্থান ষড়যন্ত্রের অভিযোগে সেন্ট পিটার্সবুর্গ জেলখানায় ফাঁসিতে ঝোলানো হলো লেনিনের বড় ভাই আলেকসান্দারকে। 'হাউস অভ্ ডেড', 'দ্য ইনসালটেড অ্যান্ড দ্য ইনজিওরড্' ('লাঞ্ছিত-বঞ্চিত') উপন্যাসের প্রখ্যাত লেখক এবং টাইম পত্রিকার সম্পাদক দস্তয়েভস্কিকে (১৮২১-৮১) দেয়া হলো মৃত্যুদণ্ড। ফায়ারিং-স্কোয়াডে যাওয়ার আগের মুহূর্তে মৃত্যুদণ্ড রহিত করে সাইবেরিয়ার সেনা শিবিরে

রেডস্কোয়ারে দর্শনার্থীদের ভিড়

যন্ত্রণাদায়ক পীড়ন ভুগবার জন্যে তাঁর ভাগ্যে জুটলো ভয়ংকর নির্বাসন। সোভিয়েত প্রগতিশীল সাহিত্যের পথিকৃৎ ঔপন্যাসিক গোর্কিকে তো জার আমলে জেলেই কাটাতে হলো দীর্ঘকাল। পুলিশের গুলিতে আহত হয়েও বরাত জোরে বেঁচে গিয়েছিলেন পৃথিবীর এই অসাধারণ কথাশিল্পী। রাজরোষে পড়লেও বিশ্বজোড়া জনপ্রিয়তার ভয়ে লেভ তলস্তয় (১৮২৮-১৯১০)কে নির্বাসনে দিতে গিয়েও দেয়া হলো না। তবে ১৯০১ সালে রুশ অর্থোডক্স গির্জার প্রধান পুরুত ঠাকুরের ফতোয়ার সুযোগ নিয়ে ঘোষণা করা হলো তাকে ধর্মদ্রোহী।

'স্মোক্' ('ধোঁয়া'), 'ভার্জিন সয়েল' ('অনাবাদি জমি'), 'রাশিয়ান- লাইফ ইন দা ইন্টেরিয়র' ('রাশিয়ার ভেতরকার জীবন'), ভূমিদাস প্রথা বিরোধী ব্যঙ্গাত্মক উপন্যাস 'এক্সপিরিয়েন্স অভ এ স্পোর্টসম্যান' ('একজন খেলোয়াড়ের অভিজ্ঞতা')

www.pathagar.com

এবং 'ফাদার্স অ্যাণ্ড সনস্' ('পিতৃগণ ও পুত্রগণ')-এর বিশ্বখ্যাত লেখক এবং পিটার্সবুর্গের 'সমকাল' অর্থাৎ 'কনটেমপোরারি' কাগজের সাংবাদিক ইভান তুর্গেনেভ (১৮১৮-৮৬)কে সাজার ভয়ে পালিয়ে যেতে হয়েছিল ইউরোপ।

রাশিয়ার আদিযুগের সাংবাদিক, লণ্ডনের 'স্পেক্‌টেটর' পত্রিকার সমকালীন রুশ ব্যঙ্গ-সাময়িকী 'দ্রোনে' (আত্মপ্রকাশ ঃ ১৭৬৯)-এর সম্পাদক ও প্রকাশক নভিকভ (১৭৪৮-১৮১৮)কেও পড়তে হয়েছিল জার সরকারের রোষানলে। ১৭৭৪ সালে জারিনা দ্বিতীয় ক্যাথারিন ভূমিদাস প্রথা আর আমলাতন্ত্র-সামন্ততন্ত্র বিরোধী বিদ্রূপাত্মক লেখার জন্যে বন্ধ করে দিলেন 'দ্রোনে' কাগজ। জারিনা শংকিত ছিলেন এসব লেখার তীব্র প্রতিক্রিয়ায় ভয়াবহ কৃষক বিদ্রোহ হতে পারে রাশিয়ায়।

তুর্গেনেভ এবং তলস্তয়ের সমসাময়িক প্রগতিশীল রুশ সাংবাদিক, কবি এবং সমালোচক পিটার্সবুর্গের সবচেয়ে জনপ্রিয় অতি উচ্চ মানের সাহিত্য পত্র সমকালে (Contemporary)-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক নিকোলাই নেক্রাসভ (১৮২১-৭৭)কেও শিকার হতে হয়েছিল সরকারি নিষেধাজ্ঞার। একটানা কুড়ি বছর (১৮৪৬-৬৬) বেরুবার পর বাধ্য হলেন তিনি কাগজটি বন্ধ করে দিতে। পিটার্সবুর্গে প্রগতিশীল সাহিত্য সংগঠন 'সমকাল' সংঘের তিনি প্রতিষ্ঠাতা। এই কাগজের লেখক ছিলেন তুর্গেনেভ, তলস্তয়, দস্তয়েভস্কি এবং চেখভসহ সেকালের প্রখ্যাত কবি, সমালোচক, কথাশিল্পী আর নাট্যকারগণ।

'লাল নাকের ব্যাঙ' (Red-nosed Frog) নামের রূপক গীতিকাব্য, 'রুশ নারী' (Russian Women) আর 'কে রাশিয়ায় সুখী' (Who is Happy in Russia) গল্প লিখে প্রখ্যাত হয়েছিলেন এই সাংবাদিক। ভূমিদাস প্রথার যন্ত্রণার চিত্র প্রতিফলিত 'কে রাশিয়ায় সুখী' গ্রন্থে।

রাশিয়ায় প্রথম রাজনৈতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লবের সূচনা ঘটে ১৮৮০ সালে। এর কয়েক বছর পর ১৮৯৮ সালে অবিভক্ত পাঞ্জাবের লাজপত রায়সহ কংগ্রেসের বামপন্থী গ্রুপের নেতৃত্বে শুরু হয় ব্রিটিশ-বিরোধী সশস্ত্র বিপ্লব। লাজপত রায়কে কারাগারে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল অকথ্য নির্যাতন ভোগ করে।

১৮৮০ সাল থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত একটানা আটত্রিশ বছর রাশিয়ায় ধারাবাহিকভাবে জ্বলতে থাকে বিপ্লবের আগুন। বলা বাহুল্য, এই দীর্ঘস্থায়ী বিপ্লবে সক্রিয় অবদান রাখেন সেদেশের প্রগতিবাদী সাংবাদিক, কথাশিল্পী, কবি এবং বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। একটানা জেলজুলুম আর সুদূর সাইবেরিয়ায় কালাপানি-দণ্ড ভুগেও তাঁরা বন্ধ করেননি কলমের খাপখোলা তলোয়ার।

এসব কাহিনী পড়তে পড়তে শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠছিল। মস্কোর বুদ্ধিজীবীদের সাহসের কথা ভেবে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠছিলাম। আর গুন গুন করে গাইছিলাম সেই গানটিঃ 'মস্কোভি, মস্কোভি, ও মাই ডার্লিং মস্কোভি-দ্য স্যাকরেড হোম অ্যান্ড মাদারল্যান্ড অফ রুসি। মস্কো, মস্কো, ও মাই ডিয়ার সিটি-মস্কো-টু ইউ উই স্যালিউট অ্যান্ড টু ইউ উই বাই'।

www.pathagar.com

এ সময় মনে হলো ভল্গা এবং মস্কোভি নদীর বাতাস এসে লাগছে আমার গায়ে। ফের স্মৃতিতে তোলপাড় করে উঠলো রাহুলের 'ভল্গা থেকে গঙ্গা'র কাহিনী। আট হাজার বছরের বিচিত্র সব দৃশ্যপট আঁকা উপন্যাসের চারপাশের মাটিতে। পশ্চিম-দক্ষিণ বাহিনী ভল্গার তীরে উত্তোলিত হলো তার গল্পের প্রাচীন ইতিহাসের পর্দা। অরণ্য পর্বত আর তুষারের শ্যামকৃষ্ণ এবং ধূসর ছায়ায় ভল্গা তটে ইন্দোস্লাভ-রুশ জনগোষ্ঠী চারদিক থেকে এসে বসত গড়ে তুললো। শুরু করলো গোচারণ, তারপর চাষবাস। নানান আঞ্চলিক শব্দের সমন্বয়ে বিন্যস্ত হলো তাদের ভাষা।

এক বিচিত্র বোলচাল নিয়ে ভল্গা থেকে একটার পর একটা জলতরঙ্গ অতিক্রম করলো মধ্য এশিয়া। এলো তারা হিমালয়ের ওদিককার পামির মালভূমি এলাকায়। তারপর উত্তর কুরু এবং আরিয়ানায়। এখানেই ভূমিষ্ঠ হলো ইন্দো-পারসিক-পহ্লভ ভাষা।

এলো তারা উত্তর-ইরাক এবং দক্ষিণের শাতিল আরব উপত্যকায়। এই মিলিত জনস্রোত বসত তুললো প্রাচীন গান্ধার ভূমি অর্থাৎ একালের আফগান ভূমির হিন্দুকুশ উপত্যকায়।

রাহুল এবং ভাষাবেত্তাদের মতে এই গান্ধারেই জন্ম ইন্দো-বৈদিক ভাষা-পরিবারের। প্রাচ্যবেত্তাদের অনেকের ধারণা, গান্ধারেই রচিত হয়েছিল আর্যদের আদি ধর্মীয় শ্লোকগ্রন্থ 'ঋক্‌বেদ'। পরে সিন্ধুতটের মহেনজোদারো হয়ে এলো তারা আধুনিক দিল্লী সংলগ্ন হস্তিনাপুরে। সেখান থেকে এলো বাংলার গাঙ্গেয় উপত্যকায়।

সংস্কৃত ভাষার অপ ভ্রংশ পালি, প্রাকৃত, পুবাল-প্রাকৃত এবং অস্ট্রিক বুলি সংমিশ্রিত হয়ে চর্যাপদ যুগে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র আর যমুনা তটে জন্ম হলো বাংলা ভাষার।

ভল্গাতীরে ইন্দো-স্লাভ-ইউরোপীয় শব্দাবলীর পল্লবায়ন ঘটেছে বলে প্রচুর ইন্দো-পারসিক-সংস্কৃত এবং বাংলা শব্দের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় রুশ ভাষায়। যেমন রুশরা খাঁটি বাংলা আগুন শব্দটিকে বলে আগন'। প্রিয়-কে বলে 'প্রিয়াতেল'। বিদায়-কে বলে 'বিদানিয়া'। রুশ অভিধান খুঁজলে পাওয়া যাবে এরকম অসংখ্য শব্দ। দুই ভাষার এই ঘনিষ্ঠতা দেখে অভিভূত না-হয়ে পারিনি। মনে মনে ভেবে দেখলাম, ভল্গা-ডন-মস্কোভা নদীর সলিলরাশি-ধোয়া এই বিশাল দেশে না-এলে কত কিছুই না অজানা থেকে যেতো। মনে হলো রবীন্দ্র কবিতার সেই অমর পংক্তিটি, 'দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া'। এখন ভাবলাম, কিছু-কিছু তো এবার দেখলাম চোখ মেলে রেখে। দেখলাম বিচিত্র-বর্ণাঢ্য-লীলাময় অনেক কিছু।

আসলে সরেজমিনে না-দেখলে শুধু পুঁথি পড়ে কিছুই দেখা হয় না। আবার 'বার্ডস-আই ভিউ' দিয়ে ভাসা-ভাসা দেখলেও চলে না। দেখতে হয় গভীরে চোখ মেলে। কথা বলতে হয় আনা মাসলোভার মতন প্রবীণা, মারিয়া এবং তানিয়ার মতন যুবতী মেয়ের সঙ্গে আর প্রাণ খুলে দিয়ে মিশতে হয় পাবলভ, ইয়াকভ, সুলতানভ এবং দিমিত্রির মতন তরুণদের সঙ্গে। ক্যামেরার মতন চোখে ধারণ করে

www.pathagar.com

রাখতে হয় পর্বত-অরণ্য-উপত্যকা, সাগর-নদী, তৃণভূমি- ক্ষেতখামার, গ্রাম-শহরের দৃশপটের হাজারো উজ্জ্বল-মলিন -বর্ণিল ছবি।

কাচের জানালায় রোদের আঁচে চোখে ঘুম আসছিল না। হঠাৎ রুমের দরজায় করাঘাতের শব্দ বেজে উঠলো ধাতব চিৎকারে। দরজা খুলে ধরতেই মুখদর্শন করলাম আনা এবং পাবলভের। আনা হন্তদন্ত হয়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেনঃ নাইন, নাইন। দি-নার, দি-নার। অর্থাৎ ঘড়িতে এখন নয়টা বাজে। ডিনারের সময় হয়েছে তোমার।

আনার ভাঙা-ভাঙা ইংরেজি শব্দ এবং উচ্চারণ শুনে মিষ্টি করে হাসলো পাবলভ। বললোঃ সময় উৎরে যাচ্ছে যে। আমরা সবাই নিচের রেস্তোরাঁয় ডাইনিং টেবিলে উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছি তোমার জন্যে। চটজলদি কাপড়-চোপড় বদলে নাও।

শেষে যোগ করলোঃ কাল সকাল আটটায় বেরুতে হবে ক্রেমলিন, রেডস্কোয়ার এবং পাতাল রেল দেখতে। সন্ধ্যায় যেতে হবে মস্কো রেল স্টেশনে। কাটা হয়ে গেছে লেনিনগ্রাদের টিকিট।

বেরুতে বেরুতে আমার চোখে ভাসলো পুশকিন, দস্তয়েভস্কি, তুর্গেনেভ, তলস্তয় এবং চেখভের ছবি। কারণ একসময় তারা বাস করতেন আধুনিক লেনিনগ্রাদ এবং সেকালের সেন্ট পিটার্সবুর্গে।

পরের দিন ভোরবেলা। জানালার শার্সিতে সূর্যের স্বর্ণাভ রশ্মি। সারারাত ছিলাম তন্দ্রার ঘোরে। কী সব বর্ণিল ছবি দেখছিলাম আচ্ছন্নতার ভেতর। বাইরের দরজায় বেল বাজিয়ে ছন্দপতন ঘটালেন আনা মাসলোভা। পাখির মতন বেলের সুরেলা গুঞ্জনে সঙ্গীতময় হয়ে উঠলো নৈঃশব্দে ভরা রুমটা।

ধড়ফড়িয়ে বিছানায় উঠে বসলাম। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি সাতটা বেজে তিরিশ মিনিট। খুলে দিলাম বন্ধ কপাট। মুখোমুখি হতেই হাত তুলে সুপ্রভাত জানালেন আনা। বললেনঃ গুড-মর্নিং। মুখমণ্ডল জুড়ে ওর মিষ্টি রোদেলা হাসি। প্রতিউত্তরে ওঁকেও স্বাগত জানালাম। ভেতরে ঢুকে সপ্রশ্ন চোখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ গুড স্লিপ?

দুই চোখ জবা ফুলের মতন লাল দেখে যেন আকাশ থেকে পড়লেন। দৃষ্টি কপালে তুলে বিস্ময় প্রকাশ করলেনঃ ও, নো-স্লিপ! রুশ ভাষায় কী যেন বললেন। আমার আচ্ছন্ন ঢুলু-ঢুলু চোখ বেদনাহত করলো বৃদ্ধাকে। বুঝলাম আমার ঘুম না-হওয়ায় আর সব মায়ের মতন কাতর হয়েছেন তিনি। জিভ কেটে বললেনঃ নিয়েত, নিয়েত! নো স্লিপ!

হাতের তিন আঙুল তুলে ইশারায় জানালেনঃ নো সরি। অর্থাৎ দুঃখ পেয়ো না। দু-তিন দিন বাদেই ঘুম হবে। আরও কিছু রুশ শব্দ বিড়বিড় করে উচ্চারণ করলেন। আমার মনে হলো বুড়ি যেন বলতে চাইছেন- নতুন জায়গা তো। তাই প্রথম প্রথম যারা এখানে আসে তাদের এ রকমই হয়। ভালো ঘুম হবে রাত কয়েক পার হলে পরে। পরক্ষণেই নিজের হাত ঘড়ি দেখলেন। শশব্যস্ত হয়ে বললেনঃ নাউ, রেডি। বাথরুমের দিকে ইশারা করে হুকুম দিলেনঃ গো, হ্যাভ্ বাথ্। ফ্রেস্-আপ্।

www.pathagar.com

স্নানাগারের দিকে পা বাড়াতেই বললেনঃ ওয়ান্ট বেড্-টি?

ঃ ইয়েস। মাথা নাড়লাম

ঃ গুড্ গুড্। হেসে বললেন আনা।

দেখলাম ঝটপট ছুটে গিয়ে সামোভারটা তুলে নিলেন তিনি। চায়ের পানি চড়ালেন রুমের এক কোণের পর্দা ঘেরা ইলেকট্রিক চুলোটায়। গোসল সেরে বেশবাস বদলে বেরুতেই দেখি বেড-টেবিলে ধোঁয়া উঠছে নকশিদার পিরিচে রাখা চায়ের পেয়ালায়। আনা বললেনঃ হট-টি। ড্রিংক। অর্থাৎ গরম চা। পান করে নাও।

এরপর নিজের চোখে-মুখে-মাথায় হাত বুলিয়ে হেসে আবার কিছু রুশ বাক্য উচ্চারণ করলেন। মনে মনে আমি তার মানে করলামঃ ভোরে গরম চা খেলে ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে। চাঙ্গা হয়ে উঠবে তোমার শরীর।

একখানা কুশন-চেয়ার টেনে আনলেন তিনি বেড-টেবিলের পাশে। ইশারায় জানালেন-যেন আমি আরাম করে বসে চায়ের পর্বটা সেরে নিই। সত্যি বলতে কী চায়ের পেয়ালায় কয়েকটা চুমুক দিতেই বেশ সুস্থ বোধ করলাম। কেটে গেলো শরীরের আড়ষ্ঠতা। আনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললামঃ ইওর ব্ল্যাক্টি ইজ ভেরি গুড। আনা যাতে বুঝতে পারে তাই ক্রিয়াপদ যোগ না করেই বললামঃ ইওর হ্যান্ড সুইট, টি সুইটি। অর্থাৎ তোমার চা তৈরির হাত যেমন মিষ্ট তেমনি তোমার চা-ও সুস্বাদু।

আন্তন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ক্রবেলের আঁকা আন্না কারেনিনা

বুঝতে পেরে পরম কৃতার্থ হয়ে একগাল মিষ্টি হাসি উপহার দিলেন আমায় প্রৌঢ়া রুম-হোস্টেজ।

আধখানা চা পেয়ালায় থাকতেই বেজে উঠলো টেলিফোন। পাবলভের ঘুম-ঘুম গলার স্বর। রিসিভার তুলে হ্যালো বলতেই ওপাশ থেকে পাবলভ বললোঃ গুডমর্নিং, মিস্টার নূরী। নিশ্চয়ই ভালো ঘুম হয়েছে তোমার? প্রতিউত্তরে সুপ্রভাত জানিয়ে বললামঃ ভালো বলতে ভালো! ভারী চমৎকার ঘুম। ভেরি একসিলেন্ট! তবে সারারাত দু-চোখ এক করতে পারিনি এই যা। গোল্ডেন টাওয়ারের স্বপ্ন দেখছিলাম

www.pathagar.com

তন্দ্রার ঘোরে। ঘুমটা ঝুলেছিল সেই সোনালি চূড়ায়। গলা চড়িয়ে হাসলো পাবলভ। বললোঃ তবু তো তুমি সোনালি চূড়ায় ডানা মেলে দিয়ে বিচরণ করেছো। তোমার মনের বসত কল্পলোকে। তাই ঘুম না হলেও এত স্বপ্ন দেখেছো। কিন্তু আমি তো নিরেট এক গদ্যের লোক। তার জন্যেই স্বপ্ন-টপ্ন আমার চোখের পাতার পাশ ঘেঁষতে চায় না।

জিজ্ঞেস করলামঃ আসল কথা বলো। বার-বার হাই-ওঠা দেখে মনে হচ্ছে তুমিও নির্ঘুম ছিলে। সত্যি কিনা?

পাবলভ বললোঃ এত ঝক্কি-ঝামেলা পোহালে ঘুম আসে কার চোখে? তবে শেষ রাতে ঘন্টা দুয়েক ঘুমিয়েছি। বাথ-টাবে উষ্ণ স্নান করলেই সব সেরে যাবে। একেবারে প্রাণবন্ত হয়ে উঠবো। তাছাড়া আজ সকাল সাড়ে আটটা থেকেই তো প্রোগ্রাম। বিকেল পাঁচটার মধ্যেই সেরে ফেলতে হবে। জানোই তো তোমাদের সব ভাবনাই আমার ঘাড়ে। সুতরাং ঘুম আসতে চাইলেও কেমন করে আসবে?

হেসে বললামঃ ইউ আর এ গ্রিন-ইয়ং ম্যান। এক মাস না ঘুমালেও চলবে তোমার। কিন্তু আমি তো বুড়োদের মিছিলে আছি। আমাদের বন্ধু তোহা খানও। বয়স্কদের কথা তাই আলাদা। তাছাড়া নতুন পরিবেশে তো অভ্যস্ত হয়নি এখনও।

পাবলভ হেসে বললোঃ উর্বশী মস্কোর রূপ দেখলে দু-দিনেই এই পরিবেশে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। এর ওপর রয়েছে আবার মনোলোভা উদ্যান-নগরী লেনিনগ্রাদ। একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়বে তখন। আর তার সম্মোহনে যাদুর কাঠির ছোঁয়া পড়বে চোখে। আপনা থেকেই তখন স্লিপিং বিউটি এসে ঝুলতে থাকবে তোমার ভুরুর তলায়। প্রবীণ হলেও নবীনের লাবণ্যময় জৌলুসে ভরে যাবে তোমার তনুমন। ঘুম-পাড়ানো পরীর গান শুনে তখন ঢুলে পড়বে তুমি শিশুর দোলনার মতন তুলতুলে বিছানায়।

রিসিভারটি কানের কাছে আরও ঘনিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলামঃ এই ভোরবেলা কার মুখ দেখে উঠলে তুমি পাবলভ? নিশ্চয় কোনো অলকানন্দার! নইলে অমন রোমান্টিক কাব্যিকতা ঝরতো না তোমার গলায়।

হো-হো করে হাসলো পাবলভ। টেলিফোনে পিয়ানোর মতন বাজলো তার কণ্ঠস্বর। মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড, সারাদিন তো গদ্যের মধ্যে ডুবে থাকতে হবে। তাছাড়া ডিপ্লোম্যাটের কাজটাও তো ভারি বিদঘুটে। একেবারে নির্জলা গদ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যের ছাত্র ছিলাম। সুযোগ পেলে তাই একটু রসটস করি। কবিতার দু-চারটা লাইন আওড়াই। ভোরবেলাটা বেশ শান্ত, নীরব। তাই এ সময়টায় আপন মনে গুন গুন করতে ইচ্ছা করে।

বললামঃ আমিও তো এক কাঠখোট্টা সাংবাদিক। কবিতার অনুরাগী হলেও তার নদীতে সাঁতার কাটবার সময় কোথায়?

পাবলভের কথা শেষ হতে চায় না। কিসে যেন আজ পেয়ে বসেছে ত্রিশের এই যুবককে। অবাক না হয়ে পারলাম না। ওদিক থেকে সে বললোঃ ভাগ্যিস তোমায়

www.pathagar.com

পেয়ে গেলাম ফোনে। তাই খোশগল্প করলাম একটু। এবার কাজের কথা। আচ্ছা তুমি কী তৈরি হচ্ছো? ওকে বিস্মিত করে দিয়ে বললামঃ সেই কখন থেকে বাথরুমের ক্রিয়াকর্ম সেরে গোছগাছ হয়ে বসে আছি। এখন মাসলোভার হাতের সুস্বাদু চায়ে প্রাণ জুড়াচ্ছি। ওঁর মতন ওল্ড বাট অ্যাকটিভ রুম-হোস্টেস থাকতে আলসেমির জো থাকে বলো। তাছাড়া ইনি একজন খাঁটি মাদারলি লেডি। যাদের তোমরা বলো মামন। আমরা বলি মা। দ্যাখো, এখানেও কত মিল রুশ ভাষার সঙ্গে আমাদের বাংলার। মনে হলো আমার কথায় গর্বিত হয়েছিল তরুণ কূটনীতিকটি। ফোনে আনন্দের একটা গুঞ্জন তুলে বললোঃ ধীরে, বন্ধু, ধীরে। কেবলই তো চব্বিশ ঘন্টা হলো এদেশের মাটিতে আছো। আরও দিন কয়েক পার হোক। তখন বুঝতে পারবে কেমন ধারা লোক এদেশের মানুষেরা। বিশেষ করে মহিলারা।

আরও আবেগে পেয়ে বসলো ওকে। টুং করে নাড়া দিতেই ওর মনের সেতারটা ওস্তাদ আলাউদ্দিন খানের হাতের যাদুর ছোঁয়ার মতন ঝংকার দিয়ে উঠলো আবার স্বরে ওর কবিতার কলগুঞ্জন। বললোঃ জানি, আমাদের সাহিত্য নিয়ে প্রচুর ঘাঁটাঘাঁটি করেছো তুমি। দ্যাখোনি আগুনে পুড়তে-পুড়তে কেমন সোনা হয়ে উঠেছিলেন গোর্কির 'মাদার' উপন্যাসের নিলভনা? তলস্তয়-এর 'ওয়ার অ্যান্ড পীস' উপন্যাসের যুদ্ধবিরোধী সহজ-সরল অথচ দৃঢ়চেতা মানুষগুলোর কথা নিশ্চয় মনে দাগ কেটে আছে তোমার। আর 'আন্না কারেনিনা'র কিটি অর্থাৎ কাডিয়ার কথা? বড় ঘরের মেয়ে হয়েও কেমন এক নির্মল চরিত্রের সেবাগত প্রাণ, সাংসারিক মেয়ে ছিল সে?....

মাঝখানে ওকে থামিয়ে দিয়ে বললামঃ তোমাদের শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী চেখভের গল্পের চরিত্রগুলোর কথা বলো। সেই যে 'লেট ব্লসমস্' গল্পের মারুসার কথা, ভূমিদাস পরিবারের ছেলে এপ্রকভ, তার মামা খানসামা নিকিফর আর প্রিফ্‌লোনস্কি বংশের ভাগ্য বিড়ম্বিতা রাজমাতা আর তার মদ্যপ ছেলে প্রিন্স ইগরের কথা।

আশ্চর্য হয়ে পাবলভ বললোঃ এত খুঁটিনাটি মনে আছে তোমার, ডিয়ার ফ্রেণ্ড? স্মৃতি তো বেশ চাঙ্গা তোমার!

ঃ চেখভের গল্প দু-একবার পড়লেই মনে দাগ কেটে থাকে। বললাম ওকে। কারণ উনি ছিলেন একজন ডাক্তার আবার পাশাপাশি সমাজ সংস্কারক, খাঁটি একজন দেশপ্রেমিকও। তাঁর ছোটগল্প এবং নাটকের মালমসলা যুগিয়েছে সাধারণ মানুষেরা। ওপরকার স্তরের অভিজাত শ্রেণীর লোকজনের পাশাপাশি নিরক্ষর কৃষক, কুলিকামিন আর ভূমিদাসদেরও রোগ নিরাময়ের মানবিক দায়িত্ব পালন করেছেন এই মহান চিকিৎসক এবং সাহিত্যিক। কী ঠিক বলেছি কিনা?

ঃ দেখছি তুমি অবাক করে দিলে আমায়-ওদিক থেকে টেলিফোনে বেজে উঠলো পাবলভের গলা। মনে হয় চেখভকে নিয়ে অনেক গবেষণা করেছো?

ঃ সাধে কী করেছি? গোর্কির লেখা পড়তে গিয়ে দেখলাম ওঁদের দু-জনের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। প্রায়শ গোর্কি যেতেন চেখভের গ্রামের বাড়ি। কথাসাহিত্য, নাটক, উপন্যাস আর রুশ সমাজ জীবনের দুর্গতি নিয়ে আলোচনা করতেন ঘন্টার পর ঘন্টা

www.pathagar.com

ধরে। গোর্কির প্রতিভার অনুরাগী ছিলেন চেখভ। বয়সে বছর আটেকের বয়োকনিষ্ঠ হলেও গোর্কিকে বুড়ো বলে ঠাট্টা করতেন এই অগ্রজ সাহিত্যিক। আন্তন চেখভের বাড়ি ছিল মস্কোর মাইল কয়েক দূরে কুচুক-কয় গ্রামে। ঠিক বলেছি কিনা?

ঃ তুমি সাহিত্য এবং ইতিহাসের অন্বেষক। সুতরাং ঠিক না হয়ে যায়?

ঃ অন্বেষক নই ভাই ছাত্র মাত্র। নিউটনের ভাষায় মহাসাগরের তীরে বসে কেবল নুড়ি কুড়িয়ে চলছি। সোনা খুঁজতে গিয়ে শুধু বালুকণাই পেলাম।

ঃ বালুকণাতেই সোনা থাকে বন্ধু। আর ছাত্ররাই তো হলো 'সিকার্স অভ্ নলেজ'। আর যারা জ্ঞানের পথে যায় তারাই আবিস্কার করে ট্রথ্। সক্রেটিসের বুলি কপচালাম বলে মনে কিছু করো না। নম্রকণ্ঠে বললো পাবলভ।

ঃ আরে সক্রেটিসের কথা বলছো কেন লেভ্ তলস্তয় এবং আন্তন চেখভও তো এই সত্যে বিশ্বাসী ছিলেন। নিশ্চয় মনে আছে তোমার চেখভও তো এই সত্যে বিশ্বাসী ছিলেন। নিশ্চয় মনে আছে তোমার চেখভের মৃত্যুর ওপর গোর্কির লেখা সেই বিখ্যাত অবিচ্যুয়ারিটির কথা। যেখানে তিনি ওর স্মৃতিচারণ করেছিলেন।

ঃ ভাসা-ভাসা মনে আছে। সংক্ষেপে বলে স্মৃতিটাকে আমার ঝালিয়ে দাও তো দেখি। দশ মিনিট তো হলো কেবল প্যান-প্যান করে গেলাম। তুমি তো আবার ফিটফাট হয়ে আছো। আমাকে তৈরি হতে হবে পরেকার প্রোগ্রাম ধরবার জন্য।

ঃ শোনো তাহলে, বললাম আমি। গোর্কি লিখেছেনঃ আন্তন পাবলোভিচের সামনে গেলে প্রতিটি মানুষের অবচেতন মনে আরও সহজ সরল হবার, সত্যসন্ধ হবার একটা প্রবল ইচ্ছা জাগে। তাঁর সান্নিধ্যে যাবার এ রকম সুযোগ বহুবার ঘটেছে আমার জীবনে। তিনি প্রায় পুরোটা জীবনই আত্মিকজীবন যাপন করেছেন। ভালোবাসতেন যা কিছু সরল, সহজ, মার্জিত আর আন্তরিক। বড় বড় বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতেন না তিনি। অথচ রুশদের বেশির ভাগই গালভরা বুলিতে মজা পায়। যাদের কপালে একজোড়া পায়জামাও জোটে না তারা জেল্লাদার মখমলের পোশাক গায়ে চড়াবার কল্পনায় মেতে থাকে।

আরও লিখেছেন গোর্কিঃ আন্তন চেখভ স্বয়ং ছিলেন আপদমস্তক সরলতার প্রতীক। অন্যকেও সরল করে তুলবার মতন অসাধারণ, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ছিল তাঁর। হীনতা, নীচতাকে ঘৃণা করতেন তিনি। তাঁর সমস্ত হাসির গল্পের চরিত্রে ধ্বনিত হয় নিষ্কলুষ, যন্ত্রণাকাতর মানব হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাস। শক্তিমান, উদ্ধত মানুষের হাতে লাঞ্ছিত হবার ভয় ছাড়া আর কোনো অনুভূতি নেই যাদের এরা হলো সেইসব চরিত্র। তাঁর সব বই পড়লেই মনে হয়।

লেখকের মনটা হৈমন্তিক সূর্যকিরণের মতোই ঝকঝকে। যা আলোকিত করে তোলে পায়ের তলার ভিজে স্যাঁতস্যাঁতে সড়ক, আকাবাঁকা পথ, নোংরা ভাঙাচোরা সব ঘরবাড়ি। যেখানে বাস করে ছোট লোকের দল। যেখানে নেংটি ইদুরের মতন ভয়ার্ত হয়ে থাকে সুডৌল চেহারার কোনো লাবণ্যময়ী নারী। ক্রীতদাসীর মতন অহোরাত্র যাকে খাটতে হয়। আর হাজার নির্দয়তার মধ্যেও যে নারী প্রাণ দিয়ে

www.pathagar.com

ভালোবাসে এবং সেবা করে তার রুক্ষ-মেহনতি স্বামীকে।

স্মৃতিচারণমূলক লেখাটির অন্যত্র গোর্কি বলেনঃ চেখভ জীবনের নিকৃষ্ট সময়ের বর্ণনা দিতেন কবির ভাষায়। অথচ তাঁর গল্পের বাইরের আবরণের তলায় ঝলসে ওঠে এক তীব্র, তীক্ষ্ম তীব্র বিদ্রূপ। তিনি গ্রামের রুগ্ন শিক্ষকদের জন্য একটি স্বাস্থ্য সদন তৈরির ছক আঁকেন। যে বাড়িটায় খেলবে আলো বাতাস যেখানে থাকবে একটি গ্রন্থাগার, সবজির বাগিচা, ফলের বাগান। যে স্বাস্থ্য নিবাসের হলঘরে থাকবে কৃষিবিজ্ঞান আর ঋতুচক্র এবং আবহাওয়া তত্ত্ববিষয়ক বক্তৃতা দেয়ার ব্যবস্থা। কারণ গ্রামের শিক্ষকদের সবকিছু জানা দরকার। গোর্কিকে লক্ষ্য করে বলতেনঃ হে বুড়ো, ওদের সবকিছুই জানতে হবে। হ্যাঁ, আমার কথায় বিরক্ত না হলে শোনো। রাশিয়ার গ্রামাঞ্চলে আজ সবচেয়ে বেশি দরকার সৎ, উদ্যমী আর প্রশিক্ষিত শিক্ষকের। এর জন্য চাই স্বচ্ছন্দ, নির্মল পরিবেশ। সাধারণ মানুষ সার্বিক শিক্ষা না পেলে রাষ্ট্র টেকে না। ওটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে আধপোড়া ইটের বাড়ির মতন। চাষীদের এতটা জ্ঞানের আলো দিতে হবে যাতে তারা আপন পায়ে দাঁড়াতে শেখে। শেখে জঠরজ্বালা থেকে বাঁচতে। বুঝলে হে ম্যাকিওমিভিচ্, গ্রাম- সমাজের হাল ধরতে হবে শিক্ষকদের। তাদেরই হতে হবে কৃষকের বন্ধু এবং পথপ্রদর্শক। এক সময় আবেগে দুই হাত বাড়িয়ে ধরতেন গোর্কির সামনে। কাতর গলায় বলতেনঃ দেখো হে বঞ্চিত-দুর্গতজনের লেখক, কী হতভাগ্য আমাদের দেশটা! জ্ঞান নেই, বিবেক নেই, আছে কেবল ঠুনকো আভিজাত্য। কেমন করে গরিবকে মারা যায়- আছে কেবল সেই দুরভিসন্ধি। লোম-ওঠা কুকুরের মতন গায়ের সমস্ত চাকচিক্য উঠে গেছে তবু আছে সাবেক জমিদারী চালের বাহার। থালাবাটি বেচে দাও, নায়েব গোমস্তার কাছে হাত পাতো তারপরও বাহাদুরি ফলাও আমি রাজবংশের লোক। চুলায় হাঁড়ি চড়ে না তারপরও ধার করে ভদকা টানো। ঘি মাখাও ঠোঁটে, সেন্ট দাও গায়ের ছেড়াখোঁড়া সিল্কের জামায়।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে এক সময় বলতেন চেখভঃ আহা, কী কদর্য কুশ্রী অসুখী আমাদের এই রুশ দেশটা!

স্মৃতিচারণের এক পর্যায়ে গোর্কি অভিভূত হয়ে লিখলেনঃ কথা বলতে বলতে আমার হাত দুটি ধরতেন আন্তন। বলতেনঃ একটি কাগজের এক বিশেষ নিবন্ধে তোমার ওপর আলোচনা করেছি আমি। বলেছি তোমার হাতেই রুশ সাহিত্যের ভবিষ্যৎ। সাধারণ মানুষও চেয়ে আছে তোমার পানে। এখন আমার ঘরে এক কাপ চা খাও। এতক্ষণ এই বুড়োটার বকাবাদ্য শুনেছো, তার জন্য এই সামান্য আপ্যায়ন।

মৃত্যুর পর এই মহান শিল্পীর প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে তার জন্য দুঃখের অন্ত ছিল না গোর্কির। চেখভের লাশ বয়ে আনা হলো শামুক বোঝাই একটি নোংরা ট্রাকে। যে মস্কোবাসীরা তাঁর ব্যাঙ্গাত্মক এবং হাসির গল্প পড়ে আনন্দ পেতো, বলতে গেলে তাদের অগোচরেই সমাধিস্থ হলেন তিনি। নির্জনে থাকলেন এই শহরের একপ্রান্তে। সেটা ছিল ১৯০৪ সাল। রুশ-জাপান যুদ্ধে নাকাল হলো জারের সেনাবাহিনী। মাঞ্চুরিয়ার

www.pathagar.com

রণাঙ্গনে নিহত এক জেনারেলের লাশ একই সময় কবরস্থ করা হলো ঘটা করে। সৈনিকরা শোকসঙ্গীত গাইলো সেনাপতির মৃতদেহ কবরে নামানোর সময়। অসংখ্য পদকধারী অনুগমন করলো লোকটির শবাধার। আর চেখভ?

আন্তন চেখভের কথায় ফিরে আসছি আবার। নতুন প্রজন্মের রুশদের কাছে ঈর্ষাযোগ্য তার জনপ্রিয়তা। সমকালেও কম প্রশস্তি কুড়াননি তিনি। রুশ মধ্যবিত্ত শ্রেণী, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় আর গ্রাম্য শিক্ষিতরা তাকে মনে করতেন বিবেকের কণ্ঠস্বর। আপন বিশ্বাস এবং নৈতিকতাবোধকে তিনি কোনোরকম ক্ষুদ্রতার কাছে কখনও নতজানু হতে দেননি। সমাজের চেকনাই-চর্বিওয়ালা নীলরক্তের লোকেরা তার গল্প পড়ে ক্ষোভে ফেটে পড়তো। কিন্তু তার ভাষার যাদু তাদেরও সম্মোহিত করতো। যাদের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রূপের বাণ বর্ষণ করতেন তারাও কৌতুকবোধ করতো তার সূক্ষ্ম-রসিকতায়। তার বাড়িতে আনাগোনা হতো নানান জাতের লোকের। ভূমিদাস, শ্রমিক-মজদুর, গ্রামের হতদরিদ্র শিক্ষক, উকিল-আমলা থেকে শুরু করে জমিদার বাড়ির কর্তা-কর্ত্রী পর্যন্ত প্রায় সবাই। অনেক সময় আসতেন ধর্মযাজকেরা। একজন নিরক্ষর কৃষকও যাতে তার কথা বুঝতে পারে, অমন এক আশ্চর্য দক্ষতায় বাঁকাচোরা বাক্যে না গিয়ে অতি সহজ ভাষায় আপন অনুভূতি ব্যক্ত করতে পারতেন।

বুদ্ধিজীবীরা তাদের জ্ঞানের বহর দেখিয়ে বড় বড় তত্ত্বকথা বলতে এবং শুনতে আসতো আন্তন চেখভের কাছে। কিন্তু তিনি তার ধার দিয়েও যেতেন না। অপার আন্তরিকতায় লোকের জটিল সমস্যাগুলো এমন জলবৎ তরলং ভাষায় খোলাসা করে বুঝিয়ে দিতেন যাতে তারা তুষ্ট হয়ে ফিরতো তার বাড়ি থেকে। সবাইকে তিনি একটি কথাই বলতেনঃ সরল হও। কাউকে ঠকিয়ো না।' সহজ কথা বলতে আমায় কহ যে, সহজ কথা বলা যায় না সহজে'-কবির এই কঠিন উপলব্ধি স্বচ্ছন্দে উত্তরে উঠতে পেরেছিলেন লীলাময় প্রকৃতি এবং বিচিত্র জীবন নাট্যের রূপকার আন্তন পাভলোভিচ চেখভ। তার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় লোকেরা চিন্তার কিছু বাড়তি খোরাক নিয়ে যেতো। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতোঃ হ্যাঁ, ঠিক কথাই বলেছেন তিনি।

১৮৬০ সালে ভূমিষ্ঠ হওয়া এই মানুষটি বেঁচেছিলেন মাত্র চুয়াল্লিশ বছর। পরমায়ুর এই ক্ষুদ্র সীমানায় বাঁধা পড়েও জয় করেছিলেন তিনি বিশ্ব। ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়নকালে রুশ সমাজ জীবনের ছোট ছোট রেখাচিত্র ভাষায় রূপায়ণের মধ্য দিয়ে তার প্রথম পদচারণা সাহিত্যে। এর সবই ছিল স্কেচ কিন্তু বর্ণচ্ছটায় উজ্জ্বল। পিটার্সবুর্গের দৈনিক কাগজ 'নিউ টাইমস'- এ প্রকাশিত 'মৃতের ভোজসভা' (ম্যাস ফর দ্য ডেড্) শিরোনামের গল্পটি-বেরুবার পরপরই কথাশিল্পী হিসাবে সুখ্যাত হলেন তিনি রুশ সাহিত্যে। এটি ১৮৮৬ সালের ঘটনা। বয়স তখন তার ছাব্বিশ।

অল্পসময়ের মধ্যেই অজস্রতায় ভরে ওঠে তার প্রকাশিত ছোট গল্পের বিশাল ভাণ্ডার। রাজনীতির ওপর সরাসরি আলোকপাত না করলেও সেকালের অস্থির, অবক্ষয়িত এবং হতাশাজর্জরিত রুশ সমাজের অনুপুংখ চিত্র উঠে এসেছে তার প্রায়

www.pathagar.com

সব ছোটগল্পে। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত পরিবারের লোকদেখানো বিবর্ণ ঠাট-ঠমক তার কলমের খোঁচায় হয়েছে রক্তাক্ত। আবার সাধারণ মানুষের দুঃখের বিষ পান করেছেন তিনি নীলকণ্ঠ হয়ে। শোষিত মানুষের সরলতা এবং সততা গৌরবের মহিমা পেয়েছে তার ভাষায় এবং কথকতায়। এর প্রতিটি বাক্যে আছে বাস্তবের করুণ, নিষ্ঠুর এবং মহৎ প্রতিচ্ছবি।

সুতরাং রাজনীতির প্রত্যক্ষ সংঘাতের কথা না থাকলেও অন্তরালে অপরাজনীতির কুৎসিত দানবীয় মূর্তি মুখ ব্যাদান করে আছে তার অনেক গল্পেই। এই অর্থে তিনি ছিলেন একজন প্রতিবাদী সমাজ সচেতন লেখক। এর জন্যেই জার স্বৈরতন্ত্রের বিরাগভাজন হতে হয়েছিল তাকে। কিন্তু যিনি সাধারণ মানুষের ক্ষোভ, বঞ্চনা আর সীমাহীন যন্ত্রণার ভাষ্যকার তিনি কেন মুষ্টিমেয় দুর্জনের অবজ্ঞার তোয়াক্কা করবেন? তার আসন তো জনগণের হৃদয়ে। চেখভের মৃত্যুর মাত্র চৌদ্দ বছরের ব্যবধানে লাঞ্ছিত-বঞ্চিতদের ক্রোধের দাবানলে ছারখার হয়ে গিয়েছিল মনুষ্যত্বের অবমাননাকারী উৎপীড়কের দল। তার অপমানের শোধ নিয়েছিল জারের সেনাবাহিনীর চেয়েও শতগুণে শক্তিমান তার অনুগামীরা।

তাছাড়া অসাধারণ প্রতিভাধর কথাশিল্পী হিসাবে দুনিয়াজোড়া অগণন মানুষের ভালোবাসা পেয়েছেন চেখভ। তাদের এই ভালোবাসার মধ্যেই জীবন্ত হয়ে আছেন তিনি। আসলে মৃত্যু তাকে স্পর্শও করতে পারেনি। যিনি তার সৃষ্টির মধ্যে বেঁচে

রাশিয়ার নিসর্গ চেখভের অনেক ছোট গল্পের উপাদান

থাকেন তিনি তো অজর, অমর, অক্ষয়।

চেখভ হলেন সেই বিরল প্রতিভাধরদের একজন যারা আবির্ভাবের মূহূর্তেই চিনে নিতে পারেন বিশ্ব। প্রথম গল্পটি কাগজে বের হবার পরই রাতারাতি সুখ্যাত

www.pathagar.com

হয়েছিলেন চেখভ।

ছোটগল্পে রাশিয়ার জনজীবন ধারার উজ্জ্বল এবং ম্লান দিকগুলোকে এমন এক ঐন্দ্রজালিক হাতে তিনি রূপ দিয়েছেন যাতে তার লেখা পড়েই বোঝা যায় ককেশাস, উড়াল, স্তেপ কিংবা তুন্দ্রা অঞ্চলের লোকেরা কেমন, সেখানকার নৈসর্গিক দৃশ্যাবলীর রূপ কেমন। কেমন করে সামুদ্রিক বাতাসে মর্মরিত হয় উইলো, পপলার, দেবদারু কিংবা চন্দন তরুবীথির শুকনো পাতা। বুঝতে পারা যায় ভল্গা অথবা ডনের মখমল-নরম ঢেউয়ের বুকের ওপর দিয়ে কেমন তরতরিয়ে বয়ে যায় পালের নৌকা, বজরা কিংবা মালগুজারি জাহাজ।

হাজার যোজন দূরের অনুরাগী পাঠক তার গল্পের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ পড়ে বুঝতে পারেন স্তেপ ভূমির মেয়েদের বুকের পাটা কতখানি। আর কেমন করে নির্ভয়ে বিচরণ করে তারা বিশাল স্তেপ প্রান্তরে। তাদের কোমরে বাঁধা চামড়ার পেটিতে গোঁজা থাকে পিস্তল অথবা বাঘ-নখ ছুরি। তারা শ্বাস নেয়, খোলা আকাশের তলে অবাধ স্বাধীনতায়। কখনও চলে তারা ধীরে মন্থরে কটিদেশ ধনুকের মতন বাঁকিয়ে, কখনও দুরন্ত বেগে ঘোড়া দাবড়িয়ে।

ভূমিদাসদের দুর্গতি অথবা রাজরাজড়া আর জমিদারদের ভ্রষ্টাচারের চিত্র তার মতন অমন অনুপুংখ পৃথিবীর খুব কম কথাকলাবিদই আঁকতে পেরেছেন। আর বলনাচের ঘরে কাঁচা বয়সের কাউন্ট- কাউন্টেস, ডিউক-ডাচেস্‌দের বেলেল্লাপনার দৃশ্য? বস্তিতে মদে চুর হয়ে-থাকা হতাশাগ্রস্ত শ্রমিকের শুয়োরের মতন চিৎকারের ছবি? ভূমিমজুরদের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির গ্লানিকর চিত্র? এর সবই তার কলমে রূপ পেয়েছে বাস্তবের জমিন ছুঁয়ে। তাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় পৃথিবীর কোনো একনিষ্ঠ পাঠকের পক্ষেই।

হ্যাঁ, বাংলা-ইংরেজি-হিন্দি-উর্দু-জার্মান-ইটালিয়ানসহ পৃথিবীর একশ'রও বেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে তার গল্প। তিনি বিশ্বগামী। তার গল্পের অনুবাদ এবং তার অনুসরণ বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পের ধারাকেও কম সমৃদ্ধ করেনি।

এই জীবন-শিল্পীর গল্প পড়বার পর এক সময় আমার মনে হয়েছিল আর বুঝি রাশিয়া ভ্রমণ না করলেই চলে। আমার পরিচিত খ্যাতিমান আলোকচিত্রীদের অনেককেই বলতে শুনেছি কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে রাশিয়া যাওয়ার কোন মানেই হয় না। কারণ চেখভের গল্প সংকলন তো রয়েছে হাতের কাছেই।

চেখভের গল্পে চোখ বুলানোর মানেই হলো ঘনিষ্ঠ আলোকে তার দেশ রাশিয়াকে দেখা। আর সেই সঙ্গে তাকেও দেখা। কারণ তার আত্মার উদ্দীপ্ত বিচ্ছুরণ আছে তার নিসর্গ-বর্ণনায়, চরিত্র চিত্রণে। মনে হয় হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে।

পশ্চিমের বিমুগ্ধ সমালোচকেরা বলেন, বিশ্বসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ গল্পগুলোর একটি হলো চেখভের 'চেরিফুল', অর্থাৎ 'দ্য''চেরি অরচার্ড'। কিন্তু তার অন্য অনেক সংবেদনশীল গল্প, বিশেষ করে 'বিলম্বে-ফোটা' তথা 'লেট ব্লসমস' পড়লে অশ্রুপাত রোধ করা যায় না। গল্পের নায়িকা প্রায় সর্বহারা রাজকুমারী মারুসার বিষণ্ন দুঃখময়

www.pathagar.com

জীবন, তার ওপর গ্রিকলোস্কি গোত্রের প্রিন্স পদবিধারী বয়ে-যাওয়া মদ্যপ বড় ভাই ইগরের অর্থ লালসার অনাচার এবং সবশেষে তার অনুচ্চারিত প্রেমের হাহাকারের দৃশ্য সব পাঠকের বুকেই তোলে দীর্ঘশ্বাস। দুই চোখ বেয়ে ঝরঝর করে গড়ায় পানি। হৃদরোগের বিশেষজ্ঞ-চিকিৎসক হওয়ার বিরল ভাগ্যের অধিকারী হয়েছিল তাদের বাড়ির এককালের খানসামার ছেলে তপরকভ। এই ছেলেই ছোটবেলায় বাসন-পেয়ালা এবং সামোভার মাজতো মারুসাদের বাড়ি। কিন্তু বড় ভাই ইগরের রোগ-পরীক্ষার জন্য ডাকা হলে কোট-টাই-পাতলুন সজ্জিত চিকিৎসককে দেখে অবাক হলো মারুসা। মনে হলো ওর রাজপুত্তুর ভাই ইগর মার্জিত রুচির এই চিকিৎসকের জুতা বইবারও যোগ্য নয়। শিক্ষা এবং সংস্কৃতি এক ভূমিদাসের ছেলেকে সমাজের কতটা উঁচু ধাপে তুলতে পারে, উজ্জ্বল মুখের তপরকভকে দেখে নারীসুলভ বিচক্ষণতায় মারুসা আঁচ করতে পারলো বিষয়টি।

মারুসার মনে হলো কত ঠুনকো এবং ফাঁকা রাশিয়ার অভিজাত সমাজের নীলরক্তের লোকেদের অহংকার। জরাজীর্ণ প্রাসাদের দমবন্ধ হয়ে-যাওয়া ঘেরাটোপ থেকে বাইরে এসে মুক্ত বাতাসে শ্বাস নিতে ইচ্ছা করলো মারুসার। ভেঙে গুড়িয়ে দিতে ইচ্ছা করলো সামন্ততন্ত্রের ভেল্কিবাজির পুতিগন্ধময় চারদেয়াল।

মনে-মনে বুঝলো মারুসা ডাক্তার তপরকভকে সে ভালোবেসে ফেলেছে। কিন্তু কথাটা বলতে গিয়েও সংকোচের কাছে বার বার হোঁচট খেতে হলো তাকে। মারুসার চোখের লেখা দেখে ডাক্তারও কেমন একটা গভীর টান অনুভব করলো দলিতা মেয়েটির প্রতি। কিন্তু বিষণ্ন অতীত তাকেও আপন হৃদয়ের গহবরে সংকুচিত করে রাখলো।

এদিকে অন্তরের দহনে পুড়ে পুড়ে ফুসফুসের জটিল রোগে আক্রান্ত হলো মারুসা। রোগ পরীক্ষার সুযোগে ঘন-ঘন যেতো ডাক্তারের চেম্বারে। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় ও ডাক্তারের মুখপানে।

দেখতে-দেখতে রোগের প্রকোপে অন্তিম সময় ঘনিয়ে এলো মারুসার। ছুটে গেলো সে ডাক্তারের বাড়ি। বিশীর্ণ লতার মতন ভূলুণ্ঠিতা হলো ডাক্তারের রোগী দেখার ঘরে। বিস্মিত ডাক্তার তাকে তুলে নিয়ে শোয়ালো বেডে। যন্ত্র দিয়ে পরখ করে দেখলো নিরাময়ের বাইরে চলে গেছে ফুসফুসের এই কালান্তক রোগ।

ডাক্তার নিজেও বিক্ষত হলো যন্ত্রণায়। হঠাৎ এক সময় বড় বড় চোখে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট গলায় উচ্চারণ করলো ওঃ 'তোমায় আমি ভালোবাসি ডাক্তার।'

ভালোবাসা নামের এই একটি মাত্র শব্দের অলৌকিক উচ্চারণ এক মুহূর্তে বদলে দিল ডাক্তারের গদ্যময় পৃথিবী। ঘর-সংসার, ভিড়াক্রান্ত রোগীকূলের পরিবেষ্টন ছেড়ে মারুসাকে নিয়ে ছুটলো সে দূরান্তের সমুদ্র তীরের স্বাস্থ্যনিবাসের পথে। ডাক্তার জানতো এ যাত্রাই হয়তো তার প্রেমের অন্তিম শয়ানযাত্রা।

ট্রেনে আরেকবার কাতর-দৃষ্টিতে ডাক্তারের মুখের পানে চেয়ে ঢলে পড়লো মারুসা বিলম্বলয়ের প্রেমিকের কোলে। তার লুণ্ঠিত দীঘল কালো কেশরাশি বেষ্টন

www.pathagar.com

করে থাকলো তপরকভের বুক, দুই হাটু এবং সমস্ত শরীর। মুক্তোর দানার মতন মারুসার চোখের অশ্রুধারা শোকের বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে গেলো তপরকভকে। মারুসার মুখমণ্ডলও ধুয়ে গেলো ডাক্তারের চোখের পানির ক্ষান্তিহীন বৃষ্টি বর্ষণে।

মানব প্রেমের উত্তাপে উষ্ণ, তার গভীর আর্তিতে সিক্ত কি অসাধারণ গল্প এটি।

মারুসার মুখ দিয়ে জীবনশিল্পী চেখভ আসলে গাইয়েছেন অপরাজেয় জীবনের জয়গান। প্রেমের উচ্চকিত ঘোষণা দিয়ে মারুসা বিচূর্ণ করে দিল শ্রেণীভেদের কঠিন শিলার দেয়াল। বলতে চাইছি মানব-মানবীর শুদ্ধ, নির্মল প্রেমই একত্র করতে পারে সমস্ত মানবাত্মাকে। এবং প্রেম আর সহমর্মিতার কাছে জীবনের অন্যসব দাবি কতই না তুচ্ছ। এই সত্যটি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে অন্তিমযাত্রায় চলে গেলো মারুসা, যখন পৃথিবীর কাছে কিছুই পাওয়ার ছিল না ওর।

একথা নিশ্চয় স্বীকার করতে হবে চেখভ ছিলেন পুরনো রাশিয়ার এক ফিনিক্স পাখি। আগুনের শিখায় ভস্ম হয়েও যাকে আবার নুতন জীবন নিয়ে উড়তে দেখা গিয়েছে পৃথিবীর অবারিত আকাশে। এই পাখিরই বন্দনাগীত গেয়েছেন আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথ। যাকে রুশরা বলেন তেগোর। তার কণ্ঠে গীত হলোঃ

'ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর
এখুনি অন্ধ বন্ধ করো না তব পাখা।....'

আমার নিজের কাছে মনে হয় এই বিশাল ডানার বিহঙ্গ ছিলেন রাশিয়ার নব সূর্যোদয়ের ফিনিক্স আন্তন চেখভ।

পাবলভের টেলিফোনের তাড়া খেয়ে কথাগুলো বলতে হলো আমায় অমন করে সময় নিয়ে। পঁচিশ মিনিটের দীর্ঘ সংলাপের পর একনাগাড়ে কয়েকবার ধন্যবাদ জানিয়ে ফোন ছেড়ে দিল। ছাড়বার আগে বললোঃ তুমি এখন লিফ্‌ট বেয়ে সোজাসুজি চলে যাও রেস্তোরাঁয়। দশ মিনিটের মধ্যেই হাজির হচ্ছি আমি ব্রেকফাস্ট টেবিলে।

ওখানে আয়োজন হয়েছিল ভুরিভোজের। নরম রুটি, মাখন-পানির জেলি-দুধ, ডিম ফ্রাই, সবজি, সেদ্ধ আলু, মাংসের সুরুয়াসহ তেরো-চৌদ্দটি আইটেম। এছাড়া ছিল স্পেশাল রুশ স্যুপ এবং ব্ল্যাক কফি। সময় ধরবার জন্য নাকেমুখে খাদ্যবস্তু গুঁজে ঠিক সাড়ে আটটায় গাড়িতে চাপলাম। সূর্যের নরম আলোতে ঝকমকিয়ে ওঠা চক্রযানগুলো ছুটলো ক্রেমলিনের দিকে।

এরা কিন্তু এখানকার ক্রেমলিনকে বলে মস্কো-ক্রেমলিন। কারণ আরও ছয়-সাতটি ক্রেমলিন আছে-ভাদিমির সিটি, গোর্কি সিটি, অস্ত্রাখান, কিয়েভ এবং কাজানসহ এদেশের মধ্যযুগীয় অনেক ক'টি প্রাচীন শহরে।

চট করে সামনের গাড়িটা এসে থামলো প্রকাণ্ড একটা রাস্তার মোড়ে। দরজা খুলতে-খুলতে পাভলভ বললোঃ এখানে আমরা মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করবো। এটা ডাউন-টাউন। শহরের প্রাণকেন্দ্র। প্লিজ কাম ডাউন। সামান্য একটু ব্রিফিং করবো এখানকার ইতিহাস নিয়ে। তাছাড়া তোমাদের ছবিও ধরে রাখা হবে টিভি ক্যামেরার ফিল্মে।

www.pathagar.com

ওকে অনুসরণ করে নিচে নেমে পড়লাম। পেছনের কার এবং মাইক্রোটাও থেমে পড়লো পশ্চিম কোণের গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গায়। মাইক্রোতে ছিলেন মস্কো টেলিভিশনের দুজন প্রতিবেদক এবং আলোকচিত্রীর দল। পেছনের কারটায় ছিলেন এপিএন-এর কয়েকজন তরুণ সাংবাদিক। সবাই আমরা তেকোণাকার জায়গাটায় সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালাম।

রাস্তাটাকে চেনা-চেনা মনে হলো। কিন্তু কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। ভোরের স্নিগ্ধ সূর্যকিরণ স্নান করছিল বিশাল ইমারতগুলোর চূড়ায়। তার বিকচ-নয়ানের আলো খেলা করছিল সামনের পার্কের উইলো আর পপলার গাছগুলোর শাখায় এবং পাতায়। মস্কভা নদীর ঝির-ঝিরে হাওয়ায় আপনা থেকে শীতল হচ্ছিল শরীর।

পাভলভ জায়গাটার পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বললোঃ গত সন্ধ্যায়ও এখান দিয়ে গিয়েছি আমরা। কিন্তু তোমাদের মুখের ভাব দেখে মনে হচ্ছে এক অচেনা জায়গায় দিয়ে এসেছি তোমাদের। নো, নেভার। দিস্ ইজ ওল্ড বাট অলওয়েজ নিউ। এটা পুরাতন কিন্তু চির নতুন। অল রোডস লীড টু রোম-এর মতন মস্কোর এই ঐতিহাসিক সড়ক।

একটু থেমে ফের বললোঃ 'হিয়ার রুলস এ ম্যান, হু হ্যাড্ নো গান্স্ বাট্ অন্লি এ পেন।' চারদিকে তাকিয়ে দেখো কে হতে পারেন ইনি? আমি ওর ইংরেজি বাক্যের ভাবানুবাদ করে খানিকটা উচ্চকণ্ঠেই বললামঃ

'এখানে শাসন করেন একজন
যাঁর হাতে বন্দুক ছিল না
ছিল কেবল একটি কলম।'

মাথা চুলকাতে থাকলাম, মানুষটি আসলে কে হতে পারেন? যাঁর হাতে বন্দুক ছিল না শুধু ছিল কলম! কে তা হলে ইনি? পুশ্কিন, গোগল, দস্তয়েভস্কি, তলস্তয় না চেখভ? অথবা তুর্গেনেভ? কিছুই ঠিক করে উঠতে পারছিলাম না। আবার এ বিশাল সড়কটা নাকি গোটা মস্কো শহরটাকে ঘিরে রেখেছে! হঠাৎ চোখ চিলের মতন উড়ে গিয়ে পড়লো কৃষ্ণপাথরের এক বিশাল স্মারকস্তম্ভের ওপর। যেখানে লম্বা দুই হাত দু'দিকে রেখে দাঁড়িয়ে আছেন আধুনিক সোভিয়েতের সাংস্কৃতিক নবজাগরণের মহানায়ক ম্যাক্সিম গোর্কি।

আমি পাভলভের দিকে তাকিয়ে হেসে বললামঃ ওই যে উনি। দ্য গ্রেট রাইটার অব রিভ্যুলিউশন-যাঁর নাম আলেকসেই ম্যাক্সিমোভিচ পেশকভ গোর্কি। আমার চোখ তখনও বিদ্ধ ছিল গোর্কি উঁচু স্তম্ভটির ওপর।

পাভলভ বললোঃ হ্যাঁ, ঠিক বলেছো। গোর্কি ছাড়া আর কে বিপ্লবের পীঠস্থান এ শহরের হৃদয়ে আসন পেতে বসতে পারেন? আর কেই বা পেরেছেন আমাদের রক্তাক্ত বিবেককে বন্দুকের নল নিয়ে নয়, কলমের খোঁচায় অমন করে জাগিয়ে তুলতে? একথা সত্য, উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ রুশ কবি এবং লেখকরা আমাদের ভাষা

www.pathagar.com

এবং সাহিত্যকে ঠাঁই দিয়েছিলেন বিশ্ব সাহিত্যের পংক্তিভোজে। তাঁদের অমর সৃষ্টি এবং অজস্র সৃজনীসম্ভার এককালের এই ক্ষুদ্র স্লাভনিক লোক সাহিত্যকে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে বিশ্বগামী সাহিত্য আর শিল্প সংস্কৃতির সুউচ্চ শিখরে।

প্রায় এক নিঃশ্বাসেই সে বলে চললোঃ এঁরা সবাই আমাদের নমস্য। সবাইকে এঁদের আমরা স্মরণ করি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধায়। আমাদের গণমানুষের মুক্তির, শতধাবিভক্ত এই সমাজের ঐক্য আর অগ্রগতির কোনো-না কোনো পর্বের এঁরা নির্মাতা। গোটা রুশ সাহিত্যের আজকের যে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি তার পেছনে আছে এই মহামনীষীদের অসামান্য অবদান। তার জন্যেই এঁদের আমরা আজকের প্রগতিবাদী, সংস্কারমুক্ত এবং মাটি ও মানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত সোভিয়েত সাহিত্যের ধারাবাহিকতার সূত্রধর হিসেবে গণ্য করি। মস্কো, পিটার্সবুর্গ এবং আরও অনেক বড় শহরেই তোমরা দেখতে পাবে এদের স্মারক স্তম্ভ। স্বেচ্ছাচারী জার, প্রজাপীড়ক ডিউক, ডাচেস এবং প্রিন্সদের নামে যেসব সড়ক ছিল সেগুলোর জায়গায় উৎকীর্ণ করেছি আমরা পুশকিন, লেরমন্তভ আর গোগলের নাম। সামনে এগুলোই দেখতে পাবে দস্তয়েভস্কি, ভুর্গেনেভ, তলস্তয় এবংচেখভ স্ট্রিট।

শেষে ওদিককার কৃষ্ণ পাথরের স্ট্যাচুটির দিকে তাকিয়ে পাভলভ বললোঃ কিন্তু গোর্কি এঁদের উত্তরসূরী হলেও এঁদের সবাইকে একা ধারণ করেছেন তাঁর কৈশোরের জীবন সংগ্রাম, তারুণ্যের রোমান্টিসিজম, পরিণত বয়সের বিপ্লববাদ এবং গণমুখী সাহিত্যের অসাধারণ শৈল্পিক সুষমায়। নতুন সোভিয়েত সাহিত্যের এবং এদেশের নব উন্মোচিত আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির মহান প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা তিনি। তাঁকে অতিক্রম করে আধুনিক সোভিয়েত সমাজের কোনো লেখক, কবি, শিল্পী কিংবা সংস্কৃতিসেবীর পক্ষেই সম্ভব নয় সামনে পা বাড়ানোর।

গোর্কির বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বললোঃ ১৯০৫ সালের গণবিপ্লবে সরাসরি অংশ নিয়েছিলেন এই কলমযোদ্ধা। স্বৈরতন্ত্রের আখড়া সেকালের ক্ষয়িষ্ণু ক্রেমলিনের ওপর যখন আঘাত হানে গণফৌজ, তিনি ছিলেন তাদের সঙ্গে। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যুদ্ধে উৎসাহ দিয়েছিলেন আর উদ্বুদ্ধ করেছিলেন মস্কোর বিপ্লবীদের। বিপ্লব ব্যর্থ হলে পর পালিয়ে গেলেন ইউরোপে। সেখানেও তিনি নিশ্চুপ বসে থাকেননি। বিপ্লবের মশাল হাতে নিয়ে নতুন করে রচনা করতে লাগলেন তার বিজয় গাথা। তাঁর বিখ্যাত পত্রিকা 'জনানিয়ে'র কথা নিশ্চয় শুনেছো তোমরা। এটি ছিল একটি সাময়িক পত্রিকারগ্রুপ। ইউরোপে নির্বাসিত রুশ বিপ্লববাদী আর উদারপন্থী লেখকরা বিপ্লবের স্বপক্ষে লেখালেখি করবার সুযোগ পেলেন তাঁর সম্পাদিত এই কাগজগুলোতে। বলতে গেলে গোর্কি ছিলেন আধুনিক সোভিয়েত সাংবাদিকতার গুরু এবং এর ফাউণ্ডিং ফাদার। সোভিয়েতের এ যুগের সাংবাদিকরা তাঁর ভাবশিষ্য।

আরেকটি কথা শুনে রাখো। গোর্কি বিশ্বাস করতেন, একটি সমগ্র জনগোষ্ঠী যখন মুক্তিপাগল হয়ে ওঠে তাদের সেই দুর্নিবার জাগরণকে তখন কোনো শক্তিই রুখতে পারে না। হয়তো ক্ষণিকের জন্যে ছাই চাপা দেয়া যায় একটি বিপ্লবের।

www.pathagar.com

কিন্তু চিরকালের জন্য স্তব্ধ করা যায় না। ভস্মস্তূপ থেকে আগুনের শত কোটি শিখা হয়ে সে বিপ্লব জ্বলে উঠবেই। তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল ১৯১৭-এর দ্বিতীয় বিপ্লবের

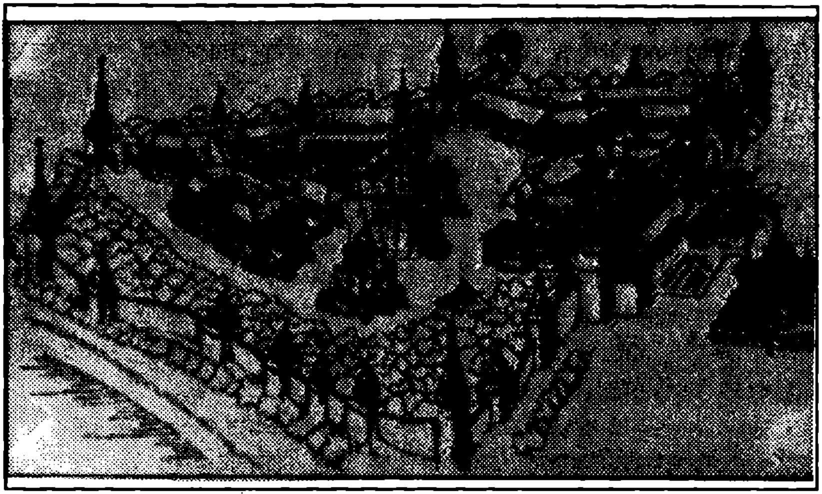

রাশিয়ার নিসর্গ চেখভের অনেক ছোট গল্পের উপাদান

বিজয় অবধারিত। তাঁর সেই প্রত্যয় জাগ্রত সত্য হয়ে উঠেছিল।

অক্টোবরের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর নতুন রাশিয়ায় ফিরে এলেন তিনি। এ রাশিয়া ছিল নবনির্মিত পনেরো প্রজাতন্ত্রের সোভিয়েত ভূমি। এই মস্কো শহরে সেদিন তাঁকে দেয়া হয়েছিল বিজয়ী বীরের সংবর্ধনা। বিশ লাখের বেশী লোক তাঁদের নন্দিত লেখককে ফুলের তোড়া হাতে অভ্যর্থনা জানাতে শরিক হয়েছিল রেডস্কোয়ারে। পৃথিবীর আর কোনো লেখক এরকম বিপুল গণসংবর্ধনা পেয়েছেন এরকম নজির ইতিহাসে নেই। স্রেফ কলম যুদ্ধ করে কৃষক-শ্রমিক সর্বহারা শ্রেণীসহ বহুজাতিক একটি সমাজকে বিপ্লবের অপরাজেয় এক রণাঙ্গনের রূপ দিয়েছিলেন গোর্কি। এটিই হলো তাঁর লেখার সবচেয়ে বড় সফলতা।

গোগল

www.pathagar.com

হঠাৎ আমি বললামঃ তিনি তো আরও আয়ুষ্মান হতে পারতেন। শুনেছি ১৯৩৬ সালে রোগশয্যায় বিষ মেশানো হয়েছিল তাঁর খাদ্যে। যার ফলে মর্মান্তিক মৃত্যু কেড়ে নিয়েছিল তার মূল্যবান জীবন প্রদীপ।

ঃ এটি একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা-বললো পাভলভ। ওর মতন একজন সর্বজনপ্রিয় অজাতশত্রু লেখকের কোনো বিরুদ্ধবাদী ছিল এটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় আমার। এ নিয়ে একটা ট্রাইব্যুনাল বসেছিল ১৯৩৮ সালে। কিন্তু শত্রুদের শনাক্ত করা যায়নি। যা হোক, এটা ওর ভাগ্যের ফের। কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা, জীবনকালেই তিনি তাঁর সব কাজ শেষ করে যেতে পেরেছিলেন। তিনি বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীদের এক পুরোধা-পুরুষ এবং মাটি ও মানুষের লেখক। তাঁর আসন আমাদের সবার হৃদয়ে। তিনি আমাদের আত্মার আলোক। মৃত্যুর উর্ধ্বে তাঁর স্থান।

কথাগুলো বলেই পাভলভ চাইলো রাস্তাটার দিকে। বললোঃ চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নাও।

দেখলাম চারদিকে দাঁড়ানো আকাশ-ছোঁয়া সার সার আধুনিক ইমারত। সামনে ছায়াদার গাছ আর বিচিত্রবর্ণ ফুলের বাগান ঘেরা বিশাল একটি পার্ক। জিজ্ঞেস করতেই পাভলভ বললো, এটা এসভিয়ার্দলভ স্কোয়ার। উরাল পর্বতের পূর্ব পাদদেশের শিল্পনগরী এসভিয়ার্দল ফস্ক-এর নামে আঠারো শতকে জায়গাটির নামকরণ করা হয়েছিলে। ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেল জংশনের মুখে শহরটির অবস্থান। পরে জারিনা দ্বিতীয় ক্যাথারিনের নাম উৎকীর্ণ হয় শহরের নামফলকে। সোভিয়েত যুগে ১৯২৪ সালে শহরের নতুন নাম হলো ইকাতিরিন বুর্গ। পরে বলশেভিক বিপ্লবের নেতা ইয়াকভ এসভিয়ার্দলভের নামে অভিষিক্ত হলো দশ লাখ লোকের এই শহর। মস্কোর এই স্কোয়ারটিও এক সময় ছিল ক্যাথারিন স্কোয়ার।

এপিএন-এর তরুণ সাংবাদিক ইয়াকভ দাঁড়ানো ছিল আমার বাম পাশে। তার দিকে চোখ কুঁচকে পাভলভ বললোঃ এখন আমাদের বন্ধু ইয়াকভ-এর ছোঁয়া লেগেছে এখানটায়। কারণ তার নামটাই খোদিত এসভিয়ার্দলভ স্কোয়ারের শুরুতে। এর জন্য ওর গর্বিত হওয়া উচিত।

সবাই হো-হো করে হেসে উঠলো পাভলভের কথায়। ইয়াকভ সবার হল্লার মধ্যেই বলে উঠলোঃ স্বেচ্ছাচারিণী জারিনাকে এই শহর থেকে ঝেটিয়ে দূর করে দিয়েছি আমরা। যেমন এই স্ট্রিট থেকে মুছে ফেলেছি আরেক অত্যাচারী জারের নাম। তার কলংকের ছাপ পলেস্তারায় ঢেকে দিয়ে উৎকীর্ণ করা হয়েছে একালের প্রজন্মের নিত্যসহচর গোর্কির নাম। আমাদের সবার দিকে তাকিয়ে সে বললো ঃ কী আমরা ক্লেদাক্ত অতীতকে ঝেড়ে ফেলে দিইনি? দেখো তোমরা, এখানকার চারদিকে নতুনের ছাপ, নতুন আলোর বিচ্ছুরণ।

জায়গাটা ছিল মস্কো-ক্রেমনিলের উত্তর তল্লাটে। এ গোর্কি স্ট্রিটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে আরকটি বিশাল ভবন। পাভলভের কাছে জিজ্ঞেস করতেই বললোঃ এটা মন্ত্রিপরিষদ ভবন। পাশের ভবনটি বলশোই থিয়েটার। এখানে অভিনীত

www.pathagar.com

হতো গোর্কি, গোগল এবং চেখভের নাটক। বলশোই কথাটির মানে দ্য বিগ। পাশেরটি মা'লি থিয়েটার। কথাটির মানে দা লিটল অর্থাৎ ছোট নাট্যালয়। ওকিদকারটি মস্কো আর্ট গ্যালারি। এখানে প্রথম মঞ্চস্থ হয়েছিল চেখভের 'দ্য সি গাল' অর্থাৎ 'গাংচিল' নাটকটি। বিশ দশকে সোভিয়েত অভিনেতা-অভিনেত্রীর দল এ নাটক নিয়ে সফর করেছিলেন ইউরোপ এবং আমেরিকা। সেখানকার নাট্যশালাগুলোতে 'গাংচিল' নাটকের সফল মঞ্চায়ন চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল পশ্চিমের দর্শক এবং নাট্য সমালোচকদের। তাঁরা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন, সোভিয়েত নাটক সত্যি অনন্য এবং বিশ্বনাট্য সাহিত্যের শীর্ষে এর স্থান। পাভলভ আরও বললোঃ উনিশ শতকের বিশ্বখ্যাত রুশ নাট্যকার অস্ত্রোভস্কির নামে এখন অভিষিক্ত মা'লি থিয়েটারের। স্কোয়ারটির পাশেই একটি আকাশছোঁয়া ভবনের দিকে তাকাতেই পাভলভ জানালোঃ ওটা মস্কভা হোটেল। আর ওদিকের বিশাল ইমারতটি দেখছো? ওটা 'প্যালেস অফ কালচার' অর্থাৎ পনেরো প্রজাতন্ত্রের সংস্কৃতির মহামিলন সদন। পাশের প্রকাণ্ড ইমারতটি শ্রমিক ক্লাব।

কিছু দূরের একটি টাওয়ারের দিকে তাকাতেই সে বললোঃ ওটা প্যালেস অভ্ সোভিয়েতস্। সোভিয়েতসমূহের মিলন-সদন। নকশায় এর উচ্চতা ছিল তেরোশ' ফুট। একশ' চল্লিশ তলার মতন উঁচু হবে এটি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য বন্ধ ছিল নির্মাণ কাজ। এখন আশি শতাংশ কাজ শেষ। পুরো ভবনটি তৈরি হলে এটি হবে বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু টাওয়ার-বিল্ডিং। আর হ্যাঁ, এখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত আধুনিক নগর পরিকল্পনার যা কিছু দেখছো সবই সোভিয়েত যুগের অগ্রসর ধ্যানধারণার সাক্ষাৎ ফলশ্রুতি।

কথা না থামিয়ে ফের সে বললোঃ আমি গোড়াতে নবনির্মিত সোভিয়েতে গোর্কির প্রভাবের কথা বলেছিলাম। ওদিকে তাকিয়ে দেখো কোথায় গিয়ে ঠেকেছে গোর্কির স্ট্রিট। ওই যে ওদিকে মস্কো- লেনিনগ্রাদ ট্রাংক রোড। এই সড়ক চলে গেছে লেনিনগ্রাদ হয়ে ফিন উপসাগর ছুঁয়ে মহাদেশীয় ইউরোপে। আর পূর্ব-উত্তরে সাইবেরিয়া হয়ে প্রশান্ত মহাসাগর উপকূলে। দুই মহাদেশের যোগসূত্র হলো গোর্কি সড়ক। মস্কোকে এটি বেষ্টন করেছে বিশাল সেন্ট্রাল স্টেডিয়াম আর মস্কো আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্টের পাশ ঘেঁষে। এর থেকেই বুঝতে পারছো, গোর্কি কেমন করে আন্তর্জাতিক যোগাযোগের পাশাপাশি তাঁর কাঙ্ক্ষিত বিশ্বমৈত্রীর হাজার দুয়ার খুলে দিয়েছেন। শান্তির এমন এক মহান দূতকে আমরা ধরে রেখেছি আমাদের হৃদয়ে। তাঁকে কি ভুলে থাকা সম্ভব?

হা করে পাভলভের কথা শুনছিলাম। আর কেবলই বিস্মিত হচ্ছিলাম। সত্যি কবরে থেকেও গোর্কি পথ নির্দেশ দিচ্ছেন পঁচিশ কোটি মানুষের এই বিশাল দেশকে।

এই তল্লাটটাকে এরা বলে নিউ মস্কো। আবার অনেকে বলে নিউ সিটি। ১৯২২ সালে শান্তির যুগ শুরু হওয়ার পর সূচনা হয় এই নতুন শহরের গোড়াপত্তনের। এর আগে চার বছর কেটে যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অস্থিরতা আর প্রতিবিপ্লবের ধকল

www.pathagar.com

সামলাতে। এর ওপর ছিল আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র। অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধরত পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীরা চেয়েছিল ইউরোপীয় রাশিয়াকে তুরস্কের মতন ভাগবাঁটোয়ারা করে নিতে। কিন্তু লেনিনের কূটনৈতিক দূরদর্শিতা আর তাঁর অনুগত বলশেভিক ফৌজ এবং গণবাহিনীর মিলিত অবরোধের মুখে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় দেশী-বিদেশী সব ষড়যন্ত্রের জটাজাল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে ১৯১৭ সালের জুন মাসে লেনিনের নেতৃত্বে প্রথম অনুষ্ঠিত হল নিখিল রাশিয়ান সোভিয়েত কংগ্রেস। তখন সর্বশেষ জার নিকোলাস আর তার ক্রীড়নক সরকারের ত্রাহি-মধুসূদন দশা। বাল্টিক এবং কৃষ্ণসাগর অঞ্চলে জার্মান বাহিনীর হাতে মার খেয়ে লবেজান হয়ে পড়েছিল জারের বেতনভুক সেনাদল। দেশ প্রায় জেরবার হওয়ার মুখে। এমন এক দুঃসময়ে সোভিয়েত কংগ্রেসের সম্মেলন ডেকে সর্বস্তরের সমাজ-প্রতিনিধিদের ঐক্যবদ্ধ করলেন লেনিন। চূড়ান্ত প্রতিরোধ যুদ্ধের জন্য প্রতিটি ফ্রন্টে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করলেন দেশপ্রেমিক জনগণকে।

প্রথম কংগ্রেসে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবীদের প্রতিনিধি সংখ্যা ছিল সব থেকে বেশী। ২৮৫ জন। মেনশেভিকরা ছিল ২৪৮। আর বলশেভিক প্রতিনিধিদের সংখ্যা ছিল এ সময় খুব কম। মাত্র ১০৫। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে তখন পর্যন্ত এই তিন দলের লক্ষ্য ছিল অভিন্ন। তাছাড়া লেনিন ছিলেন এঁদের সবারই অবিসংবাদী নেতা।

সে সময় লেনিনের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল যুদ্ধজয়, সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র থেকে উত্তরণ আর পরবর্তী পর্বে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের ধাঁচে নতুন প্রজাতান্ত্রিক স্বাধীন রাষ্ট্র ব্যবস্থা গঠন। শেষ পর্যন্ত সফল হলো তাঁর রাষ্ট্রনায়কোচিত বিচক্ষণতা। শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের নীতি ঘোষণা করে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের নিরস্ত করলেন তিনি। যুদ্ধের শেষদিকে দুই পক্ষের মধ্যে যে চুক্তি হলো তাতে কিছু কিছু ছাড় দিতে হলেও এটি ছিল আসলে এক বিরাট বিজয়।

আধুনিক রাষ্ট্রবেত্তারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মিত্র শক্তির সঙ্গে তাঁর আগ্রাসন-বিরোধী এই চুক্তিকে আখ্যায়িত করেছেন এ নিউ ডায়নামিক অ্যাণ্ড প্রোগেসিভ পীসফুল ডিপ্লোম্যাসি অভ্ লেনিন' অভিধায়। অর্থাৎ এটি ছিল 'লেনিনের নতুন যুগান্তকারী এবং অগ্রসর শান্তিবাদী কূটনীতি।

মেনশেভিকদের একটি ক্ষুদ্র তাঁবেদার গ্রুপ এই চুক্তি এবং লেনিনের নতুন রাষ্ট্র দর্শনের বিপক্ষে গেলো। তারা জারের পরাজিত সেনাদল, ইউক্রেনের কসাক অশ্বারোহী বাহিনীর একটি অংশের সঙ্গে ভিড়ে গিয়ে যোগ দিল প্রতিবিপ্লবে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবীদের প্রায় সবাই এবং মেনশেভিক গ্রুপের বেশির ভাগই থাকলেন লেনিনের পক্ষে। ১৯১৮-র অক্টোবর বিপ্লবের আগেই এঁরা লেনিনের বলশেভিক পার্টির সঙ্গে একীভূত হলেন। ১৯২২ সালের মধ্যেই প্রতিবিপ্লব এবংইউরোপীয় শ্বেত সন্ত্রাস- দুই যুদ্ধেই জয়ী হলেন লেনিন আর তার বলশেভিক দল।

www.pathagar.com

সোভিয়েত বলতে রুশ ভাষায় পরিষদ বুঝায় তথা সমিতি। জারদের আমলেও রাশিয়ার গ্রামাঞ্চলে ছিল কৃষকদের অসংখ্য সোভিয়েত। শহরে-বন্দরে ছিল শ্রমিক, নাবিক আর পেশাজীবীদের নানান স্তরের সোভিয়েত তথা গিল্ড। সেনাবাহিনীতেও

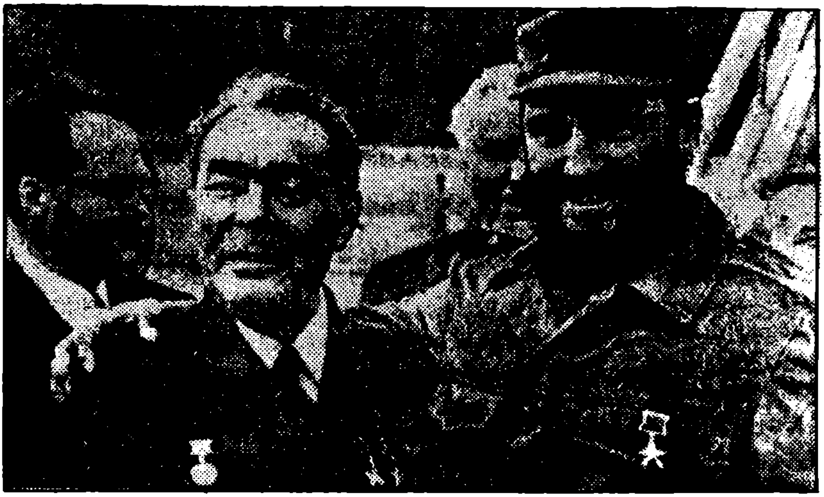

১৯৭৪ সালে শীর্ষ বৈঠকের সময় ব্রেজনেভ ও ক্যাস্ট্রো

ছিল এরকম ছোট-বড় অনেক সোভিয়েত। অক্টোবর বিপ্লবকালে পেত্রোগ্রাদ (সেন্ট পিটাসবুর্গ), মস্কো এবং সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ সোভিয়েতগুলো মেনে নেয় লেনিনের নেতৃত্ব। যার ফলে সুনিশ্চিত হয় চূড়ান্ত বলশেভিক বিজয়।

শান্তি এবং রাজনৈতিক সুস্থিতি ফিরে আসতেই দ্রুত পুনর্গঠনের কাজে হাত দিলেন লেনিন। ১৯০৪-'৫ সালের জাপানী হামলায়, জার শাসন-বিরোধী দুই ঐতিহাসিক গণবিপ্লবে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন প্রতিবিপ্লব তথা গৃহযুদ্ধে এবং সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনে অপরিমেয় ক্ষতি হয়েছিল রুশ অর্থনীতির। বেশী ক্ষতি হয় সাবেক রাজধানী এবং শিল্পনগরী পিটাসবুর্গ আর মস্কোর। উনিশ শ' আঠারোর অক্টোবরে কামানের গোলা বর্ষণ করে জারের শক্তির দুর্গ 'গ্রীষ্ম প্রাসাদ' দখল করে নেয় পিটাসবুর্গের বিপ্লবী নৌসেনারা। সেই যুদ্ধে ভাড়াটে সৈন্যদের পোড়ামাটি নীতির দরুন প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয় শহরের শিল্পকেন্দ্র আর ঐতিহাসিক ইমারতগুলোর। প্রতিরোধ যুদ্ধে-মস্কো-ক্রেমলিন এবং শহরের সাংস্কৃতিক আর বাণিজ্যিক এলাকাগুলোরও অনেক ক্ষতি হলো।

এছাড়া ধ্বংসস্তূপ হয়েছিল ভল্গা-ডন-নীপার এবং উরাল অঞ্চলের আরও অসংখ্য শহর-বন্দর, কৃষিখামার আর গ্রামগঞ্জের। অল্প সময়ের ব্যবধানে এ সর্বাত্মক ক্ষতি কাটিয়ে ওঠা ছিল এক দুঃসাধ্য কাজ। কিন্তু এই অসম্ভবকে কেবল একজনই সম্ভব করে তোলার বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। তিনি ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ

www.pathagar.com

লেনিন। একটি বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের মতন চাঙ্গা করে তুলেছিলেন তিনি ঘড়ির কাঁটাকে চোখ ঠেরে। ১৯২১ সালে ঘোষিত তার 'নয়া অর্থনীতি' তথা 'নিউ ইকোনমিক পলিসি' যাদুমন্ত্রের মতন কাজ করেছিল কলকারখানায় আর কৃষি সেক্টরে উৎপাদনের বৈপ্লবিক গতিসঞ্চারে। অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের এই কর্মকাণ্ডে পুঁজিবাদের সঙ্গে খানিকটা রফা করতে হলেও বৃহত্তর স্বার্থে বিশেষ করে সময়ের তাগিদে তা তিনি মেনে নিয়েছিলেন। তবে তিনি বিশ্বাস করতেন সর্বহারাদের ক্ষমতা এবং সম্পদের সুষম বন্টন অবশ্যই সুনিশ্চিত হবে। তেমনি বিত্তের প্রতিযোগিতায় জেরবার হবে পুঁজিকেন্দ্রিক শোষণের অবশেষটুকু। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে তিনি বিত্তের মিনার চূড়ায় আসীন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আত্মহননের প্রথম স্পষ্ট লক্ষণ হিসাবে দেখেছেন।

লেনিন তত্ত্বজ্ঞ এবং দার্শনিক হলেও রোমান্টিক প্রবণতা দ্বারা কখনও আক্রান্ত হননি। একজন নিখুঁত পরিকল্পক, অসাধারণ সংগঠক, বিজ্ঞানমনস্ক গবেষক, ব্যতিক্রমী পাঠক এবং বাস্তববাদী রাজনীতিক ছিলেন তিনি। 'সর্বাধিক শিল্পোন্নত দেশেই সর্বহারার বিপ্লব হবে প্রথম' মার্কস-এঙ্গেলসের এই ধারণাকে ভুল প্রমাণিত করে ভূমিদাস প্রথা কন্টকিত অনুন্নত রাশিয়ায় প্রথম সর্বহারার বিপ্লবকে সার্থক করে তুলেছিলেন তিনি।

শুধু বিপ্লবের সার্থকতাই নয়- সামন্তবাদের সমাধির ওপর তিনি একটি বিশাল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েম করে বিশ্বকে দেখালেন কৃষক-শ্রমিক-সৈনিক এবং বুদ্ধিজীবীসহ সর্বস্তরের মানুষকে একটি লক্ষ্যে সংগঠিত করতে পারলে আর পাশাপাশি বিপরীত স্রোতের মুখে দাঁড়ানোর মতন সংগঠন গড়ে তুলতে পারলে অনুন্নত দেশেও সবাত্মক বিপ্লব সম্ভব। সাম্যবাদী তত্ত্বে এটি হলো লেনিনের নতুন চিন্তার ফসল।

বিশ্বের দেশে-দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ভিত শক্ত করবার জন্যে ১৯১৯ সালে তিনি গঠন করলেন 'থার্ড ইন্টারন্যাশনাল' তথা কমিটার্ন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন সোভিয়েত প্রশাসনের ক্ষমতার উৎস-কাউন্সিল অভ্ পিপলস কমিসার এবং কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান। কঠোর শ্রমের জন্যে পঞ্চাশ বছর বয়সেই ভেঙ্গে পড়ে তাঁর স্বাস্থ্য। হৃদরোগে আক্রান্ত হলেন তিনি। ১৯২২ সালে প্রথম স্ট্রোক হলো তাঁর। ১৯২৩ সালে দ্বিতীয় স্ট্রোকে হারালেন বাক্‌শক্তি। ১৯২৪ সালে মস্কো থেকে তেইশ মাইল দূরের আপন পল্লী নিবাসে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সোভিয়েত রাষ্ট্রের এই মনীষী নির্মাতা।

গোর্কিকে তিনি আধুনিক রুশ সাহিত্যের স্রষ্টা এবং প্রগতিশীল সাহিত্যের অগ্রচারণ মনে করতেন। এই কথাশিল্পীর প্রতি ছিল তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা। বেঁচে থাকতেই তিনি তাঁর মস্কো সংলগ্ন গ্রামের নাম রেখেছিলেন গোর্কি ভিলেজ। মৃত্যুর পর লেনিনকে সমাহিত করা হয় রেড স্কোয়ারের সংরক্ষিত স্থানে। বারো বছর পর, ১৯৩৬ সালে, তাঁর পাশেই সমাহিত হলেন গোর্কি। সোভিয়েত জনগণ অপরিসীম শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসাবেই তাঁদের রাষ্ট্র নির্মাতার পাশে রুশ সাহিত্যের

www.pathagar.com

সর্বশ্রেষ্ঠ নির্মাতার অন্তিম শয়ান রচনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। অনেকের ধারণা, লেনিনই এ ইচ্ছা ব্যক্ত করে গিয়েছিলেন।

মৃত্যুর পর লেনিনের জীবন, সংগ্রাম এবং দর্শন নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রন্থ রচনা করেছেন তাঁর সহযোগী আর পরবর্তী প্রজন্মের অনেকেই। এদের মধ্যে ছিলেন ট্রটস্কি (১৯২৫), ভ্যালেরিও মারকিউ (১৯২৮), ভারনাদস্কি (১৯৩১), কারঝ্এন্তসেভ্ (১৯৩৮)। জোসেফ স্তালিনের 'লেনিনিজম অ্যাণ্ড প্রবলেমস্ অভ্ লেনিনিজম' বেরোয় ১৯২৮ থেকে ১৯৩৩ সালের মধ্যে।

এসব গ্রন্থের মধ্যে বেশিরভাগই প্রতিফলিত লেখকদের নিজস্ব রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী। তবে লেনিনের স্ত্রী ক্রুপস্কায়ার 'স্মৃতি কথাটি, (Memories of Lenin)-তে স্বামীর ব্যক্তিজীবন, সংগ্রাম এবং সাধনা, পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গী, স্থিতপ্রজ্ঞা, গ্রন্থপ্রীতি আর কর্মযোগের একটি নিখুঁত চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

আমরা নতুন মস্কো সিটির যে জায়গাটিতে এখন দাঁড়িয়ে আছি, এটি লেনিনেরই সুদূরপ্রসারী উন্নয়ন প্রকল্পের ফসল। অক্টোবর বিপ্লবের আগে পুরাতন মস্কোর এই উত্তর তল্লাটের ইন্টারন্যাশনাল বিমান বন্দরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ছিল ঝোপজঙ্গল এবং বিল-ঝিল আর খানাখন্দক। উত্তরের বিশাল ডায়নামো স্টেডিয়ামটিও ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। জারদের আমলের তুলনায় বিপ্লবের পর মস্কো কতটা বিস্তীর্ণ হয়েছে এবং সজ্জিত হয়েছে আধুনিক আর প্রশস্ত সব রাস্তাঘাট এবং আকাশছোঁয়া ইমারতে- আগের শহরের জবুথবু ছবি দেখলে এই বিরাট পরিবর্তনের কথা এখন আর কল্পনা করা যায় না।

বিপ্লব, গৃহযুদ্ধ আর প্রতিবিপ্লবকালে পিটাসবুর্গের জারদের গ্রীষ্মপ্রাসাদসহ এই শিল্পনগরী এবং মস্কো, ক্রেমলিন আর মস্কো শহরের যে-ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল তার সবই পুনর্নির্মিত।

গোর্কি স্ট্রিটে টিভি ক্যামেরায় চিত্রগ্রহণ আর আমাদের বক্তব্য রেকর্ড হওয়ার পর গাড়ির বহর পূর্ব দিকে একটু মোড় নিয়ে চললো। চললো দক্ষিণে মস্কো-ক্রেমলিনের দিকে। পথে আরও অনেক কথা হল গোর্কি এবং লেনিনকে নিয়ে।

টিভি সাক্ষাৎকারে মিনিট দুয়েক কথা বলতে গিয়ে বলেছিলামঃ এখানে এসে আমরা অভিভূত হলাম এক নতুন দুনিয়া দেখে। পুরাতনকে ভেঙে যাঁরা নতুন এই নগর নির্মাণ করলেন, তাঁরা নিশ্চয় ছিলেন দু'শ' বছরের আগাম চিন্তার দূত। নইলে অমন বিশাল সব সড়ক, পাতাল রোড, এত বড় বড় স্কোয়ার, উদ্যান খচিত সবুজ পার্ক, আর আধুনিক স্থাপত্য নীতির ইমারতের সারি গড়ে উঠতে পারতো না। বললাম এক নজর দেখেই মনে হল পৃথিবীর এক মনোরম নগর-সম্রাজ্ঞী এই মস্কো।

দেখতে-দেখতে এসে পড়লাম মস্কো-ক্রেমলিন সিটিতে। কয়েক বর্গমাইল জায়গা জুড়ে পুরনো শহরের এই প্রাণকেন্দ্রটি। আকাশচুম্বি ইমারত, প্রাচীন দুর্গ, এক সার বিশাল গির্জা, গ্র্যাণ্ড ক্রেমলিন প্রাসাদ, প্যালেস অভ্ কংগ্রেস, আধুনিক সুপ্রিম সোভিয়েত ভবন এবং লেনিন স্মৃতিস্তম্ভ, ঐতিহাসিক জাদুঘর আর বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের সুউচ্চ স্মারক স্তম্ভ (অবিনিস্ক) সহ বিয়াল্লিশটি দর্শনীয় ঐতিহাসিক বস্তু আছে এখানে।

www.pathagar.com

১৯৩৭ সালে রক্তবর্ণ রুবি খচিত তারকা দিয়ে শোভিত করা হয় পাঁচটি সর্বোচ্চ টাওয়ারের চূড়া। রাতের বেলা গোটা ক্রেমলিন ঝলমল করে এই লাল পাথরের আলোর বিচ্ছুরণে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় মস্কোর আকাশে যেন ফুটে আছে পাঁচটি বিশাল নক্ষত্রের ফুল।

এ হলো সোভিয়েত যুগের নতুন মস্কো। শৈল্পিক সুষমা, রূপের জৌলুস আর সবুজের বাহারে যাকে বলা যায় এক ভুবন মোহিনী উর্বশী।

দেশটিতেও তখন আরেক নতুন যুগ। লিওনিদ ব্রেজনেভ তখন পার্টি প্রধান। তিনি তখন শান্তি-সফর করছিলেন আফ্রো-এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা এবং লাতিন আমেরিকার দেশগুলো। কিউবার নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রোর সঙ্গে শীর্ষ সম্মেলন হল তার মাত্র মাস কয়েক আগে। থিথিয়ে আসছিল তখন স্নায়ু যুদ্ধের উত্তেজনা।

প্রায় হাজার বছর ধরে ইতিহাস তার পালা বদল করেছে ক্রেমলিন প্রাচীরের পাদমূলে। তরঙ্গের পর তরঙ্গ এসে আছাড় খেয়ে পড়েছে নদীর এই বাম তীরে। পাঁচশ' বছর আগেও নদীর এপারকার উপকূলীয় বাঁধ আর দুর্গ প্রাচীর ছিল পুরনো শহরের শেষ সীমানা। অনেক পরে সেতু দিয়ে মেলবন্ধন ঘটানো হল পুরনো এবং নতুন শহরের। অনেকটা লণ্ডন নগরীর মতন। টেমস নদীর সেতু ঠিক এরকম করেই যোগসূত্র রচনা করেছিল দুই লণ্ডনের।

মাঝখানে টেমসের মতোই অনাদিকাল থেকে ঢেউ তুলে বয়ে চলেছে মস্কভা। রোমান, স্যাক্সন, বর্গম্যান আর ডেনিশ ভাইকিং জলদস্যুদের মতোই এই নদীপথে এখানে এসে বার বার হানা দিয়েছিল মোঙ্গল, তাতার, খাজার এবং পোলরা। আমাদের উপমহাদেশের সিন্ধু-গঙ্গা কৃষ্ণা-কাবেরীর তটরেখা দিয়ে এরকম জনপ্রবাহের কত ক্রুদ্ধ ধারাকেই-না আমরা দেখি আছড়ে পড়তে। কিন্তু তারা যেমন কালের অভিঘাতে আত্মলীন হয়ে যায় মূল জনতরঙ্গের সঙ্গে এখানেও ঠিক তাই ঘটেছে। হিমালয়ান সাবকন্টিনেন্টের ইতিহাসের এই মিলন মোহনার দিকে চোখ রেখেই তো বাংলার কবি বলেছেনঃ 'হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড়-চীন/শকহুন-দল, পাঠান-মুগল এক দেহে হল লীন।' এখানে 'বিয়াতি ফায়িদ' নামের গোলাকার বিশাল গম্বুজওয়ালা ক্যাথেড্রালটির সামনের প্রকাণ্ড স্মারক স্তম্ভটির দিকে তাকাতে গিয়ে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলাম। সেই মুহূর্তে আমার মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথের পংক্তিগুলোর কথা। ১৯৩০ সালে এখানে এসেছিলেন কবি। চিত্র-বিচিত্র বর্ণখচিত রুশ নির্মাণশৈলীর এই অপূর্ব স্থাপত্য কীর্তি আর তার সামনেকার স্তম্ভটি দেখে নিশ্চয় তিনিও হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। স্তম্ভের শিখরে আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রুশ জাতির নবজাগরণের অগ্রদূত দুই সাহসী পুরুষ। মিখাইল পোঝারস্কি এবং মিনিন।

বহুজাতিক স্বাধীন রাশিয়ার ঐক্যের প্রতীক এঁরা। এঁদের বাদ দিয়ে এদেশের ইতিহাসের কথা ভাবাই যায় না। পোঝারস্কির পুরো নাম দিমিত্রি মিখাইলোভিচ পোঝারস্কি। এক অভিজাত বংশে ১৫৭৮ সালে তাঁর জন্ম। তাঁর পারিবারিক উপাধি ছিল 'প্রিন্স'। শরীরে নীলরক্তের ধারা বইলেও ভূমিদাস প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন

www.pathagar.com

পোঝারস্কি। বিশ্বাস করতেন তিনি জনগণই স্বাধীনতার চালিকাশক্তি। রাশিয়া ছিল তখন ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ডিউকডোমে বিভক্ত একটি বিচ্ছিন্ন খণ্ডিত দেশ।

সপ্তম শতকের মধ্যপর্বে গুপ্তযুগের পতনকালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা যেমনটি ছিল, এখানকার চালচিত্রও ছিল হুবহু প্রায় একই রকম। আমাদের ঐতিহাসিকগণ বাংলাদেশের শতাব্দীকালের ঘোর তমসাচ্ছন্ন ওই যুগটিকে বলেন 'মাৎস্য- ন্যায়ের যুগ'। অর্থাৎ যে-নিয়মে বড় মাছ গিলে খায় ছোট মাছকে ঠিক সেই রীতিতেই বাংলার বৃহৎ সামন্ত ভূস্বামীরা কুক্ষিগত করত সব ক্ষুদ্র রাজ্য এবং গ্রাম্য মন্ডল।

আদিযুগ থেকে সপ্তদশ শতকের সূচনাকাল পর্যন্ত প্রায় একই রকম নৈরাজ্যিক অবস্থা ছিল রাশিয়ার। বীর গণযোদ্ধা পোঝারস্কি এবং মিনিন ১৬১২ সালে দুর্ধর্ষ পোল হানাদারদের মস্কো থেকে উৎখাত করে পাল্টে দিয়েছিলেন এ দেশের অন্ধকার যুগের গতিধারা। এই দুই মহানায়কের স্মৃতিস্তম্ভের নিচে দাঁড়িয়ে পাবলভের মুখে শুনছিলাম এঁদের বীরত্বগাথা। আর সে সংগে রাশিয়ার অতীতের কাহিনী।

সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্গত মধ্য রাশিয়া ফেডারেশনকেই বলা হত 'রাশিয়া'। প্রত্ন প্রস্তর যুগে এদেশে আগমন এখানকার জনগোষ্ঠীর পূর্বপুরুষদের। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকে কৃষ্ণসাগর তীরে এবং ক্রিমিয়া উপদ্বীপে প্রথম উপনিবেশ গড়ে গ্রিকরা। তখন ছিল এখানে শকদের আধিপত্য। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে শকদের হটিয়েছিল যাযাবর সারমাতিয়ান বিজেতারা। খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকে স্তেপভূমিতে এলো জার্মান

মির্জা গালিব *রবীন্দ্রনাথ*

রক্তের গথ, চতুর্থ শতকে এশিয়ার হুন, সপ্তম শতকে তাতার রক্তধারার আভর জনগোষ্ঠী। সপ্তম শতকে দক্ষিণ রাশিয়ায় এক শক্তিশালী রাজ্য গড়ে তোলে তুর্কি বংশধারার খাজার জাতি। পূর্ব বুলগেরিয়ানরা নবম শতকে ভল্গা অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করে একটি সাম্রাজ্য।

www.pathagar.com

নবম শতক থেকে শুরু রুশ জাতির ইতিহাস। এ সময় তাদের পূর্বপুরুষ ইস্টার্ন স্লাভরা ক্ষুদে রাশিয়া নামে পরিচিত উত্তর ইউক্রেনে আর শ্বেত রাশিয়া নামে খ্যাত বেলারুসে গড়ে তুলল তাদের বসত। নিঝনি নভ্গোরদ আর স্মোলেনস্ক ছিল তাদের পুরনো জনপদ। তাদের জনাকীর্ণ বসত গড়ে ওঠে ওকা নদীর পুবে আর ভল্গার উজানে। দক্ষিণ রাশিয়ার প্রধান স্লাভ জনগোষ্ঠীগুলোর ওপর ছিল খাজার আধিপত্য। এই মূল রুশ বসত অঞ্চলটির উত্তর, পুব, দক্ষিণে বাস করত তুর্কি এবং উগ্রো-ফিনিক জাতি। প্রাচীন রুশ ইতিহাসের জনপ্রবাহের চেহারাটি ছিল এরকম।

নবম শতকে এ অঞ্চলে আসে উত্তর ইউরোপের স্ক্যানডিনেভিয়ান বণিক শ্রেণী আর যোদ্ধা জাতি ভারানজিয়ানরা। এদেরই একজন নেতা ছিলেন রুরিক। ভল্গা পারের রুশ কৃষকরা রুরিককে ডাকলেন তাদের বসতের মোড়ল হতে। তিনি তাঁর দলবল নিয়ে এলেন ভল্গা- ওকার মোহনা সংলগ্ন সুপ্রাচীন বাণিজ্যকেন্দ্র নভ্গোরদের। ৮৬২ সালে স্থানীয় কৃষক এবং বণিকগণ তাদের শাসনকর্তা নির্বাচন করলেন এই ভারানজিয়ান দলপতিকে। তিনি শান্তিপূর্ণ ভাবে তল্লাটটা শাসন করতে লাগলেন। আর প্রতিষ্ঠা করলেন একটি শাসক বংশ। প্রাচীন রুশ উপকথায় আছে রুরিকের বীরত্বের কাহিনী।

অতীতে রুশদের বলা হত রুস। কারও কারও মতে, এরা নাকি ছিল 'রোহস্'। এদেশের আধুনিক ইতিহাসের গবেষকদের মতে, ভারানজিয়ানদের একটি প্রধান গোত্রের নাম নাকি ছিল রুস কিংবা রোহস্। তবে তারও অনেক আগে পূর্বী-স্লাভরা একই নামে অর্থাৎ রুস নামে পরিচিত বলে ক্লাসিক্যাল যুগের ঐতিহাসিকদের ধারণা। যা-ই হোক, এই রুস নাম থেকেই গোটা দেশটার নাম হয়েছে রাসিয়া। যার আধুনিক ইউরোপীয় নাম রাশিয়া। রুরিকের উত্তরাধিকার ছিলেন ওলেগ। ৮৭৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৯১২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন গোর্কির জন্মস্থান নভ্গোরদে।

স্বাধীন জাতি এবং রাষ্ট্র হিসাবে রাশিয়ার গোড়াপত্তন নভ্গোরদ থেকে। এর জন্যে গর্ববোধ করতেন প্রগতিশীল রুশ সাহিত্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা গোর্কি। ১৬১২ সালে মস্কো বিজয়ী পোল আক্রমণকারীদের উৎসাদক, গণফৌজের অন্যতম নেতা মিনিনের জন্মস্থানও নভ্গোরদে। এর আগে পনেরো শ' শতকে মস্কো ফৌজের সংগে এখানকার কৃষক ফৌজ একত্র হয়ে উৎখাত করেছিল মোঙ্গল শাসক গোষ্ঠীর তাতার খান-সাম্রাজ্যের সেনাদলকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালেও মস্কোর অগ্রবর্তী ঘাঁটি এই শহরের গেরিলা সেনারা রচনা করেন বীরত্বের নতুন ইতিহাস। ভল্গার তীর ধরে মস্কো বেষ্টনকালে হিটলারের নাজি বাহিনীকে এরা পেছন থেকে প্রচণ্ড আঘাত হানে। যার ফলে হিটলারের মস্কো দখলের স্বপ্ন আঁতুড় ঘরেই বিচূর্ণ হল। ক্রেমলিনের পঁচিশ মাইল পর্যন্ত এসে নাকানি-চুবানি খেয়ে পিছু হটে গেল ফ্যাসিস্ট জার্মান বাহিনী।

নভ্গোরদের রুশ জনগোষ্ঠীর পূর্বসুরী ওলেগ ছিলেন স্বাধীন রাশিয়ান রাষ্ট্রের প্রকৃত জনক। এর জন্যেও নভ্গোরদের লোকেরা কম গর্ববোধ করে না। ৮৮২

www.pathagar.com

সালে ওলে তার বাসস্থান স্থানান্তরিত করলেন কিয়েভে। ১১৬৯ সাল পর্যন্ত ইউক্রেনের এই প্রাচীন শহর ছিল রাশিয়ার রাজধানী। তাতার বংশধারার খাজার আধিপত্য থেকে ওলেগ মুক্ত করলেন আধুনিক রুশদের পূর্বপুরুষ পূর্বাঞ্চলীয় স্লাভদের। তাদের ঐক্যবদ্ধ করলেন রাশিয়ার বিভিন্ন তল্লাটে বসবাসকারী রুশ জনগোষ্ঠীর সঙ্গে। ওলেগের উত্তরাধিকারী ইগোর। রুশ সাহিত্যের আদি ইতিহাসে ইগোরকে নিয়ে লেখা আছে এক রোমাঞ্চকর রূপকাহিনী। যার নামঃ ইগরের সেনাদলের বিজয় গাঁথা (The Lay of the Host of Igor)। ইগর রাজত্ব করেন ৯১২ থেকে '৪৫ সাল অব্দি। ইগরের উত্তরাধিকারীরা এসভিয়াতস্লাভ শাসন করেন ৯৬৪-৭২ পর্যন্ত। তাঁর হাতেই চূড়ান্ত পতন ঘটে তাতারি খাজারদের। তাঁর রাজ্যসীমা বিস্তৃত ছিল ভল্গার ভাটি অঞ্চল এবং উত্তর ককেশাস পর্যন্ত। গ্রিক আর বলকান এলাকায় বুলগার দখলদারদের দমন করেন তিনি।

এর পরেকার সবল শাসক ছিলেন প্রথম ভ্লাদিমির (৯৮০-১০১৫)। গ্রিক রক্ষণশীল খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হলেন তিনি। এই সময় থেকেই খ্রিস্টধর্মের অনুপ্রবেশ রুশ দেশে। বাইজান্তাইন সংস্কৃতির প্রভাবের যুগেরও শুরু এ আমল থেকে।

অখণ্ড কিয়েভান রুশ রাজ্যের শেষ রাজা ইয়ারোস্লাভ দ্য ওয়াইজ। অর্থাৎ জ্ঞানী ইয়ারোস্লাভ (১০১৮-৫৪)। তাঁর মৃত্যুর পর ক্ষুদ্র রুশ রাজ্য ভাগ হয়ে যায় এই বংশের ডিউকদের মধ্যে। দ্বিতীয় ভ্লাদিমির (১১১৩-২৫) এবং তাঁর পুত্র মাতিস্লভ (১১২৫-৩২)-এর আমলে কিয়েভ রাজ্যের অগ্রগতি তুঙ্গে ওঠে। এ যুগে রুশ অর্থনীতির প্রধান উৎস ছিল কৃষি। রাশিয়ার সমৃদ্ধ শহরগুলোর প্রতিষ্ঠাও এই আমলে। দেশের বেশিরভাগ এলাকায় এ যুগে স্বাধীন ছিল কৃষকরা। তারা ভল্গা এবং ওকা নদীর উত্তর-পূর্বাঞ্চলে চলে যায় রাজায়-রাজায় সংঘাত বাধলে পর। এ সময় রাশিয়ার রাজনৈতিক ক্ষমতাও কিয়েভ থেকে সরে আসে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে-মস্কো এলাকার ডিউক ভ্লাদিমির সুজদালদের হাতে। এই বংশের ডিউক ইউরি দোলগারুকি (মৃত্যু ১১৫৮) অনেক রক্তারক্তির পর কিয়েভের গ্র্যাণ্ড ডিউকের আসন দখল করেন। ১১৬৯ সালে তাঁর ছেলে আঁদ্রেই কিয়েভ আক্রমণ করে শহরটি ভূলুণ্ঠিত করেন। মস্কো সংলগ্ন ভ্লাদিমির শহরে প্রতিষ্ঠা করেন তিনি রাজধানী।

এ সময় মোঙ্গল বিজেতা চেঙ্গিজ খানের পৌত্র বাতু খানের গোল্ডেন হোর্ড বাহিনী চরম আঘাত হানল রুশ ভূমির ওপর। ১২৩৭-৪০ সালের মধ্যে রাশিয়ার প্রধান শহরগুলো চলে গেল মোঙ্গলদের হাতে। একমাত্র বীর প্রসবিনী শহর নভ্গোরদই তারা পারল না কব্জা করতে।

দক্ষিণ এবং পূর্ব রাশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হলো মোঙ্গল সাম্রাজ্য।১৪৮০ সাল পর্যন্ত প্রায় দু'শ' চল্লিশ বছর টিকে থাকল এই তাতার আধিপত্য। মোঙ্গল আমলে মস্কোর ডিউক রাজ্য ছিল বাতু খানের বংশধরদের অধীনে। ভল্গার তীরবর্তী সরাই শহর ছিল মোঙ্গলদের রাজধানী।

www.pathagar.com

১৩৮০ সাল ছিল রাশিয়ার ইতিহাসের এক স্মরণীয় অধ্যায়। এ-বছর স্বাধীন তাতার রাজধানী কুলিকভ্-এর যুদ্ধে মস্কো রাজ্যের ডিউক দিমিত্রি দনস্কোই-এর সেনাদের হাতে প্রথম পরাজয় ঘটল মোঙ্গলদের। যার ফলে সারা রাশিয়ায় প্রভাব বাড়লো মস্কো রাজ্যের। মস্কোর শাসক প্রথম আইভান (১৩২৮-৪১) আধিপত্য বিস্তার করলেন অনেক বৃহৎ রুশ শহরের ওপর। কিন্তু তখনও মস্কোর শাসকরা কর দিতেন সোনালী তাঁবুর তাতার শাসকদের।

নভ্‌গোরদ কিন্তু তখনও ছিল মোঙ্গলদের আওতার বাইরে একটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্র। ডিউক তৃতীয় আইভান অন্যসব শহরের সঙ্গে এই প্রজাতন্ত্রটিও কুক্ষিগত করলেন। তৃতীয় আইভান মস্কোকে 'তৃতীয় রোম' বলে মনে করতেন। আর নিজেকে পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হিসেবে গণ্য করতেন। তিনি মোঙ্গলদের কর দেয়া বন্ধ করলেন। তাঁর পুত্র তৃতীয় ভাসিলি পিতার রাজ্যসীমা আরও বাড়ালেন। চতুর্থ আইভান অর্থাৎ আইভান দ্য টেরিবল ১৫৩৩ সালে মস্কোর গ্র্যাণ্ড ডিউক হলেন।

তিনি মোঙ্গল খান রাজ্য কাজান এবং অস্ত্রাখান দখল করে নিলেন। মধ্য এবং নিম্ন ভল্গা অঞ্চলসহ রাশিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকা তাঁর দখলে। ১৫৮২ সালে আইভানের কসাক সেনাপতি ইয়ারমাক্ সাইবেরিয়ার তাতার রাজ্য সিবির জয় করলেন। কসাক বাহিনী সাইবেরিয়ার গভীর অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। তারা প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত বিস্তার করল রুশ সাম্রাজ্য। সীমান্তের এলাকাগুলোতে তারা ক্রিমিয়ান তাতার, কাজাক এবং কিরগিজদের দমিয়ে রুশ ভূমির অন্তর্গত করল। এসব এলাকায় গড়ে উঠল রুশ কৃষকদের বসত।

নিজেকে প্রথম জার তথা রুশ সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন চতুর্থ ইভান। জারতন্ত্রের শুরু এখান থেকেই। প্রভাবশালী সামন্তদের দমন করলেও তিনি পীড়নমূলক ভূমিদাস প্রথা চালু করলেন। শুরু হলো রাশিয়ার কৃষকদের জীবনে এক দুঃসহ অভিশাপের যুগ।

১৬১২ সালে পোল বিজেতাদের বিরুদ্ধে গণফৌজ নেতা পোঝারস্কি আর মিনিনের বিজয়ের মধ্য দিয়ে নির্মিত হলো আধুনিক রাশিয়ার ইতিহাস। এই বিজয়ের মধ্য দিয়ে মূল রুশ জাতির সংগে আত্মস্থ হল সাবেক বিজেতাদের বংশধর শক, হুন, পোল, রোমান, গ্রিক, গথ আর তাতার, খাজার প্রভৃতি একশ' বিশের বেশি জনগোষ্ঠীর লোক। আর এসব ভাষাভাষী মানুষ। রুশ ভাষা সমৃদ্ধ হল এদের অজস্র বুলি এবং শব্দ সম্ভারে। উনিশ শতকে এরই ফলশ্রুতিতে বিশ্বগামী হলো রুশ সাহিত্য। এ পথ ধরেই আবির্ভাব ঘটল পুশকিন, দস্তয়েভস্কি, গোগল, তুর্গেনিভ, তলস্তয়, চেখভ এবং সবশেষে গোর্কিসহ বিশ্ব সাহিত্যের দিকপালদের।

পাবলভ সংক্ষেপে এই ইতিহাস বর্ণনা করে বললঃ ১৯১৮'র অক্টোবর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে আমরা সফল করলাম জনযোদ্ধা পোঝারস্কি আর মিনিনের স্বপ্ন। আরেকবার সে এই দুই বীরের স্মৃতিস্তম্ভটার দিকে দৃষ্টি তুলে ধরল। আমি তাকে এ সময় শোনালাম রবীন্দ্রনাথের 'ভারত তীর্থ' কবিতাটির এই দুই পংক্তিঃ 'হেথায় আর্য,

www.pathagar.com

হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড়-চীন/শক-হুন দল, পাঠান-মুগল এক দেহে হল লীন।'... তাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম ইউরোপ-আমেরিকা-লাতিন আমেরিকা আর দূরপ্রাচ্য সফরশেষে আমাদের বিশ্বকবি এসেছিলেন তোমাদের এখানে। এসেছিলেন ১৯৩০ সালে তাঁর অন্তিম শয়ানের এগারো বছর আগে। তিনিও তলস্তয় এবং গোর্কির মতন ঘোষণা করেছিলেন মানবতা আর জনগণের বিজয়। ক্রেমলিন আর মস্কোর সংস্কৃতি ভবনে অভ্যর্থনাকালে তিনি বলেছেন ঃ " সোভিয়েত দেশে এসে এক 'ঐতিহাসিক মহাযজ্ঞ' দেখলাম আমি।"

রুশ বিপ্লবকে নন্দিত করে তিনি সেদিন আরও বলেছিলেনঃ 'এখানে না এলে আমার তীর্থ পরিক্রমা অসম্পূর্ণ থেকে যেত। এই তপোবনে এরা সমাজের পাঁজর থেকে সমূলে উৎপাটন করেছে শোষণ এবং লালসার মৃত্যুশেল। তোমাদের ইতিহাস সৃষ্টিকারী উদ্যোগ বিমুগ্ধ করেছে আমার প্রাণমন। তোমাদের বিপ্লবের বাণী তো আসলে বিশ্ববাণী।'

আরও বললেনঃ তোমাদের কাজ 'জনগণ-মঙ্গলদায়ক, জনগণ ঐক্যবিধায়ক, জনগণ পথপরিচায়ক। তাই তো তোমরা ধর্ম, জাতি, বর্ণ ইত্যাদির প্রভেদের গ্লানিকে মুছে ফেলবার যজ্ঞে নামতে পেরেছো।

১৩৪৮ সালে, মৃত্যুর বছর, 'সভ্যতার সংকট' শীর্ষক ভাষণে তিনি ঘোষণা দিলেনঃ 'প্রাচ্যের এই দিগন্ত থেকেই বিশ্ববাসী শুনবে মহা আশ্বাসের বাণী।' এদিকে মস্কো ভাষণে তার উপসংহার-বক্তব্য ছিলঃ 'তবে চাঁদের অন্ধকার দিকটার দিকেও তোমাদের তাকাতে হবে। তোমাদের কর্মযোগ নিখুঁত হোক। আশীর্বাদ করি, সার্থক হোক তোমাদের ব্রত।........,

পাবলভকে এ প্রসঙ্গে ১৮৫৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা বিপ্লবকালে সেকালের প্রধান কবি মির্জা গালিবের কথাও বললাম। জানালাম, গালিব তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতায় বলেছিলেনঃ 'সাম্রাজ্য দখলের উন্মাদনায় মনুষ্যত্ব হয় নিঃশেষিত। কহুর দরিয়ার তুফানে চূর্ণ হয়ে যায় দর্পিত স্পর্ধার তখ্ত-তার সিংহাসন। শেষ পর্যন্ত জনগণই হয় চিরজয়ী। কারণ তাদের খোয়াবার কিছু নেই।'

পাবলভ আমার দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে বললঃ সব মহাপ্রাণ মানুষের আত্মায় উচ্চারিত একই ধ্বনি। কারণ তারা দার্শনিক এবং ভবিষ্যৎদ্রষ্টা।

কিছুক্ষণ পর হাজার বছর আগেকার সাবেক বণিক বাজার এবং আধুনিক রেড স্কোয়ার দেখে আমরা পাতাল ট্রেনে মাইল কুড়ি ভ্রমণ করে এলাম। হোটেলে ফিরে এসে দেখা হলো মারিয়ার সংগে। একসঙ্গে ডিনার সেরে ছুটলাম মস্কো রেল স্টেশনের দিকে। এবারকার সফরের স্থান লেনিনগ্রাদ শহর এবং উত্তর মেরু মহাসাগরে দক্ষিণ তটভূমির দেশ।

মিনিট ত্রিশেক আগে এসে হাজির হলাম মস্কো রেল স্টেশনে। রাত তখন সাড়ে আটটা। এখানে অপেক্ষা করছিল আমার জন্যে নতুন এক বিস্ময়। সেই কবে দেখেছিলাম কলকাতার শিয়ালদা আর হাওড়ার জনাকীর্ণ রেল জংশন। পনেরোতে

www.pathagar.com

পা দিয়েছিলাম কেবল। লোকের ভিড়ে প্রায় হারিয়ে যেতে বসি। স্টেশনের সামনে জালের মতন ছড়ানো অসংখ্য লেন আর দূর-দূর গন্তব্যে যাওয়ার জন্যে তৈরি হয়ে-থাকা ট্রেনের বহর দেখে চড়ক-গাছ হয়ে উঠেছিল চোখ। কিন্তু এখানে দেখলাম এক এলাহি কাণ্ড। কত বিচিত্র চেহারা, পোশাক আর ভাষার মানুষে গিজ্‌গিজ্ করছিল পুরো স্টেশন-তল্লাট। রুশ ভাষার লোক ছাড়াও এদের মধ্যে ছিল কাজাক, উজবেক। তুর্কি-তাতার, তাজিক, মোঙ্গল, কসাক এবং ককেশান। এছাড়া ছিল সাইবেরিয়ান, শামানিয়ান, ইউক্রেনিয়ান, শ্বেতরুস, বেলেরুস, লাতভিয়ান, মালদোভিয়ান আর স্তেপ এবং তুন্দ্রাবাসীসহ নানান বর্ণের মানুষ। এ যেন ছিল বহুজাতিক মানবকুলের এক উতরোল সাগর। এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা তাদের।

বিশাল রেল ভবনটি আধুনিক রুশ স্থাপত্যের এক অনুপম নিদর্শন। তার প্রাঙ্গণের কোথায় শুরু আর কোথায় শেষ তা আঁচ করতে গিয়ে বারবার ধাঁধিয়ে যাচ্ছিল চোখ। আলোর বন্যায় ঝকমক করছিল চারদিক। ফ্লাডলাইটগুলোকে দেখাচ্ছিল সূর্যের ফুলঝুরির মতন। এর ওপর ছিল পরিচ্ছন্নতার এক নির্মল পরিবেশ। কোথাও চোখে পড়ল না কোনও রকম ধুলো-ময়লা কিংবা এক টুকরো বাজে কাগজ। আমাদের দেশে ম্লান আলোর নোংরা রেল স্টেশন দেখতেই অভ্যস্ত হয়ে এসেছি আমরা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে আসাম, সিলেট, চট্টগ্রাম আর জলপাইগুড়ির ব্রিটিশ টি-কোম্পানিগুলো আমাদের রেল স্টেশন আর হাটবাজারে চায়ের প্রচলন ঘটিয়েছে বলে শুনেছি। সাধারণ লোকেরা যাতে চা পানে অভ্যস্ত হয় তার জন্যে ছিল তাদের ক্যানভাসার। গোড়ার দিকে এরা বিনি পয়সায় একটি কোকিস্ বিস্কুটসহ পরম সমাদরে লোকদের আপ্যায়িত করত এক পেয়ালা গরম চায়ে। ছোটবেলায় গ্রামের হাটে এদের হাতে চা পানের প্রথম অভিজ্ঞতার কথা আজও দাগ কেটে আছে মনে। বিশেষ করে কোকিস-বিস্কুটের সৌগন্ধের কথা ভুলতে পারা যায় না। রেল স্টেশনগুলোতে চায়ের রমরমা ব্যবসার শুরু ত্রিশের দশক থেকে। চালু হল তখন স্টেশনে চায়ের স্টল, রেস্তোরাঁ আর ভাত-মাছ মাংসের ছোটখাটো সব হোটেল। ট্রেনযাত্রীর সংখ্যা যতই বাড়তে থাকল ফুলে-ফেঁপে উঠল এদের বেসাতি। কিন্তু ঘুচল না শুধু একটি দীনতা। সেটি নোংরামি আর কদর্যতা। যার আধুনিক নাম পরিবেশ দূষণ।

আমাদের দেশে রেল স্টেশন বলতে বোঝায় মাছির ভনভনানি আর নোংরা-গলিজ আবর্জনার ছড়াছড়ি। অনেক সময় সাধ করে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে গেলে দেখা যায় দিব্যি একটি কি দুটি মাছির লাশ ভাসছে ধোঁয়া-ওঠা উত্তপ্ত তরল পদার্থে। অর্থাৎ চায়ের রস আর মাছির রসে একাকার একটি পাতা এবং তিনটি কুঁড়ির চূর্ণিত তরল বস্তুটি। কাপ, পিরিচ আর চামচের বদখত অবস্থার কথা না-বলাই ভালো। গরম পানিতে চুবিয়ে নিলেও যে-ময়লা সেই ময়লাই থাকে। টেবিল পরিস্কার করা হয় যেন শতাব্দীকাল ধরে শেওলা জমে-জমে কালো ভূত হয়ে-থাকা ন্যাকড়া দিয়ে। সুতরাং চায়ের এই স্টলগুলোতে পরিচ্ছন্নতা নামক বস্তুটি মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যের নায়ক বিরহী যক্ষের মতন নীলগিরি পাহাড়ের চূড়ায়

www.pathagar.com

চিরনির্বাসিত হয়ে থাকবে- এ তো ধরেই নিতে হয়। এসব খাদ্যবস্তুর বিপণিত বাতাসে এবং বাসন-পেয়ালায় অদৃশ্য প্রাণসংহারক জীবাণু রাজ্যপাট বিস্তার করে থাকে চারপাশের দূষিত পরিবেশের কল্যাণে।

সুতরাং জনস্বাস্থ্য বিভাগ থেকে হাজারো নোটিশ টাঙিয়ে পরিবেশ দূষণকারীদের দণ্ডের ভয় দেখানো হলেও ফায়দা হয় না মোটেও। কারণ মানুষকে মনের দিক থেকে স্বাস্থ্য-সচেতন আর স্বভাবে-চরিত্রে পরিচ্ছন্ন, রুচিশীল এবং শিক্ষিত করা না গেলে অমন করে আমাদের সহ-অবস্থান করতেই হবে অপরিচ্ছন্নতার উত্তরাধিকারীদের সঙ্গে।

ককেশাস পর্বতমালা

এ দেশে যখন শিক্ষিতের হার ছিল পনেরো শতাংশ তখনও এরা ছিল মোটামুটি স্বাস্থ্য-সচেতন। জারদের দুঃশাসনের যুগে এখানকার গ্রামগুলো ছিল জীর্ণমলিন, হতশ্রী। দুর্ভিক্ষ প্রায় লেগেই থাকত। ধুঁকে-ধুঁকে মারা যেত অনাহারক্লিষ্ট ভূমিদাসেরা। চাষের একখণ্ড জমির জন্যে স্বাধীনতাপ্রিয় কৃষকেরা আপন গ্রাম ছেড়ে ছুটত দক্ষিণ পশ্চিমের ককেশাসে, উত্তর মেরু মহাসাগর উপকূলের তুন্দ্রা অঞ্চলে, কৃষ্ণসাগর তীরের স্তেপ ভূমি আর সাইবেরিয়ার ওদিককার বৈকাল হ্রদ এবং আরও পুবের প্রশান্ত মহাসাগর এলাকায়। মাসের পর মাস ধরে চলত আবাদকার এই রুশ কৃষকদের সুদীর্ঘ অভিযাত্রা। সঙ্গে থাকত তাদের তাঁবু, কৃষি সরঞ্জাম। আর থাকত হ্রদ-নদীর মাছ, বন্য পশু-পাখি শিকারের হালহাতিয়ার।

ছোট-বড় মিলিয়ে এদেশে আছে দেড় লাখ নদী এবং উপনদী। তাছাড়া ককেশাস, উরাল, পামির, তিয়েনশান, আলতাই এবং কাজাগ, কারপাথিয়ান,

www.pathagar.com

সাইয়ান, চারস্কি, নারোদনাইয়া, কারাকুম, কিজিলকুম প্রভৃতি পর্বতমালা আর মালভূমি জুড়ে আছে অসংখ্য নির্ঝরনী। এসব নদী-উপনদী এবং ঝরনার খনিজ পানি যেন সেচ সুবিধা যুগিয়েছে কৃষকদের জমিতে তেমনি এদের দিয়েছে স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য। দারিদ্র্যের যন্ত্রণা ভুগতে হলেও উদার প্রকৃতি, শ্যামল তরুবীথিশোভিত দিগন্তলীন অরণ্য আর হাতের নাগালের মধ্যে থাকা সুপেয় পানি আদিকাল থেকে এদের মনে সঞ্চারিত করেছে সৌন্দর্যচেতনা এবং পরিচ্ছন্নতাবোধ। আমাদের দেশের প্রকৃতি এবং জনজীবনের সঙ্গে এখানকার সাদৃশ্য থাকলেও আমরা কিন্তু ওরকম হতে পারিনি। আমাদের আবাদকারী কৃষকরাও সাহসী। কিন্তু ঝড়ে বন্যায়-জলোচ্ছ্বাসে ওষ্ঠাগত প্রাণ। তাছাড়া পুকুরভরা মাছ এবং গোয়ালভরা গরুর সে বাংলা তো আর নেই।

রাশিয়ার সব থেকে কর্মব্যস্ত এই বিশাল রেল স্টেশনে পা দিয়েই আমার প্রথম মনে হল এই কথাটি। এ দেশের মানুষ যে-সৌন্দর্য প্রেমিক-স্টেশনটির চারদিকে একনজর তাকালেই তা আঁচ করতে পারা যায়। বিশাল জায়গা জুড়ে বেশুমার টার্মিনাল। যাত্রার জন্যে যাত্রীবাহী বগি, কোচ আর ওয়াগনের সুদীর্ঘ বহর নিয়ে অপেক্ষমাণ সার-সার ট্রেন। প্রতিটি বগি ঝকঝকে তকতকে। যেন আনকোরা নতুন। একেকটি ট্রেনের গন্তব্য এশিয়া এবং ইউরোপের শেষ প্রান্তসীমায়। ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেল সড়কটির জন্যে সঙ্গত কারণেই গর্বিত এরা। কারণ আট হাজার কিলোমিটার লম্বা এই রেলওয়ে পৃথিবীর মধ্যে দীর্ঘতম।

এর পুব মাথা ছুঁয়েছে প্রশান্ত মাহসাগর উপকূলের রুশ সমুদ্র বন্দর ভ্লাদিভোস্তক্। জাপানের শাখালিন, কামচাট্কা দ্বীপপুঞ্জ এখান থেকে খুব একটা দূরে নয়। আন্তঃএশিয়ান-ইউরোপীয় এই রেলওয়ের পশ্চিম প্রান্ত গিয়ে ঠেকেছে ফ্রান্সের শেষ মাথায় আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলভূমিতে। এর সঙ্গে যুক্ত কোরিয়া, চীন, ইনার ও আউটার মোঙ্গলিয়া আর ভিয়েতনামের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা। চীনের গ্রেটওয়াল তথা ইনার মোঙ্গলিয়া হয়ে যে রেললাইন মধ্য রাশিয়ায় ট্রান্স-সাই-সাইবেরিয়ান রেলওয়ের সঙ্গে রচনা করেছে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সংযোগ তার মধ্য দিয়ে বিশের দশকে চীনারা আসত মস্কো। অর্থাৎ বিশ্ববিখ্যাত এই রেল স্টেশনে। যার বিস্তীর্ণ অলিন্দে এখন পায়চারী করছি আমরা।

আমার পাশে ছিল পাভলভ আর মারিয়া ইভানোভনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স মারিয়া। ভাষা এবং সাহিত্যে অনেকগুলো ডিগ্রি আছে চল্লিশ ছুঁই-ছুঁই এই কৃশতনু গোলগাল মুখের লাজনম্র মহিলার। এ দেশের সব প্রধান আঞ্চলিক ভাষা ছাড়াও আটটি আন্তর্জাতিক ভাষায় ভালো দখল আছে ওঁর। অনর্গল কথা বলতে পারেন ইংরেজি, ফরাসি, স্পেনিশ, ইতালিয়ান এবং ডাচ ভাষায়। পোলিশ, সুইডিশ এবং ফিনিক ভাষাও জানেন। লেনিনগ্রাদে ছিলেন অনেক দিন। বোধকরি এর জন্যেই আমাদের দোভাষী এবং গাইড করা হয়েছে ওঁকে এই সফরে। বিদেশী প্রতিনিধিদল নিয়ে আলমা আতা, সমরকন্দ, তাসকন্দ, কিয়েভ এবং আর্কিসিটি, স্তালিনগ্রাদ, কাজানসহ অনেক শহর ভ্রমণেরই অভিজ্ঞতা আছে মারিয়ার।

www.pathagar.com

স্বামী ইঞ্জিনিয়ার। স্কুলগামী দুই ছেলে এবং স্বামীকে নিয়ে মারিয়া ইভানোভনা থাকেন মস্কোর একটি সরকারী ফ্লাটে। প্রতিমাসে দেড় দুই সপ্তাহ থাকতে হয় সফরযাত্রী প্রতিনিধিদলের সঙ্গে ট্যুরে। একনাগাড়ে এখানে-ওখানে ছোটছুটি করতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু তারপরও মুখে লেগে থাকে হাসি। সফরযাত্রীদের মনে উঁকিঝুঁকি দেয় হাজারটা প্রশ্ন। নতুন নতুন জায়গা কিংবা দর্শনীয় বস্তু দেখলে ঔৎসুক্যের শেষ থাকে না তাদের। হেসে-হেসে সব প্রশ্নেরই জবাব দেন মারিয়া। প্রশ্নকারীর বুঝতে কষ্ট হলে বলেনঃ এক্সকিউজ মি, ইফ, ইউ ডু নট মাইন্ড-প্লিজ রিপিট এগেন। পরক্ষণে থেমে-থেমে স্পষ্ট ইংরেজি কিংবা অন্য কোনও ভাষায় জলবৎ তরলং করে বিষয়টি বুঝিয়ে দেন।

মস্কো রেল স্টেশনের পাশেকার উদ্যান খচিত জায়গাগুলো দেখে বিমোহিত হয়ে পড়েছিলাম আমি। প্রশংসা করছিলাম এখানকার ছিমছাম পরিবেশ, রেলকর্মীদের শৃংখলাবোধ, রেস্তোরাঁ আর বিপণী কেন্দ্রগুলোর পরিপাটি চেহারার। যাত্রীর এক বিশাল হাট গোটা তল্লাটটা। মিনিটে-মিনিটে ট্রেন আসছে-যাচ্ছে। অনবরত ওঠানামা চলছে যাত্রীদের। কিন্তু সামানা হৈচৈ নেই কোথাও। কখন কোথা থেকে কোন্ ট্রেন আসবে, কোন্‌টি কোন লেন থেকে ছাড়বে-কম্পিউটার বোর্ডে লাল তীরের সংকেত দিয়ে জানান দেয়া হচ্ছে তার। এর ওপর আছে মাইকের সার্বক্ষণিক ঘোষণা। সুতরাং যাত্রীদের এতটুকু ভোগান্তির জো নেই।

আমার প্রশংসা বাক্য শুনে খুশি হলেন এঁরা সবাই। পাভলভ এদেশের রেলওয়ের বিবর্তনের ওপর একটি ব্রিফ্ দিতে বলল মারিয়াকে। মহিলা হেসে বললেনঃ এখানে এখন যে সুন্দর পরিবেশ দেখছো বিপ্লবের আগে কিন্তু ঠিক অমনটি ছিল না।

আমার দিকে তাকিয়ে বললেনঃ ইংল্যাণ্ডের অনেক পরে এদেশে চালু হয় রেলযোগাযোগ ব্যবস্থা। বোধকরি জান তুমি-আঠারো শতকের গোড়াতে কাঠের রেল সড়কের ওপর ঘোড়ায়-টানা ওয়াগন চলাচলের উপায় উদ্ভাবিত হয় ওদেশে। কয়লা এবং নানান ধরনের খনিজ দ্রব্য পরিবহন করা হত সেসব ওয়াগনে। আঠারো শতকের শেষদিকে কাঠের রেলের বদলে বসানো হলো লোহার পাতের রেল। ১৮২৯ সালে জর্জ স্টিফেনসন আবিষ্কার করেন তাঁর 'রকেট' নামের বিখ্যাত লোকোমটিভ ইঞ্জিন। সেই থেকে রেলওয়ের অগ্রগতির সূচনা। ১৮২৫ সালে প্রথম লোহার পাতের রেল রোড নির্মিত হলো ম্যানচেস্টার আর লিভারপুলের মাঝখানে। এ সময় থেকেই কৃষিগণ্য, খনিজ দ্রব্যের পাশাপাশি ট্রেনযোগে যাত্রী পরিবহনের শুরু।

রুশ সম্রাট পিটার দ্য গ্রেট (১৬৭২-১৭২৫) ইংল্যান্ড,ফ্রান্স এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দেখাদেখি সাবেক রাশিয়ায় আধুনিক কলকারখানা, শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পাশাপাশি কাঠের রেলরোড খোলার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর ১২৩ বছর পর আর স্টিফেনসনের লোকোমটিভ ইঞ্জিন আবিষ্কারের উনিশ বছরের ব্যবধানে প্রথম রাশিয়ায় নির্মিত হলো আধুনিক রেলসড়ক। ১৮৪৮ সালে এ সড়কই প্রথম সাবেক রাজধানী সেন্ট পিটাসবুর্গকে যুক্ত করলো মস্কোর সংগে।

www.pathagar.com

রুশ প্রকৌশলীদের আগাম চিন্তার ফসল ৩২০ মাইল দীর্ঘ এই রেলরোড। কোথাও বাঁক না-নিয়ে সরাসরি দুই শহরকে একত্র করেছে এ ঐতিহাসিক রেলরোডটি। এ দেশের স্থল যোগাযোগের ইতিহাসে শুধু বিবর্তনই নয়-বিপ্লবও ঘটিয়েছে এটি। এই ট্রেনে কতবারই-না যাতায়াত করেছেন তুর্গেনেভ, লেভ তলস্তয়, চেখভ এবং গোর্কিসহ রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ মনীষীরা। লেভ তলস্তয়ের ইয়াসনায়া পোলিয়ানা গ্রামের বাড়িটি এই রেল সড়কেরই একটি শাখা লাইনের ধারে। যেখানে আছে পোলিয়ানা রেল স্টেশন। ১৯১০ সালে এক ভয়ংকর তুষার ঝড়ের রাতে বরফে জমে গিয়ে তিরাশি বছর বয়সে এই স্টেশনেই মৃত্যুর হিমশীতল কোলে ঢলে পড়লেন রুশ সাহিত্যের এই বিশ্বনন্দিত কথাশিল্পী।

তলস্তয়ের এ উপন্যাসের অনেক দৃশ্যপটই অঙ্কিত মস্কো এবং পিটার্সবুর্গ রেল স্টেশন দুটিকে ঘিরে। তাঁর সময়ে জার-জারিনা, ডিউক-ডাচি, তাদের আমলা, সভাসদ, দেহরক্ষীদল থেকে শুরু করে ভূমিদাস, কৃষক-মজদুরসহ সব স্তরের মানুষই যাতায়াত করত এ ট্রেনে।

তখন ট্রেনের চাকায় পিষ্ট হয়ে বেঘোরে প্রাণ হারাতেন অনেক হতভাগ্য যাত্রী। ট্রেনে ওঠার সময় হুড়াহুড়ি করতে গিয়ে তৃতীয় শ্রেণীর অনেক যাত্রীকেই বরণ করতে হত এরকম অপঘাত মৃত্যু। স্টেশনের পরিবেশও তেমন একটা আহামরি কিছু ছিল না।

এখন এখানে যে ঝকঝকে পরিবেশ দেখছো সেটি ১৯১৭ সালের ঐতিহাসিক বিপ্লবের পরেকার ঘটনা। সোভিয়েত যুগে দ্বিগুণের বেশী হয়েছে রেল লাইনের দৈর্ঘ্য। এর মোট পরিমাণ এখন এক লাখ চল্লিশ হাজার কিলোমিটার। বিশ্বের মোট রেল লাইনের দশমাংশের সমান এটি। এদিকে সারা দুনিয়ায় রেলপথে যত পণ্য পরিবাহিত হয় তার প্রায় পঞ্চাশ ভাগ পরিবহন করে সোভিয়েত রেলওয়ে। এছাড়া পৃথিবীর মোট তিন ভাগের এক ভাগ হলো এদেশের বিদ্যুৎচালিত রেলপথ। ফি-বছর প্রায় চল্লিশ কোটি যাত্রী যাতায়াত করে সোভিয়েত রেলসড়কে।

ট্রান্স-ককেশান, ট্রান্স-সাইবেরিয়ান, বৈকাল-আমুর, উরাল-ফিনিক এবং মধ্য এশিয়ান রেলসড়ক নতুন রূপান্তর ঘটিয়েছে সোভিয়েত রেল সংযোগে।

মারিয়ার ব্রিফ শেষ হলে পর আমরা উঠলাম মস্কো-লেনিনগ্রাদ ট্রেনে। আমাদের জন্যে পাশাপাশি সংরক্ষিত ছিল দুটি মনোরম কোচ। প্রথমটিতে স্থান হলো আমাদের পাঁচজনের। ভেতরে ছিল শোবার চমৎকার ব্যবস্থা। ওপরকার পাটাতনে ঠাঁই নিলাম চারজন। মারিয়া ইভানোভনার স্থান করে দেয়া হল নিচের লম্বাটে কুশন বেড়ে। সবার জন্যেই ছিল দুটি করে নরম কম্বল এবং বালিশ। শোবার আগে এলো কফি আর ট্রে-ভরতি খাদ্যবস্তু। পেছনের বড় কোচে ছিল পাবলভ আর টিভি টিম।

রাত নয়টায় ছাড়ল ইলেকট্রিক ট্রেনটি। পথে কোথাও যাত্রাবিরতি নেই। ভোর ছয়টায় নাকি পৌছবে লেনিনগ্রাদ। অন্ধকারের জন্যে রুশ দেশের বৃক্ষশোভিত গ্রাম, সবুজ শস্যক্ষেত, খামার আর চেখভ বর্ণিত তৃণভূমির সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত হতে হল আমায়।

www.pathagar.com

বিদ্যু-চালিত ট্রেন ভ্রমণের সেই প্রথম অভিজ্ঞতা আমার। ইঞ্জিনের দানবীয় চিৎকার একবারও কানে এলো না। উদ্যাম এক গতির ছন্দ তুলে চাকা চলছে বুঝতে পারলাম। অথচ কোনও ঘ্যান-ঘ্যানানো ধাতব শব্দ নেই। মনে হলো যেন মখমলের একটি গালিচার ওপর দিয়ে ডানা বিছিয়ে উড়ে চলছে এক ঝাঁক সাইবেরিয়ান রাজহাঁস। মনে পড়লো ছোটবেলাকার কথা। মেঘনার কালো ঢেউয়ের ওপর দিয়ে পাঁচ-সাত পালের ময়ুরপঙ্খি বজরা আর বালাম নৌকার আনাগোনা দেখেছি। পালে হাওয়া লাগতেই সেগুলো পেখম মেলে নিঃশব্দে উড়ে চলতো ঢেউ ভেঙ্গে। আমাদের সাগরপাড়ের মাঝিরা মৃদুছন্দা বাতাসকে বলে লিলুয়া বাতাস। যার ঝিরঝিরে দোলায় শীতল হয় শরীর, উদার হয় মন। তখন ঘরছাড়া বিরহী প্রেমিক হয়ে গলায় ভাটিয়ালির সুর তোলে মেঘনা-পদ্মাপাড়ের মাল্লারা। হয়তো মহাকবি কালিদাস মৃদুমন্দ এই সামুদ্রিক বাতাস থেকে সুর তুলে নিয়ে উদ্ভাবন করেছিলেন তাঁর 'ঋতু সংহার' কাব্যের মন্দাক্রান্তা ছন্দ।

মনে পড়লো আরবের ক্লাসিক্যাল যুগের কবিকুল শিরোমণি ইমরুল কয়েসের কথা। সেকালের বিশ্বখ্যাত কাব্যসংহিতা 'ঝুলন্ত কবিতা সপ্তক' (আরবি নামঃ 'সাব'-আ-মুয়াল্লাকা)- এর মধ্যে তাঁর রচিত কবিতাই ছিল ছন্দ সুষমায় উপমা- উৎপ্রেক্ষায় আর সুর ঝংকারে সর্বজন-নন্দিত। আরবি কাব্যকলায় আজও কোনও কবি ইমরুল কয়েস-এর কবিতার ভূনকে অতিক্রম করে যেতে পারেননি। প্রেমিকা ওনায়জা'র উদ্দেশে রচিত এই অতুলনীয় কবিতার ছন্দও ছিল মন্দাক্রান্তা। বেদুইনদের কাফেলার দূরগামী উটের মৃদু পদধ্বনি থেকে নাকি বেদনাবিধুর কবি যোজনা কেরছিলেন তাঁর এই ব্যতিক্রমী ছন্দের তাল-লয় এবং মাত্রা। কারও কারও মতে, মরুভূমির লু-হাওয়ার ধ্বনি বৈচিত্র্যও যুগিয়েছে তাঁর এই অপরূপ ছন্দের উপাদান। বিদ্যুৎ-চালিত ট্রেনটিতে উঠে এরকম এক ছন্দময়তার শিহরণ অনুভব করছিলাম আমরা ক'জন বঙ্গসন্তান। দেশ আমাদের পদ্মা-মেঘনা-যমুনা পুলিনে। সুতরাং বাতাসে ভাটিয়ালির সুর ঝংকার দিয়ে উঠলে বেসুরো গলায়ও জাগবে গান এ-তো স্বাভাবিক।

দরজা-জানালা বন্ধ ছিল আমাদের কোচটির। জানালার ইস্পাতের পর্দা উঠিয়ে স্বচ্ছ কাচের অংশটি অখোলা করে রাখলাম যাতে শীতাতপের ব্যাঘাত না-ঘটে। বাইরে উত্তর মেরুর বরফরাশি ছুঁয়ে-আসা বাতাসের কানাকানি। ভেতরকার উষ্ণতার সংগে তার ছোঁয়া লাগায় অনুভব করলাম স্নিগ্ধতার এক অনাস্বাদিত আমেজ। কাচের ওপার থেকে মাঝে মধ্যে দেখা যাচ্ছিল রেল লাইনের পাশেকার ছোট স্টেশনগুলোর ঝলমলে বিজলি আলোর চমক।

সেই ফাঁকে চোখে পড়লো রুশ কৃষকদের খামারে লকলকিয়ে -ওঠা দ্রাক্ষালতা, শশা, বাঙি আর তরমুজের কেয়ারি। কখনও কখনও আলোছায়ায় দুলতে দেখলাম দু'ধারের গ্রামের বার্চ, পপলার আর দেবদারুর শাখা। অন্ধকারে এ দেশের নিসর্গের এতটুকু দেখাও কম ভাগ্যের কথা নয়। চলছিলাম উত্তরের স্তেপ অঞ্চলের দিকে। মনের অলিন্দে হঠাৎ পায়চারি করতে শুরু করলো আন্তন চেখভের 'দ্য স্তেপ' গল্পটির

www.pathagar.com

সব দৃশ্যপট। কাহিনীটি ছিল পুরনো যুগের রাশিয়ার। তখন এ দেশে মোটরযান কিংবা ট্রেনের প্রচলন হয়নি। শহরে এমনকি দূরের কাঁচা সড়কেও চলতো ঘোড়ায়-টানা গাড়ি। ডাকের গাড়িগুলোও ছিল ঘোড়ার। সেকালে আমাদের দেশের ঢাকা, কলকাতা এবং বড় শহরগুলোতে চলতো দুই ঘোড়ার জুড়িগাড়ি। খচ্চরে-টানা এককা গাড়িরও প্রচলন ছিল। উঁচুতলার ইংরেজ সায়েব আর নবাবসুবারা চড়তেন দামি ওয়েলার ঘোড়ার শকটে। ইংরেজ লাট সায়েবদের জন্যে ছিল চার ঘোড়ায়-টানা জমকালো ওয়েলার গাড়ি। ওদিকে আগ্রা, কানপুর, লাখনৌ, লাহোর, পিন্ডি প্রভৃতি শহরে অশ্ব শকটের পাশাপাশি চলতো উট এবং গাধায়-টানা গাড়ি।

মোটরযান এবং ট্রেন প্রচলনের আগে পশুচালিত এরকম রকমারি গাড়ি চলতো উপমহাদেশের ধুলিধূসরিত শহরের অপ্রশস্ত রাস্তায়। রাশিয়ার যানবাহনের দৃশ্যটাও ছিল সেকালে প্রায় একই রকম। রাজরাজড়া আর প্রিন্স-ডিউকরা চলতেন দামি চৌঘোড়ার রথে। সাজসজ্জার রকমফেরে সেগুলোর ছিল নানান নাম। সাধারণ লোকেরা চলতেন 'ব্রিচকা' নামের লক্কড়মার্কা দুঘোড়ার জুড়ি কিংবা এক-ঘোড়ার এককায়। এদিকে উত্তরের তুষারঢাকা তুন্দ্রা আর শীতের দেশ স্তেপে চলতো কুকুরে -টানা স্লেজ গাড়ি।

আমাদের উপমহাদেশে উনিশ শতকের চল্লিশ দশকেই তৈরি হয়েছিল রেল সড়ক। ঢাকা-কলকাতা, কলকাতা-দিল্লি, লাহোর-করাচি, কলকাতা-মাদ্রাজ-বোম্বাই রেল যোগাযোগরও শুরু সেই থেকে।

রাশিয়ায়ও একই সময়ে ঘটে রেলগাড়ির চলন। কিন্তু রুশ দেশ সেই মান্ধাতার আমলের জরাজীর্ণ ব্রিচকা গাড়ির যুগ পেরিয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর, বলতে গেলে প্রায় উঠে এসেছে ইলেকট্রিক ট্রেনের আধুনিকতম যুগে। অভাবনীয় বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি আর অগ্রসর সভ্যতার ঈর্ষণীয় চূড়ায় এখন এদের অবস্থান। অথচ নামে কলকাতা-মাদ্রাজ, কলকাতা-দিল্লি, চট্টগ্রাম-বাহাদুরাবাদ, আসাম-বেঙ্গল এক্সপ্রেস ট্রেনের নামালংকার গায়ে ধারণা করলেও এই সেদিনও এ ট্রেনগুলোর চলার গতি ঘন্টায় ত্রিশ মাইলও ছিল না। আর বগিগুলোর হাল ছিল অকহিতব্য। যেন শেওলা-পড়া বুড়ো কচ্ছপের খোল এককেটি। থার্ডক্লাস, ইন্টারক্লাস এবং ফার্স্টক্লাস নামে যাত্রীর সামাজিক স্তরের বিভাজন করা হলেও ক্লাস-নির্বিশেষে সব বগির চেহারা ছিল কমবেশী এক রকম। তৃতীয় এবং ইন্টারক্লাসে বর্ণাশ্রমের কিছুটা গন্ধ থাকলেও আসন আর টয়লেটের ছবিসুরতে পার্থক্যটা মালুম করা ছিল কষ্টসাধ্য।

আসনগুলো ছিল ছেঁড়া-খোঁড়া, টুটাফাটা। জানালার কাঠ এবং কাচ ছিল ভাঙ্গাচোরা। উপরকার ছাদে বৈদ্যুতিক বাল্‌ব থাকলেও যেন সব আলোই পলাতক। আবার কোনও কোন কামরার বাতি উধাও। তস্করদের হাতে বেমালুম গায়ের সেসব বাতিদান। সুতরাং অন্ধকারে ঘাপটি মেরে থাকা ছাড়া উপায় থাকে না অসহায় যাত্রীদের। আবার টয়লেট থেকে প্রতি মুহূর্তে আসে নাড়িভূড়ি-ওগড়ানো দুর্গন্ধ।

www.pathagar.com

অভিজাত প্রথম শ্রেণীর হাল কিছুটা উন্নত হলেও সেগুলোর ছিরিও ছিল না খুব একটা সুখকর। আসনের গদি ফুঁড়ে দাঁত বের করে থাকতো ভেতরকার খড়ের বিচ্ছিরি রূপের কদর্যতা। এর ওপর ধুলাবালির আধিক্য তো ছিলই। আবার টয়লেট মোটামুটি পরিচ্ছন্ন দেখালেও পানির সংকট লেগেই থাকতো। জানালা খোলা রাখলে চোখ কানা হওয়ার যোগাড় হতো উড়ন্ত ধুলার উপদ্রবে। মাছি-মশার উপদ্রবের কথা না-বলাই ভালো।

চট্টগ্রাম-বাহাদুরাবাদ আর আসাম-বেঙ্গল ট্রেনে যাতায়াতের তিক্ত অভিজ্ঞতা ছোটবেলা থেকেই আমার ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানি বোমার ভয়ে রাতের বেলা নিষ্প্রদীপ থাকতো দূরপাল্লার এসব ট্রেন। মনে হতো এক ভৌতিক অন্ধকারের মধ্য দিয়ে চলছি পৈতৃক প্রাণ হাতে নিয়ে। দিনের বেলা গোটা ট্রেনের মাথায় ঘাসের সবুজ চাপড়া কিংবা ডালপালা গুঁজে রাখা হতো হানাদার বোমারু বিমান-চালকের চোখ ফাঁকি দিতে। একবার ভোরবেলা লাকসাম জংশন হয়ে বাহাদুরাবাদ মেল ট্রেনে যাওয়ার সময় অল্পের জন্য বেঁচে গেলাম কয়েক ঝাঁক জাপানি জঙ্গি বিমানের হামলা থেকে। সেগুলো হবিগঞ্জের শমশেরনগরের ব্রিটিশ অ্যারোড্রাম তছনছ করে চক্রাকারে উড়ে যাচ্ছিল আমাদের যাত্রীবাহী ট্রেনটির মাথার উপর দিয়ে।

মাঝপথে হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠলো ট্রেনের সাইরেন। থেমে গেল ট্রেনটি। বাঁচবার জন্যে যাত্রীদের সেকি আহাজারি। দরজা-জানালা গলিয়ে দলে দলে লোকের হুড়োহুড়ি করে নিচে লাফিয়ে পড়ার ট্র্যাজিক ছবিটি চোখ খুললেই যেন দেখতে পাই। তারপর কাদা ময়লার স্তূপের মধ্যে মুখ গুঁজে উবু হয়ে শুয়ে থাকার দৃশ্য। যুদ্ধের সেই বিকট ছবি আজও উঁকি দেয় মনে।

অতীতের সেই দুর্গতির অবস্থা একালে অনেকটা কাটিয়ে উঠলেও আজও আমরা ইলেকট্রিক ট্রেনের যুগে পা বাড়াতে পারিনি। কখন পারবো তারও কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই দৃষ্টির দিগন্তে। এছাড়া সময়ের চাকার পেছন দিকে ফেরার সেই পুরনো উত্তরাধিকার তো আজও কাটিয়ে ওঠা যায়নি। কিন্তু সোভিয়েত দেশে দূরের গন্তব্যে যেতেও এক মিনিট বিলম্ব দেখিনি ট্রেনের। এটা বোধকরি সম্ভব হয়েছে এদের চোখ সামনের দিকে আছে বলে। এরা শুধু নিয়মনিষ্ঠই নয়, দ্রুততালে এগিয়ে যাওয়াই হলো এদের লক্ষ্য। সবার স্লোগান হলোঃ প্রোগ্রেস অ্যাণ্ড মোর প্রোগ্রেস।

বলছিলাম চেখভের গল্পের সেই কবেকার ঘোড়ায়-টানা ব্রিচকা গাড়ির যুগের কথা। আমরা জুলাই মাসের পাতা উল্টাচ্ছিলাম। গল্পের সেই পটভূমিটাও ছিল জুলাইয়ের কোনও একদিনের। ব্রিচকায় করে যাচ্ছিলেন গির্জার পাদরি সিরাইস্কি, ছোট ব্যবসায়ী কুজমিচভ। তাঁদের সঙ্গে ছিল স্কুলপড়ুয়া নয় বছরের ছেলে ইগর। কোচোয়ান দেনিস্কা নামের এক মাঝবয়সী লোক। বালক ইগর প্রতিমুহূর্তে অবাক হচ্ছিল তৃণভূমির মনোরম দৃশ্যাবলী দেখে। একটা কবরের দেয়ালের ওপার থেকে উঁকি দিচ্ছিল চেরি গাছের শ্যামল কুঞ্জ। ক'দিন বাদেই ফুটবে সাদা ফুলের রাশি।

www.pathagar.com

তখন সেগুলোকে দেখতে মনে হবে সাদাটে ফেনার এক সমুদ্দুর। আর চেরিগুলো পেকে উঠলে পরে মনে হবে জায়গাটা জুড়ে আছে রক্তবর্ণ পলাশের আকাশজোড়া এক চন্দ্রাতপ।

ইগর জানতো জুলাইয়ের বিকেলে তারুই পাখিরা কিচির-মিচির করে না, ডাকে না কাদা-খোঁচা পাখিও। চেখভের বর্ণনায় আছেঃ নাইটিঙ্গেল তথা বুলবুলির গলায় গান না-থাকলেও এই সময়টায় স্তেপকে আরও সুন্দর এবং প্রাণোচ্ছল দেখায়। সূর্য ডুবে গিয়ে অন্ধকারের চাদরে পৃথিবী ঢাকা পড়লেও দিনের বেলাকার দুঃখ ভুলে যায় শ্রমক্লান্ত মানুষ। ভুলে বুঝি প্রকৃতিও। শোনা যায়, তখন তৃণভূমির আনন্দময় শ্বাস-প্রশ্বাস। ঘাসেরা অন্ধকারে দেখতে পায় না তাদের বার্ধক্য। বাতাসের শিহরণে জেগে-ওঠা তাদের বুকের একটানা মর্মরিত গুঞ্জন কেমন একটা আমেজ তোলে ঘুমপাড়ানিয়া গানের।

ঘোড়ার ছুটিয়ে চলতে গেলে মনে হয় কেটে যাচ্ছে চোখের ঘুম। তখন কোথা থেকে ভেসে আসে একটা রাতজাগা পাখির ডাক। যেন মানুষের গলায় সে বলেঃ আহ্। এখানকার লোকেরা এই পাখিকে বলে 'গালাইউ'। ওই নিঃসঙ্গ পাখির ডাকের পরই চেঁচায় পেঁচা।

কয়েক ঘন্টা এগুলেই দেখা যায় সেকেলে ঠেলাগাড়ি। কারা যেন সেগুলোকে গাদাগাদি করে রেখেছে। তারপর শোনা যাবে নিশাচর পাখির বিচিত্র ধ্বনি, ঝিঁঝি পোকার টানা গুঞ্জন। দেখা যাবে নীল আকাশ, চাঁদের আলো, রাতজাগা পাখির উড়ে-যাওয়া।

সবকিছু মিলিয়ে কানের কাছে ধ্বনি তুলবে তৃণভূমির রূপকথা, পর্যটকের গল্পকাহিনীর কথাকলি। তখন ভেতর থেকে দেখা যাবে এই তৃণভূমির অপার সৌন্দর্য, তার আনন্দিত আত্মার প্রতিচ্ছবি। দূর থেকে দেখা যাবে উত্তরের নদীমালা এবং সমুদ্রের হাতছানি। চারপাশের পাহাড়, মালভূমি আর উপত্যকার তরুবীথির শ্যামলিমায় জুড়াবে চোখ এবং প্রাণ।

বালক ইগরের মন ভরে ওঠে তার স্বদেশের এই প্রাকৃতিক শোভায়। কুজিনভ অনুচ্চ স্বরে গাইলেন পুরনো রূপকথার একটি গান। আপন মনে বললেনঃ এই হলো আমার রুশভূমি, যেখানে নিয়ত জেগে আছে তার অন্তরাত্মা।

আমরা বিদ্যুৎ-চালিত ট্রেনে উঠে নৈঃশব্দের মধ্যে অনুভব করলাম আপন মাটির নাড়িছেঁড়া টান। সবাই এক সংগে গাইতে থাকলাম 'সোনার বাংলা' গানটি। কামরাজুড়ে ধ্বনি জাগলো তার সুরেরঃ

'আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালোবাসি
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।.......'

আমাদের গান শুনে আর উচ্ছ্বাস দেখে বিমুগ্ধ হলো মারিয়া ইভানোভনা। অর্থ

www.pathagar.com

না বুঝলেও সুরের ঝংকারে আলো ঝলকে উঠলো তার চোখে। তাকে ইংরেজিতে বুঝিয়ে দিলাম গানটির মর্মকথা। আরও বললামঃ আমাদের জাতীয় সঙ্গীত এটি। পোয়েট তেগোর-এর লেখা।

সে রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র রুশ ভাষা পড়েছে। বললঃ অপূর্ব, অপূর্ব! আরও বললঃ ইয়োর গোল্ডেন বেঙ্গল রিয়্যালি ইজ এ কান্ট্রি অব বিউটি।

ট্রেন ছুটতে থাকলো। নাকে যেন ভেসে এলো এ দেশের বর্ণিল প্রকৃতির পুষ্পগন্ধমাখা সৌরভ। রাত একটার দিকে চোখজুড়ে এলো ঘুম। আমরা তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রঙ্গমঞ্চের ওপর দিয়ে ছুটে চললাম।

তড়িঘড়ি করে ঘুম ভাঙ্গাতে লেগে গেলাম সবার। হাই তুলতে-তুলতে উঠে বসলেন দলের তিনজন। কেবল এপাশ-ওপাশ করছিল আমার সংবাদপত্র জীবনের অন্তরঙ্গ বন্ধু তোহা খান। বরাবরই ও ছিল একটু ঘুমকাতুরে। দীর্ঘকালের ওঠা-বসার সুবাদে সম্পর্কটা ছিল আমাদের তুই-তুকারির। মনে হল সহজে ভাঙবে না ওর সুখকর নিদ্রা।

ব্যস্ত হয়ে তাই ওর পিঠে খোঁচা দিতে থাকলাম। কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললামঃ কী-রে আর কত ঘুমাবি। লেনিনগ্রাদ নামতে না-চাইলে ফিরতি ট্রেনে মস্কোই ফিরে যা। একা ওখানে হোটেলের নিদমহলে শুয়ে নাক-ডেকে ঘুমাস।

তোহা এখন পরলোকবাসী। ওর সঙ্গে চটুল আলাপচারিতার সুযোগ আর পাব না কখনও। কিন্তু সেদিনকার ভোরের স্মৃতিটা আজও নাড়া দেয় মনটাকে। আপনা থেকেই তখন পড়ে দীর্ঘশ্বাস। এখন লেনিনগ্রাদ ভ্রমণের কথা লিখতে গিয়ে ওর নিদ্রাতুর মুখখানা ভেসে উঠল চোখের সামনে সহজ-সরল একখানি নিরীহ মুখ।

আমার শেষের কথাটি শুনে চমকে উঠল ও। চোখ খুলে চাইল ওদিক-ওদিক। চোখ দুটি ছিল জবার মতন লাল। অর্থাৎ অসময়ে ঘুম ভাঙ্গার ঘোর তখনও কাটেনি ওর। লম্বা হাইতোলা-মুখে হাতচাপা দিয়ে বিড়বিড়িয়ে বললোঃ অ্যাঁ! কী বললি? লেনিনগ্রাদ এসেছি।

ঃ না, তা হতে যাবে কেন। এটা তোর সাতক্ষীরা। সুন্দরবনে এসে থেমেছে মস্কো-লেনিনগ্রাদ এক্সপ্রেস! বিরক্ত হয়ে বললাম।

ঃ সত্যি করে বল কোথায় এসেছি আমরা? আরেকটি হাই তুলল ও।

ঃ কী দেখছিস-রে চোখে আলসের রাজা, বস ভোলানাথ! 'কত রবি জ্বলেরে আর বুঝি কত আঁখি মেলে-রে'। তাই না?

এবার তড়াক করে উঠে বসল তোহা।

এদিকে তখন স্টেশনের পেছনে বিরাট একটি থালার মতন লাল হয়ে উঠতে শুরু করেছিল সূর্য। তার স্নিগ্ধ রশ্মি আমার মুখে। পাশের কোনও উদ্যান থেকে কানে ভেসে এল প্রভাতী পাখিদের কলকাকলি। এরা তিতির হবে নয়তো বুনো কপোত।

একই সঙ্গে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল জনসমুদ্রের। মনে হল যেন হাজার কয়েক যাত্রী ট্রেন ফুঁড়ে উঠে এসেছে শ্বেত পাথরে-মোড়া প্রকাণ্ড প্লাটফরমটির চত্বরে। ভিড়

www.pathagar.com

ঠেলে পায়ে-পায়ে এগুচ্ছে তারা। ট্রেন থামলে আমাদের জংশন স্টেশনগুলোতে যেমন কুলি এবং যাত্রীদের হল্লা আর হুড়াহুড়ির হাট বসে সে রকম কোনও দৃশ্য একটুও চোখে পড়ল না এখানে।

তলস্তয়ের 'আন্না কারেনিনা' এবং আরও কয়েকটি উপন্যাসে এই স্টেশনটির বর্ণনা পড়েছি। তখন মুটে-মজুর আর কোচওয়ানদের শোরগোল ছিল রেলের এই জংশনে। সেটি ছিল ঘোড়ার গাড়ীর যুগ। কোচওয়ানরা যাত্রী ধরবার জন্য স্টেশনে এসে হাঁকডাক দিত। যেমন ঢাকার সেকালের ফুলবাড়িয়া স্টেশনে যাত্রীদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য ঘোড়ার গাড়ী চালকরা ডাক ছেড়ে বলতঃ 'আহেন সাব, পংখিরাজে চড়বেন। চোখের পলকে যাবেন চকবাজার'।

পংখিরাজ না-হলেও মখমলের আসনের একটি অভিজাত অশ্ব শকটে উঠে মস্কোর যাত্রী আন্না তার সেন্ট পিটার্সবুর্গের পৈতৃক প্রাসাদে গিয়ে হাজির হয়েছিল।

সেই যুগ এখন তামাদি। ঘোড়ার গাড়ি উঠে গেছে অনেক যুগ হল। তার জায়গায় সারা রুশ দেশ জুড়ে এখানকার কারখানায় তৈরী নানান মডেলের আধুনিক মোটর কারের আনাগোনা। সেকালের কোচওয়ানরা এখন কার-ড্রাইভার। তারা রেল স্টেশনের বাইরে কারপার্কে থাকে। যাদের নিজস্ব বাহন নেই তাদের জন্য আছে রেন্টের কিংবা পর্যটনের গাড়ী। কুলির পাট চুকে গেছে কবে। এখন যাত্রীদেরই টানতে হয় নিজেদের লটবহর। মানুষের পিঠে অন্যের বোঝা চাপানোর রেওয়াজটাকে এদেশের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দাস-প্রথার অভিশাপ মনে করা হয়। সেই অন্ধকার যুগে ভূমিদাসদের মত কুলিকামিনরাও ছিল অভিজাততন্ত্রের কাছে ভারবাহী জন্তুতুল্য। জাতপাতের ভেদরেখাটা ঘুচে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে মানুষকে পশু হিসেবে ব্যবহারের গ্লানিটাও তাই উঠে গেছে এই অভেদ সমাজের চৌহদ্দি থেকে। পশ্চিমের শিল্পোন্নত সমাজেও দেখেছি 'মুটে' বলে এখন আর কোনও মানবেতর শ্রেণীর অস্তিত্ব নেই। হিউম্যান রাইটস-এর দাবী জোর বাতাস পাওয়ায় সম্ভব হয়েছে সেসব দেশে এই কলঙ্ক ঘোচানো। আমাদের দেশে রিকশাচালকদের মানুষ টানতে দেখে তাই চোখ কপালে তোলেন সোভিয়েত দেশের পাশাপাশি পশ্চিমা দুনিয়ার লোকেরাও।

এবার ফিরে আসি আমাদের কামরার দৃশ্যপটে। লেনিনগ্রাদ স্টেশনে ট্রেনটা থেমেছে শুনে সজাগ হল তোহার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। নীচে নামবার জন্য শুরু করল আঁকুপাকু। ওপরকার মাচানের একটা রড দুই হাতে চেপে ধরে প্রথমে ঝুলিয়ে দিল তিনহাতি দুই চিকন লম্বাটে পা। মাথার আগে অমন দৈত্যাকৃতি চিংড়িফড়িং পা নামতে দেখে ভড়কে গিয়েছিল গাইড মারিয়া ইভানোভনা। বোধকরি সে ভেবেছিল এতবড় পা-ও হয় মানুষের।

রাতে ট্রেনে চাপবার সময় ভিড়ের মধ্যে আমাদের বাঙালী খান সাহেবকে ভালমতন দেখতে পায়নি মারিয়া। তাছাড়া ঘুমের লোভে সবার আগে ওপরে গিয়ে বিছানায় আশ্রয় নিয়েছিলেন উনি। এবার নীচে নামবার পর সাত ফুটের কাছাকাছি সুদীর্ঘ দেহখানা মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই মারিয়ার মনে হল ওটা বুঝি

www.pathagar.com

ট্রেনের বগিটার ছাদ ছুঁয়েছে। এবার রীতিমতন হকচকিয়ে গেল মহিলা। দুই চোখে ওর ফুটে উঠল বিস্ময়-মিশ্রিত এক কৌতূহল। সামনাসামনি হতেই অভিভূত মারিয়া সম্ভাষণ জানালঃ গুডমর্নিং মিস্টার খান। ভাল ঘুম হয়েছে তো তোমার?

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল তোহা। শেষে নিজেকে সামলে নিয়ে সংকোচে প্রতি সম্ভাষণ জানালঃ গুড মর্নিং। স্বভাবসুলভ সলজ্জ হাসি ফুটে উঠল ওর মুখে। পরে যোগ করলঃ সরি! আই অ্যাম এ বিট লেট। মারিয়া বললঃ ও কিছু না। রাতে ট্রেনে চাপলে সবারই এ রকম একটু-আধটু লেট হয়। মারিয়ার চোখে তখনও ঝুলছিল বিস্ময়ের সঙ্গে একরাশ কৌতুক।

শেষে তোহার আপাদমস্তক আরেকবার দেখে নিয়ে যোগ করলঃ ইউ আর রিয়্যালি গ্রেট। 'গ্রেট' কথাটা হয়ত 'টল ম্যান' অর্থে ব্যবহার করেছিল ও।

খানের মুখে আর কোনও কথা জুয়ালো না। সে মাথা নুইয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল তার লাগেজ বের করবার কাজে। এই ফাঁকে অপাঙ্গে খানের দেহখানা খুঁটে-খুঁটে দেখে নিল। উঁচুতে পাঁচ ফুট আমাদের কোমলাঙ্গী কৃশ সঙ্গিনী। মস্কোর হোটেল রাশিয়ায় আমার বিশালদেহী রুম হোস্টেস আনা মাসলোভার তুলনায় একে মনে হচ্ছিল এক শীর্ণকায়া পিগ্‌মি বালিকা। সত্যি বলতে কি, দেখতে ছিল মারিয়া আমাদের মাঝারি গোছের বাঙালী মেয়েদের মতন। ও বোধকরি কামরার এক পাশে কর্মব্যস্ত খানের বৃক্ষতুল্য দেহটার সঙ্গে নিজের ক্ষুদ্র শরীরের তুলনা করছিল আর তাজ্জব হচ্ছিল মনে মনে। একটু পরে আমার কাছে এসে ফিস ফিসিয়ে বললঃ আমার মনে হয় তোমাদের এই বন্ধু বিশ্বের দীর্ঘদেহীদের একজন হবে। প্রতিযোগিতা হলে তালিকার শীর্ষের দু-চার নম্বরে থাকবে এর নাম। বলেই চোখ কুঁচকে মিষ্টি করে হাসল।

ঃ তুমি বুঝি মুগ্ধ হয়েছ আমাদের বন্ধুটিকে দেখে? রহস্য করে বললাম আমি।

ঃ অমন দীর্ঘদেহী লাজনম্র ভদ্রলোককে দেখে কেনা মুগ্ধ এবং আকৃষ্ট হয়? পাল্টা জবাব মারিয়ার। চোখ দুটি কৌতুকে নীল মাছির মতন নেচে উঠল ওর।

দলের লেট-রাইজাররা সবাই তখন ব্যস্ত ছিল গোছগাছে। কামরার খোলা দরজার মুখে দাঁড়িয়ে আমি রেল লাইনের চার পাশটা দেখছিলাম। মারিয়া কাছে দাঁড়িয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করছিল কখন এখানকার লোকজন আসবে আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে। বার-বার বাঁ-হাতের ঘড়ির কাঁটার ওপর নজর বুলাচ্ছিল ও।

এদিকে মাকড়শার জালের মতন ছড়ানো রেলের অগুনতি লাইনের ওপর জীবনানন্দ দাশের কবিতার 'শঙ্খ চিল' হয়ে উড়ে বেড়াচ্ছিল আমার চোখ। দেখছিলাম আর বিস্মিত হচ্ছিলাম। মনে হল ডালপালায়-ছাওয়া বিশাল এক বটগাছের মতন অজস্র জটাজুট ছড়িয়ে সারা পৃথিবীর রেলওয়েকে বেষ্টন করে রেখেছে এই লাইনগুলো। একা এলে নির্ঘাত হারিয়ে যেতাম এখানে।

অন্যমনস্ক মারিয়ার দিকে তাকিয়ে বললামঃ দিস ইজ লাইক এ স্পাইডার নেট। অবিকল উর্ণনাভের জালের মতন। এই জালের ভেতর আটকা পড়ে হয়

www.pathagar.com

বন্দী হয়ে থাকতাম নয়ত অন্য কোথাও গিয়ে পড়তাম পথ খুঁজতে গিয়ে। আর হতাম একেবারে নিরুদ্দেশ। আমার কথার রেশে কোনও ঐন্দ্রজালিকতা ছিল কিনা জানি না। হঠাৎ মারিয়ার তিরিক্ষি মেজাজটা হাল্কা হল। হি-হি করে হেসে উঠল। আর স্বরে মাধুরী মিশিয়ে বললঃ হ্যাঁ ঠিকই বলেছ, এই রেলওয়ে একটা স্পাইডার নেট। দুনিয়ার ভাল মানুষদের পাওয়ার জন্য রেলের পাত দিয়ে প্রকাণ্ড একটা ফাঁদ পেতে রেখেছি এখানে আমরা।

একবার এলে কেউ এখান থেকে যেতে চান না। যেমন ধর পুশকিনের কথা, দস্তয়েভস্কির কথা। তুর্গেনিভ-তলস্তয়- চেখভ এবং গোর্কিসহ আরও অনেক মহৎ লেখকের কথা। এদের জন্ম রাশিয়ার নানান জায়গায়। কিন্তু একবার এই শহরে পা দিয়ে এরা সবাই আটকা পড়ে গেলেন এর মায়াজালে পড়ে। সহজে কেউ ফিরে যেতে চাননি নিজেদের ঘরে। তোমাদের আগেও অনেকে এসেছেন ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট থেকে। তাদের কেউ কেউ এখানে ঘর বেঁধে সংসার পেতে থেকে গেলেন।

শুনেছি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তোমাদের একদল স্বাধীনতা বিপ্লবী এসেছিলেন এ শহরে। তাদের মাথার ওপর নাকি ঝুলছিল মৃত্যুদণ্ডের খাঁড়া। ফিরে যাননি আর তারা এখান থেকে। তোমরা এলে অনেক পরে। হয়ত তোমরাও বন্দী হয়ে থাকবে আমাদের মায়ার ফাঁদে। মিষ্টি করে হাসল মারিয়া।

বললামঃ ভালই তো হয় তাহলে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা তরজমা করে ওকে শোনালাম-

'ফাঁদ পাতা আছে ভুবনে। কে কখন ধরা পড়ে কে জানে'

আশ্চর্য তো! চমৎকার কবিতা আরও কী যেন বলতে যাচ্ছিল ও। মাঝখানে বাধা দিলাম। আগের কথার জের টেনে ওকে বললামঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কেন তার দেড়শ' -দুশ' বছর আগেও আমাদের অনেক স্বাধীনতা যোদ্ধা এসেছিলেন তোমাদের দেশে। ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে আমাদের নর্থ-ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ারের যুদ্ধের কথা নিশ্চয়ই শুনেছ। সেখানে সাহসী পাঠানদের বাস। খাইবার গিরিপথে একবার তারা দুই ডিভিশন ইংরেজ সৈন্যকে ঘিরে ধরে খতম করে দেয়। শেষে ইংরেজরা নিল কূটনীতির আশ্রয়। উপজাতীয়দের মধ্যে বিভেদ ধরিয়ে জায়গাটা দখল করে নিল। আর হাজার হাজার খাঁটি দেশপ্রেমিক যোদ্ধা ককেশাস, ইরান এবং উজবেকিস্তানের ভেতর দিয়ে পালিয়ে এসে ঠাঁই নিল রাশিয়ায়। তাদের অনেকে এই শহরেও আশ্রয় পেয়েছিলেন।

এরপর ১৮৫৭ সালে হল উপমহাদেশের স্বাধীনতার মহাবিপ্লব। তার প্রস্তুতি চলছিল আঠারোশ' পঞ্চান্ন-ছাপান্ন থেকে। তুমি ভালমতন জেনে থাকবে সে সময়টায় ক্রিমিয়ার সেবাস্তোপোল এবং বালাক্লাভা রণাঙ্গনে রুশ বাহিনীর সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ চলছিল ইঙ্গ-ফরাসী-তুর্কি এবং সার্ডিনিয়ান ফৌজের। কৃষ্ণসাগরে টহলরত ইঙ্গ ফরাসী রণতরীর বহর থেকে ক্রিমিয়ার মাটিতে নামানো হল আগ্রাসী সেনাদলকে। হল এক ভয়াবহ কামানযুদ্ধ। শেষে রাইফেল্স নিয়ে হল প্রচণ্ড হাতাহাতি যুদ্ধ।

www.pathagar.com

শুনে অবাক হবে তুমি আমাদের সাতান্নর মহান স্বাধীনতা বিপ্লবের পরিকল্পক এক বিপ্লবী, ডিপ্লোম্যাট এবং সাংবাদিক বিলাতে 'লণ্ডন টাইমস্' পত্রিকার সম্পাদক মিঃ ডিলনের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে দেখতে এসেছিলেন ক্রিমিয়ান ওয়ার। সেই চিঠির কল্যাণে রণাঙ্গনে ব্রিটিশ সেনাপতি জেনারেল লর্ড রেডক্লিফের খাস তাঁবুতে প্রবেশের অনুমতি পেয়েছিলেন ইণ্ডিয়ান কূটনৈতিক-সাংবাদিক আজিম উল্লাহ খান। মনে মনে তিনি ছিলেন রুশ সমর্থক। ব্রিটিশ মিত্রজোটের সেনাদলের দিকে তাক করে যখন ভারী রুশ কামান থেকে অবিরাম গোলার বৃষ্টি হচ্ছিল লোকটি তখন হর্ষোৎফুল্ল হচ্ছিলেন। কিন্তু পাছে ইংরেজরা সন্দেহ করে তার জন্য গম্ভীর হয়ে থাকলেন। ক্রিমিয়া থেকে ফেরার পথে কাবুলে রুশ রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বৈঠক হল আজিম উল্লাহ'র। ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে রাশিয়ার সামরিক সাহায্য চাইলেন তিনি। তখন আফগান এবং ইরান সীমান্তে রুশদের বিরোধ চলছিল ইংরেজদের সঙ্গে। তাছাড়া ইণ্ডিয়ান ইস্যুতেও ছিল দুই পক্ষের মন কষাকষি। এসব ঘটনার পটভূমিতে রুশ রাষ্ট্রদূত তার সরকারের পক্ষ থেকে বিপ্লবী আজিম উল্লাহকে আফগানিস্তানের ভেতর দিয়ে ভারতীয় স্বাধীনতা যোদ্ধাদের অস্ত্র সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

গণরোষের শিকার মুসোলিনীঃ ফাঁসির পর

ভারতে ফেরার পর স্বাধীনতা যুদ্ধের গোপন মুখপত্র 'মুক্তির বাণী' কাগজে সম্পাদক আজিম উল্লাহ্ ক্রিমিয়ায় রুশ যোদ্ধাদের বীরত্বের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। তাদের 'রুস্তম' তথা 'বীর' বলে আখ্যায়িত করলেন।

মারিয়া আমার কথা শুনে অবাক হল। সবিস্ময়ে বললঃ পুরনো দিনের এত কথা জান তুমি। দেখছি সাংবাদিকতার বাইরে ইতিহাস নিয়েও বেশ মাথা ঘামাও।

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে কিছু বাড়তি তথ্য দিল সে। বললঃ লেভ তলস্তয় থাকতেন তখনকার এই শহর সেন্টপিটার্সবুর্গে। তরুণ সেনা অফিসার হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন ক্রিমিয়ার সেবাস্তোপোল যুদ্ধে। বয়স ছিল তখন তার ছাব্বিশ। রণাঙ্গনে দুই পক্ষের হাজার-হাজার সাধারণ সৈনিকের লাশ ছড়িয়ে থাকতে দেখে নিদারুণ মর্মাহত হয়েছিলেন এই ঔপন্যাসিক।

সেই থেকে যুদ্ধবিরোধী হলেন তলস্তয়। পিটাসবুর্গ ফিরে এসে সে সময়কার কাগজে যুদ্ধের বিরুদ্ধে লিখলেন প্রচুর ছোট গল্প। লিখলেন কয়েকটি ছোট উপন্যাস। মারিয়ার কথায় সায় দিয়ে বললামঃ তাঁর বিশ্বনন্দিত উপন্যাস 'ওয়ার অ্যান্ড পীস' (যুদ্ধ ও শান্তি)-এ আমি দেখেছি এর স্পষ্ট ছাপ। বললামঃ ভিক্টোরিয়ান যুগের প্রধান ইংরেজ কবি টেনিসনের বিখ্যাত কবিতা 'লাইট ব্রিগেড' নিশ্চয় পড়েছ তুমি।

ঃ পড়েছি ঠিকই। তবে এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না। স্মৃতি হাতড়াতে লাগল ও।

ঃ কবিতাটি সেবাস্তোপোলে রুশ কামানের তীব্র আক্রমণ এবং তার রুশ পরিণাম নিয়ে লেখা। ব্রিটিশ বাহিনীর লাইট ব্রিগেডের ছয়শ' পঞ্চাশজন অশ্বরোহী সেনার ভেতর সাড়ে চারশ' জনই ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল রুশদের প্রচণ্ড গোলার আঘাতে। এই অযৌক্তিক যুদ্ধে ব্রিটিশ মায়েদের বুক খালি করে তাদের এত সন্তানের প্রাণহানি ঘটায় ইংল্যাণ্ডের ঘরে-ঘরে ওঠে কান্নার রোল। সে দেশের কাগজে- কাগজে নিন্দাধ্বনি ওঠে সাম্রাজ্যবাদী সরকারের বিরুদ্ধে।

দুই বিশ্বযুদ্ধের আগে ক্রিমিয়ার সেই ভয়াবহ যুদ্ধে মানবতার ধ্বংসযজ্ঞ নিয়ে পৃথিবী জুড়েও প্রথম তীব্র ঘৃণা এবং ধিক্কার উঠতে দেখা যায়। কবি টেনিসনও তখন ফেটে পড়েন ক্ষোভে এবং দুঃখে।

ঃ ওর কবিতার কিছু স্তবক মনে থাকলে বল। জানতে চাইল মারিয়া। স্টেশনের খোলা বাতাসে উড়ছিল ওর মাথার কালো চুল। দু'-এক গাছি লুটোপুটি খেলছিল কপালে।

আমি বললাম ঃ প্রথম দিককার মাত্র এই আটটি লাইন হয়ত বলতে পারবঃ

Cannon to right of them
Cannon to left of them
Cannon infront of them
Into the valley of death
Road the Six-hundred
They are not to make reply
They are not to reason why
They are but to do or die.......

কবিতাটির ভাবানুবাদ এ রকমঃ তাদের ডানে কামান/তাদের বাঁয়ে কামান/ তাদের সামনে কামান/ তারা ধেয়ে চলল মৃত্যু উপত্যকার দিকে/ ছিল তারা ছয়শ'

www.pathagar.com

অশ্বারোহী/ তাদের বলা হল না পাল্টা জবাব দিতে/ তারা জানত না তাদের পাঠানো হল/ শুধু একটি কথাই তারা জানে/ মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন-----।

শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল রুশ নন্দিনী। শেষে বললঃ টেনিসন কম্বুকণ্ঠে সত্যের বাণীই উচ্চারণ করেছেন। ইউরোপের পূর্ব সীমান্তের মীমাংসাযোগ্য একটি সাধারণ প্রশ্ন নিয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা সেকালে এ রকম একটা বর্বর যুদ্ধে মেতে উঠেছিল।

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে এদেরই এককালে দোসর ইটালীর ফ্যাসিস্ট মুসোলিনীর কী হাল দাঁড়াল? মুসোলিনী তার সমরযন্ত্রের দাপটে উত্তর আফ্রিকা আর দক্ষিণ ইউরোপকে গোলাম বানাতে চেয়েছিলেন। খোদ ইটালীয়ানদের ওপরও চালিয়েছিলেন নিপীড়নের স্টিমরোলার। কিন্তু তার পরিণাম কী হল ?

ফ্যাসিবিরোধী দেশপ্রেমিক ইটালীয়ান জনগণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রোমের পতন শেষে পলায়নপর ডিক্টেটরকে ধরে এনে প্রকাশ্যে ঝুলিয়েছিলেন ফাঁসিতে। পথের পাশের একটি গাছে তিন দিন ধরে পচছিল হিটলারের এককালের এই গুরুর লাশ। মহিলারা ঘৃণায় থু-থু ছিটিয়েছিল দুর্ধর্ষ লোকটির মৃতদেহের মুখে।

হিটলারের নাৎসী ফৌজের সঙ্গে লেনিনগ্রাদকে পিষে ফেলতে মুসোলিনীও ফিনল্যান্ডের ভেতর দিয়ে পাঠিয়েছিলেন ওর দশ ডিভিশন ফ্যাসিস্ট সেনা। নাৎসী এবং ফ্যাসিবাদের সেই পুতুল সেনারাও খোরাক হয়েছিল আমাদের কামানের। সংলাপের মধ্যেই ছুটে আসতে দেখা গেল লেনিনগ্রাদের একদল স্বাগতিককে। সবার সামনে ছিল পার্টটাইম-গাইড নাদিয়া। পুরো নামঃ নাদিয়া পলিয়া নোভানা। সুদর্শনা এক তরুণী। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের শেষ বর্ষের ছাত্রী। দেরী হওয়ার জন্য হাতজোড় করে ক্ষমা চায় ও মারিয়ার কাছে। রুমে ঢুকে হাতবাড়িয়ে ওয়েলকাম জানান নাদিয়া আমাদের সবাইকে। হাসবার সময় টোল ফুটছিল মেয়েটির দুই গোলাপী গালে। ওর পেছন-পেছন রুমে ঢুকলেন আরও ছয়জন। ওদের মধ্যে ছিলেন আধাপাকা দাড়ির এক প্রবীণ। রুমে উষ্ণ করমর্দন আর ওয়েলকামের একটা ধ্বনি জাগল।

নাদিয়া কৈফিয়ত দিলঃ কারপার্কের ভিড়ে তিনখানা গাড়ি রাখতে এতটা বিলম্ব হল আমাদের।

প্রবীণ ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে মারিয়া বললঃ ইনি ডক্টর ভাসিলি চেরখভ। লেনিনগ্রাদ হিস্টরিক্যাল ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ। এই শহরের জীবন্ত বিশ্বকোষ একটি। এর কাছ থেকে শুনতে পাবে তোমাদের জানবার মতন সব বৃত্তান্ত।

ডক্টর ইয়ানকে অভিনন্দন জানালাম। ওর সঙ্গে ছিল ওর এক সহকারী গবেষক। আর বাকিরা ছিল এখানকার এপিএন প্রতিনিধি।

কিছুক্ষণ পর সবাইকে নিয়ে একটি মাইক্রো এবং দুটি কার ছুটল শহরের দিকে।

ঘুমের মধ্যেও কেমন একটা ভয়ের স্বপ্ন দেখছিলাম। মনে হলো কোথা থেকে ঝাঁক-ঝাঁক শকুন এসে ঘিরে ফেলেছে একটা স্বচ্ছ সুন্দর নির্মেঘ আকাশ। হঠাৎ

www.pathagar.com

ওরা নিচে নেমে ছোঁ মারতে শুরু করল বাজ পাখির মতন। মুখ থেকে ওদের উগ্‌রে পড়তে দেখলাম আগুনের শত-সহস্র লেলিহান শিখা। সেই আগুনে পুড়ে ছারখার হচ্ছে চারপাশের সব শস্যক্ষেত, সার-সার গ্রাম আর মাঝখানের বিশাল এক শহর। শোনা যাচ্ছে বিপন্ন নারী-পুরুষ এবং শিশুর আর্ত হাহাকার।

সেই সঙ্গে কানে ভেসে এলো বিকট সব গর্জন। ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে দেখি একপাল হিংস্র দানব ডায়নোসরের মতন লাল জিভ বের করে ধেয়ে আসছে লোকালয়গুলোর দিকে। তাদের দাপাদাপিতে লণ্ডভণ্ড হচ্ছে চারপাশের সব সবুজ অরণ্য, বাগবাগিচা। দুমড়ে-মুচড়ে ভেঙ্গে পড়ছে মানুষের ঘরবাড়ি। তছনছ হচ্ছে শান্তিপূর্ণ সব জনবসতি। শোনা যাচ্ছে নারী এবং শিশুর পরিত্রাহী চিৎকার। আর কারা যেন পিশাচের মতন হা-হা করে হাসছে পেছন থেকে।

কানে এল কেমন সব ভয়ঙ্কর বিকট শব্দ, আঁতকে উঠে সেদিকে চাইতেই দেখি ছুটে আসছে ঝাঁকের পর ঝাঁক পঙ্গপাল। যেন গোটা পৃথিবীটাকে গ্রাস করবার জন্যে সাঁই-সাঁই করে ধেয়ে আসছে ওরা। কিছুক্ষণ পর দেখলাম সর্বগ্রাসী এক ধ্বংস-তাণ্ডবের বিভীষিকার ছবি। মনে হল হাজার হাজার মাইল জুড়ে হচ্ছে ভূমিকম্প। সাগরের বুকে চলছে তোলপাড়। ধসে পড়ছে পাহাড়ের পর পাহাড়। কী আশ্চর্য, হঠাৎ এই তুলকালামের মধ্যে ভেসে উঠতে দেখলাম একটি বিকৃত কুৎসিত মুখ। ভয়ে চুপসে গেলাম। কেমন বিকট আওয়াজ লোকটির গলায়। তর্জন-গর্জন করে কাদের যেন হুকুম দিচ্ছে সে একটা শহরকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়ার জন্যে।

বলছেঃ মানুষের আমার দরকার নেই। আমি চাই মাটি। চাই একটার পর একটা দেশ। ওই পুবের বর্বরদের বাঁচিয়ে রাখলে ওরা হবে আমাদের মস্তো বোঝা। ওদের খেতে দেবে কে? সুতরাং ওদের নির্মূল করে দাও। কীটপতঙ্গের জন্যে দয়া দেখিয়ে লাভ নেই। ভয়ে সিটিয়ে উঠে দেখলাম লোকটার সব কটি দাঁতের গোড়ায় রক্ত। যেন নরখাদক এক দানব সে।

ঘুমের মধ্যেই কে যেন জোরে ধাক্কা দিল। শুনতে পেলাম এক মেয়েলি গলার আওয়াজঃ কী হল তোমার মিস্টার নূরী? অমন করে কাঁপছ কেন। আবার বিড়বিড়ও করছ। জ্বর হল নাকি তোমার?

একটা ঠাণ্ডা হাতের ছোঁয়া লাগল কপালে। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চোখ খুলতেই দেখি উদ্বিগ্ন হয়ে আমার কপালের তাপ পরখ করছে মারিয়া। আসলে শেষ রাতের ঠাণ্ডায় খানিকটা জ্বর-জ্বর ভাব হয়েছিল শরীরে। মারিয়া উৎকণ্ঠিত হল আমার জন্যে। হাজার হোক আমাদের অভিভাবিকা এখন সে। আমাদের বঙ্গ সন্তানদের সব দায়দায়িত্ব বর্তিয়েছে ওর ওপর। অভয় দিয়ে মারিয়া বললঃ তেমন কিছু হয়নি তোমার। সামান্য তাপ শরীরে। লেনিনগ্রাদ পৌঁছেই ডাক্তার দেখাবো।

জিজ্ঞেস করলামঃ আর কত দূর লেনিনগ্রাদ?

ঃ এই তো এলাম বলে। আমার ঘড়িতে এখন ভোর চারটা বেজে ত্রিশ মিনিট। ঠিক পাঁচটায় পৌঁছে যাব।

www.pathagar.com

ঃ তাহলে তো তৈরী হয়ে নিতে হয়।

ঃ অমন তাড়াহুড়ার দরকার নেই। আমাদের রিসিভ করতে লোক আসবে স্টেশনে। তাছাড়া ওটাই তো ট্রেনের শেষ গন্তব্য। সারাদিন ওখানে থাকবে। আবার মস্কোর দিকে ছাড়বে রাতে। বলল মারিয়া। ওপরকার ঝুলন্ত আসন থেকে নিচে নামলাম। এবার হুকুম দিল ও। টয়লেটে গিয়ে ভালোমতন হাতমুখ ধুয়ে নাও। ওখানে সাবান-তোয়ালে আছে। চাইলে মাথাটাও ধুয়ে নিতে পার। খানিকটা আরাম বোধ করবে। মারিয়া নিজের আসনে গিয়ে বসল। হ্যান্ড-ব্যাগ থেকে ছোট একটি আয়না আর চিরুনি বের করে চুল পরিপাটি করতে লাগল। নিচে নেমে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই বললঃ গুড মর্নিং। উইশ ইয়োর গুড্ হেল্থ। আমি প্রতি অভিবাদন জানালাম।

মিষ্টি হেসে আবার হুকুম করলঃ আর এক সেকেন্ডও দেরি নয়। টয়লেটে ঢুকে পরিচ্ছন্ন হয়ে আসো।

যুদ্ধজয়ী রেড আর্মির বিজয় পতাকা

শাওয়ার খুলে মাথায় পানি ঢাললাম মিনিট তিনেক। হাতমুখ ধুয়ে এসে বসলাম ওর পাশে। শরীরের তাপটা কমে গেল। বেশ স্বস্তিবোধ করছিলাম।

এবার মুচকে হাসল মারিয়াঃ বেশ সুস্থ দেখাচ্ছে তোমায়। আচ্ছা অমন বিড়বিড় করছিলে কেন? সীন্ এনি ব্যাড ড্রিম? কোনও দুঃস্বপ্ন দেখনি তো।

আমি ওকে ওই বিকট লোকটির কথা বললাম। ওর তর্জন-গর্জনের কথা বললাম।

www.pathagar.com

লোকটা তার সাগরেদদের হুকুম দিয়েছে নর-নারী- শিশু সমেত একটা জনাকীর্ণ শহরকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে। আরও কী চোখের সামনে ভাসতে দেখলাম জানো। ভূমিকম্প হচ্ছে। আকাশে জ্বলছে দাবানল। ধসে পড়ছে সব ঘরবাড়ী। আর্তনাদ তুলছে শিশুরা। পশ্চিম দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে ধেয়ে আসছে পঙ্গপাল।

আমার দুঃস্বপ্নটার কথা শুনে বিষণ্ন হয়ে উঠল মারিয়ার মুখ। কাতর গলায় বললঃ তোমার দেখা ওই লোকটি হল আমাদের এই শহর আর দেশটার সেকালের জীবন্ত অভিশাপ অ্যাডল্‌ফ হিটলার। ছোট বেলায় কাগজে নিশ্চয় পড়েছ আটঘন্টার মেয়াদে লেনিনগ্রাদ শহরটাকে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিতে নাজি বাহিনীর জেনারেলদের হুকুম দিয়েছিল ওই ফ্যাসিস্ট ডিক্টেটর। তার আরও নির্দেশ ছিল আট দিনের মাথায় যেন মস্কো দখলে আসে র্জামানীর। আর এক মাসের ব্যবধানে গোটা রাশিয়াকে ছারখার করে ফ্রান্স আর পূর্ব- উত্তর ইউরোপের দেশগুলোর মতন নতজানু করা হয়।

একটু থেমে ফের বললঃ হিটলার ভেবেছিল আমাদের দেশটা অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, পোল্যান্ড অথবা ফ্রান্স। ডানকার্কের যুদ্ধে ব্রিটিশ এবং ফরাসি ফৌজকে নাস্তানাবুদ করে বিশ্বজয়ের ভূত নোপোলিয়নের মত ঘাড়ে চেপে বসেছিল তার। ডানকার্কে বেলজিয়ামের পতনের পরে- পরেই ম্যাজিনো লাইন চুরমার দখল করে নিল ফ্রান্স। হানা দিল ইংলিশ চ্যানেলে। ব্রিটেন প্রায় নাজিদের দখলে যায় -যায়। সাংবাদিক হিসাবে নিশ্চয় তোমরা জানো হিটলারের এই দেশ জয়ের নেশার পেছনে ছিল ত্রিশ দশকের ফ্রান্স আর ব্রিটেনের তোষণ নীতি।

ব্রিটেনের তখনকার প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন ১৯৩৮ সালের ২৯ মে মিউনিখ চুক্তির-দলিলে সই করে দাসখত লিখিয়ে দিয়েছিলেন। হিটলারকে। ওঁদের ভয় ছিল সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত দেশকে। যদি বলশেভিক বিপ্লব ব্রিটেন এবং ফ্রান্সকেও ভাসিয়ে নেয়। তাই নিজেদের স্বার্থে ওঁরা চেকোশ্লোভাকিয়াকে বলি দিলেন হিটলারের হোমানলে। অথচ দুই দেশের সংগেই ছিল দেশটির মৈত্রী চুক্তি। এরকম দুরপনেয় কলংক গায়ে মেখেও চেম্বারলেন লণ্ডনে ফিরে গিয়ে জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে বড় গলায় বললেনঃ আমার মনে হয় 'আমাদের যুগের সবচেয়ে তাৎপর্যবহ এক শান্তি দলিলে সই করে এসেছি আমি।'

সাংবাদিকদের সঙ্গে ব্রিটেনবাসীরাও হতবাক হলেন চেম্বারলেনের এই ঘোষণায়। দালাদিয়ের ছিলেন তখন ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি। প্যারিসে তাঁর ভাষণ শুনে ফরাসিরাও ভেঙে পড়ল। এর পরিণাম ভোগ করতে হল এই দুই নেতা এবং ওঁদের দুই দেশকে। হিটলার ক্রিমিকিট মনে করতেন চেম্বারলেন এবং দালাদিয়েরকে। ১৯৪০ সালেই ফ্রান্স গেল জার্মানির পেটে। বাকি থাকল ব্রিটেন। দুই দুর্বল মিত্রের শেষ নিঃসঙ্গ মিত্র। ভাগ্যিস এসময় চেম্বারলেনের মৃত্যুর পর ব্রিটেনের ক্ষমতায় এসেছিলেন দৃঢ়চেতা রাজনীতিক ইউনস্টন চার্চিল। কঠিন হাতে ইংল্যাণ্ডের ডুবন্ত তরীর হাল ধরলেন তিনি।

www.pathagar.com

আটলান্টিক মহাসাগরে যুদ্ধ জাহাজে বসে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ফ্রাংকলিন ডিলানো রুজভেল্টকে ভেড়ালেন তিনি মিত্র জোটে। দুই নেতা সই করলেন আটলান্টিক চার্টারে। এদিকে মার্কিন কংগ্রেস যুদ্ধে মিত্রদের সহায়তা দেয়ার জন্যে পাশ করল লেন্ড-লীজ বিল। যাতে নাজি হিটলারের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো যে কোনও মিত্র দেশকে জরুরী প্রয়োজনে যে কোনও পরিমাণ সমরাস্ত্র আর রসদ ধারে সরবরাহ করবার ব্যবস্থা ছিল।

এদিকে হিটলার মুখে আপ্তবাক্য উচ্চারণ করলেও আসলে সোভিয়েত দেশকে চোখের বিষ মনে করতেন। ফ্রান্স দখলে যাবার পর তাই তার বন্দুকের নল তাক করা হল রাশিয়ায়। ১৯৩৯ সালে দশ বছরের জন্য সোভিয়েত-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি হয়েছিল। সেই চুক্তিকে বাজে কাগজের ঝুড়িতে নিক্ষেপ করল নাজিরা। সব কিছু রাখা হল গোপন। একদিন বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ দস্যুর মতন রাতের অন্ধকারে রুশ সীমান্তে ঢুকে পড়ল নাজি বাহিনী।

তারিখটি ছিল ১৯৪০ সালের ২২ জুন। রাত তখন ৩টা ৩০ মিনিট। সীমান্ত ফাঁড়িগুলোতে রেড আর্মির সেনারা ছিলেন তখন ঘুমে বিভোর। হঠাৎ তাদের ফাঁড়িতে বৃষ্টির মতন পড়তে লাগল গোলাগুলি। তিন দিক থেকে নাজিরা আক্রমণ করল রাশিয়া। বাল্টিক সাগরের পথে ফিনল্যাণ্ডের ভেতর দিয়ে হামলা চালাল লেনিনগ্রাদ অভিমুখে। ইউক্রেনের ভেতর দিয়ে ঝড়োগতিতে ছুটল কিয়েভের দিকে। আর মস্কো দখলের জন্যে ক্রিমিয়া হয়ে ককেশাসের ভেতর দিয়ে ধেয়ে চলল ভল্গার তীর লক্ষ্য করে।

অনাক্রমণ চুক্তি ছিল বলে স্তালিন ভাবতেও পারেননি হিটলার অমন করে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। যুদ্ধের জন্যে তাই প্রস্তুত ছিলেন না আমাদের নেতারা। না আমাদের সেনাবাহিনী। কিন্তু যেই শুরু হল নাজি অগ্রাভিযান অমনি স্তালিন ফিল্ড মার্শাল হয়ে যুদ্ধের ভার নিলেন। জনগণকে ডাক দিলেন গণফৌজ আর গেরিলা বাহিনীতে যোগ দিয়ে নাজি সেনাদের রুখতে। বললেনঃ জান কবুল করে হলেও ওদের নিশ্চিহ্ন করে দাও।

ওই দুঃসময়ে আমরা মিত্র হিসাবে পেলাম ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে। কিন্তু ওদের সাহায্য আসবার আগেই মার্শাল জুকভ মস্কোর দ্বারপ্রান্তে খতম করলেন প্রায় কুড়ি ডিভিশন নাজি সেনা। বাঁচি কি মরি করে পিছু হটতে লাগল বর্বরেরা। হিটলারের তেত্রিশ ডিভিশন সৈন্য আত্মসমর্পণ করলো লালফৌজের হাতে। যুদ্ধের এই ব্যর্থতার জন্যে মস্কো অভিযানকারী ফিল্ড মার্শাল এবং জেনারেলদের দু-একজন বাদে সবাইকে ফায়ারিং স্কোয়াডে দাঁড় করিয়ে হত্যা করা হল হিটলারের নির্দেশে। নিজেই হলেন তিনি ইস্টার্ন ফ্রন্টের সর্বাধিনায়ক।

স্তালিনগ্রাদে কবর রচিত হল জার্মানদের। এদিকে দুবছর ধরে লেনিনগ্রাদে ওদের মরণ ফাঁদে ঝুলিয়ে রেখে খতম করেছি আমরা। হঠাৎ মারিয়া পুরনো স্মৃতিচারণ করতে করতে থেমে গেল। দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। বললঃ ঘরে-ঘরে যুদ্ধ দিয়েছে এই

www.pathagar.com

শহরের ত্রিশ লাখ মানুষ। আমার বয়স তখন চৌদ্দ। স্কুলে পড়তাম। গেরিলা ট্রেনিং নিয়েছিলাম। আমিও যুদ্ধ করেছি বয়স্কদের পাশে দাঁড়িয়ে। রাতদিন চারদিকে খাল এবং পরিখা খুঁড়েছে এই শহরের লাখ লাখ নারী পুরুষ, শিশু-কিশোর। এই গভীর খাল পেরিয়ে শহরের ভেতরে ঢুকতে পারেনি শত্রুর ট্যাংক। কারণ তার ভেতরে পাতা ছিল মাইনের জাল। নাজি ট্যাংকই-না ঘায়েল হয়েছে এই ফাঁদে পা দিয়ে। প্রায় হাজারখানেক জার্মান জঙ্গী এবং বোমারু বিমান ধ্বংস হয়েছে আমাদের অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট কামানের গোলায়। বাড়ির ছাদে, কলকারখানায় এবং ঝোপজংগলে মোতায়েন ছিল আমাদের শয়ে-শয়ে বিমানবিধ্বংসী কামান।

এক সময়ে রুমালে চোখ মুছতে দেখলাম মারিয়াকে। বিস্মিত হলাম। জিজ্ঞেস করলামঃ কী হল তোমার?

ঃ আমার মনে একটি দুঃখ আছে ভাই। করুণ গলা মারিয়ার।

ঃ বলোই না কথাটা?

পরে বলবো। হঠাৎ ধড়ফড়িয়ে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ও। আমরা এসে গেছি লেনিনগ্রাদ।

ঃ লেনিনগ্রাদ তাকিয়ে দেখি ট্রেন ঢুকছে টার্মিনালে।

কথা বলতে বলতে যাচ্ছিলাম আমরা। জানালার ধারে বসে দুই চোখ ভরে দেখছিলাম শহরটা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় উনিশ শ' একচল্লিশের আগস্ট থেকে তেতাল্লিশ পর্যন্ত প্রায় প্রতিদিনই কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় থাকত এ শহরের নাম। কোনও কোনও দিন এটি দখল করত সংবাদ শিরোনাম।

অবাক হয়ে ভাবছিলাম-কী আশ্চর্য এখন সেই শহরের সড়ক বেয়ে চলছি আমি। মনে হল স্বপ্ন দেখছি না তো? আস্তে আস্তে খুলতে লাগল স্মৃতির জট। যেন সেখানে জ্বলছে একটি শুকতারা। তার আলোয় ঝলকাতে দেখলাম অতীতের মুখ। স্কুলের সেভনে-এইটে পড়লেও যুদ্ধ আমার কিশোর মনটাকে বয়স্ক করে তুলছিল।

প্রতিদিনই উজ্জ্বল হয়ে থাকতাম কখন হাতে পাব দু'তিনটি দৈনিক কাগজ। মফস্বল শহর নেত্রকোনায় একদিন বাদে আসত কলকাতার দৈনিক। ট্রেনযোগে বড় বড় প্যাকেট-বন্দী হয়ে আসত আজাদ, যুগান্তর, আনন্দবাজার, অমৃতবাজার এবং স্টেটসম্যান। বাসার পাশেই থাকতেন মহকুমা প্রোপাগাণ্ডা অফিসার তথা সরকারের মহকুমা প্রচার কর্মকর্তা ইজ্জতউল্লাহ সাহেব। তার রেসিডেন্স-কাম অফিসে কলকাতার সব কাগজই আসত। ভোর বেলা ঘন্টা দুই ক্লাসের বই নাড়াচাড়া করেই ছুটতাম তার অফিস-ঘরের দিকে। ওর অফিসের টেবিলে সাজানো থাকত দৈনিকসহ রকমারি কাগজ। সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও প্রচুর উৎসাহবোধ করতেন। যুদ্ধের সময়ে বেশ জোরেশোরে চলছিল স্বাক্ষরতা অভিযান। তিনি ছিলেন এই অভিযানেরও একজন কর্মকর্তা। ওর উদ্যোগে শহরের উপকণ্ঠে এবং অনেকগুলো গ্রামে গড়ে উঠল দরিদ্র কর্মজীবী বালক-বালিকা আর বয়স্কদের জন্য ত্রিশ-চল্লিশটি নাইট স্কুল। এসব নৈশবিদ্যালয়ে শিশু-কিশোরদের প্রথম পাঠের বইটির নাম ছিল

www.pathagar.com

'ছোটদের বই'। বয়স্কদের বইয়ের নাম 'বড়দের বই'। বিনামূল্যে এসব বই দেয়া হত পড়ুয়াদের তার অফিস থেকে। তাকে আমরা মহকুমা 'মুকুল মফিলের মেলার'ও পৃষ্ঠপোষক করেছিলাম।

মনে আছে নলুয়াপাড়া নামে শহরের উপকণ্ঠের একটি গ্রামের কথা। নিরক্ষরতার ডিপো এটি। পুরো গ্রামে বড় জোর দু'/তিন জন ছিল সাক্ষর। আর সবাই আকাট অশিক্ষিত। গ্রামটি ছিল পৌরসভা এলাকার অন্তর্গত। গ্রামের মোড়ল ছিলেন হিটলারের মতন এক জাঁদরেল স্বেচ্ছাচারী। তিনি তার অধীন গ্রামবাসীদের দাসানুদাস মনে করতেন। এদের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখে মানুষ হোক এটা তিনি একদম সইতে পারতেন না। ভাবতেন চোখ ফুটলে এরা তার একচ্ছত্র আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করবে। তার মধ্যযুগীয় সালিশ-বিচার, অন্যায়-অনাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে।

গ্রামের লোকদের প্রায় সবাই ছিল নলচে বাঁশের কারিগর। বাঁশের নানারকম শৈল্পিক কাজে পারঙ্গম ছিল এরা। এদের হাতে-বোনা বাঁশের বেড়ার কোনও তুলনা ছিল না। নলচে বাঁশের পটুয়া ছিল বলে এদের নামে গ্রামটির নাম হয়েছিল নলুয়াপাড়া। মোড়লের বিধিনিষেধের জন্য পৌর এলাকায় হলেও গ্রামটা ছিল প্রদীপের তলায় এক জমাট অন্ধকারের আখড়া।

ভাঙ্গা-চোরা ইটের রাস্তার দু'ধারে ছিল বুনো আগাছার ঝোপঝাড়। ময়লা-আবর্জনার স্তূপ ছিল সর্বত্র। ঝোপঝাড়ের তলায় অবলীলায় মলমূত্র ত্যাগ করত নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই। কারণ একটিও ল্যাট্রিন ছিল না তিন-চার হাজার লোকের একটি পল্লীতে। এর জন্য মোড়ল সাহেব কখনও পৌর কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হননি। কারণ তিনি চাইতেন দুর্গতির মধ্যে থাকলেই লোকজন রাজা হিসেবে নতজানু হয়ে থাকবে তার কাছে।

আশ্চর্য, লোকটার নামের আগে ঠিকই ছিল একটা রাজভূষণ। নাম ছিল রাজা আলী বেপারি। উদ্ভট ছিল রাজা আলীর বিচার ব্যবস্থা। গ্রামের কেউ বড় ধরনের অপরাধ করলে সভা ডেকে তাকে মাথাখত কিংবা নাকেখত দেয়া হত। মাটিতে লম্বা দাগ টেনে অপরাধীকে হুকুম করা হত ওই দাগ বরাবর কপাল ঠুকে যেতে। অপরাধের মাত্রা বেশী হলে দৈর্ঘ্য হত দাগের সীমানা। দশ গজ থেকে একশ' গজ পর্যন্ত। অনেকের কপাল রক্তাক্ত হত দাগের মাটিতে কাঁচ কিংবা ইটের টুকরো থাকলে।

আবার অনেককে ঝাড়ু, লাঠি এবং বেতপেটা করা হত। কাউকে-কাউকে দেয়া হত সূর্যচ্যাঙা সাজা। গোপনে নজরানা দিলে অনেকে আবার রেহাই পেত সাজা থেকে। লোক দেখানোভাবে দু'একটা ধমক দিয়ে কিংবা ভবিষ্যতে কঠিন সাজা দেয়া হবে এরকম হাঁকডাক ছেড়ে অপরাধীকে বিদায় করা হত মাঝে মাঝে।

গোবেচারা বাঁশ শ্রমিকরা উল্টো সাজার ভয়ে টুঁ শব্দটিও করত না। কারণ মোড়ল রাজা আলীর ছিল বাঁশের বড় কারবার। তার আড়ত থেকে অনেক সময় বাঁশ ধারে এনে এদের কাজ করতে হত। সুতরাং মোড়লের কথার ওপর কথা বললে এদের মরতে হবে না খেয়ে। একদিন নানারকম চাটুবাক্যে, অশিক্ষিত

www.pathagar.com

মোড়লকে বশ মানিয়ে আমরা ক'জন ওপর ক্লাসের শহুরে ছাত্র ওর সঙ্গে বৈঠকে বসলাম। তাকে দাদা সাহেব বলে সংবোধন করলাম। ভদ্রঘরের ছেলেদের মুখে 'দাদা' ডাক শুনে বর্তে গেলেন তিনি। বললাম; বড় অফিসার ইজ্জত সাহেব আপনার বাড়ীতে।

বড় অফিসারের কথা শুনে উনি ভড়কে গেলেও খুশি হলেন। ইজ্জতউল্লাহকে স্বাগত জানানোর জন্য গেট সাজানো হল। টেবিল চেয়ার বসানো হল। রাতের বেলা ছিল হেজাক লাইটের বন্দোবস্ত। সভায় কৌশলে সভাপতি করা হল মোড়লকে।

ইজ্জতউল্লাহ সাহেব শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করলেন। বললেন; আপনারা সবাই মিলে একটি নাইট স্কুল করুন। সরকার টাকা দেবে। আপনারা নল-শ্রমিক। নলের পাত দিয়ে একটি স্কুলঘর করুন। মাদবর নাখোশ হলেও ওর কথায় সায় না দিয়ে পারলেন না। গ্রামবাসীরা এক রাতেই চল্লিশ হাত লম্বা একটি স্কুলঘর করল। দিনে স্কুলে পড়ত মেয়েরা। রাতে শ্রমিকেরা। পঞ্চাশ-ষাট বছরের বৃদ্ধরাও শিক্ষিত হতে লাগল। দেখতে দেখতে যেন একটা বিপ্লব ঘটে গেল গ্রামে। উত্তর-পূর্ব ইউরোপের এই উদ্যান নগরীর পথ চলতে চলতে স্কুল জীবনের সেই স্মৃতিটা বার বার ছায়া ফেলতে থাকল আমার মনের কানাচে। সেন্ট পিটার্সবুর্গ শহরের ইতিহাস পড়েছি 'দ্য ব্যাটল অভ্ লেনিনগ্রাদ' গ্রন্থের একটি অধ্যায়ে। মার্বেল, রেড-গ্রেনাইট, কোয়ার্টজাইট আর পরফিরি পাথর দিয়ে গড়েছিলেন প্রথম পিটার এই স্টোন-সিটি। শহর থেকে বহু মাইল দূরের কারেলিয়া মালভূমির পাথর এগুলো। ভূমিদাস শ্রমিকরা কোটি কোটি টন পাথর নৌকায় করে বয়ে আনে নেভা নদী দিয়ে। তারপর মাথায় তুলে পাথরের বড় বড় চাঙর নামায় নির্মাণের জায়গায়। এই কঠিন শ্রমের কাজে ক্লিষ্ট-ন্যুজপৃষ্ঠ হয়ে মারা যায় হাজার হাজার পাথরশ্রমিক। অনেকের জীবনলীলা সাঙ্গ হয়েছে পাথরের তলায় চাপা পড়ে। ইতিহাসে তাই বলা হয়েছে পিটার্সবুর্গ শুধু মার্বেল এবং রেড-গ্রেনাইটেই গড়া নয়-শ্রমিকের হাড় দিয়েও গড়া।

রাস্তার দু'পাশের বহুতল ইমারতগুলো দেখছিলাম। পিটার দ্য গ্রেটের যুগে এসব ইমারতে বাস করতেন পিটার এবং তার পরবর্তী উত্তরাধিকারী জারদের মন্ত্রী, সভাসদ, সেনানায়ক, পদস্থ আমলা, অভিজাত ডাচ-ডাচেস, প্রিন্স-প্রিন্সেস আর ধনপতি ব্যবসায়ীর দল। আর নগর-উপকণ্ঠে এবং পাশের গ্রামগুলোর খুপড়ি ঘরে বাস করত রাজমিস্ত্রী, দিনমজুর, জাহাজের কুলি-খালাসি, নাবিক, সৈনিক, অল্প বেতনের কেরানিকুল। যাদের 'প্রোলেতারিয়েত' বলে নাক-সিটকানো হত।

আঠারো শতকের শেষ দিকে আর উনিশ শতকে জৌলুস এবং উচ্চমার্গীয় জীবনযাত্রার জন্য ইউরোপের রূপসী সম্রাজ্ঞী হয়ে ওঠে এই শহর। এক সময় উর্বশী প্যারি নগরীও ম্লান হয়ে যায় এর কাছে। শহরের রাজরাজড়াদের ছিল বিলাসিতার জোয়ার। সেখানে ফ্রান্সের লুই রাজবংশ এবং ইংল্যাণ্ডের টিউডরদের রাজা-রানী-রাজকুমারীদের পোশাক-আশাক, উন্নাসিকতা আর রয়্যাল কালচারের সঙ্গে পাল্লা ধরে চলত এদের জাকজমকের বাহার।

www.pathagar.com

নগরকেন্দ্রের অভিজাত এলাকায় পশ্চিম ইউরোপের দেখাদেখি গড়ে উঠতে থাকে একটার পর একটা প্রমোদশালা, থিয়েটার, ব্যালে নৃত্যালয়। সৌখিন মহিলারা নাচে-গানে মুখর করে রাখতেন প্রমোদ নিকেতনগুলো। যেখানে মধ্যবিত্তদের প্রবেশ ছিল নিষেধ। বেলেল্লাপনায়ও জুড়ি ছিল না এই অভিজাত স্বেচ্ছাচারী প্রিন্স-প্রিন্সেসদের। তবে উনিশ শতকে এই শহরে বেশ কিছু মহৎ মানুষেরও আবির্ভাব ঘটতে দেখা যায়। এরাই রাশিয়ার সাহিত্য সংস্কৃতি, চারুকলা-স্থাপত্য, নাট্যশিল্প, সংগীত এবং লোকসাহিত্যকে উৎকর্ষের তুঙ্গে উঠিয়েছিলেন। এদের সাধনায় রুশ সংস্কৃতি হয়েছিল বিশ্বগামী। তার সাংবাদিকতা গণমানুষের সমতল স্পর্শ করে আন্তর্জাতিক মানে ওঠার গৌরব লাভ করে। এই অগ্রগামী মনীষীদের সাহসিক ভূমিকার কল্যাণেই এটা সম্ভব হয়।

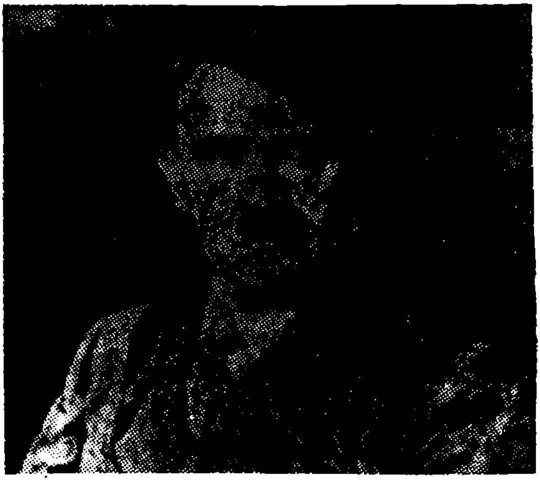

হিটলার

এখানকার সাহিত্য এবং সংস্কৃতি আন্দোলনের পথিকৃৎ পুরুষ ছিলেন এরা। এদের প্রয়াসেই এখানে গড়ে ওঠে অনেক লেখক সমিতি, সংস্কৃতিকেন্দ্র, পত্রিকাকেন্দ্রিক কবি-সাহিত্যিকদের আড্ডা, বিজ্ঞান গবেষণাগার, পৌরাণিক জাদুঘর ইত্যাদি অসংখ্য প্রতিষ্ঠান।

উনিশ শতকের আগে পশ্চিম ইউরোপে রুশ দেশকে মনে করা হত এশিয়ার একটি বার্বারিয়ান কান্ট্রি। জারদের মনে করা হত চেঙ্গিজখান, বাতুখানদের অশিক্ষিত-বর্বর উত্তরসূরী। গোটা দেশের ওপর আরোপিত এই কলংক প্রথম ঘোচালেন বিশ্বজয়ী কবি পুশকিন। তার তেজোদ্দীপ্ত ছন্দময় কবিতা 'দ্য ব্রোঞ্জ হর্সম্যান' পশ্চিমের ভিক্টোরিয়ান যুগের জাতিধর কবি, ঔপন্যাসিক এবং পণ্ডিতদের বাধ্য করল প্রথম বিস্ময়ভরা চোখ তুলে রাশিয়ার দিকে তাকাতে। তাদের হঠাৎ ঘুম ভাংল। অনুভব করলেন তারা-না, হেলাফেলা করবার মতন দেশ নয় রাশিয়া পুশকিনের পরে পরে আবির্ভাব ঘটল আরও একপুঞ্জ উজ্জ্বল নক্ষত্রের। কাব্যে, উপন্যাসে, ছোটগল্পে, নাটকে, চারুশিল্পে, সাংবাদিকতায়, রাজনীতিতে, সমাজ বিপ্লবে তাদের তোলা ঝড় আলোড়ন জাগাল পশ্চিম ইউরোপসহ তাবৎ দুনিয়ায়। এবার পুরোপুরি মোহভঙ্গ হল পশ্চিমের। সাহিত্যে ইংল্যাণ্ডের এলিজাবেথীয় এবং ভিক্টোরীয় যুগকেও ছাড়িয়ে গেল রাশিয়ার সাংস্কৃতিক

www.pathagar.com

জাগরণ। নতুন সমাজ বিপ্লবে সে অনেক দূর সামনে এগিয়ে গেল ফরাসি- বিপ্লবের উত্তরণ-পর্ব অতিক্রম করে।

এসব কথা মনে রেখাপাত করবার সময় এই শহরের অবহেলিত উপকণ্ঠের ঝুপড়ি-ঘরের মানুষগুলোর কথা ভাবলাম। লাঞ্ছনা-বঞ্চনার শিকার এই মানব সন্তানেরা আগুনে পুড়তে পুড়তে হঠাৎ একদিন ঝলসে উঠল। আসলে যুগের পর যুগ ধরে নগরের চাকচিক্যের পাশে থেকেও শিক্ষার আলো না পাওয়ায়, কর্মসংস্থানের অভাবে মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য হওয়ায় পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল তাদের ক্ষোভ। এসব দাবীতে ১৯০৫ সালের গোড়ার দিকে তারা দরখাস্ত করল জার দ্বিতীয় নিকোলাসের কাছে।

কিন্তু শনির দশায় পাওয়া জার দ্বিতীয় নিকোলাসের মন্ত্রীরা এক কানাকড়িও দাম দিলেন না নাবিক-সৈনিক আর শ্রমজীবী মানুষের সেই আকুল নিবেদনে। নিকোলাস তখন মোহগ্রস্ত ছিলেন 'রাসপুতিন' নামক এক দুশ্চরিত্র ভণ্ড সন্ন্যাসীর ভেল্কিবাজিতে। লোকটির পুরো নাম ছিল গ্রিগরি ইফিমিউভিস রাসপুতিন। লোকটি ছিল অশিক্ষিত এক কৃষক। রাশিয়ায় খ্রিস্টধর্মের পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত একটি সন্ন্যাসসাধক সম্প্রদায়ের সদস্য ছিল সে।

এখানে আসবার আগে রুশ লেখক এস-ভি রোদজিয়াংকো রচিত 'দ্য রেইন অভ্ রাসপুতিন' বইটি পড়েছিলাম আমি। এছাড়া প্রিন্স এফ এফ ইউসাউনভ 'রাসপুতিন' নামে লিখেছিলেন আরেকটি বই। এটি ১৯৩৪ সালে মস্কো থেকে প্রকাশিত হয়। আগেরটির প্রকাশকাল ছিল ১৯২৭। দুই বইয়েরই বাংলা সংস্করণ বেরিয়েছিল পঞ্চাশের দশকে কলকাতা থেকে।

এ বই পড়ে আমার মনে হয়েছিল লোকটি যেন আমার কৈশোরে দেখা নলুয়াপাড়ার সেই মোড়ল রাজা আলী বেপারির অবিকল এক প্রতিচ্ছবি। রাজা আলী তার হাঁক ডাক, হম্বিতম্বি আর দুই জাদুময় চোখের ইশারায় গোটা তল্লাটটাকে যেমন মোহগ্রস্থ করে রেখেছিল রাসপুতিনও তেমনি জার নিকোলাসের দরবার এবং প্রাসাদকে হাতের মুঠায় ভরে রাখে তুকতাকের খেল দেখিয়ে। বাহ্যিক কৌশলে মৃগি রোগে আক্রান্ত রাজপুত্র জারেভিচুকে সুস্থ করে প্রথমে এই ভণ্ড সন্ন্যাসী সম্রাজ্ঞী আলেকসান্দ্রা ফিওদরভ্নাকে পুরোপুরি তার করতলগত করে। সম্রাজ্ঞীর মাধ্যমে সম্রাট নিকোলাসকেও সে তার বশে নিয়ে আসে।

তখনকার সেন্ট পিটাসবুর্গ রাজসভা উঠত-বসত ভণ্ড রাসপুতিনের হাতের ইশারায়। সেই যেন ছিল আসল সম্রাট। আর জার নিকোলাস ছিলেন তার খেলুড়ে পুতুল। যেসব মন্ত্রী এই ভণ্ড সন্ন্যাসীর ইচ্ছার বিরোধিতা করতেন তারা পদচ্যুত হতেন তৎক্ষণাৎ। যারা তার তোষামোদ করতেন তারা টিকে থাকতেন। তবে রাসপুতিনের ক্রীড়নক হয়ে থাকতে হত তাদের।

ভাবতে অবাক লাগে সেদিনকার সেন্ট পিটাসবুর্গ তথা রাশিয়ার গোটা রাজসভাই এক ভণ্ড সন্ন্যাসীর তুকতাকের একটা পাগলা গারদ হয়ে উঠেছিল। সম্রাট সম্রাজ্ঞী,

www.pathagar.com

রাজকুমার-রাজকুমারীর দলসহ জার নিকোলাসের তাবৎ পরিবার রাসপুতিনকে মনে করতেন 'পবিত্র আত্মার অধিকারী' এক মহান সাধুপুরুষ। লোকটির তুচ্ছ খেয়াল-খুশিকেও বিনাবাক্য ব্যয়ে তারা তামিল করতেন। জন্মের দিক থেকে সম্রাজ্ঞী আলেকসান্দ্রা ছিলেন জার্মান। গুজব ছিল মুখভরা দাড়িভর্তি, সন্ন্যাসীর লেবাসধারী রাসপুতিন ছিল জার্মানদের গুপ্তচর। এদিকে লোকটি ছিল সৌম্যদর্শন আর অসাধারণ দৈহিক শক্তিসম্পন্ন। রানীর সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে কানাঘুষা চলছিল আড়ালে-আবডালে। রাজ পরিবারের অনেক রূপসী ললনা ভোগলিপ্সা চরিতার্থ করেছিল এই ভণ্ড ফকিরের। প্রমাণ পাওয়া গেছে, রানী আলেকসান্দ্রার মাধ্যমে রুশ সরকার এবং সেনাবাহিনীর অনেক গোপন তথ্য পাচার করেছিল রাসপুতিন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার শোচনীয় পরাজয়ের মূলে রাসপুতিনের প্রাসাদ ষড়যন্ত্র দায়ী ছিল বলে পরবর্তীকালে জানা যায়। জার নিকোলাস দুর্বল চরিত্রের লোক ছিলেন বলে রানী এবং রাসপুতিনের কারসাজির কথা জেনেও টুঁ শব্দটি করেননি। কারণ খ্রিস্টান সন্ন্যাসীদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতার ওপর অগাধ বিশ্বাস ছিল তার। তিনি মনে করতেন রাসপুতিন হয়ত তার মঙ্গলের জন্যই সব কাজ করছেন। অহেতুক লোকটিকে ঘাটালে তিনি শাপগ্রস্ত হবেন এবং সমূহ ক্ষতি হয়ে যেতে পারে তার।

তখন রাশিয়ায় দুমা তথা পার্লামেন্টের অধীনে কায়েম হয়েছিল মোটামুটি একটি নিয়মতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা। দুমা'র উদারনৈতিক সদস্যরা আঁচ করতে পেরেছিলেন পার্লামেন্টের একটি প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের সংগে যোগসাজশ আছে রাসপুতিনের। কারণ এই চক্রটি আলাদা শান্তিচুক্তি করতে চেয়েছিল জার্মানির সঙ্গে। ভাগ্য ভালো, লেনিনের নেতৃত্বাধীন বলশেভিক দল এ ষড়যন্ত্র প্রতিহত করায় শেষ মুহূর্তে চরম এক বিপর্যয়ের হাত থেকে বেঁচে গেল দেশটি। তবে শেষ রক্ষা পায়নি ভণ্ড রাসপুতিন। তার অনাচার এবং নারীচরিত্র হননে অতীষ্ঠ অভিজাতদের একটি গ্রুপ ১৯১৬ সালের ডিসেম্বরে এক প্রিন্সের প্রাসাদে অতর্কিত হামলা চালায় তার ওপর। কিন্তু প্রবল দৈহিক শক্তির জোরে তাদের প্রথমবার হটিয়ে দেয় সে। হামলাকারীরা শেষে এক পেয়ালা বিষ মেশানো শরবত ঢেলে দেয় তার মুখে। কিন্তু সেই বিষও তার ওপর কোনও ক্রিয়া না করায় লোকটির ঐন্দ্রজালিক শক্তি দেখে আতংকিত হয়ে পড়ে তারা। এরপর বুলেটে ঝাঁঝরা করা হল রাসপুতিনের সর্বাঙ্গ। তার মৃতদেহ বরফ ঢাকা নেভা নদীতে ডুবিয়ে রাখা হল।

সতেরো সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবকালে পিটাসবুর্গের বিদ্রোহী শ্রমিক-সৈনিক-নাবিকের দল এবং নগর পল্লীর বিক্ষুব্ধ জনতা নদী থেকে রাসপুতিনের গলিত লাশ তুলে এনে নিঃশেষ করে আগুনে পুড়িয়ে। ভণ্ড সন্ন্যাসীর ক্রীড়নক জার নিকোলাস এবং রাজপ্রাসাদের স্বেচ্ছাচারীরাও রেহাই পায়নি সেদিনকার এই বিক্ষুব্ধ নগরবাসীর হাত থেকে।

যেমন রেহাই পায়নি আমার বর্ণিত সেই মোড়ল এবং তার ক্রীড়নক পরিষদদল গ্রামের নবজাগ্রত লোকদের কবল থেকে। নৈশবিদ্যালয়ে পড়ে হঠাৎ একদিন আত্মসচেতন হয়ে ওঠে তারা এবং মোড়লের আধিপত্যকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে

www.pathagar.com

খেদিয়ে দেয় তাকে।

সেই গ্রামে এখন প্রদীপের আলো। নারী-পুরুষ প্রায় সবাই শিক্ষিত। রাস্তাঘাট ঝকঝকে-তক্‌তকে। ঘরে ঘরে পাকা টয়লেট। খবর কাগজ পড়ে নবীন-প্রবীণ সবাই।

সেই গ্রামে এখন প্রদীপের আলো। নারী-পুরুষ প্রায় সবাই শিক্ষিত। রাস্তাঘাট ঝকঝকে-তক্‌তকে। ঘরে ঘরে পাকা টয়লেট। খবর কাগজ পড়ে নবীন-প্রবীণ সবাই।

উপমাটি সামান্য হলেও এই বিশাল শহরের সেদিনকার অন্ধকারাচ্ছন্ন অশিক্ষিত, হতদরিদ্র মানুষদের কথা মনে পড়ল আমার। তাদের ভাগ্য বদলে গেল উনিশ শ' সতেরোর অক্টোবর বিপ্লবের পর।

তাকিয়ে দেখলাম সীসার পাতের মতন পরিচ্ছন্ন চওড়া রাস্তা দিয়ে চলছি। একটি ম্লান মুখ পথের কোথাও নজরে পড়ল না। যেন কত সুখী আজ এরা। চলন-বলন এবং পোশাকে আশাকে আছে একটি মার্জিত রুচিবোধ এদের।

আমার পাশের আসনে ছিলেন ডক্টর চেরখভ। তাকে আমার ছোট বেলার গল্পটা বলতেই হো হো করে হেসে উঠলেন তিনি। তার বাঁয়ের সীটে ছিল মারিয়া। আর পেছনের আসনে নাদিয়া। ওরাও মনোযোগ দিয়ে শুনছিল আমার গল্প। গল্প বলা শেষ হলে পর ওরাও যোগ দিল হাসিতে।

চেরখভ বললেনঃ আপনার গল্পটা বাংলাদেশের একটি ছোট গ্রামের হলেও দুনিয়ার সব দেশের নবজাগ্রত সমাজের সঙ্গে-বেশ মেলে। দেখুন না আমাদের এই শহরের সেকালের অশিক্ষিত, দুঃখী মানুষদের ইতিহাসে একবার চোখ বুলিয়ে। তারা যখন সতেরোতে জেগে উঠল তখন রাসপুতিনের সঙ্গে উড়ে গেল সম্রাট নিকোলাস। আবার একচল্লিশে হিটলার যখন তাদের পিষে ফেলতে চাইল তখন আবার তারা মাথা তুলে দাঁড়াল। সপারিষদ নিপাত গেল সেই বর্বর ফ্যাসিস্ট ডিক্টেটর। আমরা সবাই এই শহরের বীর নাগরিকদের জন্য গর্ববোধ করি।

গাড়ির ক্ষুদে বহরটা কিছুক্ষণ বাদেই এসে ঢুকল বিশাল এক বাড়ির আঙিনায়। চারদিকে গাছগাছালিতে-ভরা বাগিচা। শ্যামলের লাবণ্য চুইয়ে পড়ছে পত্রপল্লবের গা বেয়ে। আমাদের দেশে বর্ষা আর বসন্তে দেখা যায় এরকম কচিপাতা-রং সবুজ। এখানে কবেই বিদায় নিয়েছে বসন্ত। গ্রীষ্মও যাই-যাই করছে। এ সময়টায় এখানে সবুজের এতটা সমারোহ হবে ভাবতে পারিনি।

বাড়িটার আঙিনায় লাল পাথরের তিনটি অনুচ্চ পাহাড়। সেগুলোর চূড়ায় রুপার পাতে মোড়া ডালপালার সার-সার গাছ। প্রতিটি শাখাপ্রশাখা থেকে আকাশে অনেক দূর পর্যন্ত বাষ্প তুলে অবিরল ধারায় গড়িয়ে পড়ছে ঝরনার বৃষ্টি। পার্বত্য- নির্ঝরিনির মতই কানের পাশে ধ্বনিত হচ্ছে স্রোতের বিচিত্র কলগুঞ্জন। দূর থেকে শুনলে মনে হবে বুঝি কোথাও শাঁ-শাঁ শব্দ তুলে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। যেন কোনও অরণ্যঘেরা নদীতটে দাঁড়িয়ে আছে শ্বেত মর্মরের একটি প্রাসাদ। তার বুক থেকে সবুজ তরুবীথির ওপর ঠিকরে পড়ছে শুভ্রতার আলো।

www.pathagar.com

এই শহরে আছে জারদের শীত এবং গ্রীষ্ম প্রাসাদ। পর্যটকরা বলেন উইন্টার এবং সামার প্যালেস। একবার মনে হল এরা বুঝি এই দুই প্রাসাদের কোনও একটিতে নিয়ে এসেছে আমাদের। গাড়ি থেকে ব্যাগেজ নামানোর কাছে ব্যস্ত ছিল এখানকার লোকজন। গোটা চারেক ছোট ব্যাগ দুই কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে আগেই হাঁটা দিয়েছিল নাদিয়া। একে দেখে মনে হচ্ছিল ঘাস ফুল ছুঁয়ে-ছুঁয়ে উড়ে চলছে একটি প্রজাপতি।

আমার অবাক চোখে ঝুলছিল অনেক প্রশ্ন। এক ফাঁকে মারিয়াকে কাছে পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এ কোথায় নিয়ে এলে তোমরা। বাড়িটা কী কোনও প্যালেস?

হেসে প্রায় কুটি-কুটি মারিয়া। চোখে এক ঝলক কৌতুক তুলে শেষে বললঃ তুমি বুঝি তাই ভাবছিলে?

আমার দিকে চোখ কুঁচকে তাকাল ও। একটু থেমে যোগ করলঃ তোমার অনুমানটা অবশ্য একেবারে মিথ্যে নয়। হ্যাঁ, এটি একটি প্রাসাদ তো বটেই। তবে পিটার কিংবা রানী ক্যাথারিনের কোনও প্রাসাদ নয়। এটি আমরা মনের মতন করে গড়েছি আমাদের অতিথিদের জন্য। তাও যুদ্ধের বেশ কয়েক বছর পরে যখন শুরু হল নতুন সংস্কার এবং নির্মাণ কর্মযজ্ঞ।

কিন্তু এ-যে দেখছি অবিকল একটা রাজবাড়ির মতন। চারদিকে উদ্যান আর এখানে-ওখানে ফোয়ারার জলকেলি। ওই ঝরনার হ্রদে রাজহাঁস চড়ে বেড়ালে মানাতো ভাল। ওর পানে চোখ রেখে বললাম। মারিয়ার কালো চোখে আবার কৌতুক। ভুরুজোড়া নাচিয়ে বললঃ কেন একটু আগে একটি রাজহংসীকে দেখনি উড়ে যেতে? তোমাদের সামনে দিয়েই তো চলে গেল ডানা মেলে। ওর সঙ্গীরা এখন সাঁতার কাটছে লাদোগা ওজারোতে।

বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলামঃ কার কথা বলছ?

ঃ আস্ত বোকা একটি ! কেন, আমাদের নাদিয়া রাজহংসীর চেয়ে কম কিসে? ওর মতন চঞ্চল, ডানাকাটা পরী কটি দেখেছ জীবনে?

ঃ মানলাম তোমার কথা। সত্যি, যেমন সুদর্শনা তেমনি এক করিৎকর্মা মেয়েও। কিন্তু লাদোগা ওজারো। ওটি আবার কী? জানতে চাইলাম মারিয়ার কাছে।

ঃ লেক্ লাদোগার নাম শোননি মিস্টার জার্নালিস্ট? রুশ ভাষায় আমরা ওজারো বলি হ্রদকে। এই শহরের উত্তর-পুব কোণ ঘেঁষে সাগরের মতন দেখতে বিশাল লাদোগা লেক। গ্রীষ্ম ঋতুতে ঝাঁকে-ঝাঁকে এই লেকে জলকেলি করে বেড়ায় রাজহাঁসেরা। আরও শুনে রাখ জার্মান হামলার সময় প্রায় আট হাজার বর্গমাইলের এ হ্রদের চারপাশটা চষে বেরিয়েছিল নাৎসী সেনারা।

মাথা চুলকাতে লাগলাম। হঠাৎ মনে পড়ে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে লেনিনগ্রাদ স্বশাসিত এলাকার দুটি বিখ্যাত হ্রদের কথা তো কাগজে পড়েছি। একটি হল লাদোগা এবং আরেকটি ওনেগা। যাদের ইংরেজীতে বলে টুইন-সিস্টার। ইউরোপের হ্রদের রাজ্যে এরা হল সেই যমজ বোন। লাদোগা ইউরোপ মহাদেশের সব থেকে

www.pathagar.com

বড় হ্রদ। তারপরেই ওনেগা। দ্বিতীয়টির আয়তন প্রায় চার হাজার বর্গমাইল।

একজন দোভাষিনীর কাছে ভৌগোলিক বিদ্যার দৌড়ে হেরে যাব এটা কিছুতেই মানতে চাইল না মন। তাই স্মৃতির ঝাঁপি খুলতে খুলতে গলায় একটু জোর দিয়েই বলে উঠলামঃ মাদাম মারিয়া ইভানোভনা, লাদোগার কথা তো বললে কিন্তু ওর সিস্টার ওনেগার কথা তো একবারও তুললে না।

মারিয়া খানিকটা বিস্মিত হয়ে বললঃ ওনেগার খবরও তা হলে রাখ তুমি!

ওর কথার পিঠে এবার এক রাশ রসিকতা ছুঁড়ে দিয়ে জবাব দিলাম ঃ মাই ডিয়ার মাদাম, জার্নালিস্টরা সবজান্তা না-হলেও কিছু-কিছু খবর রাখে দুনিয়ার। তাছাড়া তোমার মতই বেড়ে উঠেছি আমরা একটা ভয়ংকর যুদ্ধের তোলপাড়ের মধ্য দিয়ে। সুতরাং সে সময়কার কিছু ঘটনা স্মৃতি থেকে আজও একেবারে মুছে যায়নি।

ঃ কী বলছো, নাৎসী হামলার শিকার তোমরাও হয়েছো?

ঃ ঠিক নাৎসীদের না-হলেও তাদের দোসর জাপানের বোমাবাজি কম হয়নি আমাদের ওপর। চার্চিল এবং রুজভেল্ট একচল্লিশে স্তালিনের সঙ্গে মিত্রজোট না-গড়লে হয়ত আমাদের উপমাহদেশটা চলে যেত প্রশান্ত মহাসগরের ওই হিংস্র হাঙ্গরের পেটে। যেমন দেখতে দেখতে ওদের উদরস্ত হয়েছিল একে-একে সলোমন, ওকিনাওয়া, নিউগিনি, হাওয়াই এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ। শেষে ইন্দোচীন, মালয়, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড এবং বার্মা গ্রাস করে ওরা তুলকালাম শুরু করে দিয়েছিল আমাদের দেশের বুকের ওপর।

আমার কথা শোনার পর মারিয়া ধীরলয়ে বললঃ শোনো, তখন তো তেরো-চৌদ্দ বছরের মেয়ে ছিলাম। এতকিছু জানবার সুযোগই হয়নি। তাছাড়া এই শহরে অবরুদ্ধ ছিলাম পুরো দুই-দুটি বছর। তিনদিক থেকে ঘিরে ধরে হিটলারের তিনবাহিনী এখানে নরক গুলজার করতে বসেছিল। লেনিনগ্রাদ রক্ষার শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল শিওসালবুর্গ দুর্গ। নামটা নিশ্চয় শুনেছো তুমি। লাদোগা হ্রদের একেবারে পুব মাথায় জায়গাটা। হ্রদ থেকে উঠে এসেছে লাদোগা নদী। তার তীর ঘেঁষে ছিল আমাদের এই ঘাঁটি। লেলিনগ্রাদ থেকে মাত্র কয়েক যোজনের দূরত্ব। শহরের পশ্চিম প্রান্তের নেভা নদী কাল তোমাদের স্পিডবোটে করে ঘুরিয়ে দেখানোর প্রোগ্রাম আছে। দেখলেই বুঝবে নেভায় যদি জার্মানদের রণতরীর বহর ঢুকতে পারত তা হলে তোমাদের সঙ্গে কখনও আর দেখা হওয়ার সুযোগ মিলত না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মারিয়া। কী-যে দুঃখের দিন ছিল আমাদের জন্য সময়টা।

বললামঃ সবই জানি সিস্টার। ছয় হাজার মাইল দূরে থেকেও আমরা মর্ম যাতনা বোধ করেছি তোমাদের জন্য ওই দুঃসময়ে। আচ্ছা এখন বল জার্মানদের কেমন করে তোমরা ঠেকালে নেভার মুখে? তোমাদের মরণপণ অবরোধের কাহিনী কাগজে এবং ইতিহাসে কতই-না পড়েছি। কিন্তু জার্মান নৌ অভিযান কেন লাদোগার সীমানায় এসে আর এগুতে পারল না তার ভাসা-ভাসা জ্ঞান থাকলেও পুরোটা জানা নেই

www.pathagar.com

আমার। তুমি যদি এ বিষয়ে কিছু বলতে আমার ধারণাটা তাহলে পরিষ্কার হত।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মারিয়া বললঃ জবাবটা ডক্টর চেরখভই ভাল দিতে পারতেন। ব্রেকফাস্টের পর ওর সঙ্গে আলাপ করে নিও। তবে এইটুকু আমি বলতে পারি শিওসালবুর্গ জার্মানদের হাতে চলে যাবার পর লেনিনগ্রাদ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে গোটা রাশিয়া থেকে। মাকড়শার জালের মতন ছড়ানো মস্কো-ককেশাস-

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে চার্চিল, রুজভেল্ট ও স্তালিন

সাইবেরিয়া এবং ইউরোপগামী যে রেললাইনটি এইমাত্র দেখে এলে-নাৎসীদের অবিরাম বোমাবাজিতে একচল্লিশের আগস্টেই-ওটা বিকল হয়ে পড়ে। আমাদের বেরুবার আর কোনও উপায়ই থাকল না।

ওর কথার মাঝখানে বললামঃ জানি লেনিনগ্রাদ রেলওয়ের চারদিকটা ছিল এক চল্লিশের জার্মান-অভিযানের সব থেকে ভয়াবহ একটা ওয়ার থিয়েটার। তোমরা ওদের এই সর্বগ্রাসী হামলা থেকে কেমন করে আত্মরক্ষা করলে সেটা আজও আমাদের কাছে এক অপার বিস্ময়।

ঃ সত্যি আমরা এক অগ্নিকুণ্ডের মাঝখানে বসবাস করছিলাম। বলল মারিয়া। শুনে অবাক হবে ওই লাদোগা-ওনেগা দুই যমজ হ্রদ আর এই নেভা নদী শেষ মুহূর্তে এক দুর্ভেদ্য দুর্গ হয়ে বাঁচিয়ে ছিল আমাদের।

ঃ কেমন করে ? চোখে আমার ফুটে উঠলো কৌতূহল।

শোনো, বলছি তার আগে একটা কথা। বাল্টিকের পূর্বাঞ্চল, হোয়াইট সী আর মেরুসাগর পাড়ের ম্যাগিল্যান্ড এলাকার আবহাওয়ার কথা তো জান নিশ্চয়। সেপ্টেম্বরের পরেই এখানে জাঁকিয়ে বসে প্রচণ্ড ভয়ংকর শীত। অক্টোবরে অনেক সময় হিমাংকের পঞ্চাশ-ষাট ডিগ্রীরও নীচে নেমে যায় তার তীব্রতা। লাদোগা-ওনেগা হ্রদ ছাড়াও কারেলিনা যোজক, কারেলিনা মালভূমি এবং দুই হ্রদের উত্তরে শ্বেত সাগরের কোলা উপদ্বীপ জুড়ে আছে হাজার কয়েক ছোট হ্রদ, বিলঝিল আর নদীনালা। এর

www.pathagar.com

সবই বারো-তেরো ফুট গভীর বরফে জমাট হয়ে যায় অক্টোবরে। এপ্রিল পর্যন্ত প্রায় সাত মাস বরফাবৃত থাকে সবকটি জলাশয়।

কারিলিয়ান যোজক রাশিয়া এবং ফিনল্যান্ডের মাঝখানে নব্বই মাইল দীর্ঘ একটি স্থল সেতু। চড়ায় এটি পঁচিশ থেকে সত্তর মাইল হবে। ফিনল্যান্ড উপসাগরের মধ্য দিয়ে এটি যুক্ত করেছে উত্তর-পুব ইউরোপকে। যোজকটির পশ্চিমে ফিনল্যাণ্ড আর পুবে লাদোগা হ্রদ। যোজকের পুব মাথায় এই লেনিনগ্রাদ শহর। আকেটি বড় শহর হল ভাইবুর্গ। ১৯৪০ সালে ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে স্বাক্ষরিত শান্তিচুক্তির পর যোজকের পুরোটাই পড়েছে আমাদের ভাগে। এর আগে দক্ষিণতম প্রান্তের সামান্য কিছু অংশ ছিল ফিনল্যাণ্ডের অন্তর্গত।

একটু থেমে মারিয়া ফের বলতে লাগলঃ তোমরা তো জান এখানকার শীত আমাদের চিরায়ত মিত্র। যার জন্য মেরু অঞ্চলের এই শীতের নাম হয়েছে 'ইনভিনসিবল ন্যাচারাল আর্মি অভ্ রাশিয়া অর্থাৎ রাশিয়ার অজেয় প্রাকৃতিক সেনাবাহিনী। হিটলারের ফিল্ডমার্শালেরা ভালভাবেই জানতেন প্রকৃতির এই দুর্দমনীয় শক্তির কথা। কিন্তু সমরবিদ্যায় অপরিণত বালক নাৎসী ডিক্টেটর এদের কারও কথারই তোয়াক্কা করলেন না।

মাত্র মাস কয়েকের ব্যবধানে বলকান এলাকা এবং বাল্টিক সাগর পাড়ের উত্তর ইউরোপীয় দেশগুলো জয়ের পর তিনি রণোন্মাদ হয়ে পড়লেন। ভাবলেন সমর বিশেষজ্ঞ জার্মান সেনানায়করা তার কাছে দুগ্ধপোষ্য শিশুমাত্র। তিনি তার সামরিক সদর দফতরের দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখতেন বিশ্ব মানচিত্র। তার লক্ষ্যবস্তুগুলোর ওপর ছড়ি ঘোরাতে-ঘোরাতে নিজের জেনারেলদের চোখের দিকেও সেই ছড়ি তুলে ধরতেন। বলতেনঃ নির্বোধের দল, একসঙ্গে দেড়শ'-দুইশ' ডিভিশন সেনা নিয়ে অভিযান চালালে কার সাধ্য তার গতিরোধ করা?

তাছাড়া তোমাদের হাতে কী হাজার কয়েক জঙ্গী বিমান নেই? শয়ে-শয়ে রণতরী, সাবমেরিন, ইউবোট নেই? হাজার হাজার ট্যাংক নেই, ডিনামাইট নেই। বেশুমার গোলাবারুদ, মেশিনগান কামান নেই? পৃথিবীতে আর কোন্ দেশের সেনাবাহিনীর আছে এতগুলো যান্ত্রিক ডিভিশন? এরকম অপরিমেয় শক্তি নিয়েও কেন তোমরা মিলিটারি জিওগ্রাফি নিয়ে মাথা ঘামাও? তোমরা আসলে সবকটি পুঁটিমাছ। হাঙ্গরের শিকার ধরবার বিদ্যা রপ্ত করতে পারনি। এক কানাকড়িও দাম নেই তোমাদের নতুন শেখা সমর কৌশলের।

সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রস্তুতি নেবার আগেই দম বন্ধ করে মারবার পরিকল্পনা যখন মাথায় এল-হিটলারের খাস কামরার দেয়ালে উঠলো এদেশের বিশাল মানচিত্র। টার্গেটগুলো ঠিক করে তাদের বুকে পেরেক বিদ্ধ করতে লাগলেন তিনি। প্রথমে সোভিয়েতের প্রধান শিল্পনগরী লেনিনগ্রাদের ওপর ঠোকা হল পেরেক। এরপর পেরেক পড়ল স্তালিনগ্রাদের লাল বিন্দুতে। তারপর মস্কোর নিশানার ওপর।

হিটলারের হুংকারের মুখে ডাকসাইটে নাৎসী মার্শালেরাও হেট মাথা হয়ে

www.pathagar.com

থাকলেন। দু-একজন সাহস করে বাল্টিকের পূর্বাঞ্চলের প্রচণ্ড শীতের প্রতিকূলতার কথা বললেন। শীত ঋতুতে নেপোলিয়নের রাশিয়া অভিযান কেন ব্যর্থ হল সেই নজির তুলে ধরলেন।

নেপোলিয়নের শোচনীয় পরাজয়ের প্রসঙ্গ উঠলে ফুরার হিটলার জ্বলে উঠলেন তেলেবেগুনে। দূরে ছুঁড়ে মারলেন তার টেবিলের একটার পর একটা পেপার-ওয়েট। চিৎকার দিয়ে বললেনঃ যতসব মেষ পুষছি আমি! গর্দভ নেপোলিয়নের সঙ্গে তুলনা করছ আমার? জাননা নেপোলিয়নের সেনাবাহিনী ছিল গাধা আর গরুর একটা জগাখিচুড়ি। আর আমি নাৎসী বাহিনীকে একযুগ ধরে গড়েছি একটা স্টিল আর্মি হিসাবে। এদের সঙ্গে ওই গেঁয়ো ফরাসি ফৌজের তুলনা হয়।....

এরপর মাথা ঠাণ্ডা করে বললেনঃ ফিনল্যাণ্ড উপসাগরের কারিলিয়া যোজকটার দিকে চেয়ে দেখ আহম্মকের দল। মাত্র নব্বই মাইল লম্বা একটা যোজক। একদিনেই তো ওটা পার হওয়া যায়। আর রাশিয়ানদের তো আমি ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি অনাক্রমণ চুক্তি করে। ওদের কামানে গোলা ভরবার আগেই তোমরা চোখের নিমিষে দখল করে নিতে পারবে লাদোগা হ্রদের পুব মাথার রুশ ঘাঁটি শিওসালবুর্গ। ওর নাগালের মধ্যেই আছে লেনিনগ্রাদ। ওটা তো উড়ে যাবে এক ফুৎকারে।

আর শীত এবং বরফের কথা বলছো। ওর মধ্য দিয়েই চলবে ঝটিকা অভিযান। এই সামান্য দূরত্বের বরফ ভাংতে উত্তর-পশ্চিম ইউরোপজয়ী পৃথিবীর সেরা একটা সেনাবাহিনীর গায়ে আঁচড়টিও পড়বে না। তাছাড়া ওই বরফের দেশের ফিনিশ সৈন্যরাও তো থাকবে তোমাদের সঙ্গে লাদোগা, ওনেগা আর কারিলো-ফিনিশ সোভিয়েতে যে কয়টি শহর এবং বন্দর পড়বে অভিযানের পথে সেগুলোকে গুঁড়িয়ে দেবে ট্যাংকের তলায়।

অবাক হয়ে শুনছিলাম মারিয়ার কথা। একজন লেডিগাইড ও। অথচ যেন কথা বলছে পুরোদস্তুর একজন জেনারেলের মতন। জিজ্ঞেস করলামঃ মাদাম মারিয়া ইভানোভ্না, তুমি কী এর আগে কোনও সেনা-অফিসার ছিলে?

ঃ কেন একথা বলছো মহাশয়?

ঃ নাৎসী অভিযান সম্পর্কে এত জ্ঞান পেলে কোথা থেকে? বিশেষ করে হিটলার সম্পর্কে?

ঃ কেন, ওই যুদ্ধের কত বই-ই তো লিখেছে আমাদের সে সময়কার জেনারেলরা। বার্লিনজয়ী মার্শাল জুকভের বইটি এর ভেতর সব থেকে জনপ্রিয়। নাৎসী নেতা হিটলারের কাণ্ডকারখানার কথা তিনি বর্ণনা করেছেন সবিস্তারে। আমরা সেই দুঃসময়ে এই শহরে অবরুদ্ধ ছিলাম। সবাই মিলে রুখেছি নাৎসীহামলা। সুতরাং স্বাভাবিক ঔৎসুক্য নিয়েই পড়েছি যুদ্ধের ইতিহাস।

ঃ বুঝতে পারলাম ইভানোভ্না। এবার বল তোমাদের উইন্টার আর্মির দাপটে কী হাল হয়েছিল নাৎসী বাহিনীর? জানতে চাইলাম আমি।

ঃ যা হবার তাই হয়েছে। অক্টোবরের বরফাবৃত এই নেভা নদী আর হ্রদের

www.pathagar.com

দেশে এসে মরণকূলে পা দিয়েছিল ওরা। আমাদের প্রচণ্ড পাল্টা আঘাতের পাশাপাশি শীতের ভয়ংকর দাঁত ওদের খেয়েছে খাবলার পর খাবলা দিয়ে। এ শহরের থেকে অবরোধ তুলে কারেলিনা যোজকের পথে পিছু হটবার সময় আমরা ওদের ঘেরাও করে ফেললাম। চুয়াল্লিশ পর্যন্ত বাঁচবার জন্য লড়াই করতে গিয়ে খতম হন জার্মানদের সত্তর ভাগেরও বেশী সেনা। উন্মুক্ত হল আমাদের জন্য বার্লিন দখলের পথ। থাক্ এখন এ পর্যন্ত, বাকী কথা শুনবে ডক্টর বেরখভের কাছে।

এ সময় শুনতে পেলাম একটি কলকণ্ঠ। হোটেলের লাউঞ্জ থেকে প্রায় ছুটতে-ছুটতে এল নাদিয়া। লীলাময় ভঙ্গিতে হাত নেড়ে মারিয়াকে বললঃ কী হল ইভানোভ্না মাদাম? এখানে দু'জনে মিলে কিসের আলাপচারিতা হচ্ছে? ওদিকে যে ব্রেকফাস্ট বরফ হল। সবাই অপেক্ষা করছেন তোমাদের জন্য।

একসঙ্গে 'দুঃখিত' বলে আমরা দু'জন ঘড়ি দেখলাম। আর উর্ধ্বশ্বাসে ছুটলাম মারিয়ার বর্ণিত হংসিনীর পিছু-পিছু।

আমাদের পাকড়াও করে নিয়ে এসে ডাইনিং হলে ঢুকল নাদিয়া পলস্কায়া। সবাইকে শুনিয়ে বললঃ এরা দু'জন টাইম-কিলার। ঝরনার কাছে ঘাসের মাঠটায় দাঁড়িয়ে রাজ্যের গল্প জুড়ে দিয়েছিল। আর নিশ্চিন্তে সময় চুরি করছিল সবার। সেই অপরাধে দু'জনকেই বেঁধে নিয়ে এলাম।

বলতে-বলতে হাসিতে ফেটে পড়ল নাদিয়া। গলায় ওর বেজে উঠল কাঁচের চুড়ির রিনিঝিনি ঝংকার। মুহূর্তে যেন যাদুর কাঠির ছোঁয়ায় পরিবেশটা তরল হয়ে উঠল। সারা রাত ট্রেন যাত্রার ক্লান্তিতে ঢুল-ঢুল করছিল অনেকের চোখ। তারাও গা ঝাড়া দিয়ে ওঠল এবং যোগ দিল হাসির হল্লায়।

ডক্টর চেরখভ্ ছিলেন রাশভারি লোক। তিনিও না -হেসে পারলেন না। সুপে র বাটিতে চুমুক দিতে-দিতে বললেনঃ টাইম-কিলার। দেখছি চমৎকার একটি শাব্দিক অলংকার ব্যবহার করেছে নাদিয়া। রুশ ভাষায় কী যেন বলে তারিফ করলেন ওর। আমার দিকে তাকিয়ে-সকৌতুকে বললেনঃ মাই ফ্রেন্ড, ইউ হ্যাভ বিন অ্যারেস্টেড নট বাই এ পুলিশ বাট বাই এ বিউটিফুল ইয়ং লেডি। ইউ আর রিয়্যালি লাকি।

ওঁর কথার সারমর্মটা হলঃ তোমার ভাগ্য ভাল বলতে হবে। পুলিশের হাতে ধরা না পড়ে পাকড়াও হয়েছ এক সুন্দরী তরুণীর হাতে। চেরখভ্ও যে-একজন রসিক মানুষ একথা জানতে পেরে সবার সঙ্গে মারিয়াও হাততালি দিয়ে উঠল। আর নাদিয়া পলস্কায়ার রাঙা মুখখানি আরও রাঙা হল লজ্জায়। সে মোটেও আঁচ করতে পারেনি ডক্টর চেরখভের মতন একজন বর্ষীয়ান পণ্ডিত ব্যক্তি হঠাৎ এরকম একটা কৌতুক ছুড়ে মারবেন। ওর লজ্জারুণ গালে ফুটল দুটি সুন্দর টোল। তবে ঠোঁটে ছিল হাসির ঝিলিক। অর্থাৎ চেরখভের রসিকতায় সে-ও কম মজা পায়নি।

মাঝখানে পাভলভ আমার দিকে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে বললঃ কার হাতে ধরা পড়েছ বুঝে দেখ! অর্থাৎ সে যেন আমাদের বাংলা প্রবাদের ভাষায় বলতে চাইছিলঃ পড়েছ মুগলের হাতে খানা খেতে হবে সাথে।

www.pathagar.com

একটু পরে ফের যোগ করলঃ এ হল গিয়ে তোমার লেনিনগ্রাদ। যে-সে শহর নয়! মেয়েদের প্রতাপই এখানে বেশী।

পাভলভের কথা শুনে এবার ঝংকার দিয়ে উঠল নাদিয়াঃ এটা কারও বলার অপেক্ষা রাখে না মিস্টার পাভলভ। নিশ্চয়ই আমাদের শহর সবদিক থেকে সেরা। আমরা আগে চলি। আর তোমাদের মস্কো চলে আমাদের পিছু-পিছু। কেন উনিশশ' পাঁচের বিপ্লব আমরা প্রথম শুরু করিনি? আর উনিশশ' সতেরোর ফেব্রুয়ারী আর

জয়নুল আবেদীনের অমর শিল্পকর্ম ক্ষুধার্ত মানুষের লাশের স্তূপ

অক্টোবর বিপ্লব? কারা প্রথম শুরু করল। আমরা করিনি?

মুখরা নাদিয়ার সঙ্গে এঁটে উঠতে না-পেরে রণেভঙ্গ দিল পাভলভ। ম্লান হেসে বললঃ তোমার কথাই ঠিক মিস নাদিয়া পলস্কায়া। তোমরাই সেরা।

ঃ হ্যাঁ, সেরা তো বটেই। শুধু মুখে বললেই হবে না। আপনারা তো রাজধানী শহরের সাহেব-সুবা। বলি, একচল্লিশের যুদ্ধের আঁচড় কতটা লেগেছে আপনাদের গায়ে? আমরাই তো তার ধকল পুরোটাই সইলাম। আগুনে পুড়তে-পুড়তে শেষে সেই আগুনে পোড়ালাম শত্রুকে। আচ্ছা, আপনারা কী যুদ্ধের সময় দুর্ভিক্ষের মুখ দেখেছিলেন? না, দেখেননি। আর আমরা দেখেছি তার ভয়াল, করাল ছায়া। যা এ দেশের কোনও শহরও অমন করে দেখেনি। যখন শত্রুরা খাদ্য সরবরাহের সব পথ বন্ধ করে দিয়ে চারদিক থেকে অবরুদ্ধ করে ফেলল এই শহর তখন কী হাল হয়েছিল আমাদের?

ঃ সবই জানি। বলল পাভলভ। সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছিল এ শহরের ত্রিশ লাখ মানুষকে।

ঃ শুধু কী দুর্ভোগ! খাদ্য ভাগাভাগি করে খেয়ে লড়তে হয়েছে আমাদের পুরো

www.pathagar.com

বেয়াল্লিশ সাল। তেতাল্লিশে ফুরিয়ে গেল সব মওজুদ খাদ্য। কুলিয়ে ওঠা গেল না আর রেশনিংয়েও। তুষার নেকড়ের মতন হিংস্র দাঁত খিঁচড়ে ধেয়ে এল দুর্ভিক্ষ। এক টুকরো পাউরুটির সঙ্গে পানি মিশিয়ে তিন বেলা চলত একেকটি পরিবারের। পাশের কিছু গ্রামে ছিল কৃষি খামার। সেখানে আলু-শসা, লাউ-কুমড়া ইত্যাদির চাষ হত। কৃষকরা এসব সবজি তুলে দিলেন প্রতিরোধ-যোদ্ধাদের হাতে। এতে চলল আরও মাসকয়েক। ওই বীর কৃষকরা জমি চাষ করতেন আবার রাইফেল হাতে নিয়ে লড়াইও করতেন। অবাক হয়ে শুনছিলাম আমি নাদিয়ার কথা। পাভলভের সঙ্গে তর্কে নেমে সে তুলে ধরল এখানকার প্রতিরোধ-যুদ্ধের আমার অজানা এক করুণ ইতিহাস। এর সঙ্গে কোথায় যেন রয়েছে আমাদের দেশের পঞ্চাশের মন্বন্তরের বেশ খানিকটা মিল। বাংলার সেই ভয়াল দুর্ভিক্ষও হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে এবং সেই উনিশ শ' তেতাল্লিশ সালেই।

ওই দুর্ভিক্ষের জন্য বলতে গেলে পুরোপুরি দায়ী ছিল ব্রিটিশ সরকার। সৈন্যদের রসদ ভাণ্ডার টৈ টুম্বর করবার মতলবে বাজার থেকে চাল ডাল-গম সব উজাড় করে নিয়ে গিয়েছিল ইংরেজের মিলিটারি ঠিকাদারেরা। আর পোয়াবারো হয়েছিল দেশীয় ফটকাবাজ, মওজুদদার আর ব্ল্যাক মার্কেটিয়ারদের। ক্ষুধার্ত মানুষের কংকালের ওপর বসে ওরা সবাই মিলে দুই হাতে লুটেছিল মুনাফা। জাপানকে ঠেকাতে গিয়ে বাংলার অসহায় জনগণকে ওই দুর্বৃত্তরা নিক্ষেপ করেছিল ক্ষুধার জ্বলন্ত নরকে।

মানবতার মরণশয্যার এই করুণ, শোকাবহ দৃশ্যটি ছিল আমাদের কৈশোরের এক মহা ট্রাজেডি। ক্ষুধার্ত মানুষের লাশের স্তূপ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে দেখেছি গ্রাম-গঞ্জে, শহরের অলিগলিতে। সেই মৃতদেহ নিয়ে মচ্ছব করতে দেখেছি শবভুক শকুনী-গৃধিনীদের। শহরের গলির ডাস্টবিনে পচা-গলিত খাদ্যের ভুক্তাবশেষ নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে দেখেছি জঠরজ্বালায় হন্যে-হওয়া মানুষ, কাক এবং কুকুরকে। এক দুঃসহ যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হতে দেখেছি সেদিনকার তরুণ শিল্পী জয়নুল আবেদীনকে। তিনি কলকাতার ডাস্টবিনের আবর্জনায় নিক্ষিপ্ত পচা-গলা ভাতের জন্য রাস্তার খেঁকি কুকুর, কাক আর নিরন্ন মানুষের টানা হেঁচড়ার বীভৎস দৃশ্যকে মূর্ত করে তুললেন তার পেন্সিল-স্কেচের সবল রেখায়।

স্কেচে বাঙময় হয়ে ধরা-পড়া দুর্ভিক্ষের সেই মর্মস্পর্শী ছবি ছাপা হল দেশ-বিদেশের পত্রপত্রিকায়। মানবতার প্রতি এই নিষ্ঠুর অবমাননার জন্যে যুদ্ধের বিভীষিকার মধ্যেও নড়ে উঠতে দেখা গেল বিবেকবান মানুষের ক্ষুব্ধ অনুভূতি। ব্রিটিশ সরকারের নির্দয়তা, নিস্পৃহতা আর অরাজক শাসনের বিরুদ্ধে চারদিক থেকে উঠতে থাকল তীব্র ঘৃণা এবং ধিক্কার। কিশোর কবি সুকান্তের বিদ্রোহী প্রাণও সেদিন এই লোমহর্ষক দৃশ্য দেখে গর্জে উঠল। 'বিবৃতি' কবিতায় তিনি লিখলেনঃ

'পথে পথে দলে দলে
কংকালের শোভাযাত্রা চলে
দুর্ভিক্ষ গুঞ্জন তোলে

www.pathagar.com

আতংকিত অন্দরমহলে ।........
রাজপথে মৃতদেহ্ উগ্র দিবালোকে
বিস্ময় নিক্ষেপ করে
অনভ্যস্ত চোখে ।......

এই কবিতার আরেক জায়গায় তিনি লিখলেনঃ 'বিপন্ন পৃথ্বীর আজ শুনি শেষ মুহুর্মূহু ডাক/আমাদের দৃপ্ত মুঠি আজ তার উত্তর পাঠাক। ফিরুক দুয়ার থেকে সন্ধানী মৃত্যুর পরোয়ানা/ব্যর্থ হোক কুচক্রান্ত, অবিরাম বিপক্ষের হানা ।......

আমার কেন যেন মনে হ্ল তেতালিশের দুর্ভিক্ষ-পীড়িত আমাদের শহর আর গ্রামগুলোর সঙ্গে আশ্চর্য একটা মিল আছে এই শহরের। সুকান্ত যেন বাংলার ক্ষুধার্ত মানুষের আর্তনাদের দৃশ্য তার কবিতার শরীরে ধারণ করতে গিয়ে এখানকার একই সময়কার দুর্ভিক্ষের ভয়ংকর রূপটিও কল্পনা করেছিলেন। তাই তো তিনি বলতে পেরেছিলেনঃ 'দুর্ভিক্ষের জীবন্ত মিছিল, প্রত্যেক নিরন্ন প্রাণে বয়ে আনে অনিবার্য মিল' একই সঙ্গে উচ্চারণ করলেনঃ 'বিপুল মৃত্যুর স্রোত টান দেয় প্রাণের শিকড়'। এবং আরও বললেনঃ যখন সমস্ত বিপন্ন প্রাণ অনিবার্য নিয়মে এক হয়ে যায় তখন উত্তোলিত হয় তাদের হাতের মুঠি। আর তারা একত্রিত হয়ে আপন দুয়ার থেকে হাঁকিয়ে নিয়ে চলে মৃত্যুর ক্রূর দানবকে তাকে দলিতমথিত করে আবার একযোগে ছিন্নভিন্ন করে দেয়া সমস্ত কুচক্রান্ত এবং ব্যর্থ করে দেয় বিপক্ষের তথা শত্রুর অবিরাম হানা। ধ্রুব সত্যের মতন জাগ্রত এই স্তবকগুলো মনে গুঞ্জন তুলতেই আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। নাদিয়াকে জিজ্ঞেস করলামঃ আচ্ছা, তারপর কী হ্ল? কেমন করে পার হলে তোমরা দুর্ভিক্ষের সেই বিভীষিকা?

আমার মুখের পানে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল নাদিয়া। হঠাৎ কেমন যেন বদলে গেল উচ্ছল মেয়েটি। ওর চোখে জ্বলতে দেখলাম একটি স্ফুলিংগ। কৌতুকের চিহ্ন উবে গিয়ে মুখমণ্ডলে ফুটে উঠল ওর গাম্ভীর্য। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বিষণ্ন কণ্ঠে বললঃ অবরোধ-যুদ্ধের অনেক পরে জন্ম হয়েছে আমার। কিন্তু বাবার মুখে শুনেছি সব কথা। বাবা শত্রুর হামলা রুখতে গিয়ে দস্যু-বোমারুর আঘাতে খুইয়ে ছিলেন একটা পা। শহরের হাজার-হাজার লোক অমন করে হতাহত হয়েছিলেন। আমাদের পরিবারেও হানা দেয় দুর্ভিক্ষ। আমার দুই ভাই মারা গেল খাদ্যাভাবে। ওরা তখন ছিল দুধের শিশু। এরকম অগণন শিশুকে দুধের এবং রুটির অভাবে ঢলে পড়তে হয়েছিল মৃত্যুর কোলে। তেতাল্লিশের শুরুতে ভয়াবহ রূপ নিল দুর্ভিক্ষ। জঠরজ্বালায় নিঃশেষ হল লাখ কয়েক যুবক বৃদ্ধ, নারী এবং শিশু। মারিয়া ইভানোভনা ছিল আমার বা পাশে। দেখলাম নাদিয়ার কথা শুনে সজল হয়ে উঠল ওর দুই চোখ। রুমাল দিয়ে ঘন-ঘন চোখ মুছছিল মারিয়া। আনন্দময় পরিবেশটা দেখতে-দেখতে থমথমে হয়ে উঠল। মারিয়ার দীর্ঘশ্বাসে ছিল ফোঁপানোর শব্দ। ওর দিকে অবাক হয়ে তাকালাম। নিজেকে সামলে নিয়ে স্থির হয়ে বসল ও। বললঃ নাদিয়া ঠিকই বলেছে। ট্রেনে তোমাকে এসব দুঃখের কথাই বলতে চেয়েছিলাম আমি। আমার

www.pathagar.com

পরিবারও যুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষের শিকার হয়েছিল। বাবা আর আমার দুই চাচা জার্মানদের বোমার আঘাতে নিহত হন। পুরো একটা বছর আধপেটা খাইয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন মা আমাকে। আর আমার ছোট এক ভাই, এক বোনকে। এসব কথা ভাবলে আজও নিজেকে সামলে রাখতে পারি না আমি। মনে হয় বুঝি পাগল হয়ে যাব।

ডক্টর চেরখভ্, পাভলভ এবং আমি ওদের দু'জনকেই সান্ত্বনা দিলাম। চেরখভ্ বললেনঃ সত্যি আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না কী দুঃখের মধ্য দিয়ে যুদ্ধের সেই দুটি বছর সাঁতরে আসতে হয়েছে এই শহরবাসীকে। একদিকে তাদের ছিল জানবাজি রেখে ফ্যাসিস্ট বর্বরদের হটানোর দায়। অন্যদিকে ছিল অনশনের নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ। ভাগ্যিস আমাদের চারদিকে ছিল জালের মতন ছড়ানো অসংখ্য হ্রদ, খাল-বিল এবং নদী।

জিজ্ঞেস করলামঃ এরা কেমন করে সহায়তা যুগিয়েছিল আপনাদের?

ঃ জানতাম এরকম প্রশ্নই আসবে একজন সাংবাদিকের কাছ থেকে। আমার কথার পিঠে কথাটা বললেন তিনি।

ঃ হ্যাঁ, এরকম একটা প্রশ্ন অনেকক্ষণ ধরে উঁকিঝুঁকি মারছিল আমার মনে।

ঃ বলছি। শুনুন তাহলে। জানেন তো এ শহরের পশ্চিমেই নেভা নদী। এই নদী দক্ষিণে প্রাচীন ভল্গা-বাল্টিক ট্রেড রুটের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। ওখানে আছে ছোট-ছোট অনেক শাখা নদী আর কয়েকশ' খাল। খালগুলোর নব্বই ভাগই কাটা হয়েছে সোভিয়েত যুগে। পৃথিবীর সব থেকে নাব্য এবং আধুনিক ক্যানাল-নেটওয়ার্ক এটি। নেভা নদী এসব খালের মধ্য দিয়ে ক্যারিলো-ফিন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র হয়ে পশ্চিমে ফিনল্যাণ্ড সীমান্ত ধরে পুব দিকে ঘুরে ছুঁয়েছে শ্বেত সাগর। আবার উত্তরে লাদোগা আর দক্ষিণে গিয়ে মিলেছে বিশাল ওনেগা হ্রদের সঙ্গে।

পাইন আর ফার গাছের বিশাল অরণ্য আছে এখানটায়। মোট ভূমির ছেষট্টি ভাগই বন। নদী এবং খালগুলো বাহিত ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে। তেতাল্লিশের শীতে শহর যখন ধুঁকছিল খাদ্যাভাবে তখন বরফাবৃত ছিল এখানকার তাবৎ জলাশয়। এগারো-বারো ফুট ছিল বরফের গভীরতা। এটা আমাদের জন্য শাপে বর হয়েছিল। রাতের বেলা নেভা বন্দরের সাহসী নাবিক আর ছোট নৌকার মাল্লারা তীরের বরফ কেটে-কেটে পার হত নদী এবং খাল। জংগলের ভেতরকার কৃষি এলাকার গঞ্জে গিয়ে তাদের নৌযানে বোঝাই করত খাদ্যদ্রব্য। আবার অরণ্যের ছায়ায়-ছায়ায় গা-ঢাকা দিয়ে শহরের গোপন নৌঘাটগুলোতে নামাত গম, ভুট্টা, সবজি, ফলফলারি ইত্যাদি।

এভাবে জার্মানদের চোখে ফাঁকি দিয়ে চরম দুর্দিনে এরা দুর্ভিক্ষের গ্রাস থেকে রক্ষা করেছে শহরবাসীকে। আমাদের প্রতিরোধ-যোদ্ধারা এদের সাহায্যেই দু'বছর ধরে জার্মান অবরোধ ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছেন। আর শেষে অবরোধ গুঁড়িয়ে দিয়ে সক্ষম হয়েছেন ওদের চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে। সুতরাং আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে বিজয়ী বীরদের পাশেই এই বীর নাবিক এবং মাঝি-মাল্লাদের আসন। অবরুদ্ধ শহরে খাদ্য সরবরাহ করতে গিয়ে কতজনকেই না এদের দিতে হয়েছে আত্মাহুতি।

www.pathagar.com

কথাগুলো বলেই চেরখভ্ তাকালেন নাদিয়া পলস্কায়ার পানে। হাসিমুখে বললেনঃ কী ঠিক বলিনি নাদিয়া?

হংসীর মতন আবার চঞ্চল হয়ে উঠল মেয়েটি। সুরেলা গলায় বললঃ আপনার চেয়ে এ শহরের ইতিহাস আর কে ভাল বলতে পারবে স্যার। আবার শোনা গেল চেরখভের স্বরঃ শোনো মেয়েরা, এখানে সবাই তো আমরা দুর্ভোগ পুইয়েছি। সুতরাং সেই দুঃখের জন্য মন খারাপ কর না বরং প্রেরণা নাও অতীত থেকে।

এ সময় প্রসঙ্গ পাল্টে নাদিয়ার দিকে উজ্জ্বল চোখে চেয়ে পাভলভ বললঃ কিছু মনে কর না নাদিয়া। তোমাকে শুধু বাজিয়ে দেখছিলাম। সত্যি তুলনা হয় না তোমাদের এ শহর এবং শহরবাসীর। নিশ্চয়ই সব কিছুতেই তোমরা পাইওনীয়র। যুদ্ধে, বিপ্লবে, সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে, প্রাকৃতিক সম্ভারে- সব তাতেই। আর সে সঙ্গে রূপে-গুণেও।

কথাগুলো বলেই মুচকে হাসল পাভলভ। নাদিয়া সারা মুখ উদ্ভাসিত করে সায় দিল ওর কথায়। শেষে কফির খালি পেয়ালা নেড়ে ঝনঝন শব্দ তুলে আমাদের দিকে তাকাল নাদিয়া। বলল ঃ আপনারা ক্লান্ত। ঘন্টা চারেক ঘুমিয়ে নিন। ও বেলায় আছে প্রোগ্রাম। নদীর ওপারে আছে শহীদ প্রতিরোধ-যোদ্ধাদের স্মৃতিস্তম্ভ। অনির্বাণ শিখাও আছে ওখানটায়। আর আছে অজ্ঞাতনামা বীরদের স্মারক। বেলা একটায় লাঞ্চ টেবিলে দেখা হবে আবার। সবাই প্রস্তুত হয়ে থাকবেন।

ওদের ধন্যবাদ জানিয়ে নিজেদের রুমে গেলাম আমরা। বাথরুমে গিয়ে ধোপদুরস্ত হলাম। বিছানায় এলিয়ে পড়তেই দুই চোখ জুড়ে নামল ঘুম।

টেলিফোনের চিৎকারে ঘুম ভাঙল। রিসিভার তুলতেই শুনতে পেলাম পাভলভের গলাঃ গুড-আফটার নুন। প্রতি-অভিবাদন জানাতেই সে বললঃ মহিলারা তটস্থ হয়ে উঠেছে। আর দেরী করলে বকুনি খেতে হবে ওদের। জলদি বাথরুম সেরে পোশাক বদলে নাও। সোজা চলে এসো ডাইনিং টেবিলে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম বেলা বারোটা বেজে ত্রিশ মিনিট। জিজ্ঞেস করলামঃ এখানকার সবাই এসে গেছেন?

ঃ আধ ঘন্টা আগেই এসেছেন এঁরা। নাদিয়া তো এসেই গোঁ-গাঁ শুরু করে দিয়েছে। বলছে তোমরা নাকি কুঁড়ের রাজা।

ঃ সত্যি?

ঃ তাহলে ওর মুখেই শোন। বলেই ওদিককার রিসিভারটা নাদিয়ার হাতে তুলে দিল পাভলভ্।

শব্দ শুনবার আগে কানে ভেসে এল নাদিয়ার গলার জলতরঙ্গ ধ্বনি। হাসির চোটে কথাই বলতে পারছিল না মেয়েটা। শুধু একরাশ খিল্‌খিল্ গুঞ্জন ঢেউ তুলল আমার রিসিভারে। শেষে নিজেকে সামলে নিয়ে নাদিয়া বললঃ মিস্টার পাভলভ তিলকে তাল করছেন। আমি ওসব কিছুই বলিনি। বরং বলেছি ওঁরা ট্রেনে সারা রাত জেগে এসেছেন। তাছাড়া এখানকার পরিবেশে খাপ খাওয়াতে কষ্ট হবে

www.pathagar.com

ওঁদের। একটু ফোন করে ওঁদের সবাইকে জাগিয়ে দিন। আর পাভলভ সায়েব কিনা দিব্যি নিজে ভাল মানুষটি সেজে নালিশ জানালেন আমার বিরুদ্ধে।

পাভলভ্ ওপাশ থেকে কী যেন বলছিল। সেদিকে কান না-দিয়ে নাদিয়াকে সান্ত্বনা দিলাম আমি। বললামঃ তোমার মতন লক্ষ্মী মেয়ে আর দুটি হয় না নাদিয়া পলস্কায়ার। তুমিই আমাদের ফ্রেন্ড, ফিলোসফার অ্যাণ্ড গাইড। এই আগন্তুকদের কষ্ট তুমি না বুঝলে আর বুঝবে কে? আমার কথায় একেবারে বর্তে গেল নাদিয়া। আরেকবার মিষ্টি হাসির তরঙ্গ তুলে অভ্যর্থনা জানাল আমায়। বিগলিত হয়ে বললঃ অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনাকে। ইউ আর রিয়্যালি এ নাইস জেন্টেলম্যান অ্যান্ড এ গুড ফ্রেন্ড।

বললামঃ এই মন্তব্যের জন্যে আমার ধন্যবাদ নাও। তবে একটা কথা। এ নিয়ে আর পাভলভের সঙ্গে বিবাদ কর না। আমরা দশ মিনিটের ভেতর আসছি।

ওপাশ থেকে নাদিয়ার উত্তর ঃ আমি মোটেও ঝগড়াটে মেয়ে নই। তবে কেউ খোঁচা দিলে আমি একটু চটে যাই এই যা। এলেই দেখবেন আমি ভাল মেজাজেই আছি। আর হ্যাঁ, আমরা কিন্তু ঠিক দেড়টায় রওয়ানা দেব।

একটা বাজবার মিনিট দশেক আগে সবাই এসে হাজির হলাম ডাইনিং টেবিলে। কুশল বিনিময় হল এখানকার সবার সঙ্গে। ওঁরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। ডক্টর চেরখভের একপাশে ব্রিফকেসের ওপর রাখা ছিল একটি মোটা বই এবং ভাঁজ করা একখানি মানচিত্র। মারিয়া এবং নাদিয়া কথা বলছিল পাশাপাশি বসে। আমাকে আসতে দেখেই হাত তুলে অভিবাদন জানাল নাদিয়া। সদ্য ফোটা টিউলিপ ফুলের মতই মিষ্টি হাসি ওর মুখমণ্ডল জুড়ে।

রুমের এক কোণে আমায় টেনে নিয়ে গিয়ে ফিসফিসিয়ে পাভলভ বললঃ চঞ্চল হরিণীটিকে খ্যাপাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তোমার জন্যে পারা গেল না। তুমি যে কী পুষমন্তর দিলে বুঝতে পারলাম না। আমার দিকে একটা কটাক্ষ হেনে চুপ মেরে গেল ও।

পাভলভকে বললামঃ এটা খুনসুটির সময় নয় বন্ধু। খামোখা কথা কাটাকাটি হলে যাত্রানাস্তি হত।

ডক্টর চেরখভের পাশে গিয়ে বসলাম। সময় কম ছিল বলে লাঞ্চ সারতে হল নাকেমুখে। চেরখভ শুধু বললেঃ যে জায়গাটায় এখন যাচ্ছি ওখানে গেলে পুরো উত্তর-পুব ইউরোপের পরিবেশ দেখতে পাবেন। গায়ে লাগবে আইসল্যাণ্ড, নরওয়ে-সুইডেন-ডেনমার্ক আর ল্যাপল্যান্ডের বাতাস। ফিনল্যান্ডের সাগর আর বনবাদাড় তো হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারবেন।

হোটেল লেনিনগ্রাদের কার পার্ক থেকে আমাদের তিনখানা গাড়ি ছুটে চলল বিশাল একটি সড়কের মার্বেল-চত্বরের বুক ছুঁয়ে-ছুঁয়ে। চওড়াতে প্রায় ফুটবলের মাঠের মতন দেখতে ছিল রাস্তাটি। দু'ধারে বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চলের মতন সবুজের ঘন নিবিড় সব দৃশ্যপট। এখানে-ওখানে সার সার উদ্যান কুঞ্জ। মনে হল যেন সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি সমুদ্রস্নানে।

www.pathagar.com

আগের বারের মত চেরখভ ছিলেন আমার বাঁ-দিকে। ওঁর বাঁয়ে ছিলেন নাদিয়া এবং মারিয়া। পেছনের সারিতে পাভলভ এবং আরও ক'জন। চেরখভের কাছে জানতে চাইলামঃ এ কোন সড়ক ধরে যাচ্ছি আমরা? নেভেস্কি প্রোস্পেক্ট। বললেন তিনি। শহরের মূল সড়ক এটি। যাকে আমরা বলি মাদার স্ট্রিট অভ্ দ্য সিটি। এর সামনের মোহনায় এসে মিলেছে শহরের সব রাস্তা এবং অলিগলি। তাছাড়া এটি পশ্চিমের ক্যারিলিয়ান যোজক পেরিয়ে ছুঁয়েছে বাল্টিক সাগর উপকূল। সেখানে সুইডেনের সড়কগুলোর সঙ্গে মিলে ছুটে গেছে আইসল্যান্ড আর উত্তর মেরু মহাসাগর তটের দিকে।

ঃ তাহলে তো দেখছি পৃথিবীর অর্ধেকটাই দেখে যাবার ভাগ্য হল আমার। ঃ অর্ধেক না হলেও উত্তর-মেরুর বিচিত্র দুনিয়াটা এক নজর নিশ্চয় দেখে যেতে পারবেন। বললেন চেরখভ। নদীর ওধারে চলুন। দেখবেন কেমন করে ওখানে ফিন-উপসাগরটার তীরে আছাড় খেয়ে পড়ছে বাল্টিক আর মেরু মহাসাগরের ঢেউ।

বললামঃ দেখুন-ডক্টর চেরখভ, এখানকার অনেক জায়গার নামই আমি জানি। কিন্তু চোখে দেখবার সৌভাগ্য হল এই প্রথম। এই-যে রাস্তাটার ওপর দিয়ে চলেছি এটার নামও কম শুনিনি। কিন্তু এটাই নেভেস্কি প্রোসপেক্ট না-দেখলে আর আপনার মুখে না-শুনলে কখনও কী আঁচ করতে পারতাম? আরেকটা কথা জানতে চাইছি ডক্টর। একের ভেতর তিন-তিনটি নাম হল কেমন করে এই শহরের? যেমন ধরুন সেন্টপিটাসবুর্গ, পেত্রোগ্রাদ আর সবেশেষে লেনিনগ্রাদ।

চেরখভ হেসে বললেনঃ একের ভেতর কিন্তু আসলে চার। আরও একটি নাম ছিল এ জায়গাটার। ইনগারম্যানল্যাণ্ড।

ঃ আশ্চর্য তো! এ শহরের এরকম একটা নাম ছিল শুনিনি তো আগে কখনও? তবে হ্যাঁ, ইন্‌গারম্যানদের কথা অল্পবিস্তর জানি। কিন্তু পুরো ধারণা নেই আমার।

ঃ ঐতিহাসিকরা ছাড়া আমাদের দেশেও আজকাল আর ওদের কথা তেমন কেউ জানে না। অথচ এক সময় উত্তর-পুবের এই গোটা তল্লাটটাই ছিল ওদের। এখন যে-পথ দিয়ে আমরা যাচ্ছি শহর বসবার অনেক আগে এখানটায় ছিল ওদের বসত। বললেন চেরখভ।

জিজ্ঞেস করলামঃ শহর করবার সময় পিটার বুঝি ওদের উচ্ছেদ করেছিলেন?

ঃ না, তা হতে যাবে কেন। পিটারের লোকজন ওদের চোখের দেখাও দেখেনি। তার আগেই ওরা লাপাত্তা হয়ে যায় ফিনদের অনাচারে। কোথায় যে ইন্‌গারেরা হারিয়ে যায় সে বিষয়ে প্রাচীন ঐতিহাসিকেরাও স্পষ্ট কিছু বলতে পারেননি। তবে ওরা যে উত্তর মেরু বলয়ের ল্যাপম্যান জাতির একটা প্রধান শাখা ছিল সে বিষয়ে সবাই একমত। আমার ধারণা, ফিন জাতি এবং পরে সুইডিশরা এ অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করলে ওই তুষার-সন্তানেরা জায়গাটা আর নিরাপদ মনে করল না। ওরা সরে যায় সুদূর উত্তরের আর্কটিক সার্কেলের দিকে। পিটার যখন ১৭০৩ সালে এখানে রাশিয়ার নতুন রাজধানী করবার নির্দেশ দিলেন জায়গাটার পুরনো নাম কিন্তু তখনও

www.pathagar.com

বদলায়নি। 'ইনগারম্যানদের বসত' নামে ছিল এর পরিচিতি। ১৭১৩ সালে মস্কো থেকে রাজধানী সরিয়ে এনে এখানে বসবাস শুরু করলেন পিটার। তার আগেই তিনি যীশুর সহচর সেন্ট পিটারের নামে এই নতুন রাজধানীর নামকরণ করেছিলেন সেন্টপিটাসবুর্গ। কিন্তু স্থানীয় লোকেরা এরপরও শহরটিকে তাদের ভাষায় বলত 'ইন্‌গারমানলান্‌দ।'

সবাই আমরা মনোযোগ দিয়ে ডক্টর চেরখভের কথা শুনছিলাম। মাঝখান থেকে নাদিয়া দুই চোখে বিস্ময় ফুটিয়ে বলে উঠল। এসবের তো কিছুই আমরা জানতাম না স্যার। আমরা এই শহরে হাঁটাচলা করি দিনরাত। জন্মেছিও এখানে। অথচ জানি না এর ইতিহাস। আমার দৃষ্টি আজ খুলে দিলেন আপনি।

মারিয়া এবং পাভলভ বললঃ আমাদেরও।

ঃ এখানকার ইতিহাস সম্পর্কে আরও কিছু বলুন ডক্টর। জ্ঞান কিছুটা বাড়িয়ে নিতে চাই। বললাম আমি।

হো-হো করে হাসলেন চেরখভ। বিনম্র কণ্ঠে বললেনঃ আমি ইতিহাস নিয়ে সামান্য নাড়াচাড়া করি মাত্র। কিইবা বেশী বলতে পারব। আপনারাও তো কম জানেন না। তবে মেরু অঞ্চল সম্পর্কে কিছু গবেষণাকাজ আছে আমার। এই যা।

ঃ বলুন-ই না? তাগিদ দিলাম ওঁকে।

ঃ শুনুন তাহলে। বলতে শুরু করলেন চেরখভ। আচ্ছা, ল্যাপল্যাণ্ডের কথা তো জানেন। ফিন ভাষায় আর্কিটিক সার্কেলের এই দেশটাকে বলা হয় লাপ্‌পি। নরওয়েজিয়ান ভাষায় নাম হল এর লাপলান। আর সুইডিশ এবং রুশ ভাষায় লাপলান্‌দ। অঞ্চলটি এখন জুড়ে আছে উত্তর ইউরোপের চার-চারটি দেশ। একটি অংশ আছে নরওয়ের ফিনমার্ক আর তোরম্ জেলায়। বড় অংশটি আছে সুইডেনের নর্দলান্‌দ প্রদেশে। এটিই হল ঐতিহাসিক ল্যাপল্যাণ্ড। অর্থাৎ খাস ল্যাপ ভূমি। আরেকটি অংশ আছে ফেডারেল সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের কোলা উপদ্বীপ এবং কারিলো-ফিনিক সোভিয়েতের উত্তর সীমানা জুড়ে।

এই অংশটি ছিল প্রাচীন রাশিয়ার ভৌগোলিক নিরবচ্ছিন্নতার অন্তর্গত। এখানেই বাস করত ল্যাপম্যানদের উপশাখার লোক ইনগারম্যানরা। সুইডেনের রাজা দ্বিতীয় গুস্‌তাভাস সপ্তদশ শতকে ডেনদের প্রচুর উৎকোচ দিয়ে সুইডিশদের পক্ষে নিয়ে আসে। ইউরোপে প্রতিষ্ঠা করেন শক্তিশালী স্বাধীন সুইডিশ রাষ্ট্র। বলশালী হয়ে পুব দিকে সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য তিনি রাশিয়ার দিকে হাত বাড়ান। ১৬১৭ সালে ইন্‌গারম্যান ভূমি অর্থাৎ লেনিনগ্রাদের চারপাশের এ-অঞ্চলটি সুইডিশ দখলদার বাহিনীর কব্জায় চলে যায়। গুসতাভাস জার্মানীর নুরেমবার্গ, স্যাক্‌সনি এবং বোহেমিয়া, পোল্যান্ডের বিশাল এলাকা, ফিনল্যাণ্ড আর মেরু অঞ্চলের ল্যাপ ভূমিও দখল করলেন। বাল্টিক অঞ্চলে তার প্রতিদ্বন্দ্বী বলতে সেকালে আর কেউ ছিল না।

পিটার দ্য গ্রেট আঠারো শতকের শেষ দিকে সুইডিশদের হাত থেকে পুনর্দখল করলেন ইন্‌গারম্যান ভূমি। আর ইউরোপিয়ান সাম্রাজ্যলিপ্সুরা যাতে রাশিয়ার দিকে

www.pathagar.com

ভবিষ্যতে হাত বাড়াতে না পারে সেই লক্ষ্য নিয়ে এখানে রাজধানী করলেন। নেভার মুখে অনেকগুলো শক্তিশালী দুর্গ করে সুরক্ষিত করলেন তিনি পিটাসবুর্গকে।

সেই থেকে ২১৫ বছর অব্দি পিটাসবুর্গ ছিল রুশ সম্রাটদের রাজধানী। ১৯১৪ সালে শহরের নাম বদল হয়ে হল পেত্রোগ্রাদ। ১৯২৪ সালে লেনিনের মৃত্যুর পর তার সম্মানে এর নতুন নাম হল লেনিনগ্রাদ। তার আগে ১৯১৮ সালে এখান থেকে মস্কোতে আবার রাজধানী সরিয়ে নিলেন লেনিন। এই শহরে জীবনের দীর্ঘসময় কাটিয়েছেন আমাদের নতুন ইতিহাসের এই মহান নির্মাতা। এখান থেকেই শুরু করেন তিনি দুই ঐতিহাসিক বিপ্লব।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন তিনি এখান থেকেই। তার সমাজ বিপ্লব সংক্রান্ত মৌলিক গবেষণার কাজ চলে নেভা নদীর তীরের এক দোতলা বাড়িতে। সুতরাং তার স্মৃতিতে এ শহরের নাম লেনিনগ্রাদ হওয়া ছিল একশ' ভাগ ন্যায়সঙ্গত।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে স্মৃতি হাতড়ালেন চেরখভ। বললেনঃ একটা কথা কিন্তু বলতে ভুলে গেছি। ইনগারম্যানরা আসলে মেরু অঞ্চলের আদিম জনগোষ্ঠী। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে মেরুজীবনে অভ্যস্ত ছিল তারা। মেরুর তৃণভূমিতে ল্যাপম্যানদের মতোই তারা চড়াত বগ্গা হরিণ। হরিণের মাংস আর বনের ফলমূল ছিল তাদের খাদ্য। আর এদের পশম আর চামড়ায় হত তাদের পোশাক।

মেরু অঞ্চলের বিচিত্র প্রকৃতি আর জীবনধারা নিয়ে মুখে মুখে রচনা করেছে এরা চমৎকার সব লোক সঙ্গীত এবং গাঁথা কাব্য। প্রাক্তন রুশ লোকসাহিত্যে এর কিছু কিছু নিদর্শন আজও খুঁজে পাওয়া যায়।

ফিনরা অনেক পরে, খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে, আসে এ-অঞ্চলে। ফিনদের আদি নিবাস ছিল বাল্টিক সাগরের দক্ষিণ দেশে। এখানে এসে ইন্‌গারম্যানদের দেখাদেখি ফিন পশু চারকরাও লোকসঙ্গীতে পারঙ্গম হয়ে ওঠে। কয়েক যুগ আগে আবিস্কৃত হয়েছে 'কালি ভালা' নামের বিখ্যাত একটি ফিন লোকসঙ্গীত গ্রন্থ। এটি তাদের মধ্যযুগীয় লোক গাথা এবং সঙ্গীতের একটি সংগ্রহ পুস্তক।

একটা কথা বোধকরি জানেন। এই তুষার অঞ্চলের লোকরা আঞ্চলিক সাহিত্যে খুবই সমৃদ্ধ। রুশদের কথাই ধরুন। কবে কোন কালে তাদের কৃষ্ণসাগর অঞ্চলে কয়েকজন নাবিক জাহাজ ভাসিয়ে গিয়েছিলেন, আপনাদের সাব-কন্টিনেন্টে। পথে হয়ত সাতটি সাগর পাড়ি দিতে হয়েছিল তাদের। আদি যুগের রুশ নাবিকদের ভারত-ভ্রমণ নিয়ে রচিত হয়েছিল অপূর্ব এক লোক কাহিনী। যার নাম 'সাত সাগরের সফরনামা'। নরওয়ের লোকদের বাস উত্তর আটলান্টিক আর আইসল্যান্ড সংলগ্ন নরওয়েজিয়ান সাগরের মাঝখানে এক লম্বালম্বি চিলতে ভূখন্ডে। নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে তারা স্ক্যান্‌ডিনেভিয়ান। তাদের লোক কাহিনীর ইউরোপীয়ান নাম 'নরওয়েজিয়ান সাগা' অর্থাৎ নরওয়েবাসীর লোকগাঁথা। তেমনি আছে স্ক্যানডিনেভিয়ান, আইসল্যাণ্ডার আর ডেনিশদের লোক কাহিনী। আসলে শীতের

www.pathagar.com

দেশের প্রকৃতি আর মধ্য রাতে সূর্য ওঠার বর্ণাঢ্য রূপময়তা আদিকাল থেকে এ অঞ্চলের মানুষকে ভাবুক করে তুলেছিল। ডক্টর চেরখভের কথা শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম। কখন যে পুশকিন সিটির ডান পাশ দিয়ে কারিলিনা যোজকের দক্ষিণ মাথায় নেভা নদীর কাছাকাছি এসে গিয়েছিলাম বলতে পারব না। ঝাঁকে ঝাঁকে গাংচিলের মেলা দেখে চমকে উঠলাম। কাঁ-কাঁ শব্দ করে ওরা উড়ছিল আকাশে। আবার পরক্ষণে নেমে এসে সাঁতার কাটছিল নদীর নীলাভ স্বচ্ছ সলিলে। অর্থাৎ তারা মত্ত ছিল মাছ-শিকারে।

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলামঃ এ কোথায় এলাম?

চটুল নাদিয়া ফস্ করে জবাব দিলঃ নেভা নদীতে সাঁতার কাটতে! বলেই খিলখিলিয়ে হেসে উঠল ও।

বোকা বনে গেলাম। চোখের সামনে পদ্মার মতন বিশাল এক নদী। দু'তীরে সবুজ ঝোপঝাড়, নলখাগড়ার বন। বড় বড় ঝাঁকড়া গাছ দাঁড়িয়ে আছে আকাশে মাথা তুলে। সুদীর্ঘ সেতুর ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলল গাড়ীর বহর।

পুব দিকের মাথায় গম্বুজঅলা প্রকাণ্ড একটি ভবন। সেদিকে চোখ ফেরাতেই নাদিয়া বললঃ ওটা নৌবাহিনীর হেড কোয়ার্টার। একচল্লিশ বেয়াল্লিশে আমাদের নৌসেনারা এখান থেকে অবিরাম গোলাবর্ষণ করে পর্যুদস্ত করেছিল নাৎসী ফৌজকে।

নদীর দক্ষিণ মাথায় চোখে পড়ল অনেকগুলো রণতরী এবং সেই সঙ্গে বাণিজ্যিক জাহাজের বহর। এটা এখানকার বিখ্যাত নৌবহর উত্তর ইউরোপের সেরা পোতাশ্রয়ও এটি।

নদী পেরিয়ে মাইল খানিক যেতেই একটি উঁচু স্তম্ভের আঙিনায় থামল গাড়ি। এটি শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ। শ্বেত পাথরের মঞ্চের ওপর একটি প্রকান্ড পেতলের আধারে জ্বলছিল ইটারনাল ফ্লেম। পাশের একটি খোলা ছাদের নীচে রাখা অনেকগুলো দীর্ঘ ফলকে উৎকীর্ণ আত্মাহুতি-দেয়া নগর রক্ষীদের নাম। যাদের নাম জানা যায়নি তাদের স্মৃতি ধরে রাখা হয়েছে আরেকটি স্তম্ভে। লেখা আছঃ 'অজ্ঞাতনামা বীরদের স্মরণে।'

জায়গাটার পাশেই জাদুঘর। আমাদের সামনে মন্তব্যের বই খুলে ধরা হল। ওতে লিখলামঃ দেশপ্রেমিক বীরেরা মৃত্যুর উর্ধ্বে। যে-কোনও জাতির গর্ব এবং অহংকার তারা। তাদের উজ্জীবিত প্রেরণার কাছে সকল অপশক্তিই চির পরাভূত।

স্মৃতিস্তম্ভের সামনে দাঁড়িয়ে টিভি টিম ক্যামেরার ফিতায় ছবি ধরে রাখলেন আমাদের পুরো দলটার। মাইক মুখের সামনে ধরলে শহররক্ষী বীরদের উদ্দেশ্য একই মন্তব্য রাখলাম।

গাড়ি ফিরে চলল নদীর কোণের ইসমাইল মসজিদের সামনে দিয়ে। দিনটি ছিল শুক্রবার। অনেক তুর্কি, তাজিক, কিরগিজ আর ককেশান মুসল্লির ভিড় দেখলাম এখানে।

আমরা এখন ফিনল্যাণ্ড উপসাগরের পুব তীর ধরে চলছি। শহরের পশ্চিম উপকণ্ঠ এটি। অনেক কিপচাক তাতারের বাস এখানে। এদের আদিম বংশধারার

www.pathagar.com

নাম কিউমানজ। রুশ ভাষায় এদের বলা হয় পোলোবত্‌সি। এককালে এই কিপচাক তাতারদের নিবাস ছিল উত্তর-পশ্চিম রাশিয়ার এশিয়াটিক অঞ্চলে। একাদশ শতকে দক্ষিণ রাশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হল এদের আধিপত্য। দু'শ' বছর ধরে বাইজানতিয়াম, হাঙ্গেরি এবং কিয়েভ-এর সঙ্গে লড়াই করে টিকেছিল এরা।

১২৪০ খ্রিস্টাব্দে চেঙ্গিজ খানের পৌত্র তাতু খানের গোল্ডেন হোর্ড বাহিনীর হাতে পরাজিত হলেও কিপচাক তাতারেরা একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। এদের কয়েকটি গোত্র ক্রিমিয়ার তাতার খানদের রাজ্যে গিয়ে বসবাস শুরু করে পনেরো শ' শতকের শেষ দিকে। দুই বিশ্বযুদ্ধকালেই ক্রিমিয়া চলে যায় জার্মানদের হাতে। জার্মান আক্রমণে সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হয় কিপ্‌চাকদের। ১৯৪৪ সালে সেবাস্তোপোলের যুদ্ধে রেড আর্মীর হাতে জার্মানরা উৎখাত হলে পর অনেক কিপ্‌চাক তাতার সরে আসে পুব-উত্তরে অর্থাৎ খাস রাশিয়ায়।

তাতার খানদের শাসন-আমলে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল কিপ্‌চাকদের একটা বড় অংশ। লেনিনগ্রাদের উপান্তে এদের অনেকের বসবাস। বেশ কিছু কসাক, কিরগিজও আছ এ এলাকায়। এদেরই দেখলাম ইসমাইল মসজিদের আঙিনায়।

ফিরতি-পথে নেভা সেতুর কাছাকাছি আসতেই চেরখভ বললেনঃ এই যে সেতুটি দেখছেন জার্মান আক্রমণ ঠেকাতে এটি আমরা ডিনামাইটে উড়িয়ে দিয়েছিলাম ১৯৪১ সালে। শহর মুক্ত হওয়ার পর-পরই আমাদের প্রকৌশলীরা দ্রুত হাতে এখানে নির্মাণ করলেন এই নতুন সেতু।

আমাদের কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বসল নাদিয়া। প্রোগ্রাম শিটটি চোখের সামনে তুলে ধরে বললঃ সেতু পেরুবার আগে নদীর এ দিকটায় আরও দুটি জায়গায় এদের নিয়ে যেতে হবে স্যার।

ওর ইশারায় গাড়িগুলো ঘুরে চলল নদীর পশ্চিম পাড়ের রাস্তা ধরে। এখানে গাংচিলেদের কাণ্ড দেখে রীতিমতন ধাঁধা লেগে গেল চোখে। যেন ওদেরই অবাধ রাজত্ব এখানটায়। নদীতে সাঁতার কাটবার পর দিব্যি এসে ডানা ঝাড়ছে অলস ভঙ্গীতে রাস্তায় বসে। রোদ পোহাচ্ছে পরমানন্দে। গাড়িগুলোকে আমল দিল না মোটেও। সুতরাং বাধ্য হয়ে তিনটি শকটকে থামিয়ে হেঁটে রওয়ানা দিতে হল আমাদের সবাইকে।

চেরখভ হেসে বললেনঃ নদীর এই এলাকাটা হল সামুদ্রিক পাখিদের একটা স্বাধীন প্রজাতন্ত্র। বাইরের কাউকে বিনা ছাড়পত্রে এখানে ঢুকতে দিতে ওরা নারাজ। নিজের চোখেই তো দেখলেন আপন জায়গা থেকে এতটুকু সরল না ওরা। বরং আমাদেরই বাধ্য করল ওদের সীমান্ত এড়িয়ে চলতে।

ভারিক্কি চালের লোকটির কথা শুনে হো-হো করে হেসে উঠল সবাই। নাদিয়া তো বলতে গেলে খুন হল হাসির চোটে।

কোনও রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে ও বললঃ হাসিয়ে মনটাকে একেবারে হাল্কা করে দিলেন স্যার। কী বলে যে ধন্যবাদ জানাবো আপনাকে! এতক্ষণ শহীদ

www.pathagar.com

স্মৃতিস্তম্ভের জায়গাটায় গিয়ে কাতর হয়ে পড়েছিলাম।

চেরখভ ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেনঃ শোনো নাদিয়া, তুমি কেবল একাই নও। ওখানে গেলে আমি এবং আমরা সবাই বিষণ্ণ হয়ে পড়ি স্বজন হারানোর বেদনায়। দুঃখময় স্মৃতিকে সব সময় ঘিরে রাখে অব্যক্ত এক হাহাকার। কিন্তু তাকে ভুলেই তো পথ চলতে হয় মানুষকে। বলবে কেমন করে? জবাব হলঃ বর্তমান প্রজন্মের সুখ এবং আনন্দের উৎস থেকে অনুপ্রেরণা সঞ্চয় করে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ফের তিনি বললেনঃ এই পাখীদের দিকেই তাকিয়ে দেখ না কেন। যুদ্ধের সময় এদের পূর্বসূরীদেরও কী কম বিপদ গেছে? চির স্বাধীনতাপ্রিয় এই সামুদ্রিক পাখিরা। অথচ শত্রুর বোমা কত প্রাণই-না সংহার করল এদের। কেড়ে নিল এদের বিচরণের স্বাধীনতা। এরা তখন চলে গিয়েছিল মেরুর মুক্তাঞ্চলে। শত্রু উৎখাত হওয়ার পর এই বিহঙ্গকুলের বিচরণ ক্ষেত্রটিও মুক্ত হল। স্বাধীনতা ফিরে এলে বোবা প্রাণীরাও কতখানি গর্বিত এবং আনন্দিত হয় এদের দিকে তাকিয়ে বুঝতে শেখ সেই সত্যটি।

আমি চেরখভের কথায় সায় দিয়ে বললামঃ আপনার কথা একশ' ভাগ সত্যি ডক্টর। তবে সঙ্গে সঙ্গে এও সত্যি, মানুষের স্বাধীনতার পাশাপাশি বন্য প্রাণীদের স্বাধীনতায়ও আপনারা বিশ্বাসী। আপনাদের দিক থেকে উপদ্রবের কোনরকম আশংকা নেই বলেই তো অমন নির্ভয়ে বিচরণ করতে পারছে এরা। সাহস পাচ্ছে নিজেদের দখল আঁকড়ে রাখতে।

আমার কথায় আবার হাসির ধুম পড়ল।

চেরখভ, বললেনঃ ঠিকই বলেছেন। আমাদের এখানে বন্য প্রাণী রক্ষার আন্দোলন চলছে সেই কবে থেকে। সোভিয়েত জনগণ এ বিষয়ে কেবল সজাগই নয়- প্রাণী -প্রেমিকও তারা। কিছুদূর সামনে গেলেই উঁচু স্তম্ভের গায়ে অনেকগুলো ফলক দেখতে পাবেন। যেখানে লেখা আছেঃ প্রাণীরা জাতির সম্পদ। ওদের বাঁচতে দাও।

হাঁটতে-হাঁটতে আমরা এক প্রাচীন দুর্গের সামনে এসে দাঁড়ালাম। দুই খ্রীস্টান সন্ন্যাসী সেন্ট পিটার এবং পলের নামে এটির নামকরণ করা হয়েছিল গোড়াতে। পিটার দ্য গ্রেট শহর নির্মাণকালে এই দুই পবিত্র পুরুষের স্মৃতি ধরে রাখবার জন্য এখানে উঁচু প্রাচীরবেষ্টিত নৌ ঘাঁটিটি করেছিলেন।

এ সময় পাভলভ আমার দিকে তাকিয়ে বললঃ দেখলে তো দুর্গ চূড়ায় দুই সন্নাসীর প্রস্তর মূর্তি। পিটার ভেবেছিলেন এরা যখন মাথায় দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছেন তখন বাইরের কোন শত্রু এ-শহর এবং নদীর পাশ ঘেঁষতে পারবে না। আসলে পিটারের আমলে রুশ নৌবাহিনী সুসংগঠিত হয়ে উঠেছিল। বাল্টিক সাগর এলাকায় অমন শক্তিশালী নৌবহর সেকালে আর কোনও দেশেরই ছিল না।

এই দুর্গে মোতায়েন ছিল প্রশিক্ষিত নৌ সেনাদল। তাছাড়া নদীর জলসীমা জুড়ে টহল দিয়ে বেড়াত তখন কামান সজ্জিত যুদ্ধ জাহাজের বহর। ফিন সাগরেও ছিল অনেক রুশ নৌ ঘাঁটি। এসব কারণেই সে যুগে রাশিয়ার জলসীমায় আসবার

www.pathagar.com

সাহস পায়নি ইউরোপের কোনও সাম্রাজ্যবাদী দেশের রণতরী। আবার এখানকার শীত ছিল তাদের জন্য সবচেয়ে বড় বাধা। একবার কোনও রণতরীর বহর যদিও-বা সাহস করে এ অঞ্চলে পা বাড়াত কিন্তু এখানকার সাগর-নদী এবং হ্রদে তুষার জমে গেলে দফা-রফা হয়ে যেত তাদের। যেমন হিটলার অনেক ক্রিয়া কসরত করেও একচল্লিশ-বেয়াল্লিশে তার কোনও নৌবাহিনী পাঠাতে পারেননি এই শীতের দেশে। কিন্তু পিটারের এই 'পবিত্র' নৌ দুর্গটি শেষ অব্দি রক্ষা করতে পারল না তার পবিত্রতা। তার পরবর্তী সম্রাটদের আমলে এটি হয়ে উঠল ফ্রান্সের বাস্তিল দুর্গের মতন এক জঘন্য বন্দীশালা। যেসব দেশপ্রেমিক স্বেচ্ছাচারী শাসকদের অনাচারের বিরুদ্ধে কথা বলতেন তাদের ওপর এখানে চলত অমানুষিক নির্যাতন। এদের চিহ্নিত করা হত রাজদ্রোহী নামে। মৃত্যুদণ্ডই ছিল রাশিয়ার এই হতভাগা মহান সন্তানদের বিধিলিপি। এ রকম অগণন দেশপ্রেমিককে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়েছিল সেন্ট পিটার এবং পলের নামে উৎসর্গীকৃত এ ভয়াবহ কয়েদখানায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একটি বিজয়স্তম্ভ

তোমরা তো লেনিনের বড় ভাই আলেকজান্দার উলিয়ানভের কথা জানো। আলেকজান্দার ছিলেন উনিশ শতকের শেষ পর্বের সমাজ বিপ্লব এবং শাসন-সংস্কার আন্দোলনের এক মহান নেতা। অমন এক বড় মাপের নেতাকে কিনা শেষ পর্যন্ত অভিযুক্ত করা হল সম্রাট তৃতীয় আলেকজান্দারের প্রাণনাশের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে।

তোমরা তো জানতে তাকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। কিন্তু নিশ্চয় জানতে না কোথায় কার্যকর হয়েছিল তার মৃত্যুদণ্ড? জায়গাটা দেখাবার জন্য তোমাদের এখানে নিয়ে এলাম আমরা। এবার ভালমতন চেয়ে দেখ সেন্ট পিটার এবং সেন্ট পলের সেই আশীর্বাদপুষ্ট দুর্গটি। এই চার উঁচু পাঁচিলের অন্ধকার গুহার ভেতরেই

www.pathagar.com

ফাঁসিতে লটকিয়ে হত্যা করা হয়েছিল উলিয়ানভের মতন এক মহাপ্রাণ ব্যক্তিকে। সেটি ছিল ১৮৮৭ সাল। লেনিনের বয়স তখন মাত্র আঠারো। এই শহরের বিশ্ববিদ্যালয়ে সবেমাত্র আইন অধ্যয়ন করতে শুরু করেছিলেন লেনিন। বড় ভাইয়ের মর্মান্তিক মৃত্যুদণ্ড তার কৈশোর মনে নিদারুণ আঘাত হানল।

এই ঘটনা বিপ্লববাদের পথে দ্রুত টেনে আনল তাকে। নইলে হয়ত একজন আইনবেত্তা হিসেবেই বেঁচে থাকতেন তিনি। একটি ভয়ংকর মৃত্যু একটি তরুণ প্রাণে কতবড় ঝড় তুলতে পারে লেনিন হলেন তার এক সাক্ষাৎ দৃষ্টান্ত। ভাইয়ের ফাঁসির দিনটিতেই তিনি শপথ নিয়েছিলেন স্বেচ্ছাচারী এবং ঘাতক-শাসকদের উৎখাত করবেন। একই সঙ্গে শপথ নিয়েছিলেন নতুন এক সমাজ গড়বেন। মাত্র চুয়ান্ন বছরে জীবনে এই লক্ষ্যটিকে পুরোপুরি রূপ দিয়ে যেতে পেরেছিলেন এই বিপ্লবী চিন্তানায়ক।

পাভলভের কথার পিঠে ডক্টর চেরখভ বললেনঃ তার জন্যেই তো তিনি স্মরণীয় হয়ে আছন গোটা সোভিয়েত দেশ জুড়ে। শুধু এই শহরই তার স্মৃতি ধরে রাখেনি। আলতাই পর্বতমালার দেশ কাজাকিস্তানের দিকে তাকিয়ে দেখুন। ওখানে প্রাচীন রিদার শহরের নতুন নাম হয়েছে লেনিনো গোরস্ক। আজারবাইজানের চা আর কমলালেবু রফতানীর এক বিখ্যাত কাস্পিয়ান বন্দরের নাম হয়েছে লেনিনোকোরান। যার আগের নাম ছিল লেনকোরান। ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেললাইনের ওপর দাঁড়ানো দক্ষিণ সাইবেরিয়ার একটি শহরের নাম লেনিনস্ক। এটির পুরনো নাম ছিল কুজনেৎস্কি।

এবার মধ্য এশিয়ার তাজিক প্রজাতন্ত্রের ম্যাপটার দিকে একবার দেখুন। ওখানে আছে ট্রান্স-আলতাই পর্বতামালার সবচেয়ে উঁচ চূড়াটি। পামীর শৃঙ্গের পর সোভিয়েতের দ্বিতীয় উচ্চতম চূড়া এটি উঁচুতে প্রায় সাড়ে তেইশ' হাজার ফুট। এর নাম এখন লেনিন- শৃঙ্গ। সাবেক নাম ছিল কাউফমান চূড়া।

এতক্ষণ চুপ করেছিল মারিয়া ইভানোভনা। এবার সে হাত উঁচিয়ে বললঃ আমি একটা কথা বলব?

ওর পানে চোখ তুলতেই দেখলাম ঠোঁটে ওর এক ঝলক রহস্যময় হাসি। মাথা নেড়ে সবাই সায় দিতেই মারিয়া চোখ কুঁচকে বললঃ এতক্ষণ তো অনেক কথাই বলা হল। কিন্তু কেউ ভেবে দেখেছেন কেন গাংচিলেরা পথরোধ করে দাঁড়াল আমাদের? আমিই বলছি, শুনুন। এই মুক্ত বিহঙ্গরা নির্ঘাৎ ঘৃণা করে আমাদের অতীতের এ-যন্ত্রণাদায়ক দুর্গটিকে। তারা চায় না কোনও বাইরের লোক এটি দেখুক। তার জন্যই অমন করে ওরা আগলে রেখেছে এই পথটি। আবার হাসতে হল সবাইকে। নাদিয়া হেসে সমর্থন জানাল মারিয়াকে। বললঃ মাদাম ইভানোভনার কথাই ঠিক।

ঘুরে ফিরে দেখলাম আমরা দুর্গটি। এটি এখন নৌবাহিনীর মিউজিয়াম।

কিছুদূর যেতেই দেখলাম ঘাটে বাঁধা আছে একটি রণতরী। ফ্রিগেট ধরনের সাবেক আমলের এক যুদ্ধজাহাজ।

পাভলভ সিঁড়ি বেয়ে জাহাজটার দিকে আমাদের নিয়ে যেতে লাগল। বললঃ দিস্ ইজ দ্য হিস্টরিক্যাল ব্যাটল শিপ অভ্ দ্য গ্রেট ফেব্রুয়ারি রেভ্যুলিউশন অর্থাৎ

www.pathagar.com

মহান অক্টোবর বিপ্লবের ঐতিহাসিক যুদ্ধজাহাজ এটি। এ জাহাজ থেকেই প্রথম ও-পাড়ের জার প্রাসাদের দিকে গোলা ছুঁড়ে ১৯১৭-এর ফেব্রুয়ারি বিপ্লব শুরু করেছিলেন আমাদের বিদ্রোহী নাবিকেরা।

জাহাজটি এখন এক ঐতিহাসিক দর্শনীয় বস্তু। যে দূরপাল্লার কামান থেকে গোলাবর্ষণ করা হয়েছিল সেটি আগের মতই মোতায়েন ছিল জাহাজের খোলে। দু'-ধারে ছিল মাঝারি গোছের আরও কয়েকটি কামান। সব ক'টিকেই সাফসুতরো করে রাখা হয়েছিল।

নেড়েচেড়ে দেখলাম বড় কামানটি। এক ফুটের বেশী চওড়া গোলার নলের মুখ। ও-পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম বিশালাকৃতির গ্রীষ্ম প্রাসাদ। মাইলখানেক জায়গা জুড়ে আছে প্রাসাদ এবং চার দিককার তরুবীথি খচিত উদ্যান। ওই প্রাসাদ তাক করেই গোলার পর গোলাবর্ষণ করা হয়েছিল এই জাহাজ থেকে। ভাবছিলাম শেষ রুশ সম্রাট নিকোলাসের হাল কেমন হয়েছিল যখন শুরু হল গোলার বৃষ্টি। আমার ভাবনাটার জবাব এল পাভলভের কাছ থেকেঃ ওই রাতের কথা বুঝি ভাবছ? নিশ্চয় ভাবছ কি দশা হয়েছিল সেদিন জার নিকোলাসের? শোনো, পিতৃপ্রাণ রক্ষার জন্য সেকি হাপিত্যেশ শুরু করেছিলেন তিনি সেদিন! রাতের অন্ধকারেই স্ত্রী-পুত্র-কন্যা আর অনুচর দল নিয়ে পালিয়ে গেলেন পিটাসবুর্গ ছেড়ে। কোষাগারে পড়ে থাকল জনগণের রক্তশোষণ করা তার বিপুল ঐশ্বর্যভাণ্ডার। পড়ে থাকল রাশি রাশি হীরা জহরত আর সোনাদানা। জিজ্ঞেস করলামঃ ওই প্রাসাদটা দেখা হবে কখন?

পাভলভের হয়ে আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জবাব দিল নাদিয়া ঃ কাল বিকেলে। এখন ঐতিহাসিক জাহাজটা আরেকবার ভালমতন দেখে নাও। কিছুক্ষণ পরেই যাব আমরা পুশকিন সিটি। ওখানে আছে শীতপ্রাসাদ ছাড়াও দেখবার মতন অনেক কিছু। ফিন উপসাগরটাও দেখতে পাবে।

জাহাজের দোতলায় কাপ্তানের কক্ষটি খুঁটে খুঁটে দেখলাম। পেতলের কম্পাসটি দেখে মনে হল আনকোরা নতুন। মনে হল যেন এই মাত্র নিজের আসন ছেড়ে উঠে গেলেন কাপ্তান।

নীচের তলায় লোহার শেকলগুলো তেমনি বাঁধা আছে মোটা খুঁটিতে। দেখলাম নদীতে মাটি কামড়ে আছে কয়েকটি ভারী নোঙর। পাটের কিছু মজবুত দড়াদড়িও চোখে পড়ল। ভাবছিলাম এই পাট নিশ্চয়ই এখানে রফতানী হয়ে এসেছিল আমাদের দেশ থেকে। কারণ রাশিয়ার সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যিক লেনদেন তো সেই কবে থেকে।

রণতরীটি দেখা শেষ হলে পর গাংচিলদের বিদায় জানিয়ে ছুটলাম বড় সড়কটির দিকে। গাড়ি ছুটল এবার সেতু পেরিয়ে পুশকিন সিটির পথে।

সবুজের লাবন্য সারা শরীরে মাখতে-মাখতে চলতে লাগলাম পথ। কিন্তু চলা যেন আর শেষ হয় না। প্রায় মাইল চল্লিশেক পেরিয়ে এলাম আরেকটি শহরে। শ্যামলিমার এক চিত্রার্পিত নগরী এটি। চোখ ফেরাতে পারছিলাম না তার ছায়াঘেরা তরুবীথি থেকে।

www.pathagar.com

আমার মুগ্ধতা দেখে ডক্টর চেরখভ হেসে বললেনঃ কবি পুশকিন সবুজের এই ভুবনটাকে বলতেন ভূস্বর্গ। বলতেনঃ এ প্যারাডাইস ইন আরথ এবং আরও বলতেনঃ এ হ্যাভেন ফর পোয়েটস অ্যাণ্ড রাইটার্স। অর্থাৎ কবি এবং লেখকদের জন্য এটি এক নন্দনকানন। পুশকিন এখানেই কাটিয়েছেন তার শৈশব, কৈশোর এবং যৌবন। শেষে শহরটা তার নামই ধারণ করল।

পুশকিনের প্রসঙ্গ উঠলে আমি ফার্সি সাহিত্যের মহাকবি ফিরদৌসীর উপমা টানলাম। বললামঃ ইরানের নাইটিঙ্গেল ওই কবিও পার্বত্য নদী এবং বৃক্ষশোভিত তার গ্রামটিকে বলতেন ভূস্বর্গ। তার নামে গ্রামটির নাম হয়েছে এখন 'ফিরদৌসী'। যার অর্থ স্বর্গ।

চেরখভ অবাক হলেন। বললেনঃ তাই নাকি! কথাটা জানা ছিল না আমার। দেখছি সত্যি-সত্যি এক অসাধারণ সাজুয্য আছে বড় কবিদের ভাবনায়। আমি জানতাম সুলতান মাহমুদ ঠকিয়েছিলেন ফিরদৌসীকে। মহাকাব্য 'শাহ্‌নামা'র ষাট হাজার শ্লোকের জন্যে ষাট হাজার স্বর্ণমুদ্রা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সুলতান। শেষে কিনা ষাট হাজার স্বর্ণ মুদ্রার বদলে ষাট হাজার রৌপ্য মুদ্রা দেবার কথা বললেন। ঘৃণাভরে সুলতানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন কবি এবং মাহমুদের ক্ষুদ্র মানসিকতার নিন্দাসূচক কবিতা লিখে পালিয়ে গেলেন রাজধানী গজনী ছেড়ে।

বললামঃ শ্লেষাত্মক কবিতাটি যাতে সুলতান এবং তার পরিষদবর্গের নজরে পড়ে তার জন্যে সেটি রাতের বেলা মাহমুদের দরবার হলের দেয়ালে টাঙ্গিয়ে রেখে গেলেন কবি।

মাথা নেড়ে চেরখভ বললেনঃ আত্মমর্যাদাশীল মহৎ কবি এবং লেখকরা এরকমই হন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভ আর বিদ্রোহ-ই তো দেশে দেশে এনেছে সমাজ-বিবর্তন। পুশকিনকেই দেখুন না। তিনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এই লীলা নিকেতনে অবস্থানকালে দুধের নহরে ভাসতে দেখেছেন জার, জারিনা, তাদের পুত্রকন্যা আর তোষামুদে পরিষদদলকে। অথচ তখন দুর্ভিক্ষের পর দুর্ভিক্ষে ভুগে আর্ত হাহাকারে রাশিয়ার আকাশ-বাতাস ভারী করে তুলেছিল কংকালসার কৃষক শ্রেণী এবং দরিদ্র-নিঃস্ব জনগণ। যুগ যুগ ধরে তাদের সম্পদ লুটে নিয়ে এখানকার প্রাসাদগুলোকে ভরে তুলতে এতটুকু বিবেকে বাধেনি স্বৈরাচারী সম্রাটদের। সাধারণ মানুষ যখন ক্ষুধার জ্বালায় ধুঁকে-ধুঁকে মরে তখন তারা নতুন নতুন অলংকরণে জৌলুস বাড়াতে থাকেন তাদের রাজপুরীর।

দরিদ্র মানুষদের স্বাধীনতা বলতে তখন কিছুই ছিল না। তারা ছিল স্রেফ গোলাম অর্থাৎ ভূমিদাস। পানির দামে জারদের সামন্তরা কিনত তাদের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির শ্রম। এক উঁচু কোঠার অভিজাত পরিবারের সন্তান হলেও মানবপ্রেমিক কবি পুশকিন বুঝেছিলেন সাধারণ মানুষের স্বাধীনতা ছাড়া মুক্তি আসবে না সামন্ত শোষিত রাশিয়ার। এই তীক্ষ্ম উপলব্ধি থেকেই তরুণ পুশকিন ১৮২০ সালে লিখলেন তার সাড়া জাগানো কবিতা, 'অ্যান ওড্ টু লিবার্টি'। অর্থাৎ 'স্বাধীনতার গান'। যে

www.pathagar.com

কবিতার ছত্রে ছত্রে ছিল জুলুমবাজদের বিরুদ্ধে সুতীব্র ঘৃণা এবং শ্লেষ। আর স্বাধীনতার জন্যে ছিল কবির হৃদয় সংবেদ্য আকুতি।

এই বিদ্রোহাত্মক কবিতা লেখার অপরাধে নির্বাসন দণ্ড দেয়া হল পুশকিনকে। তাকে অন্তরীণে রাখা হল ককেশাসের পার্বত্য উপত্যকায় এবং ক্রিমিয়ায়। দুটি

নাৎসী ফৌজের বিরুদ্ধে পাল্টা রুশ আক্রমণ

জায়গাই ছিল নৈসর্গিক সৌন্দর্যের এক অপরূপ নিকেতন। পুশকিন বন্দী হলেন প্রকৃতির মায়াবন্ধনে। কিন্তু বিমুগ্ধ কবি চুপ করে থাকলেন না প্রকৃতির বন্দনা করেও। তার কণ্ঠ থেকে কেড়ে নেয়া গেল না স্বাধীনতার গান। স্তব্ধ করা গেল না তাঁর বিক্ষুব্ধ আত্মার যন্ত্রণা। ককেশাসে বসেই রচনা করলেন তিনি আরেকটি বিদ্রোহাত্মক কবিতা 'দ্য প্রিজনার অভ্ দ্য ককেশাস' 'ককেশাসের বন্দী'।

জানেন তখন পুশকিনের বয়স ছিল কত? মাত্র একুশ। বিদ্রোহী তারুণ্যের উত্তাল তরঙ্গ তখন তার শিরায়-শিরায়। প্রায় একই বয়সে ইংরেজি সাহিত্যের দুই প্রধান কবি শেলী এবং কীটস রচনা করেছিলেন তাদের শ্রেষ্ঠ নান্দনিক আর বিদ্রোহাত্মক কবিতাগুলো। বিপ্লবধর্মী কবিতার প্রসঙ্গ এসে যাওয়ায় আমি বললামঃ আমাদের বাংলা সাহিত্যের নবজাগরণের কবি নজরুল ইসলামও ঠিক একুশ বছর বয়সেই রচনা করেছিলেন তার টালমাটাল-করা কবিতা 'দ্য রিবিলিয়ন'। যার বাংলা শিরোনাম দিয়েছিলেন তিনি 'বিদ্রোহী'। চেরখভ সায় দিয়ে বললেনঃ বিশ্ব সাহিত্যের ওপর চোখ বুলাতে গিয়ে দেখেছি সব বড় মাপের কবিদের শ্রেষ্ঠ কবিতার

www.pathagar.com

জন্ম তাদের তারুণ্যের এই বয়ঃ সন্ধিক্ষণটিতেই।

আমাদের চারপাশে ভূস্বর্গের চোখ জুড়ানো সুষমা। সুতরাং প্রসঙ্গটি আবার উঠল। আমি বললামঃ মুঘল সম্রাটদের কথা তো আপনি জানেন। এরা আপনাদেরই আরেক ভূস্বর্গ ফারগানা উপত্যকার চুগতাই বংশের লোক। সম্রাট হলেও ফারগানার এককালের শাসক বাবুরের প্রপৌত্র জাহাঙ্গীর ছিলেন একজন প্রকৃতিপ্রেমিক কবি। কাশ্মীর উপত্যকাকে তিনি 'প্যারাডাইস ইন' অর্থাৎ ভূস্বর্গ বলে অভিহিত করেছিলেন। নিজের দেখা জগৎ আর ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের কাহিনী তুলে ধরেছেন তিনি তার রচিত চরিতকথা 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গিরী' গ্রন্থে।

বাবুরের কথা তো ভালই জানেন আপনি। কারণ তার জন্ম আপনাদেরই প্রতিবেশে। ফারগানায়। তিনি একজন উজবেক। মধ্য এশিয়ার সুলতান তৈমুরের চুগতাই বংশধারার লোক তিনি। কবি এবং গদ্য লেখক হিসেবে ফার্সি সাহিত্যে উচ্চাঙ্গের আসনে তার স্থান। ভারত জয় করলেও নিজের জন্মস্থান ফারগানাকে আজীবন মনে রাখতে দেখা যায় তাকে। প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীতে শোভিত ছিল তার জন্মস্থান সির দরিয়ার দেশের এই উপত্যকাটি। তিনি তার রচিত জীবনীগ্রন্থ 'বাবুরনামায়' ফারগানাকে বলেছেন ভূস্বর্গ। আবার কাশ্মীরের সঙ্গেও যোগ করেন একই অভিধা।

প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর বর্ণনায় পারঙ্গম ছিলেন বাবুর। তার গদ্যে ছিল কাব্যের সৌরভ। আবার ইতিহাসে ছিল তার অসাধারণ পাণ্ডিত্য। নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি মধ্য এশিয়া এবং ভারতের সমকালীন ইতিহাসের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেন। তার ব্যক্তিগত চরিত্রে এবং তার লিখিত জীবনীগ্রন্থে প্রতিফলন ঘটে বিবেক-শাসিত মানবিক উচ্চাদর্শ আর অসাম্প্রদায়িকতা বোধের। মূল্যবান ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে বিশ্ব ইতিহাসে স্থান পেয়েছে তার বাবুরনামা।

ফিরিশতা, মিনহাজ, শামস-ই -সিরাজ, আবুল ফজল, ভিনসেন্ট স্মিথ, ডক্টর কাননগো প্রমুখ বিখ্যাত ঐতিহাসিকগণ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন বাবুরের রাষ্ট্র শাসন নীতির। তার শাসন নীতি ছিল পুরোপুরি অসাম্প্রদায়িক। আইনের প্রতি ছিল তার অপরিসীম শ্রদ্ধাবোধ। বিত্তবান এবং নির্বিত্ত নির্বিশেষে রাষ্ট্রের সব নাগরিককে তিনি আইনের চোখে অভিন্ন মনে করতেন।

ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ তার পুত্র এবং উত্তরসূরী হুমায়ূনকে দেয়া তার মৃত্যুকালীন একটি উপদেশের কথা প্রায়ই উদ্ধৃত করে থাকেন। এই উপদেশে তিনি বলেছিলেনঃ ভারতের শাসনকর্তা হতে যাচ্ছ তুমি হে আমার সন্তান। তুমি কোথায় জন্মেছ সে কথা তোমাকে ভুলে যেতে হবে। কারণ এ দেশের মাটিতে তুমি শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলছ। সুতরাং ভারতই তোমার স্বদেশ। এ দেশের সব ধর্মের সব বর্ণের মানুষকে সমান চোখে দেখতে হবে তোমায়। মনে রেখ একজন শাসকের যোগ্যতার একমাত্র মাপকাঠি হলঃ তার সমদর্শিতা, সুশাসন, ন্যায় বিচার এবং মানবপ্রেম।

বাবুরের মানবপ্রেমের একটি অনন্য দৃষ্টান্ত ভারতীয় ইতিহাসে উচ্চারিত হয়ে প্রবাদ কাহিনীর মত। একবার দিল্লীতে রাজস্থান জয়ের পর তার সংবর্ধনার আয়োজন

www.pathagar.com

হয়েছিল। এ সময় একটি পাগলা হাতি রাজকীয় হাতিশালা থেকে শেকল ভেঙ্গে তুলকালাম কাণ্ড শুরু করল সভাস্থ সংলগ্ন রাজপথে। দর্শনার্থীরা যে যে-দিকে পারল ছুটে পালাল প্রাণ নিয়ে। কেবল একটি মেথর শিশু পালাতে পারল না। পাগলা হাতির সামনে পড়ে গেল শিশুটি। সম্রাট তলোয়ার হাতে নিয়ে মত্ত পশুর শুড়ে আঘাত হেনে রক্ষা করলেন সেই অসহায় অস্পৃশ্য বালককে।

সম্রাটকে হত্যা করবার সুযোগ খুঁজছিল তখন এক রাজপুত্র যুবক। কারণ এই বিজেতা অধিকার করে নিয়েছিলেন তার দেশ। প্রতিহিংসায় এবং ঘৃণায় টগবগ করে ফুটছিল তার রক্ত। কোমরে কাপড়ের তলায় লুকানো ছিল তার বিষমাখা ছুরি। কিন্তু নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে একটি অসহায় শিশুর প্রাণ যেভাবে রক্ষা করলেন এই বিজেতা সেই দৃশ্যটি দেখে অভিভূত হয়ে পড়ল আততায়ী যুবক। আত্মগ্লানিতে জর্জরিত হল সে। তার মন বলল-এরকম মহাপ্রাণ মানুষেরই সাজে শাসন করা। পাপবোধে ক্ষতবিক্ষত রাজপুত্র যুবক ছুরিসমেত আত্মসমর্পণ করল সম্রাট সমীপে।

শাস্তির বদলে বাবুর তাকে নিজের বুকে তুলে নিলেন এবং যুবকটিকে তার দেশরক্ষী দলের অফিসার পদে অভিষিক্ত করলেন।

ঐতিহাসিকগণ বাবুরকে বিশ্বের মহান শাসকদের পংক্তিতে স্থান দিয়েছেন। বাবুরের পুত্র হুমায়ুন এবং পৌত্র আকবর অনুসরণ করেন তার নীতি। আকবর তার উদার অসম্প্রদায়িক নীতির রূপ দিয়ে রাজায়-রাজায় বিভেদে লিপ্ত খণ্ডবিখণ্ড ভারতকে অশোকের সময়ের মত ঐক্যবদ্ধ করলেন। গোটা উপমহাদেশকে একীভূত করলেন এককেন্দ্রীক সরকারের অধীনে।

অহিংস নীতির অনুসারক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, সর্বভারতীয় রাজচক্রধারী সম্রাট অশোকের সঙ্গে দেশ-বিদেশের নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকগণ তুলনা করেন বাবুর পৌত্র আকবরকে। পিতা হুমায়ুনের উত্থান পতনের জন্য লেখাপড়ার সুযোগ পাননি আকবর। কিন্তু বাবুরের বিদ্যানুরাগ এবং সংস্কৃতিপ্রীতি ছিল তার ধমনীতে। নিরক্ষর হয়েও যোগ্য রাজনীতিক, পণ্ডিত এবং জ্ঞানী গুণীদের কদর করতে জানতেন আকবর। তার সভা প্রখ্যাতি পেয়েছিল নবরত্ন সভা নামে। এখানে স্থান পেয়েছিলেন বিশ্বখ্যাত ঐতিহাসিক আবুল ফজল, দার্শনিক ফৈজী, ভূমি ও অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ তোডরমল, হাস্যরসবেত্তা মোল্লা দোপেয়াজা, বীরবল, কিংবদন্তীখ্যাত সঙ্গীত সাধক মিয়া তানসেন প্রমুখ।

আকবরের জীবনচরিত 'আকবরনামা' রচনা করে এই সর্বশ্রেষ্ঠ মুঘল সম্রাটকে চিরস্মরণীয় করে রাখেন পণ্ডিতকুল শিরোমনি আবুল ফজল। রাজনৈতিক দূরদর্শিতার জন্যে এই লোকটি আকবরের প্রধানমন্ত্রীর পদও অলংকৃত করেন। বিশ্ব ইতিহাসে আবুল ফজলের অবিস্মরণীয় অবদান হল তার রচিত ইতিহাস গ্রন্থ 'আইন-ই-আকবরী'। ভারতীয় ইতিহাসের এটি একটি আকরগ্রন্থ। ফজল এই গ্রন্থে শুধু আকবরের আমলের শাসন সংক্রান্ত নীতিমালা এবং কার্যক্রমই তুলে ধরেননি-একই সংগে প্রাচীনকাল থেকে তার সময় পর্যন্ত উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের

www.pathagar.com

নৃতাত্ত্বিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক আর রাজনৈতিক ইতিহাস তুলে ধরেছেন। আমাদের বাঙালী জাতির উৎপত্তির কথাও লেখা আছে এই গ্রন্থে।

চেরখভের সঙ্গে কথা বলছিলাম একটি উইলো ঝোপের তলায় দাঁড়িয়ে। এখানে ছোটবেলায় একটি রাজকীয় বিদ্যালয়ে পড়তেন কবি আলেকজান্ডার পুশকিন।

চেরখভ মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন আমার কথা। পাভলভ, মারিয়া, নাদিয়া এবং অন্যরা সবাই পাখির মতন কলরব করতে-করতে এগিয়ে গেল সামনেকার প্রাসাদ এলাকাটার দিকে।

বৃক্ষঘেরা একটি ময়দানের দিকে আমার চোখ পড়তেই প্রসঙ্গ বদল করে চেরখভকে জিজ্ঞেস করলামঃ অমন মনোরম জায়গা খুব কমই চোখে পড়ছে আমার। কী নাম স্থানটির?

ঃ আগে নাম ছিল জারস্কোই সেলো। জবাবে বললেন চেরখভ। অর্থাৎ জারের পাড়া। রুশ 'সেলো' কথাটার মানে গল্লা। পরে সোভিয়েত আমলে নাম হয়েছে 'দেতস্কোই সেলো'। অর্থাৎ শিশুদের গ্রাম। আমরা রুশ ভাষায় শিশুদের বলি 'দেতস্‌কো'।

ঃ কখন এখানে জারদের পাড়া গড়ে উঠল ডক্টর? ফের জিজ্ঞেস করলাম ওকে।

ঃ পিটার দ্য গ্রেটের আমলে। তিনিই পাড়াটার গোড়াপত্তন করেছিলেন।

তিনি একটি পুরনো দালানের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ ওই যে ওই বাড়ীটি দেখুন। ওখানেই এক সময় ছিল রয়্যাল লিচি। অর্থাৎ রাজকীয় স্কুল। রুশ ভাষায় লিচিকে বলা হয় স্কুল। পুশকিন এই স্কুলেই পড়তেন। পরে শহরের দক্ষিণের এই নির্জন অভিজাত এলাকাটায় গড়ে ওঠে একটি সিটি। এখন প্রায়-এক লাখ লোকের বাস এখানে। এর চারপাশে ঘুরে বেড়াতেন কিশোর পুশকিন। দেখুন কেমন সুবজাভ জায়গাটা। এখানকার মনোলোভা প্রকৃতিই ভাবুক করে তুলেছিল পুশকিনকে। ছাত্র বয়সে এখানে বসেই তিনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিয়ে লিখেছিলেন প্রচুর কবিতা। সেই বয়সেই তার মধ্যে ঘটতে দেখা যায় প্রতিভার বিস্ময়কর স্ফূরন।

ঃ এখন স্কুলটা বুঝি আর বসে না?

ঃ না, এটি এখন একটি জাদুঘর। পুশকিনের বই, বইয়ের পাণ্ডুলিপি, তার জীবনের অনেক নিদর্শন আর সেকালের অনেক ঐতিহাসিক উপকরণ সংরক্ষতি আছে এখানে। আর জানেন, জারদের সমস্ত দুষ্কর্মের নির্দশন মুছে ফেলা হয় এই তল্লাট থেকে। পুশকিনকে চিরঞ্জীব করে রাখবার জন্য কবির স্মৃতিবিজড়িত শহরটার নামকরণ করেছি আমরা পুশকিন সিটি। এখানে তার স্মৃতিফলকের উন্মোচন হয়েছে ১৯৩৭ সালে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার ঠিক দু'বছর আগে।

বৃক্ষকুঞ্জের ছায়ায় পায়চারি করতে-করতে কিছু দূরে দেখছিলাম দুটি বিশাল প্রাসাদ। সেদিকে সপ্রশ্ন চোখ তুলে তাকাতেই চেরখভ বললেন ঃ এটি হল সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথারিনের গ্রীষ্ম প্রাসাদ। সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথের আমলে শুরু হয় এর নির্মাণ কাজ। দ্বিতীয়টি সম্রাট প্রথম আলেকজান্ডারের গ্রীষ্ম প্রাসাদ। ইউরোপের

www.pathagar.com

সপ্তদশ শতকীয় অলঙ্করণবহুল বারোক স্থাপত্য রীতিতে নির্মিত ক্যাথারিন প্রাসাদ। আর ক্লাসিক্যাল রীতিতে গড়া আলেকজান্ডার প্রাসাদ। এটির কাজ শেষ হতে লাগে চার বছর। ১৭৯২ সালে হল গোড়াপত্তন। শেষ হল ১৭৯৬ সালে। আলেকজান্ডার প্রাসাদের নির্মাণ রীতি ক্লাসিক স্টাইলের। ওখানে গেলেই দুই নির্মাণ রীতির তফাৎ বুঝতে পারবেন।

কথা প্রসঙ্গে চেরখভ ফের বললেনঃ জানেন হিটলারের বাহিনী ছিল কেমন নৃশংস এবং বর্বর। চেঙ্গিজ খানের বাহিনীর চেয়েও জঘন্য ছিল নাৎসী ফৌজ। সভ্যতা এবং সংস্কৃতির জঘন্য ঘাতক এরা। জানেনই তো মোঙ্গলরা রোমের দ্বারপ্রান্তে গিয়েও ঐতিহাসিক শহরটাকে ধ্বংস করল না। কিন্তু এরা একচল্লিশ- তেতাল্লিশে লেনিনগ্রাদ অবরোধকালে পুশকিন সিটিকে মোটেও রেহাই দিল না। পুড়ে ছারখার করল এখানকার ঐতিহাসিক ভবনগুলো। জাদুঘরগুলো থেকে লুটে নিয়ে গেল মূল্যবান সব ঐতিহাসিক দলিল এবং পৌরাণিক সম্পদ আর রত্নরাজি।

তবে ওদের অবরোধ বিচূর্ণ হবার পর আবার আমরা বোমায় বিধবস্ত জাদুঘরগুলো দ্রুত সারিয়ে তুললাম। আমাদের পাল্টা কামানের আঘাতে পিঁপড়ার মতন ঝাঁকে ঝাঁকে মরল নাৎসী দস্যুরা। এই যে সবুজ তরুবীথি দেখছেন পুশকিন সিটিতে এবং চারপাশের গ্রামে এর সবই প্রায় ছাই হয়ে গিয়েছিল দস্যুদের নারকীয় বর্বরতায়। আবার আমরা নতুন গাছ আর উদ্যান রচনা করে জায়গাটাকে ভূস্বর্গ করে তুললাম।

ঘাসের গালিচায় মোড়া ছিল উদ্যানটি। গাছের ছায়াতলে ছিল মার্বেলের হাতলঅলা সার-সার চেয়ার এবং লম্বাটে বেঞ্চ। কথা বলতে বলতে আমরা দু'জন একটি বেঞ্চে এসে বসলাম। চেরখভ বললেনঃ আমি আপনাকে এই শহরের চারটি নামের কথা বলেছিলাম। আসলে সাংস্কৃতিক দিক থেকে বিচার করলে নাম হবে পাঁচটি। পুশকিন সিটি নামটি তো ইতিহাসেরই অন্তর্গত হয়ে আছে।

লক্ষ্য করেছি অতীতের কথা উঠলে চেরখভের চেহারাটা কেমন যেন বদলে যায়। একজন বিজ্ঞানমনস্ক গবেষক হলেও তাকে তখন দেখা যায় আবেগতাড়িত হয়ে উঠতে। মনে হয় বর্তমানকে এক পাশে ফেলে রেখে তিনি হাঁটতে শুরু করেছেন ইতিহাসের রহস্যময় রাজপথ ধরে। সেখানে পৌরাণিক কাহিনী আর ভৌগোলিক বৈচিত্র্য প্রকৃতির সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে ছায়াপাত ঘটায় ওর মানসলোকে। মুহূর্তে মানুষটি কবির মতন একজন ভাবুক হয়ে ওঠেন।

বেঞ্চটির পিঠে হেলান দিয়ে সামনের দিকে পা দু'টি গড়িয়ে দিলেন চেরখভ। উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর দুই চোখ। আমার দিকে দৃষ্টি তুলে ধরে বললেনঃ জানেনই তো এক সময় এ জায়গাটা ছিল জারদের খাস তালুক। সাধারণ মানুষ এর আনাচে-কানাচেও পা বাড়াতে পারত না। ওদর দেহরক্ষী সেনাদের অশ্বখুর ধ্বনিতে কাঁপত এখানকার মাটি। ক্যাথারিন যখন চাবুক হাতে ঘোড়া দাবড়িয়ে এদিকে আসতেন দূর থেকে লোকেরা দেখত তাকে সভয়ে।

www.pathagar.com

কিন্তু আজ ওরা কোথায়? কয়েকটি প্রাসাদ ছাড়া আর কোনও নামনিশানাও নেই ওদের এখানে। অথচ পুশকিন? তিনি ছিলেন, আছেন এবং চিরকাল থাকবেন। তার 'স্বাধীনতার গান' অনাগত যুগে যুগেও ধ্বনিত হতে থাকবে রুশদের কণ্ঠে। এখানে তারই রাজত্ব-জারদের এক তিল অস্তিত্বও আর এখানে নেই। তাই আমি বলছিলাম পঞ্চম পদবি হলেও এই সাবেক রুশ রাজধানীর জনচিত্তগ্রাহী নাম পুশকিন নগরী। যেমন আপনি বলছিলেন ইরানের ফিরদৌসী শহরের কথা।

জিজ্ঞেস করছিলাম চেরখভকে, কখন আমরা যাব জারদের প্রাসাদগুলো দেখতে? সঙ্গে সঙ্গে জবাবঃ ওই স্বৈরশাসকদের দীর্ঘশ্বাস এখানকার ধুলোবালিতে অনেক শুনতে পাবেন। তার চেয়ে বরং ভাল এখানটায় আরও কিছুক্ষণ বসে থেকে ইতিহাস নিয়ে কথা বলা।

সঙ্গে করে নিয়ে আসা লাল কভারের মোটা ডায়রিটা আমার হাতেই ছিল। সফর শুরু হওয়ার পর থেকে লেখালেখিতে ওটার অর্ধেকটা প্রায় ভরে গিয়েছিল। এ নিয়ে অবশ্য বন্ধুদের মধ্যে হাসি ঠাট্টাও কম হয়নি। কেউ কেউ মন্তব্য করেছিল দেশে ফিরে গিয়ে এই সফরের ওপর পুরোদস্তুর একখানা কেতাবই ছেপে ফেলবেন উনি।

পাভলভ ছিল ঢাকার তখনকার সোভিয়েত দূতাবাসের তথ্য বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা। কূটনৈতিক দিক থেকে তার পদবি ছিল ফার্স্ট সেক্রেটারি। জার্নালিজমের পাশাপাশি সাহিত্যের ডিগ্রী থাকায় এই ত্রিশোর্ধ যুবকের মধ্যে বরাবরই লক্ষ্য করেছি জ্ঞানের ব্যাপারে গভীর এক আগ্রহবোধ। আমার হয়ে সে জবাব দিয়েছিলঃ আমি তো মনে করি সফরকালে প্রত্যেক সাংবাদিকের পকেটেই একটি নোটবুক আর একটি কলম থাকা উচিত। আর সেটা দেশে হোক কিংবা বিদেশেই হোক। কারণ চোখ দিয়ে যা দেখি তা সব সময় হুবহু স্মৃতিতে ধরে রাখা যায় না। মেমোরি ক্যান বিট্রে। স্মৃতি ভুল করবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু চোখে দেখে কলমে তার ছবি ধরে রাখা হলে ভুল হওয়ার আর কোনও সুযোগই থাকে না। নূরী বই লিখুন আর না-ই লিখুন কিন্তু সাংবাদিক হিসেবে ঠিক কাজটিই করছেন। পাভলভের কথা শুনে চুপসে গিয়েছিল আমার বন্ধুরা। বোধকরি বেশ খানিকটা লজ্জাও পেয়েছিল তারা। তবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম আমি। পাভলভ এখন কোথায় আছে জানি না। সত্তরের দশকের পর অনেক পানি গড়িয়েছে ভল্গা-ডন, নীপার-উরাল, আমু এবং সির দরিয়ায়। আমাদের পদ্মা-মেঘনা আর গঙ্গা-যমুনায়ও কম পানি গড়ায়নি। বয়সের ভারে সবাই আমরা এখন ন্যুব্জপৃষ্ঠ। আমাদের সেদিনকার বন্ধুদের মধ্যে যারা ছিল উজ্জ্বল তরুণ তাদের চুলেও এখন যথেষ্ট পাক ধরেছে। আর পাভলভ? শুনেছি সে বছর কয়েক বাদে রাষ্ট্রদূত হয়েছিল শ্রীলংকার।

নিশ্চয় এখন তার অবসর জীবনের পালা। এবং ধবধবে চুল নিয়ে হয়ত চারণ করে চলেছে কূটনৈতিক জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার স্মৃতি।

সেই সফর শেষে ঢাকায় ফেরার পর আরও দু'তিন বার দেখা হয়েছিল পাভলভের সঙ্গে। একবার রমনায় দেখা হলে কৃত্রিম হ্রদটির পশ্চিম পাড়ের বিশাল বটগাছ আর

www.pathagar.com

দু'ধারের তরুবীথির দিকে তাকিয়ে বলেছিলঃ সত্যি তোমরা ভাগ্যবান। পৃথিবীতে আর কোথাও দেখিনি তোমাদের দেশের মতন অমন সোনাফলা উর্বর মাটি। এই মাটিতে কোনও শস্যবীজ কিংবা গাছের একটি চারা লাগালেই হল। অমনি মাটির রস পেয়ে তেজিয়ান হয়ে উঠবে ক্ষেতের ফসল, আর বাগিচার গাছপালা। দেখতে দেখতে সবুজে ভরে উঠবে চার পাশের সবকিছু। যেন যাদুর কাঠির ছোঁয়ায় আপনা থেকেই রূপ ধরে ওঠে সবুজ।

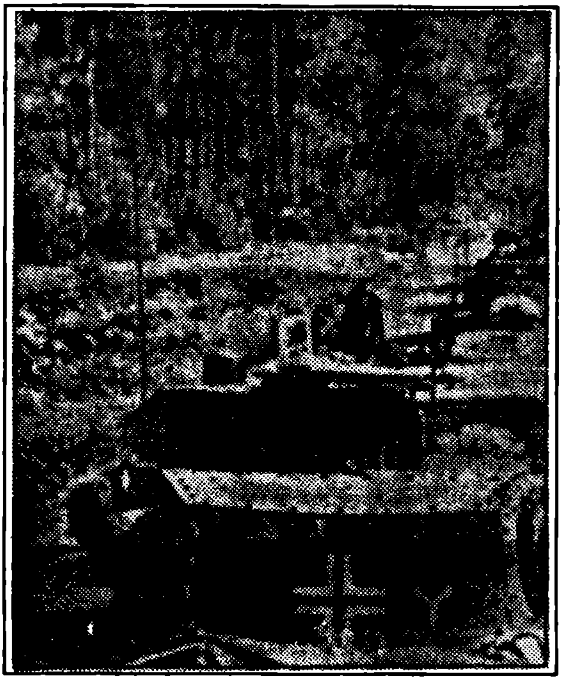

সোভিয়েত ভূগর্ভে নাৎসী ট্যাংক

অথচ আমাদের দেশে একটা গাছকে বাড়িয়ে তুলতে বছরের পর বছর ধরে কত যত্নই না করতে হয়। একটানা সার এবং সেচের পানি যুগিয়ে চলতে হয়। আবার জমিতে ফসল ফলাতে কী প্রাণান্ত পরিশ্রমই না করতে হয় আমাদের কৃষকদের। তুমি তো নিজের চোখেই দেখে এলে সব কিছু।

শীতের আগে আমাদের শহরগুলোর পার্কে গাছপালার স্নিগ্ধ-শ্যামল রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে এসেছ। কিন্তু শীতে একটানা তুষার ঝড় শুরু হলে ওদের কি দশা হয় তাতো দেখনি। স্তেপভূমির কয়েক জাতের চিরঞ্জীব তরু-গুল্ম আর ঘাস ছাড়া সবই ন্যাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে শীতের দাপটে। প্রকৃতির মনোরম দৃশ্যপটগুলোকে দেখলে তখন মনে হয় বরফে লেপ্টে থাকা কংকালের রাশি। প্রকৃতি রুদ্ধশ্বাস হয়ে ছয়-সাত মাস ধরে অপেক্ষা করতে থাকে বসন্ত ঋতুর জন্য। বসন্তে বইতে থাকে গা-জুড়ানো বাতাস। বরফ গলে গিয়ে শুকনো হয় মাটি। আধো-গরম আর আধো- শীতল হাওয়ার ছোঁয়ায় গাছের ন্যাড়া ডালগুলোতে গজাতে থাকে সবুজ পাতা। ফুটতে থাকে লাল-হলুদ, সাদা-বেগুনি, নীল-সোনালী কত কী বাহারি রংয়ের ফুল। দেড়-দুই সপ্তাহের মধ্যেই প্রকৃতির ভাঙা হাটে শুরু হয় বসন্ত উৎসব। পাতা, ফুল এবং ফল ভারে নুইয়ে পড়ে গাছের শাখা প্রশাখা। বসন্তের বৃষ্টি আমাদের যোগায় সেচের পানি। এই বৃষ্টি এ দেশের প্রকৃতির সঞ্জীবনী সুধা। তার

www.pathagar.com

প্রাণদায়িনী শক্তি। এরজন্যই এ দেশের লোকেরা নন্দিত করে বসন্তকে। তাকে মনে করে তাদের সুখের সময়ের আগমনী বার্তাবাহক।

কিন্তু এর পরও মধ্য রাশিয়ার চরম আবহাওয়ার শহর এবং গ্রামগুলোতে সবুজকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বসন্তেও কম কষ্ট করতে হয় না আমাদের। নদী, খাল এবং বিল-ঝিল থেকে নালা দিয়ে পানি এনে শ্যামল রাখতে হয় বৃক্ষকুঞ্জ। তাই বলছিলাম আদতেই তোমরা ভাগ্যবান। কারণ সবুজ এবং ফল-ফুল-ফসলের দাক্ষিণ্য সোনার রেণুর মতন বাংলার উর্বর মাটি মুঠো ভরে তুলে দেয় তোমাদের হাতে। যদি এই সোনার মাটির পুরোটাই তোমরা কাজে লাগাতে পারতে তাহলে কখনও অভাবের মুখ দেখতে হত না তোমাদের। আমার মনে হয় তোমরাই হতে পৃথিবীর সবচেয়ে স্বয়ম্ভর, সুখী জাতি।

পাভলভের কথাগুলো ছিল বাস্তব অভিজ্ঞতাসঞ্জাত। কেননা, সে ঢাকায় তিন বছর ছিল। এই সময়টায় সে ঘুরে ঘুরে দেখেছে বাংলাদেশের মাঠঘাট, গ্রামগঞ্জ এবং নদীনালা। আবার ছোটবেলায় দেখেছে রাশিয়ার অনুর্বর স্তেপভূমি, তৃণহীন প্রান্তর, পুবের সাইবেরিয়া, বৈকাল এবং উরানের ওদিককার আলতাই আর কিজিলকুম মরুর বিশাল রৌদ্রদগ্ধ জগৎ। সামান্য কিছু গমের জন্য সেখানে সে দেখেছে শ্রমজীবী কৃষককে অহোরাত্র পরিশ্রম করতে। ওদের তুলনায় আসলেই আমরা অলস এবং শ্রমবিমুখ। কারণ কোনওকালেই লড়তে হয়নি আমাদের চরম আবহাওয়ার সঙ্গে। আমাদের লড়াই ছিল কেবল গ্রীষ্ম, বর্ষা এবং শরৎ এই তিন ঋতুর খরা, ঝড়, বন্যা এবং জলোচ্ছ্বাসের দুর্যোগের বিরুদ্ধে।

পাভলভের কথাগুলো আজও মনে পড়ে আমার। বেশী মনে পড়ে যখন বিচার করতে বসি পৃথিবীর সেই উত্তরতম চিরতুষার ভূমি, মধ্যবর্তী পামীরের উষ্ণ বলয় আর আমাদের বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলের মৃদু আবহাওয়ার দেশের জনজীবনধারার অবিশ্বাস্য রকমের তফাতের কথা। সেবার কাস্পিয়ান সাগরের উত্তরের তুষার ভূমি সফরকালে লিখে রেখেছিলাম পাভলভ এবং ডক্টর চেরখভের অনেক মূল্যবান কথা।

পুশকিন নগরীর পার্কে বসে চেরখভের সঙ্গে সেদিন আলাপ করবার সময় এই সুযোগে পুশকিন পরবর্তী রুশ সাহিত্য নিয়ে কিছু কথা হবে ভাবছিলাম। কারণ এখানে শীতের আগের মনোরম প্রকৃতির ছায়াতলে এসে বসলে স্বাভাবিক কারণেই পেয়ে বসে সাহিত্য মনস্কতায়। কারণ যেখানে ছিল রুশ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম গায়ক পাখীর বিচরণ সেখানে অন্যসব প্রসঙ্গ তো একেবারে জলো অর্থাৎ পানসে। এই আশায় লাল মলাটের ডায়রি বইটা খুলে ধরেছিলাম। অনুরোধ জানালামঃ 'উনিশ এবং বিশ শতকের রুশ কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার আর শিল্পীদের বিষয়ে কিছু বলুন ডক্টর। সঙ্গে সঙ্গে জবাব এল তার কাছ থেকেঃ বলব তো নিশ্চয়। তার আগে আমার এই মানচিত্রটা দেখুন। এর সঙ্গে যোগ আছে আদিম মানব বসতের। যোগ আছে এখানকার প্রাচীন ইউরেশিয়ান সভ্যতার, ভূগোল ইতিহাস আর ভাষা সাহিত্যের।

www.pathagar.com

বললেনঃ মারিয়া ইভানোভনা থাকলে ভাল হত। ও-তো মৃত জারদের দীর্ঘশ্বাস শুনতে ওদের সঙ্গে চলে গেল দুই গ্রীষ্ম প্রাসাদে। আপনি না ওর কাছে শুনতে চেয়েছিলেন জারের মতন ছড়ানো এখানকার রেল লাইন, সমুদ্র এবং আকাশ পথের কথা। মনে নেই আপনার? আগ্রহ দেখিয়ে বললামঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ। মনে আছে। নাৎসী আক্রমণে এই শহরের চারপাশটা তছনছ হয়ে গিয়েছিল। ছোট বেলায় কাগজে পড়েছি সেসব ভয়ংকর কাহিনী। কথাটা ওঠে সেই প্রসঙ্গে। বলুন না এখন এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সঙ্গে ইউরোপ এবং এশিয়ার যোগসূত্র কোথায়? এবং যুদ্ধের সময় কী হাল হয়েছিল এই বিশাল অঞ্চলের? ম্যাপটা খুলে ধরলেন চেরখভ্ আমার সামনে। বললেনঃ এই দেখুন বাল্টিক সাগর এবং ফিন সাগরের কতটা কাছে পুরানো পিটাসবুর্গ বন্দর আর শহরের অবস্থান। ডানদিকে পুব-উত্তরে সাগর এবং ওনেগা হ্রদের একেবারে বুকের কাছে আছি আমরা। লেনিনগ্রাদ জংশন থেকে শাখা রেল লাইনটা কোথায় চলে গেছে দেখুন। উত্তর মহাসাগর উপকূলের মারমানস্ক শহরে। শহরটার আধুনিক নাম পেত্রোজাভদস্ক। এটাই মেরুর দক্ষিণ-পশ্চিমের শেষ শহর। একেবারে উত্তরে রয়েছে আর্কটিক সার্কেল এবং আর্কটিক মহাসাগর। ডানদিকে খানিকটা কাছে ব্যারেন্ট সাগর, কীপটাভ এবং পূর্ব সাইবেরিয়ান সাগর। উত্তর-পশ্চিম ঘেঁষে আছে সুইডেন, তার উত্তরে নরওয়ে, পাশে ডেনমার্ক। একেবারে পশ্চিম-উত্তর কোণে ইংল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড তথা ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ।

দক্ষিণে নেদারল্যান্ড, বেলজিয়াম, জার্মানি। বরাবর দক্ষিণ বাল্টিক সাগরের পশ্চিম কূল ঘেঁষে পোল্যান্ড। পোল্যাণ্ডের পশ্চিমে চেকোস্লোভাকিয়া, ইয়োগোস্লাভিয়া, দক্ষিণে কৃষ্ণ সাগর ঘেঁষে রুমানিয়া এবং তুরস্ক। পুবে লেনিনগ্রাদের লাগোয়া ফিনল্যাণ্ড। ফিন রাজধানী হেলসিংকির দিকে দেখুন। এই পার্ক থেকে দেখা যাচ্ছে তার তীরের নীলাভ ঢেউয়ের ফেনা। হেলসিংকির সোজা দক্ষিণে বাল্টিকের পুব শাখার পাড়ে আছে এস্তোনিয়া, লাতভিয়া এবং তার দক্ষিণে বেলে রাশিয়া।

রাশিয়ার প্রাচীন স্বাধীন প্রজাতন্ত্র এবং নগর রাষ্ট্র নভগোরদ বরাবর দক্ষিণ-পুব ঘেঁষে গিয়ে মিলেছে এই দীর্ঘ রেলপথ। লেনিনগ্রাদ জংশন স্টেশন থেকে নভগোরদের দূরত্ব বড়জোর মাইল পঞ্চাশেক হবে। এখান থেকে দু'শ' মাইলের ব্যবধানে কালিনিন শহর এবং তার কিছু দূরেই মস্কো জংশন। মস্কো থেকে এই রেললাইন দক্ষিণে সোজাসুজি খারকভ্ জংশন এবং নীপার নদী তীরবর্তী দ্বিতীয় প্রাচীন রুশ রাজধানী কিয়েভ হয়ে সরাসরি পশ্চিমে চলে গেছে পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ারশ শহরের রেল স্টেশনের দিকে। সেখান থেকে যুক্ত করেছে তাবৎ পশ্চিম উইরোপকে। ওয়ারশ'র পুবে ইউক্রেনিয়া। সেখান থেকে কিয়েভ রেল জংশনের আরেকটি শাখা যুক্ত করেছে পশ্চিম-দক্ষিণে দানিয়ুব নদীর দেশ হাঙ্গেরী এবং সুইটজারল্যান্ডকে। খারকভ্ জংশন থেকে আরেকটি লাইন সরাসরি কৃষ্ণ সাগরের উত্তর উপকূলে বিশ্বযুদ্ধের শীর্ষ শক্তিবর্গের সম্মেলনস্থল ইয়াল্টাকে যুক্ত করেছে। মস্কোর রেলপথ একইভাবে পুবের কাজাখস্তান, উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিয়া, তাজিকিস্তানকে যেমন

www.pathagar.com

যুক্ত করেছে তেমনি দক্ষিণ-পশ্চিমে ককেশাসের ভেতর দিয়ে বিস্তৃত হয়ে যুক্ত করেছে কাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিমের দেশগুলোকে এবং পূর্বতটের ইরানকে।

ইউরোপ এবং এশিয়ার এই সংযোগ শিরাগুলো দেখিয়ে ডক্টর চেরখভ্ বললেনঃ আপনার বুঝবার সুবিধার জন্যই এই ভৌগোলিক অবস্থানগুলো দেখালাম। প্রাচীনকালে এই সুবিশাল অঞ্চলে ছিল আদিম মানবের স্থল বাণিজ্যপথ। এখান দিয়েই তরঙ্গের পর তরঙ্গ এসেছিল প্রাচ্য-প্রতীচ্য সভ্যতার। পুশকিনের পূর্ববর্তী আমাদের লোক এবং চারণ কবিগণ ছিলেন এই সভ্যতার ধারক।

আবার ১৯৪১ সালে অপারেশন বারবারোসা নাম দিয়ে সোভিয়েত ভূমির এই চিরায়ত সভ্যতাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চেয়েছিলেন উন্মাদ জার্মান ডিক্টেটর হিটলার। আপনি শুনে বিস্মিত হবেন উত্তর মেরু সংলগ্ন তুষার অঞ্চল বাদে বাদবাকি এই গোটা এলাকায় হিটলার মোতায়েন করেছিলেন পঞ্চাশ লাখ নাৎসী সেনা। প্রাচীন যুগের জার্মান বিজেতা লৌহমানব নামে পরিচিত জার্মান সম্রাট বারবারোসার নামে পরিচালিত হিটলারের এই অভিযানকে আমরা বলি 'বারবেরিয়ান' তথা বর্বরদের ধ্বংসযজ্ঞ।

দেখুন, আমরা এখন বাল্টিক সাগরের পুব প্রান্তে ফিন- কারেলিনা সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের এক প্রান্তে ফিন উপসাগরের তীরে রয়েছি। এখান থেকেই পাল্টা অভিযান চালিয়ে হিটলারের বারবেরিয়ান অভিযানকে খতম করেছি আমরা। যার সুবাদে রক্ষা পেয়েছে মানবজাতির সভ্যতা। রক্ষা পেয়েছে পুশকিনের অমর সাহিত্যকর্ম। আর এরই সুরক্ষিত সড়ক ধরে বিকশিত হয়েছে গণমুখী আধুনিক রুশ সাহিত্য। এই নতুন যুগের কথা আরেক সময় বলব। এখন চলুন ফিন উপসাগর তীরের যাদুঘরগুলোর পথে। দু'জনই আমরা নীরব পথচারণায় যাত্রা করলাম ওদিকটায়।

প্রাসাদ এলাকায় ঢুকতেই প্রথমে চোখে পড়ল রাশিয়ার সবচেয়ে ক্ষমতাশালী সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন 'দা গ্রেটের স্ট্যাচু। একটি প্রকাণ্ড শ্বেত অশ্বের পিঠে বসে আছেন ক্যাথারিন। হাতে চাবুক, মাথায় হ্যাট। পরনে সেকালের লম্বাটে কোট এবং প্যান্ট। হ্যাটের চারপাশ গলিয়ে পিঠের ওপর ঝুলছে দীঘল কালো কেশরাশি। যোদ্ধার বেশবাস পরলেও মুখমণ্ডলে ওর উদ্ভাসিত এক মোহিনী নারীর রূপের জৌলুস। যে-ভাস্কর মূর্তিটি গড়েছেন তিনি যেন তাঁর অনন্য শৈল্পিক হাতের ছোঁয়ায় এক জীবন্ত রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন এই নারীর সর্বাঙ্গে। ইস্পাত কঠিন এক পুরষালী ব্যক্তিত্ব চালচলনে এবং ভাবভঙ্গীতে প্রকাশ পেলেও শ্বেত পাথরের ভাঁজে ফুটিয়ে-তোলা মুখের আদলে এক রূপসী রমণীর লীলাময় সৌন্দর্যের অভিব্যক্তিটিকে লুকিয়ে রাখতে পারেননি ভাস্কর।

ডান পাশের উঁচু মার্বেলের পেভমেন্টের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় থমকে দাঁড়ালাম। অভিভূতের মতন তাকিয়ে রইলাম ক্যাথারিনের পানে। মনে হল এই মাত্র বুঝি কোনও রণাঙ্গন থেকে ফিরছেন তিনি। প্রকাণ্ড শ্বেত অশ্বটিকেও মনে হল বুঝি জ্বলজ্যান্ত। যেন দুই কান খাড়া করে লেজ নাড়ছিল জন্তুটি। তীব্র এক দ্যুতি

www.pathagar.com

ঠিকরে পড়ছিল ক্যাথারিনের দীপান্বিত চোখ দু'টি থেকে।

আমার হতবাক দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে একটু জোরেই হেসে উঠলেন চেরখভ। বললেনঃ পাথরের অবয়ব থেকে জেগে উঠে এই বহুবল্লভা রমণী শেষ নাগাদ দেখছি আপনাকেও সম্মোহিত করল। জানেন, রাজনীতিতে এবং কুটনীতিতে আর পাশাপাশি প্রেমের নাটকীয়তায়ও কতখানি সেয়ানা ছিলেন এই অরুশীয় মহিলা?

ঃ অরুশীয়। বিস্মিত হলাম আমি। ইনি পিটার দ্য গ্রেটের উত্তরাধিকারিনী ছিলেন না?

ঃ মোটেও না। মুচকি হেসে জবাব দিলেন ডক্টর চেরখভ। তাহলে ওকে অরুশীয় বললাম কেন? দেখছি আপনি পিটারের দ্বিতীয় স্ত্রী জারিনা প্রথম ক্যাথারিনের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলছেন এই শ্বেত অশ্বারোহিনীকে।

ঃ প্রথম ক্যাথারিন কিংবা কোনও রুশ গোত্রের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই কথাটা প্রথম জানলাম আপনার কাছ থেকে ডক্টর। এক কৃষক কন্যা ছিলেন প্রথম ক্যাথারিন এ কথা জানি। এ কালের এস্তোনিয়া আর লাতভিয়ার কিছু এলাকা নিয়ে রাশিয়ার যে সাবেক প্রদেশ লিভোনিয়া সে-অঞ্চলেরই এক সাধারণ কৃষক পরিবারে জন্ম প্রথম ক্যাথারিনের, তাই না?

ঃ হ্যাঁ, পুরোপুরি ঠিক কথা-বললেন চেরখভ। তবে জায়গাটা এখান থেকে কিন্তু খুব একটা দূরে নয়। বাল্টিক সাগর আর দুই শাখা রিগা এবং ফিন উপসাগরের মাঝখানে এর অবস্থান। উত্তর দিকে আমাদের পেগাস আর নারভা হ্রদ।

ঃ তাহলে দেখছি পিটার দ্য গ্রেটের সংসার আলো করেছেন যে- কৃষক তনয়া এবং শেষে জারিনা হওয়ারও সৌভাগ্য অর্জন করেছেন তিনি ছিলেন আপনাদের প্রতিবেশেরই একজন।

ঃ ঠিকই বলেছেন। তবে এ কাহিনীটাও কম রোমাঞ্চকর নয়। বললেন চেরখভ। জানেনই তো ইতিহাস বড় বিচিত্র। রক্তের দিক থেকে না হলেও ভৌগোলিক দিক থেকে দুই ক্যাথারিনের কিন্তু খানিকটা মিল আছে। লিভোনিয়া নামটির সাবেক নাম লিভ্‌নানদ। ত্রয়োদশ শতকের আগে পশ্চিম ফিন উপকূলে বাস করত লিভ্‌স নামে ফিন জাতির একটি শাখা। তাদের নামেই জায়গাটির নাম হয়েছে লিভ্‌লান্‌দ। রিগার সেকালের খ্রীষ্টান বিশপের নেতৃত্বে ১২০২ সালে প্রতিষ্ঠিত এক জার্মান ধর্ম সম্প্রদায়ের গোঁড়া যুদ্ধবাজ নাইটরা অঞ্চলটি দখল করে নিয়েছিল।

বাল্টিক তীরের দেশগুলোকে বাহুবলে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করাই ছিল রিগার এই ধর্মান্ধ সম্প্রদায়ের লক্ষ্য। এরা 'ভ্রাতৃসম্প্রদায়' এবং 'নাইটস অভ্ সোর্ড বেয়ারার্স' অর্থাৎ তলোয়ার বাহক যোদ্ধাদল নামে পরিচিত ছিল। জার্মানীর টিউটনিক নাইটস্‌দের মতন সংগঠিত ছিল এরা। এদের পোশাক ছিল রক্তবর্ণ, হাতে থাকত রেডক্রস এবং তলোয়ার। বাল্টিক সাগর তীরের লিভস্ তথা লিভোনিয়ান, এস্‌তস্ অর্থাৎ এস্তোনিয়ান এবং বেলস্ জাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলো পদানত করে এরা। আধুনিক লাতভিয়ানদের পূর্ব পুরুষ ছিল লেটস্ জনগোষ্ঠী। পরবর্তীকালে এরা লিভোনিয়ান

www.pathagar.com

এবং 'কোর্তলানদ নাইটস্' নামে পরিচিত হল।

১২৩৬ সালে লিথোনিয়ার দেশপ্রেমিক জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে সিয়াউলসির ইতিহাস খ্যাত যুদ্ধে পরাজিত করে এদের। সিয়াউলসির রণাঙ্গনে শোচনীয় পরাজয়ের পর এরা ভিড়ে গেল টিউটনিক নাইটদের দলে। এদিকে ১৫২৫ সালে টিউটনরা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তুললেও বজায় রাখল নিজেদের স্বাধীনতা।

এদিকে পশ্চিম ইউরোপে লুথারের ধর্মসংস্কার আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠলে রক্তবর্ণ পোশাক এবং তলোয়ারধারী এই লিভোনিয়ান নাইটরা দুর্বল হয়ে পড়ল। এর ঠিক বত্রিশ বছরের মাথায় ১৫৫৭ সালে রুশ সম্রাট চতুর্থ আইভান অঞ্চলটি আক্রমণ করলে যুদ্ধবাজ এ খ্রীষ্টান সম্প্রদায়টি ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও সত্য এরপরও কিন্তু দমল না এরা। বরং মাটি কামড়ে পড়ে থাকল বাল্টিক তীরর বিজিত রাজ্যগুলোকে।

শুনলে আশ্চর্য হবেন, এই নাইটদেরই বংশধরেরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকাল অব্দি 'বাল্টিক ব্যারন'স তথা বাল্টিক এলাকার জমিদার গোষ্ঠী হিসেবে তাদের অধিকৃত রাজ্যগুলোর বড়-বড় তালুকমুলক ভোগ দখল করে এসেছে। এই বৈদেশিক আধিপত্যবাদীরা ছিল তাদের রাজ্যের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা। স্থানীয় কৃষকদের কয়েক যুগ আগেও ভূমিদাস হিসেবে পদানত করে রেখেছিল এরা। বাল্টিক এলাকার দেশীয় কৃষকদের দুর্গতির অন্ত ছিল না এদের উৎপীড়নে।

এক সময় বাল্টিকের এই জার্মান জমিদারেরা তাদের দেশের নগরকেন্দ্রিক বণিক সংঘের মদদপুষ্ট হয়ে বাল্টিক তীরে রিগাসহ কয়েকটি বড় শহর এবং বন্দর প্রতিষ্ঠা করে বাণিজ্য কুঠি। এবং হয়ে ওঠে বিরাট পুঁজির মালিক। নভগোরদ তো আমাদের এই শহরের বলতে গেলে, কাক-ওড়া দূরত্বের মধ্যেই। লুবেক ছিল বাল্টিক অঞ্চলে এই আধিপত্যবাদী মধ্যযুগীয় জার্মান বণিক সংঘের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র। পোল্যাণ্ড থেকে হল্যাণ্ড পর্যন্ত ছিল এদের বাণিজ্যিক আধিপত্য। আর স্ক্যানডিনেভিয়ান দেশগুলোতে ছিল এদের একচেটিয়া বাণিজ্য।

ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত এই জার্মান বাণিজ্যিক রাজত্ব ছিল তাবৎ পুব এবং পশ্চিম ইউরোপ জুড়ে। সমুদ্রে ডাচ এবং ব্রিটিশ বাণিজ্যিক আধিপত্য সবল হয়ে উঠার পর ম্লান হয়ে পড়ে এদের শক্তি। এছাড়া শুল্ক বৃদ্ধি, নতুন সামুদ্রিক আইন চালু, ইউরোপে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রশক্তির উদ্ভব এবং পাশাপাশি জার্মান সরকারের কাছ থেকে সরাসরি মদদ না পাওয়াটাও ছিল বণিক সংঘটির পতনের আরেকটি বড় কারণ। সপ্তদশ শতকে এটি বিলুপ্ত হলেও লুবেক, হামবুর্গ, ব্রেমেন প্রভৃতি প্রধান জার্মান শহর এই হানসিয়াটিক ট্রেডার্স লীগের ঐতিহ্য ধরে রেখেছে একালেও। আমাদের এ শহরে অনেক জার্মান দেখতে পাবেন আপনি। দেখতে পাবেন মস্কোতে, পোল্যান্ডের ওয়ারশ'তে, ইউক্রেনিয়ায়, লাতভিয়ায়, ফিনল্যাণ্ডের হেলসিংকিতে এমনকি কাজাখস্তানের রাজধানী আলমাআতা শহরেও। এরা ওই জার্মান হানসিয়াটিক বণিকদেরই বংশধর। ওখানকার তৃতীয় ভাষাও জার্মান।

www.pathagar.com

বর্ণনার এ পর্যায়ে এসে হঠাৎ থামলেন চেরখভ। স্বগতোক্তি করে বললেনঃ দেখুন কেমন পাগলাটে এক লোক আমি। বিন্দুতে এসে সাঁতার কাটছি সিন্ধুতে গিয়ে। ক্যাথারিনের সাদা ঘোড়ার কাছে দাঁড়িয়ে হানস তথা সেই প্রাচীন জার্মান নগরের বণিকদের নিয়ে কি মস্তবড় একটা গল্পই-না ফেঁদে বসলাম। ঐতিহাসিকদের নিয়ে বোধকরি এ কারণেই মহাজ্বালাতনে পড়েন লোকেরা।

বললামঃ কোথায় জ্বালাতন? আমার জ্ঞান তো অনেক বাড়ল আপনার এই সারগর্ভ ভাষণে। একটুও বিরক্ত হইনি আমি। বরং এতক্ষণ মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম আপনার কথা।

ঃ সত্যি বলছেন তো? জানতে চাইলেন ডক্টর চেরখভ।

ঃ একশ' বার সত্যি।

ঃ তাহলে এবার আসল কথায় ফিরে যাই। প্রথম এবং দ্বিতীয় ক্যাথারিনের কথায়। ফিন উপসাগর তটের প্রাচীন লিভ্‌স জনগোষ্ঠীর দেশ লিভোনিয়া দখলের সময় প্রথম পিটারের সেনারা বন্দী করে সেখানকার সুন্দরী কৃষক কন্যা ক্যাথারিনকে। সেটা ছিল ১৭০২ সাল। ইনিই সম্রাজ্ঞী প্রথম ক্যাথারিন। অসামান্যা রূপসী ছিলেন। জন্মসূত্রে নাম ছিল মার্থা স্কাভবনোস্কায়া। এখানকার রাজপ্রাসাদে প্রথম সাক্ষাতেই মার্থার রূপে মজে গেলেন পিটার। মার্থা ছিলেন লুথারের সংশোধিত খ্রীষ্ট মতবাদে দীক্ষিতা। পিটার বছর কয়েক বাদেই স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করলেন এই সুন্দরী লিভোনিয়ান তরুণীকে। বিয়ের সময় পুরনো ধর্মমত বদলে মার্থা দীক্ষিত হলেন রুশ অর্থোডক্স ধর্মমতে। নতুন নাম হল ওর ক্যাথারিন।

১৭১১ সালে প্রথম স্ত্রীকে তালাক দিয়ে ক্যাথারিনের সঙ্গে প্রথাগত নিয়মে ঘর বাঁধলেন পিটার। তেরো বছর পর ১৭২৪ সালে এই মহিলার রূপে-গুণে বুদ্ধিমত্তায় এবং সেবা পরায়ণতায় মুগ্ধ দোর্দণ্ড প্রতাপ পিটার দ্য গ্রেট কৃষক ঘরের মেয়েটিকে তার সম্রাজ্ঞী এবং রাশিয়ার যুগ্ম শাসকের পদে ভূষিত করলেন। এক বছর পর ১৭২৫ সালে পিটার হঠাৎ মারা গেলেন কোনও উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করবার আগেই। কিন্তু ক্যাথারিনের বন্দীদশার সময়কার আশ্রয়দাতা মন্ত্রী আলেকজান্ডার মেনশিকভ আর প্রাসাদের গার্ডবাহিনী এই রূপসী মহিলাকে বসালেন রুশ সিংহাসনে। মেনশিকভ হলেন ক্যাথারিনের প্রধান উপদেষ্টা। লোকটির অসাধারণ প্রভাব ছিল সম্রাজ্ঞী প্রথম ক্যাথারিনের ওপর। ওর শাসনকাল ছিল শান্তিপূর্ণ। অভিজাত এবং কৃষক শ্রেণীর সঙ্গে আপসরফা করে চলতেন তিনি। মাত্র দু'বছর রাজত্বের পর স্বাভাবিক মৃত্যু হল ওর।

ক্যাথারিনের ছেলে দ্বিতীয় পিটার মায়ের উত্তরাধিকারী হিসেবে ষোল বছর রাজত্ব করেন। তার মৃত্যুর পর ক্যাথারিনের কন্যা প্রিন্সেস এলিজাবেথ সিংহাসনে বসলেন ১৭৪১ সালে। ১৭৬২ সালে অব্দি মোট একুশ বছর রুশ সম্রাজ্ঞী ছিলেন এলিজাবেথ। সৎ ভাই শিশু সম্রাট ৬ষ্ঠ আইভান এবং সৎ মায়ের মনোনীত রিজেন্ট আনা লিওপোল্ডোভবনার বিরুদ্ধে এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় এলেন

www.pathagar.com

এলিজাবেথ। ওই সময় দরবারের জার্মান অমাত্যরা ছিলেন শিশু সম্রাটের অভিভাবক আনার প্রিয়ভাজন। কিন্তু প্রাসাদ রক্ষীরা ঘৃণার চোখে দেখত জার্মানদের। তারা পিটারের অনুরাগী কন্যা হিসেবে ভালবাসত এলিজাবেথকে।

নেতৃত্বের গুণে গুণান্বিতা এবং দৃঢ়চেতা এলিজাবেথ স্বয়ং অস্ত্র হাতে তার রক্ষী সেনাদলকে নিয়ে পরিচালনা করেন বিপক্ষের বিরুদ্ধে রক্তপাতহীন অভ্যুত্থান। রাশিয়ার ইতিহাসে এ এক অভিনব ঘটনা। এলিজাবেথ ছিলেন প্রচণ্ড রকমের জার্মান আধিপত্যবিরোধী। তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালের রুশ নেতাদের মতন দৃঢ় মনোবল নিয়ে রাশিয়াকে মুক্ত করেন জার্মান প্রভাবের নাগপাশ থেকে। সাত বছরের ঐতিহাসিক রুশ-প্রশিয়ান (জার্মান) যুদ্ধে (War of Seven Years) তিনি জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। দেশপ্রেমিক রুশ সেনাদের নিয়ে জয় করে চলছিলেন একটার পর একটা যুদ্ধ। কিন্তু হঠাৎ এলিজাবেথের মৃত্যুতে তার ভ্রাতুষ্পুত্র তৃতীয় পিটার সিংহাসনে বসলেন। দুর্বলচেতা তৃতীয় পিটার যুদ্ধ থেকে সরে এলে প্রায় হেরে যাওয়া যুদ্ধে বিজয়ী হলেন ফ্রেডারিক।

রুশ ইতিহাসে জাতীয় স্বাধীনতার বীরাঙ্গণা নেত্রী হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছেন এলিজাবেথ। বিখ্যাত রাজনীতিক বেস্‌তোজেভ- রিউমিন ছিলেন এলিজাবেথের প্রধানমন্ত্রী। এলিজোবেথ রাশিয়ায় সরকারী ব্যাংকিং ব্যবস্থার গোড়াপত্তন করেন।

তার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়। পিটার্সবুর্গের ফাইন আর্টস আকাদেমিও তার পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত। উনিশ শতকে রুশ সাংস্কৃতিক জাগরণে অসামান্য অবদান এলিজাবেথের।

তার উত্তরাধিকারী এবং ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন অকর্মন্য এবং বিকৃতমস্তিষ্ক। রুশ প্রুশিয়ান যুদ্ধ থেকে তার পিছু টানের ফলে অশেষ দুর্গতি ভুগতে হল রাশিয়াকে। মাত্র এক বছর ক্ষমতায় ছিলেন তৃতীয় পিটার। জার্মান রক্ত ধারার মেয়ে দ্বিতীয় ক্যাথারিনকে বিয়ে করবার পর বেড়ে যায় এই আধা-উন্মাদ রুশ সম্রাটের পাগলামো। এ ঘটনা রাশিয়ার ইতিহাসের আরেক বিচিত্র কাহিনী এবং এক কলংকিত অধ্যায়।

এখানে এসে ফের থামলেন চেরখভ। আমরা তখন অশ্বারূঢ় দ্বিতীয় ক্যাথারিনের স্ট্যাচুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। মাত্র একশ' গজ দূরেই ক্যাথারিনের গ্রীষ্ম প্রাসাদ।

আমার আগ্রহ এসসময়টায় প্রায় তুঙ্গে উঠল। শশব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলামঃ থামলেন কেন উক্টর? বলুন না এই বিচিত্র কাহিনীটা। উৎসুক্যের চূড়ায় তুলে কেন হতদ্যোম করতে চাইছেন?

দুই চোখে রহস্যের বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে চেরখভ বললেনঃ এসব কথা বলতে চাইছিলাম না। কারণ এর মধ্যে আছে অনেক বিচ্ছিরি কাণ্ডকারখানা। তবু যখন শুনতে চাইছেন, বলছি।

জার্মানীর আন হলত জারবসত বংশের নাম নিশ্চয় শুনেছেন। মধ্য জার্মানীর নয়শ' বর্গমাইলের ক্ষুদ্র একটি রাজ্য ছিল এটি। চারদিকে এর সাবেক প্রুশিয়ান

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যের স্যাকসনি এবং ব্রানডেনবার্গ প্রদেশের সীমান্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে জার্মানীর পতনের পর ১৯৪৫ সালে এটি রেড আর্মির দখলে এল। রাজ্যটির নতুন নাম হল তখন স্যাকসনি-আনহল্‌ত। আলবার্ট দ্য বিয়ার তথা ভালুক-আলবার্ট প্রতিষ্ঠিত জার্মানীর এক প্রাচীন রাজবংশ ১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পর্যন্ত রাজ্যটি শাসন করত। বিভিন্ন সময়ে এই বংশের নানান শাখার লোকেরা অঞ্চলটিকে টুকরো-টুকরো নিয়ে শাসন করছিল। ১৮৬৩ সালে এটি একত্র হল অখণ্ড ডিউক রাজ্যে। ১৮৭১ সালে ডিউকডোমটি একীভূত হল জার্মান সাম্রাজ্যের সঙ্গে। ১৯১৮ সালে প্রজাতন্ত্র হওয়ার পর এটি যোগ দেয় উইনার রিপাবলিকে। আনহল্‌ত বংশের শাসকদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন প্রথম লিওপোল্ড। ইনি ছিলেন আনহল্‌ত-দেসাউ'র ডিউক। আনহল্‌ত জারবসত এলাকা ছিল আরেকজন ক্ষুদে জমিদারের অধীনস্থ। এই বংশেরই মোহিনী মেয়ে সোফিয়ানা। বলতে এও ছিল এক অবজ্ঞাত পরিবারের সন্তান। শুধু রূপই ছিল তার পুঁজি রুশ সম্রাট তৃতীয় পিটারের সঙ্গে এই মেয়ের দাম্পত্য বন্ধন যেমন সর্বনাশ করল রাশিয়ার, তেমনি পিটারেরও কাল হল সে। ১৭৪৪ সালে সোফিকে বিয়ে করবার সময় তৃতীয় পিটার ছিলেন একজন প্রিন্স। কিন্তু অস্থিরচিত্ত এই তরুণ রাজকুমার পরমা সুন্দরী হলেও নববধূকে পছন্দ করতেন না। কেন জানি চরম অবহেলা এবং অবজ্ঞার চোখে দেখতেন স্ত্রীকে। এতে ক্যাথারিন নিজের মন মত চলতে শুরু করলেন। অল্পকালের মধ্যেই তার চার পাশে এসে জুটল অনেক প্রেমিক। ফুলের পাশে যেমন ভ্রমরের মেলা বসে তেমনি আকাল হল না এই অভিসারিকার প্রেমিককুলের। শোনা যায় ১৭৬২ সালে রূপমুগ্ধ এবং ভক্ত-অনুরক্ত অশ্বরোহী রক্ষী দলের অভ্যুত্থানের কল্যাণে সহজেই সিংহাসনের পথ নিষ্কন্টক করতে পেরেছিলেন সোফিয়া। সম্রাজ্ঞী এবং জারিনা হওয়ার পরই নাম নিলেন তিনি দ্বিতীয় ক্যাথারিন। এই গ্রীষ্ম প্রাসাদের দাসদাসীরা সেকালে কানাঘুষা করত অনেক সুদর্শন সাধারণ অশ্বারোহী সৈনিকও নাকি বাহুলগ্না হত স্বামী-পরিত্যক্তা রূপবর্তী এই সম্রাজ্ঞীর। রানীর ইচ্ছা চরিতার্থ না করে উপায় ছিল না কারও। ওর বিরাগভাজন হলে ডিউক থেকে শুরু করে সৈনিক পর্যন্ত যে কাউকে প্রাণ হারাতে হত বেঘোরে।

ঃ এ-যে দেখছি আরেক ক্লিওপেট্রার কাহিনী। সাদা ঘোড়ার পিঠে বসা ক্যাথারিনের দিকে তাকিয়ে বিমূঢ় বিস্ময়ে বললাম আমি।

ঃ ক্লিওপেট্রাই কী শুধু? ইংল্যাণ্ডের রানী প্রথম এলিজাবেথও কম যায় কিসে বললেন চেরখভ। ডিউক অফ এসেক্সসহ কত বিরাগভাজন লাভারকেই না মরতে হল এই রানীর হুকুমে। শিরচ্ছেদ হওয়া এই হতভাগ্যদের দীর্ঘশ্বাস আজও গুমরে ফিরছে টাওয়ার অফ লণ্ডন দুর্গে।

প্রশ্ন করলামঃ মধ্যযুগীয় সম্রাজ্ঞীদের মতন চারিত্রিক দোষ ছিল ক্যাথারিনের এটা না হয় মেনে নেয়া গেল। কিন্তু ওকে ক্যাথারিন দ্য গ্রেট কেন বলেছেন আপনারা?

www.pathagar.com

ঃ আমরা বলছি না। সরাসরি উত্তর চেরখভের। বলেছেন সেকালের নির্বোধ ইউরোপিয়ান ঐতিহাসিকেরা। ওকে আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিলেন প্রুশিয়ান সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিক। তিনি জানতেন রুশ প্রিন্স তৃতীয় পিটার বিকৃতমস্তিষ্ক। তাই ওর গলায় ঝুলিয়ে দিলেন জার্মান মেয়ে সোফিকে। ফ্রেডারিকের মতলব ছিল এই বিয়ের সুবাদে রাশিয়ার ওপর জার্মান প্রভাব বাড়ানো।

তবে একথা সত্য, বিয়ের পর সোফি লুথারিয়ান খ্রীষ্ট মতবাদ ছেড়ে রুশ রক্ষণশীল ধর্মমত নিয়েছিলেন সম্রাজ্ঞী প্রথম ক্যাথারিনের মত এবং সোফির বদলে নামও নিয়েছিলেন ক্যাথারিন। মেয়েটি সাহিত্যানুরাগী এবং সংস্কৃতিবান ছিলেন অনুরক্ত ছিলেন কবি ভল্টেয়ার এবং দার্শনিক-অর্থনীতিবিদ মন্তেস্কোর। রুশ সমাজ-পরিবেশ আর সংস্কৃতি আত্মস্থ করে চেয়েছিলেন খাঁটি রুশ হতে। কিন্তু ভয়ংকর উচ্চাভিলাষী ছিলেন ক্যাথারিন। বিকারগ্রস্থ স্বামী পিটার যাতে রাজা হতে না পারেন তার জন্য পুত্র পলকে সিংহাসনে বসাতে আঁটেন মারাত্মক ষড়যন্ত্র। অথচ এই পলকে পিটারের ঔরসজাত সন্তান নয় বলে ঘোষণা দিতেও লজ্জাবোধ করেনি এই উদ্ভট স্বভাবের জার্মান মহিলা। অবশ্য পরেকার ঐতিহাসিকদের মতে ঘটনাটি নাকি ছিল ভিত্তিহীন। কারণ স্বামীকে ঘৃণা করতেন বলেই কথাটা প্রচার করেছিলেন ভ্রষ্টা ক্যাথারিন। চেরখভ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেনঃ এবার বুঝে দেখুন কতটা কুৎসিত, নোংরা এবং নির্লজ্জ ছিল রাশিয়ার সেকালের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতারা। ক্ষমতা দখলের মতলবে রাজ দরবারে আপন প্রিয়ভাজনদের একটি দল পুষতেন দ্বিতীয় ক্যাথারিন। ওর প্রেমিক গ্রিগরি ওরলভ ছিলেন ষড়যন্ত্রকারী দলের নেতা। তিনিই এই জার্মান বংশীয় রুশ সম্রাজ্ঞীকে স্বেচ্ছাচারিণী করে তোলেন। ১৭৬২ সালে তৃতীয় পিটার সিংহাসনে বসলেও মাত্র কয়েক মাসের মাথায় এক সংশয়কর অবস্থায় হঠাৎ মৃত্যু ঘটল ওর। বলা হয় ক্যাথারিন এবং তার অনুরাগভাজন ষড়যন্ত্রীদের হাতে নিহত হয়েছিলেন তিনি। এরাই পুত্র পলের বদলে সিংহাসনে বসিয়েছেন ক্যাথারিনকে।

একথাও অবশ্য সত্য, প্রখ্যাত আইন বেত্তা বেকারিয়া এবং মন্তেস্কোর চিন্তাধারা অনুসারে রাশিয়ার শাসন সংস্কারের জন্য অনেক ক'টি বড় পরিকল্পনা নিয়েছিলেন ক্যাথারিন। কিন্তু কসাক নেতা পুগাকেভ-এর নেতৃত্বে সংঘটিত রুশ কৃষক বিপ্লব (১৭৭৩-৭৫) এবং ফরাসী বিপ্লবের পর চরম প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠলেন ক্যাথারিন। জমিদারদের কর থেকে অব্যাহতি দিলেন তিনি। তাদের বানালেন কৃষক শ্রেণীর স্বেচ্ছাচারী রাজা। এই ভূস্বামীকুলই ছিল তার ক্ষমতার উৎস। তার সময়ে ভূমিদাস প্রথা এক মারাত্মক রূপ নিল। কট্টর সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন ক্যাথারিন। তার অন্যতম প্রেমিক পোনিতোওয়াস্কিকে বসালেন পোল্যাণ্ডের সিংহাসনে। প্রুশিয়া, রাশিয়া এবং অস্ট্রিয়ার মধ্যে পোল্যাণ্ড ভাগ হলে (১৭৭২-৯৫)-এর সিংহ ভাগ আদায় করলেন ক্যাথারিন। তুর্কি সাম্রাজ্য উৎখাতে তার অভিলাষ সামান্য সফল হয়েছিল। তুরস্কের বিরুদ্ধে তার অভিযান (১৭৬৮-৭৮) কুচাক কায়নারজি সন্ধির মধ্য দিয়ে শেষ হল। এতে অবশ্য নিকট প্রাচ্যের প্রধান শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি পেল রাশিয়া। ১৭৮৩

www.pathagar.com

সালে ক্রিমিয়া এল তার দখলে। ক্যাথারিনের ইস্টার্ন পলিসির প্রধান নিয়ন্ত্রক ছিলেন তার আরেক ঘনিষ্ঠ প্রেমিক, কূটনীতিক পোতেমকিন। একে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণ রাশিয়ায় সফল বিজয় অভিযানে বেরিয়েছিলেন তিনি। পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কের প্রশ্নে সুকৌশলে সংঘাত এড়িয়ে চলেন তিনি। তার সময়েই আলাস্কায় গড়ে ওঠে রুশ বসতি।

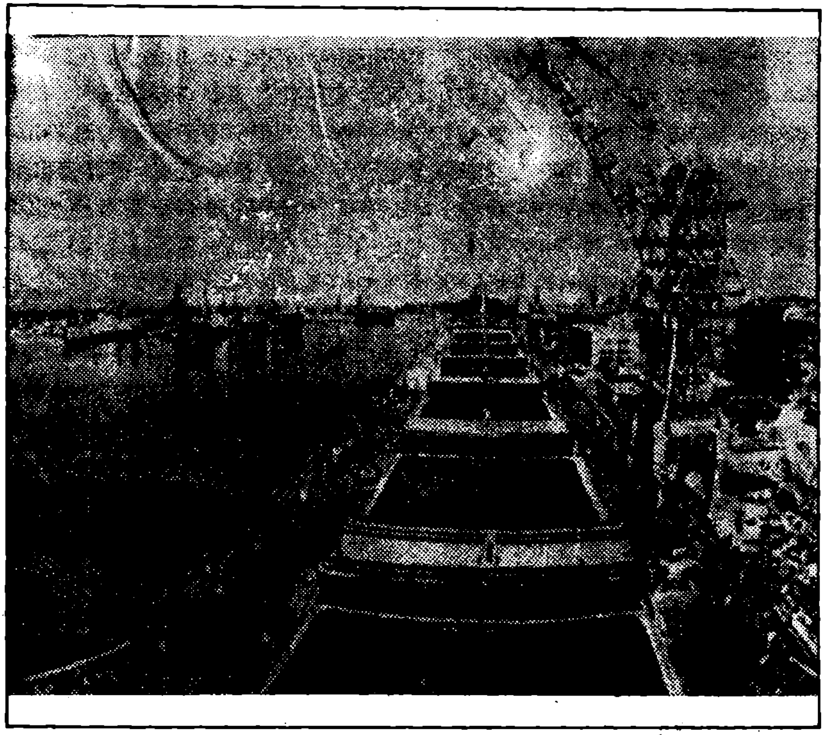

বাল্টিক তীরের একটি আধুনিক বন্দর

কবি ভল্টেয়ারের উচ্ছ্বসিত প্রশংসাই পশ্চিম ইউরোপে খ্যাতিমান করে তোলে ক্যাথারিনকে। ভল্টেয়ারের সঙ্গে ছিল তার নিয়মিত পত্রালাপ। ক্যাথারিন মূলত ফরাসী ভাষায় স্মৃতিকথা, রম্যনাটক এবং ছোট গল্প লেখেন প্রচুর। রুশ ভাষায়ও আছে তার বেশ কিছু রচনা। একথা স্বীকার করতে হয় রুশ সাহিত্যের বিকাশে তার অবদান কম ছিল না। প্রখ্যাত ফরাসী কবি এবং দার্শনিক দিদেরোঁ তার দরবারে কাটিয়েছিলেন কিছু সময়। তার প্রেমিকের সংখ্যা একটি কাহিনীর মত হলেও তার ওপর বিশেষ প্রভাব ছিল কেবল ওরলভ এবং পোতেমকিন-এর।

চেরখভ বললেনঃ বোধকরি যুদ্ধজয়, সাম্রাজ্য বিস্তার আর দূর প্রাচ্য নীতির জন্যই এই বাহিনীকে 'ক্যাথারিন দ্য গ্রেট' বলে নন্দিত করেন পশ্চিমা ঐতিহাসিকরা।

www.pathagar.com

এছাড়া রাষ্ট্রকে প্রদেশ, জেলা আর অঞ্চলে বিভাজনও ছিল তার একটি বড় কাজ। ১৯১৮ সালের বিপ্লব পর্যন্ত চালু ছিল ওর এই শাসন সংস্কার নীতি। কিন্তু আমরা ক্যাথারিনকে ঘৃণা করি ওর স্বেচ্ছাচার, কৃষকদের ওপর উৎপীড়ন, জমিদার তোষণ আর স্বৈরিণী চরিত্রের জন্য।

এ সময় আমাদের খোঁজে এসেছিল পাভলভ। সে শুনতে পেয়েছিল চেরখভের শেষ বাক্যটি। শুনে বললঃ উই অল্সো হেইট হার। কিন্তু কথা হল আপনারা এখানে লটকে আছেন কেন? চলুন না ওর কীর্তিকলাপের কিছু নমুনা দেখে আসি সামার প্যালেসে গিয়ে।

বিনা বাক্য ব্যয়ে আমরা বাধ্য হলাম পাভলভের পিছু-পিছু তাল রেখে চলতে। তৃতীয় দিন ভোর বেলা। ঘড়িতে আটটা বাজল। তাড়াহুড়া করে সারতে হল ব্রেকফাস্ট। কারণ আজ পাড়ি দিতে হবে দীর্ঘ পথ। মনে গুন গুন করছিল দুটি নাম। জুলা উরপালা আর লুজ হাইকা। বাল্টিক সাগরের মাথার দিকে ডান পাশের দুই ছোট কিন্তু সামরিক গুরুত্বপূর্ণ শহর। মেরু মহাসাগরের প্রায় লাগোয়া। পিটাসবুর্গ থেকে দূরত্ব হবে একশ' মাইলের কাছাকাছি। উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের পর্যটকরা এই দুই সীমান্ত শহর হয়েই ঢোকেন রুশ দেশে।

চেরখভ তার মানচিত্রের বইটি খুলে ধরলেন। আমাকে দেখিয়ে বললেনঃ পশ্চিম দিকে দেখুন বাল্টিকের ওপারে সুইডেন। স্টকহোম শহর এবং বন্দরটা সাগরের কোল ঘেঁষেই। ওখান থেকে জাহাজ কিংবা বিমানযোগে সোজাসুজি এখানে আসা যায়। আর বোতলের গলার মতন দেখতে বাল্টিকের উত্তরের সংকীর্ণ সমুদ্র পথ ধরে আসতে হলে পুব তীরের ফিনল্যাণ্ড হয়ে যেতে হয়। সেখান থেকে মোটরযোগে সোজাসুজি আসা যায় আমাদের সীমান্ত শহর জুলা উরপালায়। দূরত্ব কম বলে পশ্চিম ইউরোপের ভ্রমণকারীরা এই পথ ধরে আসতেই বেশী পছন্দ করেন।

ম্যাপে চোখ রেখেই তিনি বললেন দক্ষিণ-পশ্চিম মহাদেশীয় ইউরোপে বাল্টিকের কতটা কোল ঘেঁষে নেদারল্যাণ্ডস্-এর আন্তর্জাতিক বন্দর আম্‌সর্টারডাম। এখানে উত্তর সাগর আর বাল্টিকের কোলাকুলি। ঠিক ওপারে লণ্ডন। আর বাল্টিকের দক্ষিণ-পশ্চিমে অনেকখানি পথ পেরিয়ে বার্লিন, তার পুবে ব্রাসেলস। আর বার্লিন বরাবর দক্ষিণে প্যারিস। ইউরোপের এসব রাজধানী শহর থেকে বিমানে আর ওয়ারশ হয়ে আসতে হলে ট্রেনে কিংবা মোটরেও আসা যায় আমাদের দেশে।

এখন আমরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইস্টার্ন ফ্রন্টের উত্তরে মেরুর রাজ্যের দিকে যাচ্ছি। এখানে দাঁত বসানোর চেষ্টা করলেও শীতের কামড়ে পর্যুদস্ত হয়ে গিয়েছিল হিটলারের নাৎসী বাহিনী। চেরখভ বাল্টিকের ওপারকার ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টও দেখিয়ে দিলেন। কারণ সেখানে সাড়ে চার বছর ধরে যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে রাখলেও এখানে ছোবল মারতে এসেই লোকটির দফা রফা হয়ে গিয়েছিল।

আমরা সকাল সাড়ে আটটার দিকে যাত্রা করলাম ফিনল্যান্ডের সীমান্ত ধরে উরপালার দিকে। সাঁজোয়া গাড়ীর মতন দুটি শক্তপোক্ত মাইক্রো ছিল আমাদের

www.pathagar.com

সঙ্গে। এ যেন ছিল বরফের মুলুকে একদল দুঃসাহসী অভিযাত্রী হয়ে যাওয়া। বেশ রোমাঞ্চ বোধ করছিলাম আমি। বহু যুগ আগে রুশ সমুদ্র অভিযাত্রী দলের ডেনিশ অধিনায়ক এডমিরাল বেরিং সাইবেরিয়ার পথে প্রশান্ত মহাসাগরের সংকীর্ণ মাথা পেরিয়ে আবিষ্কার করেছিলেন উত্তর আমেরিকার আলাস্কা উপদ্বীপ। দেখা গেল প্রশান্ত এবং মেরু মহাসাগরের এই প্রণালী পথে উত্তর গোলার্ধে এশিয়া এবং আমেরিকার দূরত্ব মাত্র তেইশ মাইল। এ ছিল এক অভাবনীয় আবিষ্কার। আমেরিকা

একটি সমবায় খামারে তুলা আহরণ

মহাদেশ হাত বাড়ালেই এশিয়াকে ছুঁতে পারে, আঠারোশ' শতকের মধ্যপর্ব পর্যন্ত এটি ছিল ভূগোল বেত্তাদের কল্পনার বাইরে। ১৭৪১ সালে এই পিটাসবুর্গ শহর থেকেই ইওব্রাসান বেরিং দুটি জাহাজ নিয়ে কামচাটকা দ্বীপ ঘুরে পাড়ি দিলেন পশ্চিমে। ১৬ জুলাই আবিস্কার করলেন তিনি কানাডার উত্তর প্রান্তের আলাস্কা উপদ্বীপ। ফেরার পথে কামচাটকা উপকূলে মারা গেলেও বেরিং প্রণালী বেরিং সাগর আর বেরিং দ্বীপ অমর করে রেখেছে এই দুঃসাহসী নাবিককে। সাইবেরিয়ার মোঙ্গলীয়রা এই প্রণালী দিয়েই আনুমানিক চল্লিশ হাজার বছর আগে কাঠের ভেলায় আমেরিকায় গিয়ে বসত গড়ে তোলে বলে নৃতত্ত্ববিদদের ধারণা। আমেরিকানদের কাছে এরাই হল আমেরিকার আদিবাসী ইণ্ডিয়ান। আমরা যাদের বলি রেড ইণ্ডিয়ান।

চেরখভ এবং তার সহকারী ইয়াকভ ছাড়া আমাদের স্বাগতিক দলের আর কেউ মেরুমণ্ডলের এতখানি কাছে এর আগে কখনও যাননি। সুতরাং সবার মনে ছিল নিদারুণ এক উত্তেজনা। মহিলা দু'জন আনন্দে কলরব তুলছিল। নাদিয়া তো ময়ূরীর মতন পেখম মেলে উড়তে চাইছিল।

www.pathagar.com

ওদের দিকে তাকিয়ে মুচকে হাসলেন ডক্টর চেরখভ। বললেনঃ দেখছি সব কিছুতে মহিলাদের কৌতূহলই বেশী। কিন্তু আমি ভাবছি শেষ পর্যন্ত এ আনন্দটা থাকলেই হল। কারণ যাচ্ছি আমরা শীত মহারাজের এলাকায়। তোমরা মোটা ওভারকোট ছাড়াও যত পার গরম কাপড়-চোপড় সঙ্গে করে নাও।

ওরা বললঃ এ সব ব্যবস্থা তো আমাদের রয়েছেই। তাছাড়া এখনও তো শীত আসতে অনেক দেরী। যদি হঠাৎ তুষার ঝড়ও হয় তাহলেও রুশ মেয়েরা তার ধকল সইতে ভয় পায় না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন স্যার। আমরা আপনাদের অস্বস্তিতে ফেলব না।

আমরা ওভারকোট, পশমী টুপি, দস্তানা ইত্যাদি সঙ্গে নিয়েছিলাম। দুই মহিলার সাহস আমাদের বেশী উৎসাহিত করেছিল। কারিলিনা ভূমির অরণ্য এবং হ্রদের রাজ্য না দেখে দেশে ফেরার কথা ভাবতেই পারছিলাম না। তাছাড়া জুলাই মাসে বরফ গলবার কথা নয়। তুষার বৃষ্টিও এ সময় বড় একটা হয় না। অবশ্য চেরখভ বলছিলেন উত্তরের আবহাওয়ার মতিগতির ঠিক নেই। হেমন্তেও আচমকা বদলে যেতে পারে আবহাওয়া। বইতে পারে কারিলিনার ওদিকে গায়ে-হুল-ফোটানো হিমেল বাতাস।

তবে তিনি ভরসাও দিয়েছিলেন। বলেছিলেনঃ তাই বলে ঘাবড়ে যাবেন না কিন্তু। আমাদের দুই মাইক্রোই তো শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত। আবহাওয়া কোথাও যাত্রানাস্তি ঘটালে আমরা গাড়ীতেই আশ্রয় নেব। তাছাড়া পথে এয়ারকণ্ডিশণ্ড্ পর্যটন কেন্দ্রও আছে অনেক।

তুষার রাজ্যের ওদিকে এরা এতসব আধুনিক সুবিধার ব্যবস্থা করে রেখেছেন জানতাম না। সুতরাং স্বস্তির হাওয়া বইল মনে। শহর পেরিয়ে উত্তর-পশ্চিমমুখো হয়ে চলল মাইক্রো দুটি। সামনে পড়ল এক দিগন্তহীন প্রান্তর। এখানে চোখে পড়ল কৃষক পল্লী আর তাদের অনেক সমবায় খামার। সব খামারই গ্রিনহাউস। বিশাল-বিশাল কাচের ঘর একেকটি। ছাদ মাটি থেকে ২৫-৩০ ফুট উঁচু। তুষার ঝড় কিংবা হিমেল বাতাস পুরো কাচের আচ্ছাদনের জন্যে ভেতরকার ফসলের কোনও রকম ক্ষতি করতে পারে না। আবার কাচের ভেতর দিয়ে আসে সূর্যালোক। ফসল বেড়ে ওঠার জন্য যতটা তাপ, আলো এবং বাতাসের দরকার তার সব আধুনিক ব্যবস্থাই আছে এসব গ্রিনহাউস কৃষি খামারে।

সবুজের সমারোহ খামারগুলোতে। থরে-বিথরে ধরে আছে শশা, খিরা, লাউ, কুমড়া। দ্রাক্ষার ঝোপে কালো এবং সবুজ আঙুরের সেকি বাহার। নাশপাতি, আপেল, বেদানা, তরমুজ এবং আরও অনেক অচেনা ফল ভারে নত কেয়ারি-দেয়া সার-সার গাছ। পুরো এলাকাটাই সবজি, ফল এবং শস্যভাণ্ডার। আধুনিক কৃষিতে এরা কত খানি অগ্রসর না-দেখলে বোঝাই যেত না।

এক জায়গায় দেখলাম গোলাপ ফুলের সার-সার ক্ষেত। এখানকার কৃষকরা পরিকল্পিত নিয়মে চাষ করে লাল, নীল এবং কালো জাতের গোলাপ। ফুলদানির শোভাবর্ধন ছাড়াও মূল্যবান আতর আর সেন্ট হয় গোলাপ-নির্যাসে। ইউরোপ জুড়ে

www.pathagar.com

এখানকার গোলাপের কদর। লাদোগা হ্রদের তীর ছুঁয়ে আমরা যাচ্ছিলাম পশ্চিমে। এতদিন হ্রদটার নামই শুনছিলাম। এখন চোখ দিয়ে দেখলাম। দুই তীরের সীমানা আঁচ করতে পারলাম না। বিশাল এক সাগরের মতন মন হল। জাহাজ, ছোট-বড় নানান জাতের নৌযান, পালতোলা নৌকার ভীড় হ্রদ জুড়ে। পর্যটকদের বিহারের জন্যে প্রমোদতরী। তাদের অনেক ছাউনি দেখলাম লাদোগার এ-পারে। পুব পার ঘেঁষে পিটাসবুর্গ থেকে আসা রেল লাইন চলে গেছে উত্তর মেরু সাগর তীরের মারসানক্স বন্দরের দিকে।

পশ্চিমে দীর্ঘ বাঁক ঘুরতেই চোখে পড়ল কারেলিনা-ফিন প্রজাতন্ত্রের আদিগন্ত অরণ্যভূমি। এখানে ওক, পপ্‌লার, বার্চ গাছের সংখ্যাই বেশী। অরণ্যের ভেতর দিয়ে চলে গেছে পাকা সড়ক। এর ওপর দিয়ে দ্রুতবেগে চলল আমাদের গাড়ীর বহর। সৌভাগ্য বলতে হবে দিনটা ছিল সূর্যকরোজ্জ্বল। আমাদের পড়তে হল না তুষার ঝড়ের মুখে।

ঘন্টা কয়েক পর এসে পড়লাম জুলা উরপালা শহরের কাছে। পশ্চিমে ফিন উপসাগর। শহরের চারদিকে ঘন নিবিড় বনভূমি। ১৯১৭ সালে প্রতি বিপ্লবকালে এখানে অজ্ঞাতবাসে ছিলেন লেনিন। একটি বিশাল ওক গাছের কাটাগুড়িকে টেবিলের মতন ব্যবহার করে তিনি লিখেছিলেন তার নুতন অর্থনৈতিক তত্ত্ব। গাছের সেই গুড়িটা এখন এক ঐতিহাসিক দর্শনীয় বস্তু। গুড়িটা ছুঁয়ে দেখলাম। পাশেই বয়ে যাচ্ছিল ফিন উপসাগর।

এখানে লেনিনের নামে একটি জাদুঘর আছে। তার রচিত পুস্তক এবং ব্যবহার্য জিনিসপত্র জাদুঘরের দুর্লভ উপকরণ। আমরা ঘুরে ফিরে সবকিছু দেখলাম। পাশে ছিল একটি মনোরম সরাইখানা এবং পর্যটন কেন্দ্র। সরাইতে সবাই মিলে হল্লা করে সারলাম মধ্যাহ্নভোজ।

কাজাকস্তান। উত্তর ইউরোপ থেকে উড়ে এলাম মধ্য এশিয়ার এই বিশাল দেশে। বলতে গেলে এলাম অনেকটা ঘরের কাছে। দক্ষিণ সীমান্তে এশিয়ার বিখ্যাত আলতাই এবং আনা-তাও পর্বতমালা। বোয়িং বিমানের জানালা থেকে দেখছিলাম বেলুখা চূড়ার গায়ে লেপ্টে-থাকা রাশি-রাশি সাদা মেঘের বর্ণালি। সাদার গায়ে মুঠো মুঠো সোনা ছড়াচ্ছিল পড়ন্ত বেলার সূর্য। আলতাইয়ের সবচেয়ে উঁচু চূড়া বেলুখা। পার্বত্য সমতল থেকে পনেরো হাজার একশ' পঞ্চান্ন ফুট উপরে উঠে বাহু মেলেছে এটি আকাশের নীল সায়রে। ডানে হিন্দুকুশ আর বাঁয়ে হিমালয়।

মনে-মনে ভাবছিলাম এখান থেকে আকাশ পথে না-জানি কত দূর হবে বাংলাদেশ? আমার পাশের আসনেই ছিল পাভলভ। সে যেন বুঝে নিয়েছিল আমার ভাবনার কথা। কানের কাছে মুখ বাড়িয়ে বলল: আধঘন্টা পরেই আমরা নামতে যাচ্ছি আলমা-আতা বিমানবন্দরে। এখানে তোমরা দেখতে পাবে এশিয়ার আবহাওয়া। আর কাজাকদের ভাষায় এবং চলন-বলনে খুঁজে পাবে নিজেদের সংস্কৃতিরও অনেক মিল।

www.pathagar.com

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলামঃ এ-ও কি সম্ভব? কোথায় কাজাকভূমি আর কোথায় বাংলাদেশ? এখানে তো মোঙ্গলিয়া এবং চীনের প্রভাবই বেশী থাকবার কথা। কারণ কাজাকদের বাসভূমিটা তো এই দুই দেশের পশ্চিম সীমান্ত জুড়ে আছে।

পাভলভ তার হাতব্যাগ থেকে একটি মানচিত্র বের করে রাখল আমার ছোট টেবিলটার ওপর। বললঃ ভাল করে তাকিয়ে দেখ আলতাই আর তিয়েনশান পর্বতমালা থেকে পামীর আর হিমালয় কতটা কাছে। কাজাগ রাজধানী আলমা-আতার সামান্য দক্ষিণে কিরগিজ প্রজাতন্ত্রের অবস্থানটা নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছ। পশ্চিমে কিরগিজিস্তানের মাথা ছুঁয়ে কাজাগ ভূমির ভেতর দিয়ে চীন এবং মঙ্গোলিয়ার দিকে চলে গেছে তিয়েনশান-এর শৈল-শিরাগুলো। দেখ কেমন করে এটি উঠেছে তোমাদের উপমহাদেশের কাশ্মীর উপত্যকার উত্তরবর্তী কারাকোরাম আর পামীর গ্রন্থি থেকে। তাজিকিস্তান তো পামীরেরই দেশ। উত্তর-পশ্চিমে এই পর্বতমালারই প্রান্ত ছুঁয়ে উজবেক প্রজাতন্ত্র। আর দক্ষিণ-পশ্চিমে কাস্পিয়ান সাগরের একেবারে ডান কোণের দিকটায় তুর্কমেন প্রজাতন্ত্র।

এবার আলমা-আতার দক্ষিণে চোখ বুলাও। দেখ কিরগিজ প্রজাতন্ত্রের দক্ষিণ-পশ্চিমে কতটা কাছে তিব্বত এবং নেপাল। এবার বুঝে দেখ নিশ্চয় আমি ভুল বলিনি। তোমাদের উপমহাদেশের বিশেষ করে বাংলাদেশের অনেক মিল আছে প্রাচ্য সভ্যতার এই পীঠস্থানগুলোতে। নেপালের সীমান্ত ছুঁয়েই তো তোমাদের দেশ। কাঠমুন্ড থেকে ঢাকার দূরত্ব কতটা? আকাশপথে বড় জোর ঘন্টাখানিক হবে।

এশিয়ার এই ভৌগলিক এবং সাংস্কৃতিক সংলগ্নতার কথা জানতাম। আমি জানতাম খ্রীষ্টপূর্ব দেড় হাজার অব্দের দিকে আর্য-বিজেতারা কাস্পিয়ান অঞ্চল থেকে হিন্দুকুশের খাইবার গিরিপথ ধরে প্রবেশ করেছিল ভারতে। তার আগে দ্রাবিড়, প্রাচীন মেসোপটেমিয়া তথা ইরাকের শাতিল আরব উপত্যকার সুমারীয় এবং ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী আল্পস পর্বতমালার দেশের আলপাইন আর দিনারিক জনগোষ্ঠী মিলে জন্ম দিয়েছিল উপমহাদেশের পাঁচ হাজার বছর আগেকার সিন্ধু সভ্যতার। যার অন্য নাম মহেনজোদারো এবং হারাপ্পা সভ্যতা। বাংলা লিপির জনক ব্রাহ্মি লিপির উদ্ভাবক তো ছিলেন মহেনজোদারোর পণ্ডিতেরাই।

পুরাতত্ত্ববেত্তা রাহুল সাংকৃত্যায়নের গবেষণার কথা এ প্রসঙ্গে এর আগে একবার বলেছিলাম। রাহুল তার ঐতিহাসিক উপন্যাস 'ভল্গা থেকে গঙ্গা'য় প্রাচীন এবং আধুনিক সূত্রগ্রন্থগুলোর আলোকে এই বহু বিস্তৃত আন্তঃমহাদেশীয় সভ্যতার পল্লবায়নের চিত্র এঁকেছেন প্রায় নিখুঁতভাবে। কিন্তু ভাষা-সাহিত্য ও ইতিহাসের ছাত্র পাভলভ ম্যাপ খুলে হাতে-নাতে ভৌগোলিক সংলগ্নতার চিত্রটি অমনভাবে ধরিয়ে না দিলে অতটা গভীর হত না আমার উপলব্ধি।

www.pathagar.com

আমার জ্ঞান পরিপুষ্ট করবার জন্য এই আধুনিক রুশ কূটনীতিক গবেষককে ধন্যবাদ জানালাম উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে। কিন্তু মানচিত্রটি আমার চোখ দুটিকে তখনও আঁকড়ে রাখল। দেখছিলাম আলমা-আতা থেকে পশ্চিমে উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসকন্দের দূরত্ব কতটা হবে। আর সেখান থেকে কোথায় কাজাক মরুভূমির বুকে আরল সাগর এবং সিরদরিয়া।

এই নদী তীরের ঐতিহাসিক শহরগুলো দেখবার কথা আছে আমাদের। তাহলেও মানচিত্রে নদীর প্রবাহ-পথের আগাম ধারণা পেলে চোখের দেখাটা হয় সার্থক। তার জন্যই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলাম ম্যাপের বিন্দুগুলোর ওপর। দেখলাম পামীরের উত্তরে তিয়েনমান পর্বতমালায় বেলুখা চূড়ার কোকন্দ হ্রদের উৎস থেকে বেরিয়েছে সিরদরিয়া। তারপর বাঁকের পর বাঁক নিয়ে চলে গেছে তাসকন্দের পশ্চিম পাশ ঘেঁষে বিশাল কাজাগ মরুর দিকে। পথে উজবেকিস্তানের চির ধুসর কিজিলকুম প্রান্তর। 'যে-নদী মরুতে হল হারা' বলে নদীপ্রেমিক কবিদের দীর্ঘশ্বাস ফেলতে দেখা যায় চিরযৌবনা সির কিন্তু তাঁদের আশ্বস্ত করেছে।

পথে নারিয়ান এবং কারা দরিয়ার মিলিত স্রোতে পুষ্ট হয়েছে সে। এখানে তিন নদী মিলে জন্ম দিয়েছে বাবরের জন্মস্থান মধ্য এশিয়ার চিরহরিৎ ভূমি ফরগানা রাজ্যের। ফরগানার আয়তন পঞ্চাশ হাজার বর্গমাইলের কিছু বেশী। বলতে গেলে বাংলাদেশের আয়তনের প্রায় কাছাকাছি। পিতা আহমদ মীর্জার অকাল মৃত্যুর পর মাত্র বারো বছর বয়সে এই রাজ্যটির উত্তরাধিকার হয়েছিলেন জহিরুদ্দিন মুহম্মদ বাবর।

সিরদরিয়ার কথা বলছিলাম। দক্ষিণের তিয়েনশান পর্বতমালার উৎস থেকে বাহিত তেরোশ' মাইল দীর্ঘ এই নদী ফরগানা উপত্যকার উত্তরে খুজন্দ নদীতে এসে মেশে। এখান থেকে পশ্চিমে সোজাসুজি বাঁক নিয়ে গিয়ে পড়ে আরল সাগরে। সোজা দক্ষিণে উজবেকিস্তানের ঐতিহাসিক শহর তুর্কুল, বুখারা এবং সমরকন্দ। পশ্চিমে কাস্পিয়ান সৈকত ছুঁয়ে তুর্কমেনিস্তানের রাজধানী আশ্‌কাবাদ, কারা আর মারিভ্ শহর।

মহাকবি ফিরদৌসী তার ষাট হাজার শ্লোকের মহাকাব্য 'শাহ্‌নামা'য় সিরদরিয়াকে বলেছেন 'শিহুন' দরিয়া। ইরানবাসীদের কাছে আজও এটি শিহুন নামেই পরিচিত। আলেকজাণ্ডারের অভিযান কাহিনীতে আছে এই নদীর নাম। গ্রীকরা একে বলত জাকসারটিস। ৩২৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আলেকজাণ্ডার সিরদরিয়ার তীরবর্তী ফরগানায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন একটি শহর।

এর আগে এখানে ছিল মধ্য এশিয়ার খ্রীষ্টপূর্ব দুই হাজার অব্দের এক প্রাচীনতম শহর। তার ধ্বংসাবশেষের কাছে সিরদরিয়ার দিকে মুখ করে নির্মিত হয়েছিল গ্রীক স্থাপত্যকলায় নির্মিত শহরটি। উজবেকরা একে বলে খোশহেন্‌ত। শহরটির পুরনো কীর্তিমালার অনেক নিদর্শন একালেও টিকে আছে। সোভিয়েত যুগে শহরটিকে

www.pathagar.com

ঢেলে সাজিয়ে নতুন করে গড়া হয়। নতুন নামকরণ করা হয় লেনিনাবাদ। এটি ফরগানা উপত্যকার সবচেয়ে আধুনিক এবং বড় শহর।

বস্ত্র আর কার্পেট শিল্পের জন্য খোশহেন্ত শহর বিখ্যাত। কারণ সির এবং তার পাশ দিয়ে বয়ে চলা মধ্য এশিয়ার দীর্ঘতম নদী আমু দরিয়ার গোটা অববাহিকাটাই তুলার দেশ। ১৪৫০ মাইল দীর্ঘ আমুর উৎস হিমালয় সংলগ্ন হিন্দুকুশ পর্বতমালার চূড়ায়। সেখান থেকে এটি উত্তর-পশ্চিমে সুদীর্ঘ পথ ঘুরে ঢুকে পড়েছে তুর্কমেন এবং উজবেক প্রজাতন্ত্রে। কাস্পিয়ানের নব্বই মাইল দীর্ঘ এক বদ্বীপের মধ্য দিয়ে এটি সুজাসুজি গিয়ে পড়েছে আরল সাগরে। এখানে একাকার হয়েছে সির এবং আমুর মিলিত স্রোতধারা।

আফগানিস্তান এবং রাশিয়ার মাঝখানের সীমান্ত রেখা হল আমু দরিয়ার রূপালী স্রোত। দুই দেশের সীমান্তের শুকনো-উষর ভূমিকে শস্যশ্যামল করে তুলেছে আমু থেকে বাহিত সেচের পানি। ক্লাসিক্যাল যুগের গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোডোটাস তার 'হিস্ট্রি' গ্রন্থে আমু দরিয়াকে আখ্যায়িত করেছেন অক্সাস নদী নামে।

সংস্কৃত ভাষায় রচিত সূত্রগ্রন্থগুলোতে এই নদীর নাম হল অক্ষু নদ। রাহুলও তার গ্রন্থে 'অক্ষু' নামটিই বাবহার করেছেন। যেমন তিনি ইরাকের তাইগ্রিস নদীকে তিগ্রা আর ইউফ্রেতিসকে ইফ্রা নদী নামে উল্লেখ করেন। সম্ভবত আলেকজান্ডারের ভারত অভিযানকালে তার সঙ্গে আগত গ্রীক ঐতিহাসিকগণ তাদের পূর্বসূরী হিরোডোচাসের সূত্র ধরে প্রাচীন মেসোপটেমিয়া তথা ইরাকের এই দুই প্রধান নদীকে তাদের বর্ণনায় তাইগ্রিস-ইউফ্রেতিস বলে উল্লেখ করেন। সেখান থেকে অপভ্রংশ হয়ে সংস্কৃত ভাষায় এদের নাম হয়েছে তিগ্রা এবং ইফ্রা।

ভারতের প্রথম মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের দরবারে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ অব্দে অবস্থান করছিলেন গ্রীক দূত মেগাস্থিনিস এবং আরও কিছু সংখ্যক গ্রীক পণ্ডিত। তাদের বর্ণনায় মধ্য এশীয়ায় এবং ভারতের ভৌগোলিক স্থান আর নদ-নদীর গ্রীক উচ্চারণ সঞ্জাত অনেক রূপান্তরিত নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন তারা আমাদের গঙ্গা নদীকে বলেছেন গ্যানজেস আর সিন্ধু নদকে বলেছেন ইণ্ডাস। আর গঙ্গার তীরে বসবাসকারী বাঙালীদের পূর্ব পুরুষ আদি জনগোষ্ঠীকে বলেছেন, 'গঙ্গারিদাই'। জাতি অর্থে বিশেষণটি ব্যবহার করেছেন তারা। এদিকে ইণ্ডাস নাম থেকেই পরবর্তীকালে 'ইণ্ডিয়া' নামটির উদ্ভব।

ইণ্ডাস অর্থাৎ সিন্ধু হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিমেই যে বিশাল ভূমির ওপর দিয়ে বয়ে গেছে গ্রীকরা তার দুই পাশের দেশটাকে 'ইণ্ডাসল্যাণ্ড' বলে অভিহিত করেন। এই বিশেষণটি রূপ বদল করে পরে হয়েছে ইণ্ডিয়ানা এবং ইণ্ডিয়া। ইণ্ডাস শব্দের এই উৎসমূল থেকেই 'হিন্ড' অর্থাৎ হিন্দু নামের উৎপত্তি। প্রাচীন আরব জিওগ্রাফার আল-ইদ্রিসী, সুলায়মান প্রমুখ গ্রীকদের অনুসরণ করে মহাদেশটিকে অভিহিত করেন 'হিন্দু' নামে। আর এখানকার অধিবাসীদের আখ্যায়িত করেন হিন্দু বিশেষণে, যার থেকে হিন্দুস্থান কথাটির উৎপত্তি। আসলে প্রাচীন আর্য মহাকাব্য এবং সূত্রগ্রন্থগুলোতে

www.pathagar.com

ভারতের উত্তর-পশ্চিমের অঞ্চলটিকে উল্লেখ করা হয় 'আর্যাবর্ত' নামে। কারণ এখানে কাস্পিয়ানের তীরবর্তী আরিয়ানা অঞ্চল থেকে আগত লোকেরা নতুন বসত স্থাপন করেছিল। আরিয়ানা শব্দ থেকে অ্যারিয়ান এবং আর্য শব্দের উদ্ভব। আর খ্রীষ্টপূর্ব সহস্রাব্দের এই নবাগত জনগোষ্ঠী চতুর্বেদের অনুশাসন মেনে চলত বলে তাদের শাস্ত্রীয় নাম ছিল বৈদিক। এসব প্রাচীনতম সূত্রগ্রন্থের কোথাও হিন্দু নামের কোনও উল্লেখ দেখা যায় না।

এটি গ্রীকদের বর্ণিত ইণ্ডাস শব্দেরই অনেক পরেকার সংস্করণ। যেমন ইরান ছিল গ্রীকদের কাছে 'পারসিয়া'। এই ভৌগোলিক নাম থেকে এই ভূমির অধিবাসীরা পারসিক নামে পরিচিত। মূলত এরা ছিল আদি পহলব জনগোষ্ঠী এবং এদের ভাষাকেও বলা হত 'পাহ্লভী'। ফিরদৌসী এবং কবি জালালুদ্দিন রুমী প্রাচীন ফার্সি ভাষাকে পাহলভী ভাষা নামেই অভিহিত করেছেন।

কিন্তু মধ্য এশিয়ার লোকেরা তাদের দুই প্রধান নদীকে সির এবং আমু নামেই জেনে এসেছে। আজও এই নামই তাদের কাছে অতি প্রিয়। আমু এবং সিরদরিয়ার দেশ হল মধ্যএশীয় সভ্যতার প্রাচীনতম লীলাভূমি। এই নদীর অববাহিকায় অতীতে বার বার শোনা গেছে শক-হুন, তুর্কি-তাতার, পারসিক, গ্রীক এবং দুধর্ষ মোঙ্গল বিজেতাদের অশ্ব ক্ষুরধ্বনি। শোনা গেছে, উৎপীড়িত মানবকুলের কত আর্ত-হাহাকার।

কিন্তু নদী দুটি আগের মতই তেমনি বয়ে চলেছে তাদের আরক্ত সলিলধারার অমূর্ত চিহ্ন বুকে নিয়ে। ফরগানা উপত্যকা পেরুবার পর আকাশ থেকে দেখলাম সির এবং আমুর রূপালী রেখা। একটু পরেই বিমানবালার কণ্ঠে শোনা গেলঃ আমরা অবতরণ করছি আলমা-আতা বিমানবন্দরে।

আলমা-আতা বিমানবন্দর। কয়েক পাক চক্কর দিয়ে বোয়িংটি থামল পোর্ট ভবনের বিশাল আঙিনায়। সিঁড়ির মুখে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন কাজাক সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের একদল কর্মকর্তা। তাদের সঙ্গে ছিলেন স্থানীয় কয়েকজন সিনিয়র সাংবাদিক। এরা এখানকার পত্রপত্রিকা এবং সংবাদ সংস্থার প্রতিনিধি। করমর্দন করবার সময় সমস্বরে সবাই বলছিলেনঃ ওয়েকলকাম ফ্রেণ্ডস্! ওয়েলকাম টু আলমা-আতা।

আমাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিল মারিয়া। এখানে সবাই তার জানাশোনা। কারণ আরও অনেকবার এ শহরে বিদেশী প্রতিনিধিদলের গাইড হয়ে এসেছে সে। স্বাগতিকদের মধ্যে তিনজন ছিলেন মহিলা সাংবাদিক। বয়স এদের চব্বিশ-পঁচিশের মাঝামাঝি। দেখে মনে হল সব ক'জনই কাজাক। তবে কিরগিজ-মঙ্গোলীয় আদলও আছে এদের চেহারায়।

ইতিহাসে পড়েছি সুদূর অতীতে কাজাক রক্তধারার সঙ্গে সংমিশ্রণ ঘটেছিল কিরগিজ রক্তের। সুতরাং মিলটা থাকাই স্বাভাবিক। এক সময় কিন্তু কিরগিজই বলা হত কাজাকদের। এখন যেসব কিরগিজ বাস করে কাজাক ভূমিতে তাদের নাম কারা-কিরগিজ। এদের দেখে আমার মনে হল সাইবেরিয়ার দক্ষিণে যে কালো মাটির স্তেপ এবং তুরান নিম্নভূমিতে বহু হাজার বছর আগে বাস করত যে আদিম

www.pathagar.com

জনগোষ্ঠী আজও তাদের নারী-পুরুষের মুখমণ্ডলে আছে সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের ছাপ। এখানে ইতিহাসের অনেক বিবর্তন আর পালাবদল ঘটলেও মঙ্গোলিয়া-চীনের পশ্চিম সীমান্ত আর উরাল-কাস্পিয়ানের পুবের এই বিশাল গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশের মানুষ হারিয়ে যায়নি অতীতের অন্ধকারে।

এক সময় এদের বলা হত তাতার। পারসিকরা আসলে সাইবেরিয়ার প্রাচীন মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীকেই দিয়েছিল এই নাম। গোড়াতে এরা ছিল যাযাবর। পরে এরা ছড়িয়ে পড়তে থাকে চীনে উরাল পর্বতমালার পশ্চিমে, মধ্য এশিয়ায়, পারস্যে এবং ভারতে। তুর্কমেন, কাজাক, উজবেক, তাজিক এবং কিরগিজরা এদেরই বংশধর। তিব্বতের বৌদ্ধ লামারা মঙ্গোলিয়ানদেরই আরেকটি শাখা। এছাড়া এদের বড় দু'টি গ্রুপ বুরইয়াত এবং কালমাক। মঙ্গোলিয়ার উত্তরে আর বৈকাল হ্রদের পুবে পর্বতময় অরণ্যাঞ্চলে বুরইয়াতদের বাসস্থান। বৈকাল পতিত থেকে সেলেঙ্গা নদীর উপত্যকায় আজকাল এদের কৃষিজীবীর জীবন যাপন করতে দেখা যায়। আদিম যুগের মতন একালেও এরা ঘোড়া, গরু এবং মেষ পোষে।

অঞ্চলটির ভৌগোলিক নাম হল বুরইয়াত- মঙ্গোলিয়া। এখানকার মোট জনসংখ্যা সত্তর লাখ। বুরইয়াত ছাড়া এদের অর্ধেকই হল রুশ। আগা বুরইয়াত আর উসত-উরদিন বুরইয়াত নামে আরও দু'টি শাখা আছে এদের। দুই স্ব-শাসিত এলাকায় এদের বাস। এলাকা দু'টির নাম ওক্‌রাগ। এদের ভাষায় ওক্‌রাগ বলতে বোঝায় স্ব-শাসিত অঞ্চল।

কাল্‌মাকরা হল এশিয়ার ওইরাত মোঙ্গলদের একটি শাখা। আলতাই পর্বতমালার দেশ থেকে বাস্তু ত্যাগ করে নিম্নভল্গা অঞ্চলে কাল্‌মাকরা আসে সতেরো শতকের গোড়ার দিকে। এখানে তারা রুশ দেশে সামন্ত ভূমি মালিকের মর্যাদা পেয়েছিল। জারদের সেনাবাহিনীতেও এক সময় ছিল এদের বেশ নামডাক। কিন্তু সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথারিনের আমলে ভল্গা অঞ্চলে রুশ উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা শুরু হলে ১৭৭১ সালের দিকে এরা চীনের দিকে যাত্রা করে।

এদের এই নতুন বাস্তুত্যাগ ছিল মহাকাব্যের উপাখ্যানের মত নাটকীয়। কাজাক এবং কিরগিজদের হামলায় নানা রকম বিপর্যয় নেমে আসে এদের ওপর। শেষে এরা সিংকিয়াং সীমান্তে গিয়ে পৌঁছে। সেখানে ইলি উপত্যকায় আজও আছে কালমাকরা। জায়গাটা আলমা-আতার উত্তর-পুবে চীনের উরুমচি থেকে খুব বেশী দূরে নয়।

কিন্তু ভল্গার পশ্চিমের কাল্‌মাকরা ছিল গোঁড়া লামাপন্থী। এরা বৌদ্ধধর্মের মূল শাখা হীনযান পন্থার অনুসারী। সম্রাট অশোকের আমলে ভারত থেকে প্রথমে তিব্বতে প্রচারিত হয়েছিল হীনযান বৌদ্ধ মতবাদ। সেখান থেকে উত্তর-পশ্চিমের খাইবার গিরিপথ এবং কাশ্মীরের কারাকোরাম-এর পার্বত্য পথে এটি প্রবেশ করে মধ্য এশিয়া, চীন এবং মঙ্গোলিয়ায়। কিংবদন্তীতে আছে, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে গৌতম বুদ্ধের অনুরাগিণী একজন ভারতীয় ও এক চীনা রাজকুমারী তিব্বতে প্রচার করেন লামা-মতবাদ। এরা দু'জনই পরে তিব্বতরাজের সহধর্মিনী হয়ে ছিলেন।

www.pathagar.com

কিন্তু বৌদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থে আছে, তিব্বতের রাজার আমন্ত্রণে ভারত থেকে পাঠানো এক বৌদ্ধ ভিক্ষু ৭৪৯ সালে লাসা শহরের কাছে স্থাপন করে একটি মঠ। এখানে প্রচার করা হত হীনযানভিত্তিক লামা মতবাদ। 'কানজুর' এবং 'তানজুর' নামক দু'টি বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থের অনুদিত ভাষ্য থেকে পাওয়া যায় লামা মতবাদের

সিরদরিয়া এবং বলকান হ্রদের তীরাঞ্চল রূপালী আঁশ অর্থাৎ তুলার দেশল। আলমা- আতার চারদিককার সমতলে বাংলাদেশের মতন ধানের বাহার দেখে জুড়ায় দুই চোখ। এছাড়া এখানে আছে আখ, রবার, তরু, দ্রাক্ষা, আপেল, খুবানি আর নাশপাতির বন।

ধারণা। লামা বলা হয় শ্রেষ্ঠতম ভিক্ষু তথা শ্রমণকে। কানজুর গ্রন্থে পবিত্র বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহে নির্দেশিত আচার-অনুষ্ঠানের নিয়মাবলী বর্ণিত। আর তানজুর হল বৌদ্ধ সঙ্গীতসমূহের একটি সংকলন। কয়েক বছর কঠোর নিয়ম পালনের পর একজন ভিক্ষুক উত্তরণ ঘটে সাধন মার্গে এবং তিনি লামা হন।

ঢাকার বিক্রমপুরের বিশ্বখ্যাত বৌদ্ধ ভিক্ষু শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপংকর ১০৩৮ সালে তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্মের মহা সংস্কারকের ভূমিকা পালন করেন। তার বৌদ্ধ নাম কালি-দাস-পা। তিনি তিব্বত থেকে আদিম প্রকৃতি পূজার অবসান ঘটিয়ে লামা মতবাদে সমন্বয় আনলেন। ত্রয়োদশ শতকে চেঙ্গিজ খানের পৌত্র কুবলাই খান চীনের সিংহাসনে বসবার পর দীক্ষিত হন বৌদ্ধ ধর্মে। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের তিনি জাগতিক শাসনকর্তার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। এর ফলে পশ্চিম তিব্বতে একটানা নব্বই বছর লামারা ভোগ করেছিল নিষ্কুশ রাজনৈতিক ক্ষমতা। পনেরোশ' শতকের দিকে 'দ্বিতীয় অতীশ' নামে পরিচিত বিখ্যাত ভিক্ষু সং-গা-পা আলাদা একটি বৌদ্ধ ধর্মীয় সম্প্রদায় গড়ে তুললেন তিব্বতে। এদের বলা হত 'ইয়েলো হ্যাট অর্ডার'। এরা হলদে টুপি পরত বলে এই নামে বিশেষিত করা হত এদের। এই সম্প্রদায়ের

www.pathagar.com

মধ্যে উত্তরাধিকারী হিসেবে যারা অভিষিক্ত হত তাদের লাভ করতে হত সরাসরি ঐশী ক্ষমতা অর্থাৎ অবতারের ক্ষমতা। তিব্বতের পশ্চিম লামা বংশের প্রধানতম প্রশমণ দালাইলামা নাকি এ ধরনের ক্ষমতা লাভ করেন। বলা হয়, মৃত্যুকালে তার আত্মা প্রবেশ করে সদ্যজাত একটি শিশুর শরীরে। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের পর শিশুটিকে যত্নের সঙ্গে শিক্ষা দেয়া হয় তার প্রাপ্য শীর্ষপদের জন্য। এই মতবাদে আশ্রমিক সন্ন্যাসীদের স্থান পদস্থ লামাদের অনেক পরে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানকালে প্রার্থনা, যপমালা গলায় ধারণ, বিরাটাকৃতির শিঙ্গা কিংবা ড্রামের প্রচণ্ড শব্দের তালে তালে ধর্মীয় সঙ্গীত পরিবেশন এদের আচারের অন্তর্গত।

কিন্তু লামাপন্থী পশ্চিমী কাল্‌মাকরা ১৯২০ সালে রাশিয়া স্বশাসন পেলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে সেটি টিকিয়ে রাখতে পারেনি। নাৎসীদের প্ররোচনায় তাদের বেশীরভাগ ওই সময় ফ্যাসিস্ট ফৌজের সঙ্গে ভিড়ে যায় এবং যুদ্ধের পরে জার্মানীতে বাস্তুহারার ভাগ্যবরণ করে। বাদ বাকী হাজার কয়েক পৃথিবীর নানান জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। আমরা এখন যে পথ দিয়ে যাচ্ছি কাজাক রাজধানী আলমা-আতা শহরের দিকে- কয়েকশ' বছর আগেও এর চার পাশে উড়ত অশ্বপৃষ্ঠে ধাবমান বিজয়ী মোঙ্গলদের পতাকা। ১২৪০ সালে তাদের একটি লিখিত ভাষার প্রচলন হলেও এখন বহু ভাষাভাষী জনশ্রেণীতে বিভক্ত তারা।

কাজাক ভাষা মূলত এর থেকেই উদ্ভূত। উজবেগ, কিরগিজ, তাজিক এবং তুর্কমেন ভাষারও বিকাশ ঘটেছে এই একই উৎস থেকে। ত্রয়োদশ দশকে প্রথম ইতিহাসের দীপালোকের সামনে আসে গোবি মরু এবং বৈকাল হ্রদ অঞ্চলের যাযাবর মঙ্গোলীয়রা। এ ছিল এক বিস্ময়কর নাটকীয় ঘটনা। তৃণভূমির সন্ধানে মাসের পর মাস ধরে ঘোড়ার পিঠে চলতে থাকা হাজার কয়েক লোক হঠাৎ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে তিমুজিন নামক বিশ/একুশ বছরের এক দুঃসাহসী যুবকের নেতৃত্বে। ছেলেটি ছিল মঙ্গোলিয়ার ছোট একটি এলাকার সর্দারের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর তাকে শুধু রাজ্যহারাই করেনি- তার কিশোরী স্ত্রীকে পর্যন্ত লুটে নিয়েছিল। এই অন্যায়ের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য পাগল হয়ে ওঠে তিমুজিন।

তাকে পাহাড়ে পালিয়ে যেতে দেখা যায়। সেখানে গোপনে অবস্থান নিয়ে গড়ে তুলতে থাকে সে এক দুর্ধর্ষ বাহিনী। অল্পকালের মধ্যে হারানো রাজ্যসহ তার কব্জায় আসে গোটা মঙ্গোলিয়া। এরপর পেয়ে বসে তাকে বিশ্বজয়ের নেশায়। পূর্ব ইউরোপ আর এশিয়ার বেশীর ভাগ এলাকা হাতে আসবার পর সেই যুবক নিলেন 'মহান খান' অর্থাৎ চেঙ্গিজ খান খেতাব। তার পৌত্র বাতু খান এবং কুবলাই খান চেঙ্গিজের সাম্রাজ্যকে দিয়েছিলেন দীর্ঘ স্থায়িত্ব। চীনে মোঙ্গলরা প্রতিষ্ঠিত করেছিল ইউয়ান রাজবংশ। রাশিয়ায় তাদের বংশের নাম ছিল গোল্ডেন হোর্ড অর্থাৎ সোনালী তাঁবুর শাসকদল। কাজাকস্তানসহ মধ্য এশিয়ার এ অঞ্চলে ছিল জাগাতাই খানেত, ইরানে কিরমান খানেত এবং ভারতে মুগল রাজবংশ।

www.pathagar.com

'মুগল' কথাটি এসেছে মোঙ্গল শব্দ থেকে। চতুর্দশ শতকে মধ্য এশিয়ায় এবং খারেজমে বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা তৈমুর লং আর ভারতে মুগল রাজবংশের উদ্‌গাতা বাবর নিজেদের চিহ্নিত করেছেন চেঙ্গিজ খানের বংশধর হিসেবে।

শহরের দিকে চলবার পথে নতুন করে দেখে নিচ্ছিলাম কাজাকস্তানের মানচিত্রটি। আয়তনটার ওপর চোখ বুলাতে গিয়ে অবাক না হয়ে পারিনি। প্রায় এগারো লাখ বর্গমাইল জুড়ে দেশটি। বর্তমান ভারতের আয়তনের প্রায় কাছাকাছি। অথচ জনসংখ্যা জনাকীর্ণ ভারতের তুলনায় বলতে গেলে সমুদ্রে বারিবিন্দু তুল্য। মাত্র সত্তর লাখ। দক্ষিণের এই উপত্যকা আর কারাগান্দা, আকতিয়ুবিস, আকগুলিন এবং সিমকেন্তসহ মাত্র আর কয়েকটি অঞ্চলই শস্যশ্যামল। বাকী সবই ধূধূ মরুভূমি।

সিরদরিয়া এবং বলকান হ্রদের তীরাঞ্চল রূপালী আঁশ অর্থাৎ তুলার দেশ। আলমা-আতার চারদিককার সমতলে বাংলাদেশের মতন ধানের বাহার দেখে জুড়ায় দুই চোখ। এছাড়া এখানে আছে আখ, রবার, তরু, দ্রাক্ষা, আপেল, খুবানি আর নাশপাতির বন।

উত্তরের উরাল, ইরতিশ এবং দক্ষিণের ইলি আর সিরদরিয়া এঁকে- বেঁকে চলে গেছে মরুর বুক পেরিয়ে। প্রত্নপ্রস্তর যুগে এসব জায়গায় ছিল আদিম মানব বসত। এরাই তাতার, উজবেক, কিরগিজ আর এখানকার কাজাকদের পূর্বপুরুষ। ইতিহাস পূর্বাঞ্চলে এসব নদী তীরেই বাস করত মঙ্গোলীয়রা।

যারা মধ্য যুগে ছিল বিশ্বত্রাস এক দুর্মদ জাতি-খাস মঙ্গোলিয়াসহ তাদের সংখ্যা এখন বোধকরি পঞ্চাশ লাখও হবে না। মাত্র এদের পনেরো লাখের বাস সাড়ে পাঁচ লাখ বর্গমাইলের দেশ মঙ্গোলিয়ায়। অন্যরা সবই একাকার হয়ে গেছে মধ্য এশীয় তুর্কী এবং ইরানী রক্তধারার সঙ্গে। ভারতীয় মুগলদেরও একালে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

এখানে এসে কাজাক, উজবেক, কিরগিজ আর তাজিক ভাষায় ফার্সী-তুর্কী-আরবী এবং বেশ কিছুটা রুশ ভাষার প্রভাব দেখে বিস্মিত হয়েছি। আমাদের মত এরাও তুর্কী বাবা, হাওয়া আর জমিন শব্দ ব্যবহার করে। মা বুলিটি তো আছেই। চাঁদও এদের আকাশে জোছনা ছড়ায়। সুরুজ দেয় রৌশনি। প্রায় ষাট ভাগ কাজাক মুসলমান।

লোহা, কয়লা, তামা, সীসা প্রভৃতি মূল্যবান খনিজ থাকায় শিল্পে এরা এগিয়েছে অনেকখানি। বিশেষ করে ইউরেনিয়াম খনি আণবিক শক্তি অর্জনে প্রচুর সহায়তা যুগিয়েছে এদের।

মুগ্ধ হচ্ছিলাম শ্যামল উপত্যকা আলমা-আতার অপার নৈসর্গিক সৌন্দর্য দেখে। যেন এটি একটি বৃক্ষনগরী। গাছের ছায়ায়-ছায়ায় আমরা গিয়ে উঠলাম একটি মনোরম হোটেলে। স্থানীয় সঙ্গী রশিদ খানভ বললেনঃ গাছ আমাদের সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। গাছের সঞ্জীবনী সুধা পান করে বেঁচে আছি আমরা। তার জন্যই ওয়েট লিফটার এবং জিমনাস্ট হিসেবে এ পর্যন্ত কম স্বর্ণপদক পাইনি আমরা বিশ্ব অলিম্পিক থেকে।

www.pathagar.com

রশিদভ বাড়িয়ে কিছু বলেননি। কারণ জানতাম প্রতি অলিম্পিকেই অনেক স্বর্ণ এবং রৌপ্যপদক জিতে আনে আধুনিক যুগের কাজাকরা। খেলাধুলা, শারীরিক ক্রিয়াকসরতে ঈর্ষাযোগ্য উৎসাহ এদের। গাছের কথা বলতে গিয়ে রশিদভ ফের বললেনঃ জানেন এই শহরে আমাদের গাছের সংখ্যা কত?

রাস্তার দু'ধারে আমাদের মধুপুর অরণ্যের মতন গজারি গাছের আকারের সার-সার উঁচু তরুবীথি দেখে জিজ্ঞেস করলামঃ কত হতে পারে?

ঃ মাথা পিছু তেরোশ'। জবাব দিলেন তিনি।

ঃ তেরোশ'। তাও জনপ্রতি? আমার দুই চোখে বিস্ময় নামল। আসলেই আলমা-আতা একটি অরণ্যময় শহর। সুতরাং গাছের সমারোহ তো এখানে থাকবেই। রশিদভের হিসাবে পঞ্চাশ কোটির বেশী গাছ আছে চার লাখ লোকের এই শহরে। এখানে কেউ এলে কথাটা অবিশ্বাস করতে পারবেন না। কারণ তাদের চোখের দৃষ্টি এখানে আপনা থেকেই হারিয়ে যাবে সবুজের মেলায়।

কাজাকরা তাদের এ প্রিয় শহরকে বলে আলমু-আতা। শব্দটিতে গন্ধ আছে তার এই নাম বিশেষণের। এটি একটি তুর্কী-আরব শব্দ। কে নামটি রেখেছিলেন এখন আর তা জানা যায় না। তবে শহরের দৃশ্যাবলীর সঙ্গে অপূর্ব এক মিল আছে নামের।

রশিদ খানভ বললেনঃ আরবী আলম কথাটি তুর্কী- মোঙ্গলিয়ান প্রভাবিত কাজাক ভাষায় এসে হয়েছে আলমু। যার মানে পৃথিবী অথবা রাজ্য। আর কাজাকরা 'আতা' বলে আপেলকে। এদিক থেকে কথাটির মানে দাঁড়ায় আপেলের দেশ। দেখুন না চারদিকে একবার নজর বুলিয়ে। আপেলে-আপেলে কেমন ছেয়ে আছে শহরের বাগিচাগুলো। পাকার সময় এলে গাছতলায় আপনা থেকেই ঝরে পড়ে থাকে অগুনতি ফল। সেদিকে নজর দেবারও ফুরসত নেই পথচারীদের। কারণ এত ফল খাবে কে?

আরও বললেনঃ তবে এগুলো বাইরে চালান দিয়ে ভাল আয় করে সরকার। আবার বেশ সুস্বাদু এখানকার আপেলের উপজাত নানারকম খাদ্য। যেমন হালুয়া, মোরব্বা। এসবের প্রচুর চাহিদা আন্তর্জাতিক বাজারে।

আলমু-আতা নামের আরেকটি ব্যাখ্যাও শুনলাম রশিদের মুখে। 'আতা' কথাটির বিকল্প মানে করুণা অর্থাৎ দাক্ষিণ্য। এদিক থেকে বিচার করলে জায়গাটির মানে দাঁড়ায়ঃ প্রকৃতির দাক্ষিণ্যপুষ্ট ভূমি। ওর কথায় সায় দিয়ে বললামঃ আমার মতে এ নামটাও কম মানানসই নয়। যে দেশের প্রায় দশ লাখ বর্গমাইল এলাকাই মরুভূমি সেখানে বৃক্ষময় এই চিরহরিৎ উপত্যকাটিকে অবশ্যই প্রকৃতির দান অর্থাৎ গিফট অফ নেচার বলা যায়। মানুষ কেন, জীবজন্তুও তো শুনেছি প্রাণের দায়ে আঁইটাঁই করে এ দেশের কারাকুম এবং কিজিলকুম মরুভূমিতে। যার বালু সাগরের আগুন পেরিয়ে একটানা দশ-বিশ দিন চললেও চোখে পড়বে না একটি ওয়েসিস। সেই নিঃসীম ধূসরের রাজ্যে এ তো আসলেই এক ভূস্বর্গ। এ রিয়্যাল প্যারাডাইস ইন আর্থ।

এই প্রথম শুনলাম এখানকার ইলি নদীর নাম। ইলি ভ্যালির কথা অবশ্য শুনেছি। কিন্তু জানতাম না এ নামে ছয়শ' মাইল দীর্ঘ একটি নদী আছে। যার

www.pathagar.com

রূপালী ধারা চীনের সিংকিয়াং মরুভূমি পেরিয়ে এসেছে এতটা পশ্চিমে। আর সীমান্তে এসে বড় একটি মোড় ঘুরে ঢুকেছে কাজাকদের দেশে। এরপর জোড়া-মরুভূমিতে নেমে গিয়েছে কত যে বাঁক তার হিসাব এরাও রাখে না। জোড়া-মরু বলতে এরা বোঝে কারাকুম আর কিজিলকুমকে।

চীন যেখানে ছুঁয়েছে কাজাক ভূমির পূর্ব-দক্ষিণ সীমান্ত তার বুক জুড়ে এই নদীর বিস্তৃর্ণী শ্যামল উপত্যকা। একমাত্র এখানেই শোনা যায় উত্তর, পূর্ব এবং মধ্য এশিয়ার নানান জাতের পাখীর বিচিত্র কলগুঞ্জন। মোঙ্গল আর তুর্ক গোত্রের লোকদের মতন এরাও বহুভাষী। অর্থাৎ গলায় এদের কত কি সুরের গান!

একটি কাজাক রূপকথার রাজকন্যা- রাজপুত্র

বলখাশ হ্রদের কথা এর আগে একবার বলেছি। এটি কাজাকস্তানের সবচেয়ে বড় জলাশয়। ইলি নদী উত্তর-পশ্চিম চীন ঢুঁড়ে এই হ্রদে এসে সাইবেরিয়ান রাজহংসী হয়ে সাঁতার কাটছে। নদীর দীর্ঘ যাত্রাপথে আছে আমাদের মেঘনার ভাটি অঞ্চলের মতন অনেক বিল আর হাওর। অক্টোবর-নভেম্বরের প্রচণ্ড শীতে যখন সাইবেরিয়ার নদী-নালাগুলো বিশেষ করে বৈকাল হ্রদ ঢেকে যায় বরফে-এখানকার হাল্কা শীতের মৃদু আবহাওয়ায় তখন সেখানকার যাযাবর হাঁসেরা আসে ভ্রমণে। বেশ আরামে মাস কয়েক কাটিয়ে যায় ইলি, আমু আর সির দরিয়ার জলময় প্রমোদ নির্বাসগুলোতে। যেমনটা ওই একই সময় তারা পর্যটনে আসে বাংলাদেশেও।

এখানকার ফুলের কথা বলা হয়নি। আলমা-আতার বাগানে যেমন আছে ফলদার গাছের সাদা-হলুদ আর লাল ফুলের বাহার তেমনি নদীর বিলে আছে নানান জাতের

www.pathagar.com

জলপদ্মের বর্ণালি।

সেদিন পড়ন্ত বেলায় ট্রাম কারে করে বেরিয়েছিলাম শহর ভ্রমণে। মধ্য এশিয়ার একটি শহরে এই প্রথম দেখলাম ট্রামযোগে যাত্রী পারাপার। বেশ ঝকঝকে আর আরামদায়ক ট্রাম কোচগুলো। ভালই লাগছিল আমাদের বৈকালিক ভ্রমণ। নগরের উত্তর-তল্লাটে একটি জায়গায় এসে দেখলাম স্বচ্ছপানির একটি জলাশয়। বুক জুড়ে তার রঙের মেলা বসিয়েছে লাল নীল এবং শেতপদ্মের ঝাড়। এ যেন ঝিলের ওপর চুনি, পান্না এবং রক্তপ্রবাল খচিত এক ভাসমান কার্পেট। মুগ্ধ দুই চোখ তুলে পান করলাম এই পুষ্প সৌন্দর্য।

বেশ সমৃদ্ধ কাজাকদের লোকসাহিত্য। তাদের রূপকথায় আছে উটচারক, মেষের রাখাল এবং ঘোড়সওয়ারদের প্রেমের কাহিনী। কাজাক লোককাহিনীর নায়কদের আকাশ রথে করে আনতে দেখা যায় চীনের রাজকন্যাদের। এর একটা বড় কারণ হল প্রাচীনকাল থেকে মধ্য-দক্ষিণ এশিয়ার এই অঞ্চলের সঙ্গে ইলি-ইয়াংসি নদীর দেশ চীনের নিবিড় ভৌগোলিক সম্পর্ক। বলতে গেলে কাজাক ভূমির সঙ্গে লেগেই আছে সিংকিয়াং। চীনের মান্দারিন ভাষায় যার নাম শিন হিয়াং।

ছয় লাখ একষট্টি হাজার বর্গমাইল এলাকা জুড়ে থাকা এই মরুময় অঞ্চলের অর্ধেকটাই পর্বতাকীর্ণ। উত্তর-দক্ষিণে আর পুর্ব-পশ্চিমে তিনটি পর্বতমালা এফোড়-ওফোঁড় করেছে ভূখন্ডটিকে। এগুলো হল তারবাগাতাই, তিয়েনশান এবং আলতিন তাগ। তিনটি নামেই তুর্কী উজবেগ ভাষার গন্ধ মিশে আছে। তিয়েনশান-এর নামে আছে প্রাচীন মান্দারিন ভাষা আর কাজাক বুলির মিশ্রণ। এখানকার তিন ঐতিহাসিক নদী কাশগড়, ইলি এবং তারিম নেমেছে তিব্বতের উত্তরবর্তী তারাবাগাতাই আর আলতিনের উঁচু চূড়া থেকে। নদীগুলোর নামেও আছে তুর্কী ভাষা পরিবারের শাখা কাজাগ-উজবেকের সৌরভ।

স্বর্ণ এবং সুবজ জেইড পাথরের খনি আছে নদীতটের ভূগর্ভে। ইলি আর তারিমের স্বচ্ছ সলিলধারা পশ্চিমে কাজাক ভূমিতে বয়ে নিয়ে আসে সোনার রেণু এবং সবুজাভ জেইড মণি। সেই কবে থেকে কাজাক মেয়েদের কানে শোভা পেয়ে এসছে নদী থেকে কুড়ানো এই জেইড পাথরের দুল। মধ্য অঞ্চলে আছে তাকলা মাকান মরুদ্যান। তিন পার্বত্য নদীর পানি জায়গাটাকে ভরে তুলেছে সবুজে শ্যামলে। মাকান শব্দটি আরবী-যার মানে বসত। এখানকার লোকজনের নব্বই ভাগই তুর্কী রক্তধারার কাজাক এবং কিরগিজ। এরা সবাই মুসলিম। এরা চীনের সংখ্যালঘু শ্রেণীর একটা বড় অংশ।

তাকলা মাকান মরুদ্যানের আশপাশে আছে আরও কয়েকটি ওয়েসিস। এসব উর্বর ভূমিতে ফলে ভুট্টা, বার্লি, ধান, বাংগি-তরমুজ আর কার্পাস তুলা। বয়ন শিল্পী হিসেবে এখানকার মরুদ্যানবাসী কাজাক এবং কিরিগিজদের বেশ নাম-ডাক। কার্পাস তুলার সুতায় বোনা এদের সালোয়ার, কামিজ, শাল, টুপি, লম্বা কুর্তা ইত্যাদির কারুকাজ দেখার মত। চীনের রাজধানী বেইজিং এবং কাজাক রাজধানী আলমা-

www.pathagar.com

আতার কুটির শিল্প সদনে আমি দেখেছি এসব হাতে বোনা কাজাক-কিরগিজ পোশাকের চাহিদা। ইলি উপত্যকা চীনা-তুর্কিস্তান এবং কাজাকস্তান দুই অঞ্চলকেই দুই হাতে বিলিয়েছে তার দাক্ষিণ্য।

এক সময় সিংকিয়াং অঞ্চলকে বলা হত পূর্ব তুর্কিস্তান। আর কাজাক, কিরগিজ, উজবেক এবং তাজিক ভূমিসহ মধ্য এশিয়ার এদিককার অঞ্চলকে বলা হত পশ্চিম তুর্কিস্তান। দুই অংশেই বাস তুর্কী বংশোদ্ভূতদের। পশ্চিমের এলাকাটি কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ তীর ছুঁয়ে আনাতোলিয়ার বিশাল সমভূমিতে গিয়ে পড়েছে। সেখান থেকে ভূমধ্যসাগর আর কৃষ্ণসাগর পেরিয়ে ছুঁয়েছে ইউরোপ। গ্রীক ঐতিহাসিকদের কাছে দার্দানেলিস এবং বসফোরাস প্রণালী সংলগ্ন আনাতোলিয়ার এদিককার অংশটির নাম ছিল এশিয়া মাইনর। এখানে এক মাইল দীর্ঘ এই দুই জল বিভাজিকার মধ্য দিয়ে কোলাকুলি করেছে দুই মহাদেশ। এই সেদিনও সেলজুক এবং পরে তাদেরই রক্তধারার ওসমানীয় তুর্কীরা শাসন করত পশ্চিম তুর্কিস্তান। এই বংশের সুলতান বায়েজীদ এবং এশিয়া-ইউরোপের ইতিহাসখ্যাত শাসক সুলায়মান দ্য গ্রেটের আমলে তুর্কিরা ম্যাসিডোনিয়া, গ্রীস, যুগোশ্লাভিয়া এবং হাঙ্গেরী পর্যন্ত প্রায় গোটা পূর্ব ইউরোপে বিস্তার করেছিল তাদের আধিপত্য। ভূমধ্যসাগর থেকে তারা উৎখাত করে ইউরোপীয় নৌ-শক্তিগুলোকে। তুর্কী নৌবহর শাসন করত তখন ভূমধ্য এবং কৃষ্ণসাগরের সলিলরাশি।

ভূমধ্যসাগর তুরস্কের নিয়ন্ত্রণে থাকার কারণেই আটলান্টিকের ভেতর দিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশের সন্ধানে জাহাজ নিয়ে বেরিয়ে পনেরশ' শতকের শেষ দিকে আমেরিকা আবিষ্কার করলেন 'জেনোয়ার' নাবিক কলম্বাস। আর পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা একই পথে দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে জাঞ্জিবার দ্বীপ ছুঁয়ে বাধ্য হয়েছিলেন ভারত সন্ধানে আসতে। তিনি নেমেছিলেন পশ্চিম ভারতের কালিকট বন্দরে। ভাস্কো দা-গামার সেই অবতরণই কাল হয়েছিল আমাদের। ১৪৯৮ সালে সেই যে গোয়ায় পর্তুগীজদের আগমন তারপর থেকে বঙ্গোপসাগরে শুরু হল শ্বেতাঙ্গ জলদস্যুদের উপদ্রব। আর এসব ঘটনার আড়াইশ' বছরের ব্যবধানে আমাদের গোটা উপমহাদেশটি গেল ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীদের কব্জায়।

পূর্ব তুর্কিস্তান এবং মধ্য এশিয়ায়ও রক্তপাতের মধ্যদিয়ে ক্ষমতার হাতবদল হয়েছিল বার বার। এখানে চারশ' খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে আলেকজাণ্ডারের বিজয় অভিযানের মধ্য দিয়ে প্রথম স্থাপিত হয়েছিল গ্রীক উপনিবেশ। এরপর এল পারসিক, পূর্ব রোমান অর্থাৎ বাইজান্তাইন, শক -হুন, মোঙ্গল এবং জারশাসিত রাশিয়া আর চীনের হান বংশের আধিপত্যের যুগ। অষ্টম-নবম শতকে দামেশকের উমাইয়া এবং বাগদাদের আব্বাসীয়রা এখানে এল বিজয় নিশান উড়িয়ে। মুসলিম বিজয়ের পর উত্তর এবং মধ্য এশিয়ায় বদলে যায় ইতিহাসের চালচিত্র। এখানে দশম শতকে প্রথম বিশ্বশক্তি হয়ে উঠতে থাকে তুর্কী তাতাররা। তারা খাইবার পার হয়ে এসে ভারতে কায়েম করে তুর্কী সালতানাত। তার আগে ইরান এবং খারেজমের নবদীক্ষিত

www.pathagar.com

মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে লড়তে লড়তে এক সময় তারাও কবুল করে এই ধর্মমত। এখানে তুর্কীদের সঙ্গে মোঙ্গলদের এক আশ্চর্য মিল দেখা যায়।

চেঙ্গিজ খান পারস্য এবং খারেজমের মুসলিম সভ্যতার পীঠস্থানগুলো ভস্মসাৎ করেছিলেন। তার পৌত্র হালাকু খান ধ্বংস করেছিল বাগদাদ। এখানকার বিশ্বখ্যাত 'বায়তুল হিকমা' তথ্যজ্ঞান নিকেতনের বিজ্ঞান এবং দর্শনের দুর্লভ পাণ্ডুলিপিগুলো হালাকু নিক্ষেপ করে দজলা নদীতে। কারণ নরঘাতক হালাকু মনে করত জ্ঞান মানুষকে পরিণত করে কাপুরুষে। সুতরাং পৃথিবীতে জ্ঞানের আধার গ্রন্থ না থাকলেই মানুষ হতে পারবে যুদ্ধজয়ী বীর। কিন্তু দেখা গেল হালাকুর মৃত্যুর পর দু'তিন যুগ পার না হতেই তার বংশধররা অর্থাৎ মোঙ্গল বিজেতারা বিস্ময়করভাবে দীক্ষা নিল ইসলামে এবং এদের অনেকেই পৃষ্ঠপোষক হল সাহিত্য এবং সংস্কৃতির।

রোমানদেরও দখা যায় একই আচরণ করতে। এক সময় রোমে তারা সিংহের খাঁচায় পুরে হত্যা করেছিল খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকদের। পরে সেই দুর্দণ্ড প্রতাপশালীরাই হল রোমান ক্যাথলিক চার্চের প্রবক্তা। ভ্যাটিকানের পোপ হলেন খ্রীস্ট জগতের মাথার মণি। এসব ঘটনা যেন ইতিহাসের এক বিচিত্র নাটক।

কাজাকদের কথা বলছিলাম। মধ্যযুগে তুর্কী শাখাগুলোর সঙ্গে ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পর মধ্য এশিয়ার পূর্ব সীমান্তে তারা গড়ে তোলে এক স্বাধীন দেশ। যেটি এখনকার সিংকিয়াং। এখানকার তুরফান শহর ছিল দেশটির রাজধানী।

ভূমিকম্পে বার কয়েক বিধ্বস্ত হলেও শহরটি টিকে আছে এখনও। যেমন আছে আলমা-আতা। এই শহরও উঠে এসেছে ভূমিকম্পের ধ্বংসস্তূপ থেকে। ওদিকে আছে পাহাড়ের উপর ইতিহাসখ্যাত শহর কাশগড়। একসময় কাশগড়ের বণিকরা বাণিজ্য সম্ভার নিয়ে আসতেন কাশ্মীর, তিব্বত এবং বাংলাদেশে।

কাশগড়ের উত্তরে খোটান, খুলজা এবং মরুদ্যানের শহর উরুমচি। এক সময় বৌদ্ধধর্মের পীঠস্থান ছিল এসব জায়গা। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে খোটান হয়েই বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য আফগানিস্তানের প্রাচীন গান্ধারায় এসেছিলেন চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন। তখন ভারতে ছিল গুপ্ত যুগ। আবার এ পথেই খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে প্রখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং এসেছিলেন বাংলাদেশে। ষোলশ' শতকে ভয়াবহ ভূমিকম্প আর আবহাওয়া বদল হওয়ায় কাজাকদের তুরফান রাজ্যটি জেরবার হয়ে যায়।

উনিশ শতকে চীনারা এখানে স্থাপন করে তাদের আধিপত্য। উপনিবেশ হিসেবে তারা শাসন করত এলাকাটি। তখন অঞ্চলটাকে বলা হত চীনা তুর্কিস্তান। আঠারো শতকে চীনের সম্রাট এবং রাশিয়ার জারদের মধ্যে এলাকাটির অধিকার নিয়ে বাধে তীব্র সংঘাত। রুশরা জয়ী হলে পরে এলাকাটির নাম হল রাশিয়ান তুর্কিস্তান। ১৮৫৮ সালে মধ্য এশিয়ার এই গোটা অঞ্চল রুশদের হাতে চলে যায়। ১৯১২ সালে চূড়ান্তভাবে সীমানা নির্ধারিত হল কাজাকস্তানসহ গোটা পশ্চিম তুর্কিস্তানের। এর আগে এখানে ছিল সেলুকাস এবং তার গ্রীস উত্তরসূরিরা, কুষান শাসক গোষ্ঠী,

www.pathagar.com

পারস্যের সাসানীয় বংশ আর খারেজমের সুলতান এবং বুখারার খানদের শাসন।

ব্যাকট্রিয়া ছিল গ্রীকদের পূর্ব সাম্রাজ্যের রাজধানী। ঐতিহাসিক বলখকে গ্রীকরা বলত ব্যাকট্রিয়া। কারাকুম এবং কিজিলকুম মরুভূমিতে দেখেছি উটের পাল চরে বেড়াতে। এসব উটকে এখনও বলা হয় 'ব্যাকট্রিয়ান ক্যামেল'। অর্থাৎ বলখী উট।

রুশ বিপ্লবের পর কাজাকস্তানে আসে সমাজতন্ত্র। এ যুগে আধুনিকতা এসেছে এ দেশে। সাইবেরিয়ার সঙ্গে রেল যোগাযোগ গড়ে ওঠায় এখন দ্রুত ঘুরে আসা যায় উত্তর এশিয়ার শেষ প্রান্তে। আবার ককেশাস দিয়ে যাওয়া যায় ইউরোপে। আলমা-আতা এ অঞ্চলের বড় রেল জংশন। একটি আধুনিক রেল স্টেশন এটি। চমৎকার এর স্থাপত্য।

কাজাকদের সাহিত্য এবং সংস্কৃতি দু'একটা কথা বলা দরকার। অনেক প্রাচীন এদের লোকসাহিত্য। মধ্যযুগে আরব এবং ইরানের সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসায় পরিপুষ্ট হয়েছে এটি। কাজাক লোকসাহিত্যে প্রভাব পড়েছে আরব্য রজনী অর্থাৎ আলেফ লায়লার অনেক গল্পের। যেমন এখানকার বেশ কিছু উপকথায় আছে আরব্য রজনীর উড়ন্ত ঘোড়া, জাদুকর, দৈত্য, রাজপুত্র, রাজকন্যা, জীন ইত্যাদির কথা। 'উড়ন্ত ঘোড়া' নামক একটি কাজাক রূপকথায় আছে- কেমন করে এখানকার এক রাজপুত্র চীনের এক সুন্দরী সুলতান-কন্যাকে মেঘের উপর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে এসেছিলেন। মেয়েটি পরমা সুন্দরী ছিল বলে তাকে আকাশে নির্মিত এক প্রাসাদে রাখা হয়েছিল। যাতে কেউ তাকে দেখে ছিনতাই করতে না পারে। কাজাকরা কেবল অপূর্ব সুন্দর রূপকথারই স্রষ্টা ছিল না। গাথা কাব্যেও স্ফুরণ ঘটতে দেখা যায় তাদের সহজাত প্রতিভার। মরুজীবনের ক্লান্তিহীন সংগ্রামের সঙ্গে প্রাণের গভীর লালিত প্রেম আর বিরহ-বেদনাকে অনুরঞ্জিত করে রূপ দিয়ে গেছে তারা মধ্য এশিয়ার সব থেকে বর্ণাঢ্য লোককাহিনীর।

আমাদের বাউল কবিদের মতন এক ধরনের একতারা হাতে নিয়ে যাযাবর কাজাক কবিরা যেতেন এক মরুদ্যান থেকে আরেক মরুদ্যানে। আর গলা চড়িয়ে গাইতেন পূর্বপুরুষদের কষ্টকল্প জীবনের যন্ত্রণার গান। গাইতেন মধ্যযুগের কাজাক বীরদের দুঃসাহসিক অভিযাত্রা আর তাদের প্রেম এবং বিরহের ওপর রচিত পালাসংগীত।

কাজাকদের রক্তধারায় আছে সাইবেরিয়া এবং উরাল-আলতাই মরু অঞ্চলের আদিম মোঙ্গলীয় আর তুর্কি জনগোষ্ঠীর মিলিত রক্তের মিশ্রণ। চেঙ্গিস খানের পুত্র বাতু খানের গোল্ডেন হোর্ড বাহিনীর যে ক্ষুদ্র অংশটি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল আলতাই পর্বত আর কাজাক মরু অঞ্চলে-শেষ অব্দি তারা একাকার হয়ে যায় এদের সঙ্গে। মোঙ্গল-তুর্কি রক্তধারার লোকদেরই মহাকবি ফেরদৌসী এবং ঐতিহাসিক রশিদ উদ্দিন চিহ্নিত করেছেন তাতার নামে।

এই তাতারেরা এখন কাজাক জনগোষ্ঠীরই অংশ। ইতিহাসকালের গোড়ার দিকে শক-হূন-কুশান জাতি এবং খ্রীষ্টপূর্ব যুগে পারসিক আর গ্রীকরা মধ্য এশিয়া দখল করতে এসে কম রক্তপাত ঘটায়নি কাজাক ভূমিতে। তেমনি স্বগোত্রীয় তাতার

www.pathagar.com

বিজেতারাও রক্তস্রোত বইয়েছিল এখানকার শান্তিপূর্ণ মরুদ্যানের জনপদগুলোতে।

মোঙ্গল সোনালী তাঁবুর সেনাদল দু'শ' বছর শাসন করেছিল রুশ ভূমি এবং কৃষ্ণসাগরের পশ্চিমে বল্কান পর্বতমালার দেশ। তখন এই সেনাদলে যোগ দিয়েছিল স্লাভ রক্তধারার রুশ, তুর্কি রক্তধারার খাজার আভর-কুমান-আজারী এবং উজবেকেরা। সেই অভিযানকালে উরাল-আলতাই পার্বত্য ভূমি, কিজিলকুম-কারাকুম মরু অঞ্চল, আমু আর সিরদরিয়া এবং আরল সাগরের শ্যামল উপত্যকায় চালিয়েছিল এরা অকথ্য উৎপীড়ন। সে সব কথা ভুলে যাননি কাজাক কবিরা।

নিজেদের লোককাহিনীতে এসব দুর্ভাগ্যের কথা লিখে রেখে গেছেন মধ্য যুগের কাজাক কবি ফুজুলী, বাকি, ইউনুস এমরী, নাদিম, আসিক উমর, এমরাহ্ কাইসেরিলা প্রমুখ। এসব ক্লাসিক্যাল কাব্যকাহিনী আধুনিক কাজাক সাহিত্যের পাঠকদের কাছে এই বিশ শতকেও অসাধারণ জনপ্রিয়।

সুদূর অতীতে কাজাক জনগোষ্ঠী আলতাই, উরাল এবং তিয়েনশানের রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তরে উট আর মেষচারণ করে জীবন ধারণ করত। পশুপাল নিয়ে তারা সন্ধান করত তৃণভূমির। যেখানে ঘাস এবং তৃণগুল্ম সেখানেই পড়ত তাদের ডেরা। সঙ্গে থাকত বৃদ্ধ পিতা-মাতা আর স্ত্রী-পুত্র-কন্যা। চলমান সংসার নিয়ে উটের পিঠে পাড়ি দিতে হত তাদের এক মরু থেকে আরেক মরু। এভাবে কেটে যেত বছরের পর বছর। খুঁজে-পাওয়া নতুন তৃণভূমি কিংবা মরুদ্যান হত কাজাক গোত্রগুলোর আপন ভূমি।

উট, ঘোড়া আর মেষ এবং ছাগ পাল ছিল কাজাকদের কাছে জীবনের আরেক নাম। রোদে-পোড়া প্রান্তরে উট এবং ঘোড়া ছিল তাদের একমাত্র বাহন। এদের ছাড়া অজানা-অচেনা মরু পাড়ি দেয়ার কথা কল্পনাও করতে পারত না তারা। আবার মরুদ্যানে খরা দেখা দিলে এদের দুধ এবং মাংস খেয়েই বেঁচে থাকতে হত তাদের মাসের পর মাস। উটের পশম দিয়ে তারা বুনত শীতবস্ত্র, কম্বল আর তাঁবুর আচ্ছাদন।

তাদের কারাকুল ভেড়ার নামডাক দুনিয়া জোড়া। 'কারা' শব্দটির মানে কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ কালো। এটি একটি কাজাক-তুর্কি শব্দ। এই কালো ভেড়ার শাবকের চামড়া তুলতুলে নরম এবং বেশ টেকসই। এর ব্যাপক চাহিদা রাশিয়ায়, চীনে, আমাদের উপমহাদেশে আর ইউরোপ জুড়ে। একালে উন্নতমানের আধুনিক কারাকুল শিল্প কারখানা গড়ে উঠছে আলমা-আতায়, কাশাগড়ে, বুখারায় এবং সমরকন্দ তাসকন্দে। আর মারভ, আলকাবাদ প্রভৃতি শহরে। কারাকুল দিয়ে হয় অপূর্ব কুটির শিল্প সম্ভার, এ ছাড়াও নানান জাতের আকর্ষণীয় চামড়ার পোশাক। আমি আলমা-আতায় এবং সমরকন্দে দেখেছি এসব মনোলোভা কারাকুল শিল্প সামগ্রী।

কাজাক, কিরগিজ, উজবেক এবং তুর্কমেন সাহিত্যে আছে কারাকুল মেষের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। মধ্য এশীয় যাযাবর, উটচারক আর কৃষকদের জীবনে এই মেষদের অবদানের শেষ নেই। চামড়া ছাড়াও এদের পশমে হয় কারুখচিত উৎকৃষ্ট কার্পেট। মাংসে হয় এদের সুস্বাদু কাবাব। যাকে এরা বলে শিশ-কাবাব। আর আমরা বলি শিক-কাবাব।

www.pathagar.com

বাংলাদেশসহ আমাদের তাবৎ উপমহাদেশে কাবাব এবং পোলাও'র প্রচলন হয়েছে এই মধ্য এশিয়া থেকে। তুর্কি, ইরানী আর আফগানরা এই খাদ্য রীতি চালু করেছেন এ অঞ্চলে। মধ্য এশিয়ার তুর্কি জ্যাকেট, কান-টুপি, চাদর, কম্বল, আলখেল্লা আর মেয়েদের শীতকালীন গাত্রাবরণে কারাকুল পশমের শৈল্পিক কাজ মনোমুগ্ধকর। কাজাক-কিরগিজ এবং উজবেক মহিলারা তাদের নিপুণ হাতে ফুল-পাতা-পাখীর রংদার বুটি তুলে মোহনীয় করে তুলেন এসব সামগ্রী।

সেকালে চেঙ্গিস খান, বাতু খান, কুবলাই খান, তৈমুর, উলুগ বেগ এবং বুখারা, খিবা আর কোকন্দ-এর খানদের দরবার জমকালো দেখাত এসব মোহনীয় কার্পেটের জৌলুসে। খোলা প্রান্তরে চেঙ্গিসের বিশাল দরবার ছিল একটি তাঁবুর শহর। তার দরবারের লেখকদের বর্ণনায় আছে বিভিন্ন দেশের দূত এবং বিজয়ী সেনাপতিদের খেলাত বিতরণের জন্য চেঙ্গিজ অনেক সময় অভিযান পথেই আয়োজন করতেন রাজকীয় দরবারের। অসংখ্য তাঁবুর প্রকাণ্ড এই ঘেরাটোপের মেঝে শোভিত থাকত চিত্রখচিত বিরাটকায় কার্পেটে। এর কোন কোনওটি হত লম্বায় দুই থেকে তিন হাজার গজ। চওড়াতেও হত প্রায় একই রকম।

কথাটা উঠেছে কাজাকদের ইতিহাস, তাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি আর পরবর্তীকালের ভূমিকেন্দ্রিক জীবন নিয়ে। একথা সত্য, এক সময় কাজাকরা তাদের আদিম পূর্বপুরুষ তাতারদের মতই ছিল দুর্ধর্ষ। তারা কাস্পিয়ানের উত্তর-পশ্চিম উচ্চভূমি এবং উরাল-আলতাই অঞ্চল থেকে এখনকার কাজাকস্তানে অভিযান চালায় দ্বাদশ শতকের দিকে। এদের মূল শাখা ছিল তুর্ক ভাষাভাষী। এই অঞ্চলে বসত গড়বার পর এদের বলা হত কিরগিজ তুর্কিদেরই আরেকটি শাখা। গোড়াতে গৌরবর্ণ হলেও সুদীর্ঘকাল মধ্য এশিয়ার মরু অঞ্চলে বসবাসের জন্য কিরগিজদের গায়ের রং খানিকটা তামাটে হয়ে ওঠে।

কাজাকরা একই গোত্রের লোক হলেও মরুবাসী তামাটে কিরগিজদের থেকে নিজেদের আলাদা করবার জন্য ওদের বলত কারা-কিরগিজ অর্থাৎ কালো কিরগিজ। কিরগিজদের পূর্বপুরুষ এক গোত্রপতির নাম ছিল কাজাখ। এ অঞ্চলে বিজয় পতাকা উড়িয়ে-আসা কিরগিজদের নতুন শাখাটি ওই গোত্রপতির নামেই নিজেদের কাজাক বলে পরিচয় দিতে থাকে। তবে উনিশ শতকে মধ্য এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তারের পর জারদের সরকারী দলিলে এদের কিরগিজ বলেই উল্লেখ করা হত।

তবে রুশ বিপ্লবের পর কাজাক এবং কিরগিজরা দুই পৃথক জাতি হিসেবেই পরিচিত হয়। ১৯২০ সালে এখনকার কাজাকস্তানকে কিরগিজ স্বশাসিত অঞ্চলের মর্যাদা দেয়া হল। ১৯২৫ সালে হল এটি কাজাক স্বশাসিত সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র। আর ১৯৩৬ সালে সাংবিধানিকভাবে কাজাকস্তান পেল সোভিয়েত ইউনিয়নের অঙ্গীভূত এক স্বতন্ত্র প্রজাতন্ত্রের মর্যাদা।

এ যুগেই আধুনিকতার গোড়াপত্তন হল কাজাক ভূমিতে। নির্মিত হল বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার, বিশ্ববিদ্যালয়, সাহিত্য সদন, ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক জাদুঘর।

www.pathagar.com

পাশাপাশি গড়ে উঠল বস্ত্র শিল্প, রেশম শিল্প এবং যন্ত্র শিল্পের অনেক কলকারখানা। একটি পরিসংখ্যানে দেখলাম ১৯২৮ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে মাত্র এগারো বছরে একশ' কুড়িটি বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে দেশটিতে। সবচেয়ে অবাক হওয়ার মতন ঘটনা হল দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের বিপর্যয়ও ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি কাজাকদের অগ্রগতি এবং নির্মাণের জোয়ার।

১৯৩৯ সালে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরেকার চার বছরে চুয়াল্লিশটি নতুন শহর গড়ে উঠে এই মরুময় দেশে। যেখানে আগে ছিল সূর্যের খরতাপ থেকে কাজাক যাযাবরদের মাথা গোঁজার কিছু মেটে ডেরা সেখানে নির্মিত হয়েছে পশ্চিমা ধাঁচের আধুনিক শিল্পনগর। নির্মিত হয়েছে স্কুল-কলেজ, খেলাধুলার স্টেডিয়াম, বিপণী-বিতান, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, কাফেটোরিয়া কমিউনিটি সেন্টার ইত্যাদি কত কি। আধুনিক সুযোগ-সুবিধায় সমৃদ্ধ এসব নতুন শহর।

এই সেদিনও এক অন্ধকার দুনিয়ায় বাস্ ছিল কাজাকদের। উট এবং কিছু পার্বত্য টাট্টুঘোড়া এবং খচ্চর ছাড়া এদের চলবার উপায় ছিল না দূরান্তের কোনও মরুদ্যান কিংবা তৃণভূমিতে যাওয়ার। এখন কংক্রিটের পাকা চওড়া সড়কে আধুনিক মডেলের মোটরযান এবং ট্রাকে পাড়ি দেয় এরা হাজার হাজার মাইলের পথ।

কাজাক কৃষকদের অনেকের কাছেই মনে হয় এ যেন এক ভোজবাজি। মাত্র পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে এ রকম একটা বৈপ্লবিক রূপান্তর এসেছে তাদের এককালের এই ঊষর মরুময় দেশে।

আরবের বেদুঈনের মত এই সেদিনও কাজাক পশুচারকরা লু-হাওয়ার শাঁ-শাঁ ধ্বনির সঙ্গে তাল রেখে দিগন্ত নীল প্রান্তরে গাইত তাদের কষ্টকর জীবনের দুঃখের গান। অশিক্ষিত কাজাক লোককবিরা মাটির কুঁড়ে ঘরে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে ফেরা মরু রাখালদের শোনাত প্রাচীনকালের উপকথা এবং রূপকথা।

আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের কাহিনীর জন্ম কাজাকদেরই দেশে। অষ্টম নবম শতকে পারস্য জয় করে আরবরা এ অবস্থানে আসবার পর এই কাহিনীটি মুখ থেকে মুখে ফিরে চলে যায় খোরাসানা বুখ-রায় এবং সমরকন্দে।

সেখান থেকে পাড়ি জমায় শাতিল আরবের দেশ ইরাকে। আর স্থান পায় বাগদাদে রচিত আরব্য উপন্যাসে। শত শত লেখক এবং গল্পকারের যোগ করা এই বিশাল আরব্য-রজনীর গল্প সংহিতায় আপন আসন করে নিয়েছে মধ্য এশিয়ার এ রকম চমকপ্রদ অসংখ্য রূপকাহিনী ঃ

রাতারাতি এদেশে একটার পর একটা মনোরম শহর গড়ে ওঠায় এবং রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে থাকা মরুভূমিতে জালের মতন রেল লাইন ছড়িয়ে পড়ায় কাজাক বুড়োরা স্মরণ করত আলাদীনের যাদুর চেরাগের গল্পকথা। বিস্মিত হয়ে তারা ভাবত এসব নিশ্চয়ই উইগর-কাজাকদের বিধরা মায়ের সাহসী ছেলে আলাদীনের অনুগত সেই দৈত্যের কাজ। প্রদীপ ঘষলেই যে দৈত্য হাজির হত ছেলেটির কাছে এবং তার হুকুমে আকাশে উঠিয়ে নিয়ে যেত তাকে হাজার যোজন

www.pathagar.com

পেরিয়ে কোনও ভিন দেশে। মুহূর্তে বানিয়ে দিত মনোরম শহর, ফলফুলের সবুজ বৃক্ষখচিত উদ্যান, কিংখানের ঝালর দেয়া রেশম-মসলিন আর মখমলের পোশাক।

সেই বুড়োরা এখন তাজ্জব হয়ে দেখলেন- নবযুগের কাজাক তরুণ- তরুণীরা বৈমানিক হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। নতুন শহরগুলোর রেশম কারখানাগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে দেখছে আলাদীনের পোশাকের মতন জমকালো মিহি বুটিদার রেশমী পোশাক। বস্ত্র কারখানা থেকে বেরুচ্ছে কার্পাস তুলার রকমারি কাপড় এবং পুরুষদের শার্ট, কোর্তা, প্যান্ট। আর মেয়েদের গারারা, সালোয়ার, কামিজ, ওড়না, চাদর ইত্যাদি। সেকালের উটের কারাভাঁর জায়গা দখল করেছে বড় বড় রেল ওয়াগনের বহর। রেল সড়ক তো গোটা দেশটাকেই ঘিরে রেখেছে। ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেল সড়ক সীমান্তের কিনার ছুঁয়ে ছুঁয়ে হাজার মাইল পাড়ি দিচ্ছে সাইবেরিয়া হয়ে উত্তর মেরু সাগরের নভো ব্রিস্ক শহরে। কাজাকরা তাদের ভাষায় এই সুদীর্ঘ রেল সড়ককে বলে 'তুর্কসিব'। ১৯২৬ সালে শুরু হয় রেলের এই মহাসড়কের নির্মাণ কাজ। ১৯৩০ সালে মাত্র চার বছরে শেষ হল কাজটি। হাজার হাজার কাজাক শ্রমিক পিঁপড়ার পালের মতন রাতদিন খেটে গড়লেন এই দুই হাজার মাইলের সড়ক।

এ-ও বুড়োর কাছে আরেক ভোজবাজির গল্পের মতন মনে হয়। এ লাইনের একটি শাখা ট্রান্স-কাস্পিয়ান রেল সড়কের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ছুঁয়েছে তাসকন্দ এবং সমরকন্দ শহর। আরও ছয়টি দীর্ঘ রেল পথ নির্মিত হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর যুগে।

এর একটি গেছে উরালে দক্ষিণে এটি ছুঁয়েছে বলখাশ হ্রদের তীরবর্তী কারাগান্ডার মরুউদ্যান শহর। বলখাশের তীর লেকে এমবার তেল খনি পর্যন্ত গেছে আরেকটি রেল লাইন। বলখাশ হ্রদের কারাগান্ডা শহরের জংশন থেকে জাজ কাজগানের তামার খনিতে গেছে ২৬০ মাইল দীর্ঘ অন্য একটি রেল সড়ক। পাবলোদা শহরটিকে ছুঁয়েছে চারশ' মাইলের নতুন এক রেল লাইন।

নৌ যোগাযোগেও অন্ধকার যুগ পেরিয়ে নতুন যুগে পা রেখেছে মধ্য এশিয়ার এককালের ধুলোমলিন তিমিরাচ্ছন্ন এই দেশ। চারটি নদীকে খাল কেটে একত্র করে সাত হাজার দু'শ' মাইলের এক বিশাল নৌপথ গড়ে তোলা হয়েছে। নদীগুলো হল সিরদরিয়া, নীরা, ইরতিশ এবং ইলিদরিয়া। যোগাযোগের এই বিপ্লব আধুনিক কাজাকস্তানের এক রূপকথা। আর খনিজ সম্পদের গল্প ? বলতে গেলে এদেশ এখন ভাসছে তেল, তামা, সীসা, ইউরেনিয়াম, কয়লা, সোনা-রূপা এবং আরও অনেক ধাতব ভূগর্ভস্থ খনির সাগরের ওপর। খনিজ সম্পদের উত্তোলন এ দেশকে প্রাচুর্যের মুখ দেখিয়েছে। আর এদের পৌরাণিক এবং আধুনিক সাহিত্য-শিল্প সংস্কৃতির সম্ভার রেল-নৌ আর বিমান পথ ধরে বিশ্বগামী হতে শুরু করেছে।

= সমাপ্ত =

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

সানাউল্লাহ নূরী ঃ একটি পরিচিত নাম। তিনি ছিলেন একজন সুনামখ্যাত জাতীয় সম্পাদক, ঔপন্যাসিক, শিশুতোষ লেখক, ঐতিহাসিক, কলামিস্ট এবং কবি।

আনধার মানিকের রাজকন্যা, নিঝুম দ্বীপের উপাখ্যান, রোহিঙ্গা কন্যা, আফ্রিকানা আমার ভালবাসা ইত্যাদি তাঁর উপন্যাস। আদিগন্ত, স্বর্গের এ প্রান্তে, মোহক নদীর বাঁকে-অনুদিত উপন্যাস। আলেখ্য-গল্প গ্রন্থ।

বঙ্গোপসাগরের রূপকথা, সোনার হরিণ চাই, বুদ্ধি শেখার গল্প, বিশ্বের সেরা এক শিশু, দারুচিনি দ্বীপের দেশে শিশু-কিশোরদের প্রিয় বই। দারুচিনি দ্বীপের দেশে সপ্তম শ্রেণীর সাহিত্য পুস্তকে পাঠ্য ছিল দেড় যুগ। বিশ্বের প্রথম রিপোর্টার কিশোরদের আরেকটি মনমাতানো বই।

বোশেখ আসে পাগল ঘোড়ায়, মেঘের নৌকায় চাঁদের ছেলে-ছড়ার বই। আন্দোলিত জলপাই, শান্তির পদাবলী কাব্যগ্রন্থ।

বঙ্গোপসাগরের ইতিহাস, হিউয়েন সাং যখন বলেন, ভুলুয়া–সমতট সভ্যতা, সাংবাদিকতার ইতিহাস, সাংবাদিকতার অগ্নিযুগ, নোয়াখালীর ইতিবৃত্ত-ইতিহাস সমৃদ্ধ লেখা। পথ চলতে দেখা,
রাষ্ট্রভাষা ঃ কিছু ইতিহাস আর কিছু স্মৃতি,
স্বাধীনতা ঃ স্বাদেশিক চেতনার আলোকে-স্মৃতি কথ।

উপমহাদেশের হত্যার রাজনীতি, পার্লামেন্টারী রাজনীতি, বিশ্বনবীর পররাষ্ট্র নীতি-রাজনৈতিক লেখা।

বাংলাদেশের সমাজ সংস্কৃতি এবং ভাষার বিবর্তন, পয়লা বৈশাখ এবং নববর্ষ- সমাজতাত্ত্বিক লেখা।

বিশ্ব সাহিত্য ও সুফী দর্শন, মহানবী (সঃ) এর রাজনৈতিক দর্শন-দর্শনের লেখা।

এছাড়াও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আছে তাঁর অনেক লেখা।
জন্মঃ ১৯২৮ সালের ২৮ মে।
মৃত্যুঃ ২০০১ সালের ১৫ জুন।

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা

www.pathagar.com